সহস্র এক আরব্য রজনী

ডঃ জে· সি· মারড্রুসের

সহস্র-এক আরব্য রজনী

[চার খণ্ডে পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ]

দ্বিতীয় খণ্ড

ভাষান্তর

ক্ষিতীশ সরকার
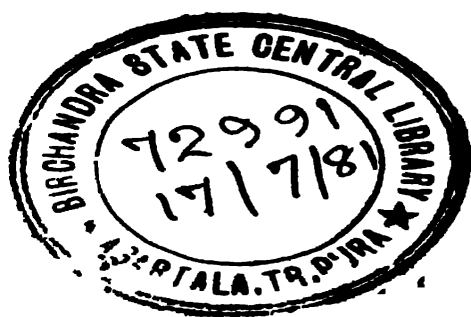
ক্যালক্যাটা পাবলিকেশনস্

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

SAHASRA-EK-ARABYA RAJANI

Rendered into Bengali

By

Kshitish Sarkar

প্রথম সংস্করণ শ্রাবণ, ১৩৫৪

প্রকাশক ॥ মলয়েন্দ্রকুমার সেন

ক্যালকাটা পাবলিকেশনস্

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা—৭০০০৭৩

মুদ্রাকর ॥ শ্রীতিনকড়ি বারিক

অনন্ত প্রেস

৫১, ঝামাপুকুর লেন,

কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী ॥ মণীন্দ্র মিত্র

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ॥ ইম্প্রেসন হাউস

কলিকাতা-৭০০০০৯

● মূল্য চল্লিশ টাকা ●

সহস্র এক আরব্য রজনী

একশো সত্তরতম রজনীর দ্বিতীয় যামে ছোটবোন দুনিয়াজাদ গালিচা থেকে উঠে এসে শাহরাজাদের পাশে বসে বললো, এবার তোমার গল্প শুরু করো দিদি।

শাহরাজাদ বললো, শাহেনশাহ যদি শুনতে চান নিশ্চয়ই শোনাবো বোন।

শাহরিয়ার বলে, আমি শোনার জন্যে হাঁ করে আছি শাহরাজাদ। তুমি এবার শুরু কর।

শাহরাজাদ বলে, তা হলে শুনুন, জাঁহাপনা, এবার শাহজাদা কামার অল-জামান আর শাহজাদী বদর এর প্রণয় কাহিনী বলছি :

বহুকাল আগে খালিদানে শাহরিমান নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ ছিলেন। ধন-দৌলত, লোক-লস্কর, সৈন্য-সামন্তে তার তুল্য সুলতান সে সময়ে সমগ্র আরবে আর কেউ ছিল না। একদিকে কঠোর হাতে শত্রু দমন এবং অন্যদিকে দক্ষতার সঙ্গে প্রজাপালন তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। বিলাস ব্যসনেও ছিল তাঁর প্রগাঢ় আসক্তি। চারটি বেগম এবং সত্তরটি রক্ষিতা ছিল তাঁর হারেমে। কিন্তু এ সত্ত্বেও বাদশাহর মনে সুখ ছিল না। দেখতে দেখতে বয়স গড়িয়ে বিকেল হতে চললো, কিন্তু বাদশাহর কোনও সন্তানাদি হলো না। তার এই বিশাল সলতানিয়তের কে হবে উত্তরাধিকারী, সেই চিন্তাতেই নিয়ত মুহ্যমান হয়ে থাকেন তিনি।

চিন্তায় চিন্তায় দিন দিন কৃশকায় হতে থাকেন সুলতান। একদিন প্রধান উজিরকে মনের দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, আল্লাহ আমাকে সবই দিয়েছেন। কোনও দিকেই কোনও অভাব রাখেননি। কিন্তু একটি পুত্র সন্তান থেকে কেন আমাকে বঞ্চিত করলেন তিনি?

উজির চট করে এ কথার কোনও জবাব দিতে পারে না। এ দুঃখ তো শুধু তাঁর একার নয়। সমগ্র খালিদানবাসী সদা সর্বদা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানায়, সুলতান যাতে পুত্র লাভ করেন।

গভীরভাবে চিন্তা করে অনেকক্ষণ পরে উজির বললো, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এ সমস্যার সমাধান কেউ করে দিতে পারে না, জাঁহাপনা। আপনি তাঁকেই স্মরণ করুন। নিশ্চয়ই তিনি আপনার আবেদনে সাড়া দেবেন। আজ রাতে যখন আপনি হারেমে যাবেন তার আগে শুদ্ধাচারভাবে হাতমুখ ধুয়ে রুজু করে নামাজ সেরে নেবেন। নামাজান্তে আল্লাহর কাছে

প্রার্থনা জানাবেন, আজ রাতের সহবাসে যেন একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়।

—চমৎকার কথা বলেছ উজির, আনন্দে প্রায় চিৎকার করে ওঠে শাহরিমান, আমারও মনে হয় এতে আল্লাহ ফেরাতে পারবেন না আমাকে।

সুলতান খুশি হয়ে উজিরকে মূল্যবান সাজ-পোশাক উপহার দিলেন। সন্ধ্যাকালে একটি মনমতো রক্ষিতা পছন্দ করলেন। আজ রাতে তার ঘরেই তিনি কাটাবেন। উজিরের পরামর্শ মতো বেশবাস পরিবর্তন করে শুদ্ধ চিত্তে নামাজ সারলেন। নামাজান্তে কায়মনে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন, আল্লাহ, তুমিই একমাত্র ভরসা, তুমি না দিলে আমি এই অতুল বৈভবের মালিক হয়েও দীনভিখারী হয়েই থাকবো।

সেই ঋতে সুলতান যে রক্ষিতার ঘরে গিয়েছিলেন দশমাস পরে তারই গর্ভে এক সুদর্শন পুত্রের জন্ম হয়। শাহরিমান আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন। এতকালের সাধ তাঁর পূর্ণ হলো। সারা সলতানিয়তে আনন্দের বন্যা বয়ে যেতে লাগলো। প্রজারা নবজাতকের শতায়ু কামনা করে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করলো। সুলতান আদর করে তার নাম রাখলেন কামার অল-জামান—অর্থাৎ এ যুগের চাঁদ।

তা চাঁদই বটে। এমন রূপ চোখে পড়ে না। তারায় ভরা চৈত্র মাসের রাতে ছাতের ওপর মাদুর পেতে চিৎ হয়ে শুয়ে দূর নীলনভে যে রূপের হাট প্রত্যক্ষ করা যায় একমাত্র তার সঙ্গেই বুঝি তুলনা চলে কামার অল-জামানের রূপ। অথবা কোনও এক বসন্ত বিকালের বিদায়ী সূর্যের বিদায় চুম্বনে আরক্তিম হাজার হাজার ফোটা ফুলের সমারোহে তার তুল্য রূপ ধরা পড়ে।

শাহরিমান পুত্রকে কোনও সময় চোখের আড়াল করেন না। তার লেখাপড়া শেখানোর ভার দেওয়া হয় শহরের সবচেয়ে নামজাদা মৌলভীর ওপর। দিনে দিনে বড় হতে থাকে কামার অল-জামান।

যখন তার পনেরো বছর বয়স, জামানের দেহে যৌবনের জোয়ার আসতে থাকে। শাহরিমান পুত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবেন, আল্লাহ তাকে যখন দিলেন, দুহাত ভরেই দিলেন। এমন রূপ তিনি কখনও চোখে দেখেননি।

সুলতান মনে মনে স্থির করলেন, এবার পুত্রের শাদী দিয়ে দিতে হবে। তার নিজের বয়স হয়েছে। মানুষের শরীর বলা যায় না, হুট করে মরে গেলে মনের সাধ মনেই রয়ে যাবে। উজিরকে ডেকে বললেন, শোন, উজির, ছেলে তো বড় হলো, আমার শরীর স্বাস্থ্যও দেখছো, খুব ভাল নাই। তা জামানের যদি শাদী দিয়ে দিই খুব কি খারাপ দেখাবে। ওর শাদীটা না দেখে যদি মরি আমার এত কালের সাধ অপূর্ণ থেকে যাবে।

উজির বললো, জাঁহাপনা পুত্র আপনার জ্ঞানে গুণে বিদ্যায় বুদ্ধিতে উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। এখনই শাদীর প্রশস্ত সময়। আমার মনে হয় আর দেরি না করে শুভ কাজ সম্পন্ন করে দিন। আপনার প্রজারাও এই শুভ দিনটির জন্যে অধীর আগ্রহে দিন গুণছে। তাছাড়া স্বামী স্ত্রীর সহবাসে দেহ ক্লেদ মুক্ত হয়। সুতরাং আপনি যা ভেবেছেন তা চমৎকার।

সুলতানের মনে যেটুকু দ্বিধা ছিল তাও সাফ হয়ে গেল। কামার

অল-জামানকে খবর পাঠালেন। একটু পরেই জামান এসে বাবাকে কুর্নিশ জানিয়ে অবনত মস্তকে দাঁড়ায়। —আব্বাজান, আমাকে ডেকেছেন?

এই সময়ে রাত্রি অবসান হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো। দুনিয়াজাদ বলে, কি সুন্দর করে তুমি বলতে পারো দিদি—!

শাহরাজাদ বলে, এবার একটু ঘুমিয়ে নে।

বাদশাহ শারিয়ার শাহরাজাদকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। —সত্যি, শাহরাজাদ, কিসসাগুলো শুনতে শুনতে কোথা দিয়ে যে রাত কাবার হয়ে যায় বুঝতেই পারি না। তুমি আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছ।

শাহরাজাদ বলে, সেই জন্যেই তো আমি সকাল হতে না হতেই গল্প থামিয়ে দিই, জাঁহাপনা। সারারাত্রি জাগরণের পরে আপনার যাতে ঠিক মতো ঘুম হয় সেটাও তো আমাকে দেখতে হবে।

শারিয়ার আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে, কেন? দেখতে হবে কেন? আমার ভবিষ্যৎ খারাপ হলে তোমার কী?

বা রে, আপনিই তো আমার সব। স্বামী ছাড়া মেয়েদের আর কি থাকে?

শারিয়ার শাহরাজাদের ঠোঁটে ঠোঁট রাখে। দুনিয়াজাদ দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে নিজের ঠোঁট। রক্ত বেরিয়ে যায়। আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে, সুলতান শারিয়ারের বুকের নিচে কি করে তার দিদি হারিয়ে যেতে থাকে। শাহরাজাদ একটা মৃদু চাপড় দিয়ে দুনিয়াজাদকে বলে, দূর মুখপুড়ী, পাশ ফিরে শো।

পরদিন একশো একাত্তরতম রজনী:

সারাদিন দরবারের কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যা হতে না হতেই সুলতান শারিয়ার শাহরাজাদার কক্ষে চলে আসে। দুনিয়াজাদ নিচে গালিচায় গিয়ে শোয়। শাহরাজাদ সরে এসে শারিয়ারের গা ঘেঁসে বসে। শারিয়ার ওকে বুকে টেনে নিয়ে আলতো করে একটু চুমু খায়। তারপর চলতে থাকে পূর্বরাগের পালা। রাত্রি বাড়ে। রিরংসাও বাড়তে থাকে দুজনের। উত্তেজনায় অস্ফুট স্তনন করতে থাকে শাহরাজাদ।

দুনিয়াজাদ এবার আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। বুকে তাকিয়া চেপে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ বাদে শাহরাজাদ ডাকে, দুনিয়া, ওপরে আয়।

দুনিয়া উঠে এসে শাহরাজাদের পাশে বসে। আবার গল্প শুরু হয়।

তারপর শুনুন, জাঁহাপনা, শাহজাদা কামার অল-জামান বাবাকে কুর্নিশ জানিয়ে বলে, আমাকে ডেকেছেন, আব্বাজান?

—হ্যাঁ বাবা, বসো।

জামান সুলতানের পাশে গিয়ে বসে। শাহরিমান বলে, আমার বয়স হয়েছে, বেঁচে থাকতে থাকতে তোমার শাদীটা দেখে যেতে চাই, বাবা।

কামার অল-জামানের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, কিন্তু আব্বাজান, এখনই আমি বিয়ে করতে চাই না। জীবনে নারীর প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে,

কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি তার কোনও অভাব বুঝতে পারিনি, আব্বাজান। মেয়েদের সম্বন্ধে আমার কোনও ধ্যান ধারণা গড়ে ওঠেনি। ওদের সম্পর্কে আমার কোন মোহ বা আকর্ষণ কিছুই নাই। এ অবস্থায় হঠাৎ একটা মেয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক, আমার মনে হয়, সুখের হবে না। আঁদত কথা, শাদী নিয়ে আমি এখনও কিছু ভাবিইনি। আমার মন ঠিক তৈরি হয়ে ওঠেনি। আপনি অপেক্ষা করুন, আব্বাজান। আমি শাদী করবো না—এমন কথা বলছি না। কিন্তু শাদী করার আগে আমাকে প্রস্তুত হতে দিন, এই আমার আর্জি।

শাহরিমান পুত্রের কথায় বিচলিত হলেন। —কিন্তু বাবা, শিক্ষাদীক্ষার পাঠ তোমার শেষ হয়ে গেছে। এবার সংসার ধর্ম পালন করার সময় এসেছে। এখন তুমি বলছো, মেয়েদের সম্পর্কে তোমার কোনও ধ্যান ধারণাই গড়ে ওঠেনি। আমার মনে হচ্ছে, তুমি কিছু গোপন করছো। কিন্তু গোপন করার কোনও ব্যাপার থাকতে পারে না, বাবা। তুমি এখন বড় হয়েছ। অনেক পড়াশুনা করেছো। সব কিছু ভালো-মন্দ বোঝার বিদ্যাবুদ্ধি তুমি অর্জন করেছো। তুমি বিনা দ্বিধায় বল, আমি তোমার মনের কথাই শুনতে চাই।

কামার অল-জামান মাথা নিচু করে বসে থাকে। বাবার কাছে সে ধরা পড়ে গেছে। সত্যিই সে আসল কথাটা শত চেষ্টা করেও বাবাকে বলতে পারেনি। কিন্তু বৃদ্ধ শাহরিমানের চোখ এড়ায়নি। জামান যে কি একটা গোপন করতে চাইছে তা তিনি বুঝতে পেরেছেন।

একটুক্ষণ পরে জামান বললো, আপনি ঠিকই ধরেছেন, আব্বাজান, আমি একটা কথা বলতে গিয়ে বলতে পারিনি। আপনি আমাকে নানা শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বহু কিতাবে পড়েছি, মেয়েদের নানারকম ছলাকলা বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী। তাদের রূপ যৌবন দিয়ে কিভাবে পুরুষের সর্ব-নাশ করে সেই সব বিচিত্র বিবরণ জানলে কোনও মেয়েকে কেউ ভালো চোখে দেখতে পারে না, আব্বাজান। যে মেয়ে খারাপ হতে চায় তাকে আপনি জিঞ্জিরে বেঁধে কয়েদ করে রাখলেও সে পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী হতে পারে। একথা আমি বানিয়ে বলছি না, আব্বাজান, আমাদের পীর পয়গম্বররা এই বাণী রেখে গেছেন। আর আমার একমাত্র আর্জি, জাঁহাপনা আপনি আমাকে আর শাদীর কথা বলবেন না। এ সত্ত্বেও আমার কথা যদি না শোনেন, যদি জোর করে কোনও মেয়েকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেন, ফল ভালো হবে না। হয়তো আপনার মনের একটা সাধ পূরণ করতে গিয়ে আমাকেই আপনি চিরকালের মতো হারাবেন।

বাদশাহ শাহরিমান শিউরে ওঠেন। —না না না, সে হতে পারে না। অমন অলুক্ষণে কথা মুখে আনতে নাই, বাবা। আমি তো তোমাকে জোর জবরদস্তি করছিনা। তোমার বয়স হয়েছে। আর আমিও বুড়ো হয়েছি। এ অবস্থায় বিয়ে শাদী করে ধন দৌলত বুঝে নিয়ে প্রজা পালন করাই তোমার ধর্ম। আর আমার কথাটা একবার ভাবো, কবে মরে যাবো, মরার আগে কে না নাতির মুখ দেখে যেতে চায়? যাই হোক, তুমি আদৌ ভেবো না তোমাকে ধরে বেঁধে শাদী দিয়ে আমার মনোবাসনা চরিতার্থ করবো। যাকে শাদী করবে সে হবে তোমার খাস বেগম। সারাজীবনের সঙ্গী। তার সঙ্গে তোমার

যদি বনিবনাও না হয় সে শাদী তো জহর সামিল। আমি কিছুতেই তা হতে দেবো না। কিন্তু বাবা, তবুও একটা কথা থেকেই যায়। আমি জানি তুমি বহু জ্ঞান আহরণ করেছ। বহু দর্শন তোমার নখদর্পণে। তবু বলবো, আরও কিছু অনুসন্ধান করে দেখ, মেয়েদের সম্বন্ধে ভালো কথাও নিশ্চয়ই অনেক মনীষীই বলেছেন। তোমার বয়স অল্প। পুঁথিগত বিদ্যাই তোমার এখন একমাত্র মূলধন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা অনেক সময় সব অধিত বিদ্যার দৃঢ় প্রত্যয়কে ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে দেয়। সে সব নজির তো কিতাবে লেখা থাকে না। নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। যাই হোক, এখন আর তোমাকে উত্যক্ত করতে চাই না। তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাক। পরে যদি কখনও তোমার চিন্তা-ভাবনার কোনও রদবদল হয়, আমাকে অসঙ্কোচে জানাবে।

এরপর আরও একটা বছর কেটে যায়। শাহরিমান আর কোনও প্রশ্ন তোলেন না। ছেলের প্রতি তার দারুণ দুর্বলতা। কোনও কথায় সে আহত হয় সুলতান তা আদৌ চান না।

শাহরিমানের শরীর দিন দিন জরাগ্রস্ত হতে থাকে। মৃত্যু হাতছানি দিচ্ছে, বুঝতে কষ্ট হয় না। একদিকে অপত্য পুত্র স্নেহ অন্যদিকে জীবনের শেষ সাধ! নির্জন প্রাসাদ কক্ষে একা একা বসে ভাবেন। ছেলে বড় হয়েছে, তার অমতে কোনও কিছু চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। অথচ এদিকে দিনও শেষ হয়ে আসছে। নাতির মুখ আর বুঝি দেখে যাওয়া হলো না। শাহরিমান নিশ্চিত জানেন, প্রথম যৌবনের স্বপ্নরঙিন কল্পনার দিনগুলো সব পুরুষের জীবনেই একবার আসে। ধরাবাঁধা জীবনের শাশ্বত আবর্তকে সে তখন কিছুকালের জন্য স্বীকার করতে চায় না। সকলে যা করে সকলে যা বলে তা সে করতে চায় না—বলতে চায় না। সে চায় নতুন কিছু একটা করতে—যাতে সে হতে পারবে অনন্য। তারপর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির প্রসারতা বাড়ে, অভিজ্ঞতার আয়তন ব্যাপ্ত হয়।

শাহরিমান ভাবেন। জামানকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে হয়—তার ধ্যান-ধারণার কোনও পরিবর্তন হয়েছে কিনা।

কামার অল-জামান আবার এসে সুলতানকে কুর্নিশ জানিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়ায়। মুখের দিকে তাকালে কেউ ভাবতেই পারবে না এ ছেলে বাবার কথার অবাধ্য হতে পারে। তার কথাবার্তায় হাব-ভাবে চাল-চলনে এত শালীনতা, এত ভব্যতা বিশ্বাসই করা যায় না যে বাবার একটি অপূর্ণ সাধ সে মেটাবে না। শাহরিমান জিজ্ঞেস করেন, এখনও কি তোমার সেই একমত, জামান?

কামার অল-জামান বাবার বিষন্ন করুণ মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারে না। তার একটি অপূর্ণ সাধ পূরণ করতে পারছে না সে। সেই অপরাধ তাকে এই একটা বছর ধরে দংশন করে আসছে। কিন্তু, তন্নতন্ন করে খুঁজেও, কোনও একটা কিতাবে মেয়েদের সম্পর্কে একটা ভালো কথাও তার নজরে পড়েনি। বরং যতই বইএর পাতা উল্টিয়েছে মেয়েদের সম্পর্কে আরও মারাত্মক খারাপ খারাপ উক্তি সে পড়েছে। তাদের মতো ভ্রষ্টা, নষ্ট চরিত্রা, নির্বোধ, বিশ্বাসঘাতিকা, ছলনাময়ী প্রাণী বিশ্ব সংসারে আর কিছু

নাই। কামার অল-জামান-এর ধারণা দিন দিন বদ্ধমূল হতে থাকে। কোন নারীর সঙ্গে জীবনের গাঁটছড়া বাঁধার আগে তার যেন মৃত্যু হয়, এই তার আল্লাহর কাছে একমাত্র প্রার্থনা।

—আব্বাজান, আমি অনেক ভেবে দেখলাম, আপনার সাধ আমি কিছুতেই পূরণ করতে পারবো না। এই একটা বছরে আমি আরও নানা কিতাব পড়েছি। যতই পড়ছি, বিশ্বাস করুন, মেয়েদের সম্পর্কে ধারণা আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দুনিয়াতে যত খারাপ কাজ আছে তার কোনওটাই তাদের অসাধ্য নয়।

সুলতান শাহরিমান বুঝলেন, পুত্র এখন ঘোরে রয়েছে। তাকে বোঝানো বিষম দায়। সময়ে সবই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এখন জোর করে বোঝাতে গেলে হিতে-বিপরীত হতে পারে।

মনের দুঃখ কিছুটা হাল্কা করার জন্য উজিরকে ডেকে বললেন, দেখ উজির, আমি ভেবে দেখেছি, মানুষের চাওয়ার শেষ নাই। আমি যখন নিঃসন্তান ছিলাম তখন আল্লাহর কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা ছিল, আল্লাহ আমাকে একটি পুত্র সন্তান দাও। আর কিছু বাসনা নাই আমার। তিনি আমার প্রার্থনা পূরণ করলেন। একটা চাঁদের মতো ছেলে দিলেন। আজ কিন্তু আমি তাতেই সন্তুষ্ট নই—আজ আমার সাধ একটি নাতির। কিন্তু জামান ঘোরতর নারী বিদ্বেষী। এক বছর আগে যা ছিল এখন তার থেকেও আরও এক কাঠি বেশি। ভারি ভারি কিতাব পড়ে ওর দিন দিন মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের নামই সে কানে শুনতে চায় না। এখন কি করা যায় বলতো?

অনেকক্ষণ একথার কোনও জবাব দিতে পারে না উজির। তন্ময় হয়ে ভাবতে থাকে। তাইতো বড় কঠিন সমস্যা।

—জাঁহাপনা, উজির বলে, আপনি মেহেরবানী করে আরও একটা বছর ধৈর্য ধরে থাকুন। তারপর একদিন আচমকা তাকে দরবারে ডেকে পাঠাবেন। সেখানে উপস্থিত আমির ওমরাহ-গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনে আপনি ঘোষণা করে দেবেন, কামার অল-জামানের শাদীর দিন পাকা করে ফেলেছেন।

—কিন্তু উজির, ছেলে যেমন এক রোখা, এতে কি ফল ভালো হবে?

—হবে জাঁহাপনা, হবে। আমি জানি জামানের মতো বিনয়ী ভদ্র নম্র এবং পিতৃভক্ত পুত্র খুব বড় একটা হয় না। আপনি পাঁচজন গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছে খেলো হয়ে যাবেন, আপনার কথার কোনও দাম থাকবে না তেমন বেয়াদপি সে কখনও করতে পারবে না। আমি তার স্বভাব চরিত্র খুব ভালো করে জানি, হুজুর। অমন চরিত্রবান ছেলে আমার জিন্দগীতে দেখিনি।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

একশো বাহাত্তরতম রজনীতে আবার সে শুরু করে :

উজিরের পরামর্শে সুলতান শাহরিমান উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।—তুমি ঠিক বলেছ, উজির। সে আমাকে ভক্তি করে, ভালোবাসে। আমার ইজ্জৎ নষ্ট হতে পারে এমন কাজ সে কখনও করতে পারে না—একথা আমি জানি। যদি

প্রকাশ্য দরবারে দশজন সম্ভ্রান্ত মানুষের সামনে আমি বড় মুখ করে ঘোষণা করি, শাহজাদা জামানের শাদীর ব্যবস্থা পাকা করেছি তাহলে, তার অনিচ্ছা থাকলেও, আমার মুখরক্ষা করার জন্যও সে 'না' করতে পারবে না। তুমি ঠিকই বলেছ, উজির। তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না। তোমার মতো বিদ্যান বিচক্ষণ উজির পেয়ে আমি গর্বিত। এই নাও তোমার পুরস্কার।

শাহরিমান তাঁর কণ্ঠ থেকে মহামূল্যবান মণিমুক্তা খচিত রত্নহার খুলে উজিরের হাতে তুলে দিলেন। উজির দ্বিধা ভরে হাত পেতে নিতে নিতে অবাক হয়ে বললো, এ যে অমূল্য রত্নহার, জাঁহাপনা।

—তোমার এ পরামর্শ মূল্য দিয়ে যাচাই করা যায় না, উজির। আমি খুশি হয়ে দিলাম। তুমিও মনে কোনও সংশয় রেখ না।

এরপর আরও একটা বছর কেটে গেল। একদিন পূর্ণ দরবার কক্ষে কামার অল-জামানকে ডেকে পাঠালেন শাহরিমান। পিতৃভক্ত পুত্র যথাবিহিত কুর্নিশ জানিয়ে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলো। জামানের রূপের আলোয় যেন দরবার কক্ষ আরও বেশি আলোকিত হয়ে উঠলো। আমির ওমরাহ অভ্যাগতদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠলো—আহা, আল্লাহ কি ভাবেই গড়েছেন? আসমানের চাঁদও হার মেনে যায়।

—শোন বাবা, সুলতান শাহরিমান ধীরে ধীরে বলেন, আমি তোমার শাদীর ব্যবস্থা করছি। আমি বুড়ো হয়েছি। • কবে আছি কবে নাই, তাই যাবার আগে তোমাকে শাদী দিয়ে যেতে চাই। আজ এখানে শহরের সম্ভ্রান্ত আমির ওমরাহরা আছেন। তাদের সামনে ঘোষণা করছি, যত সত্বর সম্ভব আমি তোমার শাদী দেবো।

কামার অল-জামান এতক্ষণ বিনয়াবনত সুবোধ বালকের মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। সুলতানের কথায় সে লাঠি খাওয়া ক্রুদ্ধ সাপের মতো ফণা তুলে ধরলো। চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে উঠলো। রোষ কষায়িত বিস্ফারিত চোখে সে সুলতানের দিকে উদ্ধতভাবে চেয়ে রইলো। মুখে কোনও ভাষা নাই। চোখে তার অগ্নিঝরা প্রতিবাদ।

উপস্থিত আমির ওমরাহ অভ্যাগতরা মাথা নিচু করে বসে রইলো। সুলতান গর্জে উঠলেন।—আমার অবাধ্য! এতবড় স্পর্ধা! এই—কে আছিস, ওকে বাঁধ। বেঁধে নিয়ে গিয়ে পাশের পড়ো বাড়িটার চিলেকোঠার ঘরে বন্ধ করে রেখে দে।

সুলতানের হুকুম। সঙ্গে সঙ্গে শাহজাদাকে বেঁধে প্রহরীরা নিয়ে গেল পড়ো বাড়ির চিলে কোঠায়। অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে তারা দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। যদি শাহজাদা কিছু বলেন এই প্রত্যাশায় উৎকর্ণ হয়ে রইলো তারা।. কিন্তু না, কামার অল-জামান কোন সাড়াশব্দ করলো না। অন্ধকার ঘরের এক কোণে বসে ভাবতে লাগলো ; এই বরং ভালো হয়েছে। বাবার কথায় যদি সুবোধ বালকের মতো সে সায় দিত সে-ই হতো তার অপমৃত্যু। আজ এই জীর্ণবাড়ির অন্ধকার চিলেকোঠায় আমাকে বন্দী করে সুলতান আর একবার প্রমাণ করলেন, দুনিয়াতে যত অঘটন ঘটেছে তার মূলে সেই নারী।

শোক-কাতর অবসন্ন মনে সুলতান শাহরিমান প্রাসাদে নিজের শয়ন-কক্ষে ফিরে গেলেন। প্রাণাধিক একমাত্র পুত্র আজ তারই হুকুমে কারারুদ্ধ। অথচ এই পুত্র লাভের আকুতি তাকে একদিন পাগল করে তুলেছিল। দুহাতে মুখ ঢেকে শিশুর মতো ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। অপত্য স্নেহ একসময় পুত্রের সব গুনাহ্‌ মাফ করে দিল। সুলতান ভাবলেন, তার কি দোষ? সে তো তাকে একাধিকবার তার মনের কথা খুলে বলেছে। এ অবস্থায়, ছেলে বড় হয়েছে, জোর করে তার ওপর কিছু চাপিয়ে দিতে যাওয়াই অন্যায়। এ জন্যে তার তো কোনও অপরাধ নাই। যত নষ্টের গোড়া ঐ উজির। তার ঐ বাজে পরামর্শ নিতে গিয়েই যত অনর্থ ঘটলো। যতই ভাবেন তিনি, সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়তে থাকে উজিরের উপর। উজিরকে ডেকে পাঠালেন শাহরিমান।

—তুমিই এর জন্যে একমাত্র দায়ী, উজির। তোমার ঐ বদ পরামর্শ নিয়েই আমার মান-ইজ্জৎ সব গেল। একমাত্র পুত্রকে আজ আমি কয়েদ করলাম—সবই তোমার অপরিণামদর্শিতায়। যাক এখন উপায় বাতলাও, কিভাবে এর সমাধান হতে পারে। তুমি তো জান উজির, আমার বুকের কলিজা একমাত্র পুত্র সে। তাকে এই ভাবে কষ্ট দিয়ে আমি কি করে বাঁচবো?

উজির করজোড়ে বলে, হুজুর। অধমের কথা শুনুন, ধৈর্য ধরে পনেরোটা দিন আপনি চুপচাপ থাকুন।

—কী বললে? পনেরো দিন? পনেরো দিন ধরে সে ঐ নোংরা অন্ধকার ঘরে পচবে?

—না হুজুর, পচবে কেন, তার সব ব্যবস্থাই আমি করে দিয়েছি।

একথা শুনে শাহরিমান-এর মুখ কঠিন হয়ে ওঠে।—কী ব্যবস্থা করে দিয়েছ। কার হুকুমে? তোমার আমি গর্দান নেবো।

—হুজুরের ইচ্ছা। যেদিন হুজুরের দরবারে চাকরী নিয়েছি সেইদিন জান কবুল করেছি। জাঁহাপনার যদি তাই অভিপ্রায় হয় নিতে পারেন আমার গর্দান। কিন্তু সুলতানের কোনও ইজ্জৎহানী হয় তেমন কোনও কাজ আমি করিনি। করতে পারি না। শাহজাদা আপনার যেমন পরম পেয়ারের আমাদেরও কি কম আদরের? আপনার সলতানিয়তের প্রতিটি মানুষ তাকে বড় ভালো-বাসে। সে-ই আমাদের একমাত্র আশা ভরসা। ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। এই কারণে, যদি কোনও প্রহরী শাহজাদার কষ্টে কাতর হয়ে তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের একটু ব্যবস্থা করে থাকে তবে কি সুলতান তাদের সে গুণাহ উপেক্ষার চোখে এড়িয়ে যেতে পারেন না?

—উজির, সত্যিই তোমার বুদ্ধির তুলনা নাই। কিন্তু সাবধান এ-সব কথা আমি জানি তা যেন তোমার প্রহরীরাও জানতে না পারে।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন জাঁহাপনা, শাহজাদা জানেন না, আমার হুকুমে প্রহরীরা তার থাকা খাওয়ার অমন সুন্দর ব্যবস্থা কর দিয়েছে। তার ধারণা প্রহরীরা ভালোবেসে সবারই অলক্ষ্যে এসব করছে। তারা তাকে এ-ও শুনিয়ে দিয়েছে, সুলতান জানতে পারলে তাদের হয়তো গর্দান যাবে। তা যাক। কিন্তু তাই বলে তাদের শাহজাদাকে এইভাবে তারা কষ্টে রাখতে

পারবে না।

সুলতান শাহরিমান শুনে খুশি হয়। বলেন, কিন্তু পনেরোটা দিন তার অদর্শন আমি কেমন করে সইবো? তাকে পাশে না পেলে যে আমি ঘুমাতে পারি না, উজির।

উজির বলে, এছাড়া কোনও উপায় নাই, জাঁহাপনা। এই পনেরোটা দিন আপনাকে কষ্ট করে থাকতেই হবে। তারপর দেখবেন, শাহজাদা আপনার কত বাধ্য হয়ে গেছে। শাদীতে আর সে অমত করবে না।

সুলতান সবই বুঝলেন জামান-এর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনও ত্রুটী হবে না তা সত্ত্বেও সে রাতে তিনি ভালো করে ঘুমাতে পারলেন না। পালঙ্কে শুয়ে শুধু বার বার জামানের শূন্য শয্যার দিকেই নজর চলে যায়। বুকের মধ্যে কেমন হু হু করতে থাকে। রাত্রির প্রহর বাড়ে। সুলতান ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি পায়চারী করতে থাকেন। ঘুম আর আসে না।

ওদিকে কামার অল-জামান রাতের খানাপিনা শেষ করে। বইপত্র নিয়ে বসে। অনেক রাত অবধি একমনে পড়াশুনা করে শুতে যাবার আগে রোজ-এর অভ্যাসমতো হাত মুখ ধুয়ে রুজু করে কোরানের কয়েক পাতা সুর করে পড়ে। পাঠ শেষ হলে গায়ের একটি মাত্র কামিজ ছাড়া পরনের সব সাজ-পোশাক খুলে ফেলে শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। আর শোয়ামাত্র গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

তারপর যে-সব ঘটনা ঘটলো সেগুলো স্বপ্ন না সত্যি তা কে বলতে পারে?

এই সময় রজনী শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

এরপর একশো ছিয়াত্তরতম রজনীঃ

দ্বিতীয় প্রহরে আবার কাহিনীর সূত্রপাত হয়। শাহরাজাদ বলতে থাকে।

যে পড়ো বাড়িটার চিলে-কোঠায় কামার অল-জামান গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল সেই ধ্বংস স্তূপ সদৃশ জরাজীর্ণ পড়ো প্রাসাদটা এক সময়ে খুব রমরমা চেহারা ছিল। সে অতি প্রাচীনকালের কথা। রোম তখন দুনিয়ার সেরা শহর। তখন সব রাস্তাই রোমে গিয়ে মিশেছিল। সব মানুষই রোম-যাত্রী। এই ভাঙ্গা প্রাসাদ সেই আমলের। তখনকার সুলতান বাদশাহের সুখের আধার ছিল এই প্রাসাদ। কালের হাতছানিতে আজ শুধু দাঁত বের করা ইঁটের পাজা ছাড়া আর কোন বাহারই অবশিষ্ট নাই।

এই ভাঙ্গা প্রাসাদের পিছনে একটা বিশাল কূপ আছে। সেই কূপে বাস করে এক যুবতী জিনি। ইবলিসের বংশধর মাইমুনাহ। মাইমুনাহর

[এর আগের তিনটি রজনী মাত্র কয়েকটি ছত্রে শেষ করেছেন ডঃ মাঃদ্রুস। এখানে সেই কয়েক ছত্রের জন্য আলাদাভাবে সেই রজনী-ত্রয়ের উল্লেখ করলাম না। এতে গল্পের গতি ব্যাহত হতো মাত্র। এর পরে এই ধরনের বর্জন উল্লেখ করে জানানো হবে না—অনুবাদক]

বাবা সাবটেরা নিয়ানের বাদশাহ জিন দিমিরিয়াৎ। তার অমিত শৌর্য বীর্যের অলৌকিক কাহিনী বিশ্ববিশ্রুত।

মাঝরাতে মাইমুনাহ কূপ থেকে বেরিয়ে আকাশে ওড়ে। এই তার প্রতি দিনের অভ্যাস। উড়তে উড়তে সে প্রথমে মহাশূন্যে উঠে যায়। তারপর ঠিক করে কোনদিকে কোথায় যাবে।

সেদিন রাতেও সে যথা নিয়মে কূপ থেকে বেরিয়ে উপরে উঠছে হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে দেখলো, চিলেকোঠার ঘরে আলো জ্বলছে। জন্মাবধি এতকালের মধ্যে এমন অভূতপূর্ব দৃশ্য সে কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। এই রকম জনমানব পরিত্যক্ত একটা পড়ো বাড়িতে কেউ কখনও পদার্পণ করে না। আজ হঠাৎ এখানে মানুষ কি করে এল? জিনি ভাবলো, এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনও গূঢ় রহস্য আছে। ব্যাপারটা কি দেখতে হবে। চিলে কোঠার ঘরের জানালা দিয়ে সে ভিতরে ঢুকে পড়লো।

চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর কামার অল-জামানের অর্ধ উলঙ্গ দেহটার দিকে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকে জিনি। এত রূপ কোনও পুরুষ মানুষের হয়? তার দেহমনে এক আজানা আনন্দের শিহরণ লাগে। পা টিপে টিপে সে জামানের পালঙ্কের পাশে এগিয়ে যায়। অপলক চোখে তাকে প্রাণ ভরে দেখতে থাকে। এই ভাবে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে যায়। কিন্তু জিনির আর দেখে দেখে আশ মেটে না। আল্লাহর এই অতুলনীয় সৃষ্টির কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। দুচোখ জলে ভরে যায়। ভাবে, এমন খোদার আশীর্বাদকে এইভাবে নির্বাসন দিয়েছে কোম পাষাণ হৃদয় বাবা-মা। কি তার এমন অপরাধ—যার জন্য তাকে বন্দী করে রেখেছে এই রুদ্ধ কয়েদ খানায়? তারা কি জানে না এটা শয়তান আফ্রিদি দানবের আস্তানা? একবার তাদের কারো নজরে পড়লে ছেলেটাকে কি তারা আস্ত রাখবে? যাইহোক, অন্য কোন জিন যাতে না এর কোন অনিষ্ট করতে পারে তা আমাকে দেখতেই হবে।

জামানের কপালে মুখটা নামিয়ে আলতোভাবে একটু চুমু দিল জিনি। তারপর জানলা দিয়ে বেরিয়ে আকাশের ওপরে উঠে গেল। যেখানে সাদা মেঘের পেঁজারা হালকা হাওয়ার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে সেখানে উঠে গিয়ে ডানা মেলে ভেসে বেড়াতে থাকে সে।

একটুক্ষণ পরে পাখার ঝটপটানী আর বিকট কর্কশ আওয়াজে সে সজাগ হয়ে এদিক ওদিক চায়। একটা বিশাল দৈত্য তার দিকেই উড়ে আসছে। আরও একটু কাছে আসতেই চিনতে পারে—আফ্রিদি দানাশ। একটা শয়তান দৈত্য। ব্যাটা সর্বশক্তিমান শাহেন শাহ সুলেমানের বশ্যতা স্বীকার করে না। পয়লা নম্বরের নাস্তিক। এর বাবা সামহারিস সবচেয়ে দ্রুতগামী জিন বলে পরিচিত।

মাইমুনাহর আশঙ্কা জাগে, যদি ঐ পড়ো প্রাসাদের চিলে কোঠার দিকে ওর নজর পড়ে? সুতরাং আর অপেক্ষা না করে শোঁ করে অনেকটা নিচে নেমে এসে একেবারে দানাশের মুখোমুখি থামে। ইচ্ছে ছিল পাখার এক বাড়ি মেরে একেবারে ধরাশায়ী করে দেবে তাকে। কিন্তু দানাশ বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। মাথার উপরে মাইমুনাহকে শোঁ শোঁ করে নামতে দেখে

চিৎকার করে ওঠে সে।

—শোন, শাহজাদী মাইমুনাহ, আমি দানাশ। শাহেনশাহ সুলেমান আমার রক্ষা কর্তা, দোহাই তোমার আমাকে মেরো না। সুলেমান তোমার ভালো করবেন।

মাইমুনাহ মনে মনে হাসে—ভূতের মুখে রাম নাম। এখন ব্যাটা বেকায়দায় পড়েছে অমনি সুলেমান ওর রক্ষা কর্তা হয়ে গেল! অন্য সময় সে সুলেমানকে মানতেই চায় না। এত বড় আহাম্মক! দানাশ বলে, তুমি আমাকে মেরো না মাইমুনাহ। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমার কোনও অনিষ্ট করবো না।

—ঠিক বলছো? আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি, একটা শর্তে। সত্যি করে বল, তুমি কোথা থেকে আসছো? আর এত দেরিই বা কেন? এখন তোমার মনের মধ্যে কি শয়তানীই বা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে? ঠিক ঠিক সাচ্চা বাৎ বলবে। আমার সঙ্গে বেগড়বাই করলে তোমাকে আমি জ্যান্ত রাখবো না। পাখা ছিঁড়ে খুঁড়ে দেবো। আঁচড়ে গায়ের ছাল চামড়া খুলে নেবো। আর এমন গোত্তা মারবো—পিঠের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে। তোমার কোনও বাবা রক্ষা করতে আসবে না এখানে।

দানাশ জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, কি যে বল সুন্দরী, তোমার কাছে আমি মিথ্যে বলতে পারি। আর বলবো বা কেন? যাক ওসব কথা, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে বেশ ভালোই হলো। আজ যে কি মজার কাণ্ড কারখানা হয়েছে, বলছি শোন। কিন্তু তার আগে আমাকে কথা দাও, আমার কিসসা শোনার পর তুমি যদি খুশি হও—আমাকে যেখানে খুশি চলে যেতে দেবে?

মাইমুনাহ অধৈর্য হয়ে বলে, আমি সুলেমানের নামে হলফ করে বলছি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যেখানে খুশি তুমি যেও, আমি কোনও বাধা দেবো না, নাও এবার তোমার কাহিনী শুরু কর।

আফ্রিদ দানাশ এবার মাইমুনাহর পাশে এসে ভাসতে থাকলো।

—তাহলে শোন সেই কাহিনী।

আমি সুদূর চীনের পশ্চিম অঞ্চল থেকে উড়ে আসছি। তুমি হয়তো শুনে থাকবে, প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট ঘায়ুরের সাম্রাজ্য সেটা। তার দাপটে কত বড় বড় সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। তার সেনাবাহিনীর ছোট ছোট দল আমাদের গোটা সেনাবাহিনীর চেয়েও বিশাল। সে দেশের মেয়েরা সবাই পরমা সুন্দরী—হুরীর মতো। স্নানের পরে তাদের দেহ থেকে ফুলের খুশবু ছড়িয়ে পড়ে সারা ঘরে। সেই সম্রাট ঘায়ুরের একটি মাত্র কন্যা বদর। তার রূপের বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। তবু যদি শুনতে চাও, আমার সাধ্যমতো বর্ণনা দিতে চেষ্টা করবো।

তার আজানুলম্বিত কালো চুলের সঙ্গে বুঝিবা একমাত্র নিরন্তর নির্ঝর ঝরনারই তুলনা চলে। তার মুখের সৌন্দর্যের বর্ণনা আর কি করে দিই। শুধু বলতে পারি আশমানের চাঁদ যদি তার মুখের মতো সুন্দর হতে পারতো—ধন্য হতো সে। হরিণীর মতো তার কাজল কালো চোখের তারায় আমি ঘন নীল অতল সমুদ্রের গভীরতা প্রত্যক্ষ করেছি। তার পাকা

আঙ্গুরের মতো দুটি ঠোঁট, মরালের মতো গ্রীবা, সুডৌল স্তন, ক্ষীণ কটি, ভারি নিতম্ব, নিরাসক্ত পুরুষের বুকেও ঝড় তুলতে পারে।

সম্রাট ঘায়ুর তার মেয়েকে প্রাণাধিক ভালোবাসে। তার মুখে হাসি ফোটাবার জন্য ঘায়ুরের চেষ্টার অন্ত নাই। কিছুদিন আগে মেয়ের জন্য সে সাতখানা সাতমহলা আজব প্রাসাদ বানিয়ে দিয়েছে। একখানা প্রাসাদ আগাগোড়া স্ফটিকের তৈরি। দ্বিতীয়খানা দুধের মতো চকমিলানো অ্যালাব্যাসটারের তৈরি। তৃতীয় প্রাসাদ পুরোটাই চীনে মাটিতে গড়া। চতুর্থখানা বাহারী রঙের মারবেল পাথর দিয়ে তৈরি করেছে সে। পঞ্চমখানা রুপো, ষষ্ঠখানা সোনা আর সপ্তম প্রাসাদখানা তৈরি করা হয়েছে হীরে দিয়ে। প্রত্যেকটি প্রাসাদ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কি তাদের গড়ন আর কি তাদের কারুকর্ম। দুনিয়ার সেরা কারিগর দিয়ে বানিয়ে দিয়েছে সম্রাট ঘায়ুর। শুধু মেয়ের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য। সম্রাটের ইচ্ছা প্রত্যেকটি প্রাসাদে বদর একটি করে বছর কাটাবে। প্রত্যেক বছরে নতুন নতুন প্রাসাদে বাস করলে তার মনে একঘেয়েমির ছাপ পড়বে না। সদা সর্বদা হাসি খুশি উৎফুল্ল হয়ে থাকবে সে।

প্রাসাদের ঐ মনোরম পরিবেশে আমি তাকে দেখেছি। তুমি কি বিশ্বাস করবে তাকে দেখার পর থেকেই আমার মাথাটা কেমন বিগড়ে গেছে।

দেশ বিদেশের রাজা বাদশাহরা এসেছিল তার পাণি প্রার্থনা করতে। সম্রাট ঘায়ুর চেয়েছিল মেয়ে তার পছন্দ মতো পাত্র বেছে নিক। কিন্তু বদর কারো দিকে ফিরেও তাকায় নি। তার এক কথা ঃ আমি নিজেই আমার রানী। ভারতের সূক্ষ্ম মসলিনের স্পর্শেই যে কাতর হয়ে পড়ে সেই কুসুমাদপি কোমল এই তনু কি করে একটা পুরুষের দৌরাত্ম সহ্য করবে, বাবা? না, তুমি ওদের বিদেয় করে দাও। আমি কোনও পুরুষের প্রভুত্ব সহ্য করতে পারবো না।

সম্রাট ঘায়ুর মেয়েকে অখুশি করার কথা ভাবতেই পারে না। সে যা পছন্দ করে না তা কিছুতেই তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায় না সে।

একবার এক পরাক্রমশালী সম্রাট লক্ষ লক্ষ মোহরের উপহার উপঢৌকন পাঠিয়ে সম্রাট ঘায়ুরের কাছে প্রস্তাব পেশ করলে, সে তার কন্যার পাণি প্রার্থী।

সম্রাট ঘায়ুর মেয়েকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলো। এই সম্রাটের রানী হলে তার মর্যাদার হানী হবে না। কারণ ঘায়ুরের মতো তারও জগৎ জোড়া নাম।

কিন্তু এত বোঝানোর ফল হলো উল্টো। বদর রাগে ফুসতে ফুসতে বললো, বাবা তুমি যেভাবে আমাকে নির্যাতন করছো তাতে আর আমি এ জীবন রাখতে চাই না। এক্ষুণি তরবারীর এক কোপে নিজেকে আমি শেষ করে দেবো।

বাবা শিউরে উঠলো। সে কি মা! ও কথা কি মুখে আনতে আছে? থাক, ওসব কথা আর মুখে আনবো না আমি। তোমার যখন একান্তই ইচ্ছা নয়, আমি আর তোমাকে বিরক্ত করবো না, মা। কিন্তু দোহাই বেটা, রাগের মাথায় যাতা কিছু করে বসো না।

আফ্রিদ দানাশ বললো, শুনলে তো মাইমুনাহ। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি—সেই মেয়েকে। চল, তুমিও দেখে আসবে সেই ডানাকাটা হুরীকে।

এই সময় রজনী অতিক্রান্ত হচ্ছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

মাইমুনাহ এতক্ষণ চুপচাপ দানাশের কাহিনী শুনছিল। দানাশ থামলে সে হো হো করে হাসতে হাসতে বললো, একটা মেয়ের রূপেই তুমি মজে গেছ! কি করে ভাবলে তার মতো সুন্দর আর হয় না? তুমি দেখনি বলে? আমি যে শাহজাদাকে ভালোবেসেছি তাকে যদি দেখতে তা হলে আর তোমার এই উচ্ছ্বাসের ফুলঝুরি মুখ দিয়ে বেরুতো না।

দানাশ বললো, তা হতে পারে। কিন্তু তোমার ভালোবাসাকে তো আমি দেখিনি। যাই হোক, তোমার যদি আপত্তি না থাকে চল তাকে একবার দেখে নয়ন সার্থক করে আসি। তবে নিজে চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই যে, আমার রাজকুমারীর চেয়েও সুন্দর কেউ হতে পারে।

মাইমুনাহ রেগে ওঠে, চুপ কর। যাকে চোখে দেখিনি সে বড় সুন্দরী। অমন চোখ ঝলসানো রূপ আমি ঢের দেখেছি। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, আমার ভালোবাসার নখের যুগ্যি হবে না তোমার সেই রাজকুমারী। তার রূপ দেখেই যদি তোমার মাথা বিগড়ে গিয়ে থাকে তবে আর আমার ভালোবাসাকে দেখে কাজ নাই। একবার তাকে চোখে দেখলেই তুমি ভিরমি খেয়ে পড়ে যাবে—আর চৈতন্য ফিরবে না। কেন বেঘোরে প্রাণটা হারাবে, থাক, তাকে আর চোখে দেখে তোমার কাজ নাই।

দানাশ বলে, কিন্তু কে সে? কোথায় থাকে?

মাইমুনাহ বলে, সে এহ বাদশাহর ছেলে। আমি যে কূপে বাস করি তার পাশে যে ভাঙ্গা প্রাসাদ—তারই চিলেকোঠার ঘরে সে এখন বন্দী হয়ে আছে। সাবধান, কক্ষণো তুমি একা যাবে না সেখানে। যদি দেখতে চাও আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। তোমার মতো শয়তানকে আমি এক ফোঁটা বিশ্বাস করি না। সুন্দর ছেলে দেখলেই তার সর্বনাশ করতে তোমরা ওস্তাদ।

—আহা, অত চটছো কেন সুন্দরী। একবার যখন বলেছ সে তোমার ভালোবাসা, আমি তার অনিষ্ট করতে পারি? আমি কসম খেয়ে বলছি, একা সেখানে কখনো যাবো না। তবে তাকে একবার দেখতে চাই—কেমন সে সুন্দর। তা তোমার সঙ্গেই যাবো। দূর থেকে এক পলক দেখবো মাত্র।

মাইমুনাহ বলে, নিয়ে যেতে পারি একটা শর্তে। তাকে দেখে যদি তোমার মনে হয় সত্যি সে তোমার রাজকুমারীর চেয়ে সুন্দর তা হলে আমাকে পেট পুরে ভালো মন্দ খাওয়াত হবে। আর তোমার রাজকুমারী যদি আমার শাহজাদার চেয়ে বেশি সুন্দরী হয়, আমি তোমাকে খাওয়াবো—যা চাইবে।

দানাশ আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, চমৎকার! ঠিক আছে, তাই হবে। তাহলে চল, আগে আমার রাজকুমারী বদরকে দেখিয়ে নিয়ে আসি—

মাইমুনাহ বাধা দিয়ে বলে, আমার শাহজাদা তো ঐ নিচে ভাঙ্গা

প্রাসাদের চিলেকোঠার ঘরেই শুয়ে আছে। এখান থেকে সোজা নেমে গেলেই তাকে দেখতে পাবে। এক পলকের ব্যাপার। আগে চল তাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। তারপর যাওয়া যাবে তোমার রাজকুমারীর দেশে। সেখানে যেতে তো রাত কাবার হয়ে যাবে।

ওরা দুজনে শোঁ শোঁ করে নিচে নেমে এসে চিলে কোঠার ঘরের জানালা দিয়ে কামার অল-জামানের ঘরে ঢুকে পড়লো।

মাইমুনাহ ফিস ফিস করে দানাশের কানে কানে বলে, খুব সাবধান, কোনও শব্দ করবে না। তোমার যা বাজ খাঁই স্বভাব, এখুনি হয়তো খ্যাঁ খ্যাঁ করে উঠবে। তা হলে ওর ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

দানাশ একভাবে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে। এমন নিখুঁত দেহসৌষ্ঠব সে কোন মানুষের কখনও দেখেনি।

মাইমুনাহ বিরক্ত হয়ে বলে, অমন হাঁ করে দেখছ কী?

দানাশের তন্ময়তা কাটে, সত্যি, এমন অপরূপ সুন্দর ছেলে আমি আর কোথাও দেখিনি, মাইমুনাহ। দেখে নয়ন সার্থক হয়ে গেল। নাঃ, আমি হেরে গেলাম তোমার কাছে। এ রূপের কোনও জুড়ি নাই। বেহেস্তেও আছে কি না সন্দেহ। আমার রাজকুমারী দুনিয়ার সেরা সুন্দরী বলে তোমার কাছে বড়াই করেছিলাম। কিন্তু সে দম্ভ আমার ভেঙ্গে দিলে। কিন্তু এত প্রশংসা করেও একটা কথা ভয়ে ভয়ে বলবো। যাই বল এত রূপ কোনও পুরুষ মানুষের মানায় না। আল্লাহ বোধ হয় মেয়ে গড়তে গড়তে হঠাৎ ভুল করে ছেলে বানিয়ে দিয়েছেন। দেখছ না, ওর সারা দেহটায় কেমন মেয়েলী ছাপ —একেবারে বদর-এর মতন।

দানাশের মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, মাইমুনাহ দানাশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রচণ্ড জোরে পাখার বাড়ি মারলো। দানাশের একটা শিং ভেঙ্গে পড়ে গেল। মাইমুনাহ রাগে থর থর করে কাঁপতে থাকে, শয়তান বদমাইশ্ বেল্লিক, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! তুই তো তুই, তোর বাপ-ঠাকুরদা—চৌদ্দপুরুষের কেউ কখনও দেখেছে এমন রূপবান পুরুষ? ভাগ হতচ্ছাড়া, প্রাণে যদি বাঁচতে চাস, এক্ষুণি বেরিয়ে যা এখান থেকে। না হলে তোকে আমি তুলে আছাড় মারবো।

দানাশ ভয়ে জড়সড় হয়ে গেছে। গুটি গুটি জানলার দিকে এগিয়ে যায়। মাইমুনাহ হুকুমের স্বরে বলে, এক্ষুণি সোজা চলে যা তোর রাজ-কুমারী বদর-এর কাছে। আজ রাতেই তাকে এখানে নিয়ে আসা চাই। আমি শাহজাদার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবো সে কেমন সুন্দরী? আর তার মেয়েলী শরীরের সঙ্গে শাহজাদার শরীরেরই বা কতটুকু মিল আছে আমার দেখা দরকার। আমার হুকুম যদি তামিল না করিস, এই রাতেই যদি বদরকে এখানে না আনিস তোর কপালে অনেক দুঃখ। তোকে আমি কেটে টুকরো টুকরো করে শেয়াল শকুন দিয়ে খাওয়াবো মনে থাকে যেন।

দানাশ কোনও কথা না বলে ঘাড় নেড়ে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সে ফিরে আসে। পিঠের ওপর ঘুমন্ত রাজকুমারী বদর। ফিনফিনে পাতলা একটি মাত্র শেমিজ ছাড়া তার পরণে অন্য কোনও পোশাক নাই। প্রায় কাঁচের মতো সচ্ছ শেমিজটার নিচে তার ধবধবে ফর্সা

দেহখানা আয়নার মতো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ঘরের মধ্যে ঢুকতেই দানাশকে লক্ষ্য করে মাইমুনাহ কটাক্ষ করে বলে, কি রে হতচ্ছাড়া এত দেরি কেন? এই খালিদান থেকে চীনে যেতে আসতে কতটুকু সময় লাগে? না, রাজকুমারীর ন্যাংটো শরীর দেখে আর ঠিক থাকতে পারিস নি? পথের মাঝে কোথাও ঝোপ জঙ্গলে নামিয়েছিলি বুঝি? যাগ গে, এখন শাহজাদার যেন ঘুম না ভাঙ্গে।

দানাশ অতি সন্তর্পণে বদরকে শাহজাদার পাশে শুইয়ে দিয়ে আলতো-ভাবে শেমিজটা গা থেকে খুলে নিল। মাইমুনাহ অপলক ভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলো। নাঃ, কোথাও কোনও খুঁত ধরা গেল না। বরং দানাশ যা রূপের বর্ণনা দিয়েছিল আসলে সে তার চেয়ে ঢের—ঢের বেশি সুন্দরী। শাহজাদার সঙ্গে রাজকুমারীর অঙ্গ সৌষ্ঠবের তফাৎ কিছুই নাই। মনে হয়, ওরা যেন একই ছাঁচে গড়া—জমজ। দুজনেরই মুখের সুরৎ একই রকম অনন্যসাধারণ—অপূর্ব সুন্দর।

মাইমুনাহ বললো, হুঁ, স্বীকার করতেই হয় তোমার রাজকুমারী কিছু কম সুন্দরী না। দুজনের মধ্যে কে বেশি সুন্দর এ নিয়ে তর্ক করা যেতে পারে। আমি বলবো, আমার শাহজাদা বেশি সুন্দর। আর তুমি বলতে পার তোমার রাজকুমারীই বেশি সুন্দরী। এ তর্কের মীমাংসা হতে পারে না। কিন্তু তুমি যে একটা ডাঁহা মিথ্যে কথা বলেছ তা তো প্রমাণ হয়ে গেল। আমার শাহজাদার শরীরে যে আদৌ মেয়েলী ছাপ নাই। তা তো এখন দেখতে পাচ্ছ? আর তা ছাড়া মেয়েদের সারা শরীর জুড়ে থাকে কামের ছাপ। ওই দেখ, ওর বুক, ওর কোমর, পাছা, যেখানে দেখবে, শরীর চনমন করে উঠবে। আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে 'বাঃ'। কিন্তু সত্যিই 'বাঃ' বলার মতো নিখুঁত কিনা সেটা কেউ খুটিয়ে দেখতে পারে? নিরুত্তাপ নিষ্কাম চিত্তে যদি বিচার কর আমার শাহজাদাই প্রথম পুরস্কার পাবে। কি বল?

—দেখ মাইমুনাহ, এ নিয়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করতে চাই না। তুমি যদি খুশি হও, আমি মনের কথা চেপে তোমাকে খুশি করার জন্যে না হয় মিথ্যেটাই মেনে নিলাম।

—কী, এত বড় কথা, আমি মিথ্যে বলছি!

—আহা-হা অত চটছ কেন? আমি তো মেনে নিচ্ছি, তোমার শাহজাদাই বেশি সুন্দর। সে-ই প্রথম, আমার রাজকুমারী দ্বিতীয়। তুমি খুশি তো?

মাইমুনাহ আরও চটে ওঠে। অমন ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলার কি দরকার? যদি সাহস থাকে তবে বল, আমার কথা তুই মানতে রাজি নোস। তুই না পুরুষ মানুষ—একটা নপুংসক কোথাকার।

—এ তোমার ভারি অন্যায়। অমন করে গালাগাল দিচ্ছ কেন? আমি তো তোমার কথা মেনেই নিয়েছি।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

একশো বিরাশীতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয়:

মাইমুনাহ রেগে কাঁই। —তুমি কি আর সত্যি সত্যি মেনে নিয়েছ? মুখে মানছো আমার প্যাঁদানীর ভয়ে। কিন্তু তাতেও তোমার নিস্তার নাই। তোমার মতো মিচকে শয়তানকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় আমার জানা আছে।

এই বলে মাইমুনাহ এক খানা পাখার ঝাপট মারে দানেশের চোখে। বেচারী, বরাৎ জোর, তড়াক করে দু পা পিছিয়ে যেতে পেরেছিল তাই রক্ষে। না হলে চোখটাই যেত। কিন্তু ততক্ষণে মাইমুনাহ ক্ষেপে উঠেছে। তাক করছে, দানেশের ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। দানেশ ওর মতলব বুঝে নিমেষের মধ্যে একটা মাছি হয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে বিছানায়—ওদের দুজনের মাঝখানে। অন্য সময় মাইমুনাহ ছেড়ে কথা কইতো না। যেন তেন প্রকারে ওর পিন্ডি চটকে দিত। কিন্তু এখন, এই অবস্থায়, বিছানার ওপর ধস্তাধস্তি করা সম্ভব না। তাতে ওদের দুজনের ঘুম ভেঙ্গে যাবে। তাই সে নিজেকে সামলে নিল।

—ঠিক আছে, কিছু বলবো না। বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এস।

দানাশ বলে, তুমি আমাকে মারবে।

মাইমুনাহ বলে, খোদা কসম, কিছু বলবো না, বেরিয়ে এস।

এবার দানাশ উড়ে এসে আবার নিজের আসল রূপ ধরলো।

—শোন দানাশ, মাইমুনাহ বলে, এভাবে এই বিতর্কের নিষ্পত্তি হবে না। তার চেয়ে এমন কাউকে সালিশ মানা যাক—যে ব্যাপারটার ফয়শালা করে দিতে পারবে।

দানাশ বললো, সেই ভালো। তোমার যাকে ইচ্ছে ডাকো।

মাইমুনাহ মেঝের উপর তিনবার টোকা দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে মেঝেটা দুভাগ হয়ে নিচে থেকে উঠে এল বিশাল বিকট কদাকার কুৎসিৎ এক দৈত্য। মাথায় তার ইয়া বড় বড় ছ'খানা শিং। এক এক খানার মাপ চার হাজার চারশো আশী হাত। তার লেজের শেষের দিকটা গাঁইতির কাঁটার মতো। তে-ভাগা। পিঠের উপর দুম্বার মতো একটা কুঁজ। আর একটা পা খোঁড়া। নাক বলে কোন বস্তু নাই। গোলাকার চোখ দুটো নাকের জায়গাটা দখল করে আছে। তার একখানা বাহু লম্বায় পাঁচ হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ হাত। আর একখানা মাত্র বিঘৎখানেক লম্বা। এক একখানা হাতের থাবা দেখতে ঠিক জলের ডেকচীর মতো। ওর নাম কশকশ ইবন ফকরাশ ইবন আত্রাশ—আবু হানফাশের বংশধর।

ঘরের ভিতরে উঠে দাঁড়াতেই আবার মেঝেটা জোড়া লেগে গেল। কশকশ আভূমি আনত হয়ে মাইমুনাহকে কুর্নিশ জানিয়ে বললো, বান্দা হাজির মালিকন।

মাইমুনাহ হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গী করে বললো, জিতা রহো, বেটা। আমার সঙ্গে হাড়েহারামজাদা এই দানাশের ঝগড়া বেঁধেছে। তোমাকে আমরা সালিশ মানছি। তুমি ফয়সালা করে দাও। ঐ যে দেখছ শাহজাদা আর রাজকুমারী শুয়ে ঘুমাচ্ছে, তোমাকে বলে দিতে হবে কে বেশি খুবসুরৎ। খুব ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখ। তোমার বিচারে যাকে

বেশি সুন্দর মনে হবে আমরা তাকেই সেরা বলে মেনে নেবো। রায় দেবার আগে খুব ভালো করে ভেবে দেখবে—যেন কোনও অবিচার না হয়।

কাশকাশ এতক্ষণ পালঙ্কের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়েছিল। এবার ফিরে দেখেই আনন্দে উত্তেজনায় ধেই ধেই করে নাচতে লাগলো। ওরে ব্বাস, একি দেখছি। আশমানের চাঁদ মাটিতে নেমে এসেছে। কিন্তু মালকিন, বড় মুশকিলে ফেললেন; দুজনেই তো দেখি একইতরা খুবসুরৎ। ফারাক তো কিছু বুঝি না।

মাইমুনাহ বলে, তা বললে তো হবে না কাশকাশ, এর মধ্যে একজনকে বাছাই করে বলতেই হবে।

কাশকাশ বলে, ঠিক আছে ঘাবড়াবেন না, উপায় একটা বাৎলে দিচ্ছি।

—কী সে উপায়?

কাশকাশ বললো, প্রথমে আমি এই রাজকুমারীর রূপের গুণগান করে একটা কবিতা শোনাতে চাই।

মাইমুনাহ বাধা দিয়ে বলে, অত সময় নাই। ওসব কাব্যিটাব্যি রাখ, এখন সোজাসুজি যা বলতে চাও বল।

কাশকাশ বললো, তা হলে এক কাজ করুন। আমরা তিনজনই অদৃশ্য হয়ে হাওয়ায় মিশে থাকি। তারপর সকাল হতে দিন। ওরা ঘুম থেকে জেগে উঠুক। দুজনে দুজনকে দেখুক। তখনই বোঝা যাবে কার রূপে কে বেশি মুগ্ধ হয়। যদি ছেলেটা মেয়েটার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে তা হলে বুঝতে হবে মেয়েটাই বেশি সুন্দরী। আর যদি ছেলেটার জন্য মেয়েটার ছটফটানি ধরে তা হলে বুঝবেন ছেলেটার রূপে এমন কোনও যাদু আছে যার টানে মেয়েটা আর ঠিক থাকতে পারছে না। সব সমস্যা লহমায় জল হয়ে যাবে মালকিন। খালি অদৃশ্য হয়ে ঘাপটি মেরে দেখতে থাকুন।

এই সময় রাত কাবার হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামায়।

পরদিন একশো তিরাশীতম রজনী:

রজনীর মধ্যভাগে আবার কাহিনী শুরু হয়। মাইমুনাহ লাফিয়ে ওঠে, ওঃ, কি চমৎকার বুদ্ধি তোমার কাশকাশ। দানাশও হেঁড়ে গলায় বাহবা দিতে থাকে, বেড়ে-মজার! এই বলে আবার সে মাছি হয়ে উড়ে গিয়ে বসলো কামার অল-জামানের ঘাড়ে। কুটুস করে দিল একটা কামড়। কামড়ের যন্ত্রণায় সে সারা শরীর ঝাঁকিয়ে ছটফট করে ওঠে। ঘাড়ের কাছে, যেখানটা জ্বালা করছিল, হাত বুলিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করে। কিন্তু ততক্ষণে কি দানাশ সেখানে বসে থাকার পাত্র। শাহজাদা উঠে পড়বে আশঙ্কায় মাইমুনাহ আর কাশকাশও অদৃশ্য হয়ে হাওয়ায় মিশে গিয়েছিল।

এরপরের ঘটনাগুলো বড় মজার:

কামার অল-জামানের চোখে তখন ঢুলু ঢুলু ঘুম। হাতখানা ঘাড়ের কাছে কিছুক্ষণ বুলিয়ে আলতোভাবে নামিয়ে বিছানার ওপর রাখতে যায়। কিন্তু পাশে শূন্য-শয্যা ছিল না। রাজকুমারী বদরের কুসুমাদপি কোমল বিবস্ত্রা দেহখানি এলিয়ে পড়েছিল সেখানে। হাতখানা নামিয়ে রাখতে গিয়ে রাখলো সে বদরের কবোষ্ণ উরুর খাঁজে।

এবার তার ঘুম ছুটে গেল। একবার চোখ মেলে বদরকে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো বন্ধ করে ফেললো। হয়তো বা সে ভুল দেখলো, কিংবা খোয়াব-এর খোয়াড়ি কাটছে না! চোখ বন্ধ করেই হাতটা আস্তে আস্তে চালিয়ে অনুভব করতে থাকলো—সত্যিই কোনও রক্ত-মাংসের কোনও মেয়ে তার পাশে শুয়ে আছে, কিনা। নাঃ, ভুল সে করেনি। খোয়াবও দেখছে না। 'এই তো মাখনের মতো মোলায়েম কি নরম তার উরুর মাংস। প্রাণ ভরে জোরে শ্বাস টানলো সে। আঃ, কী সুন্দর খুশবু? মেয়েটার গা থেকে সেই সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল ঘরময়। এবার সে মাথা তুলে চোখ মেলে দেখলো। তার পাশে এক অচেনা অজানা অপরূপা। তার নিরাবরণ নগ্ন নিরুপম রূপের দিকে চেয়ে চেয়ে এক অভূতপূর্ব অনাস্বাদিত পুলকে জামানের দেহমন শিহরিত হয়ে উঠতে থাকে।

একটি মেয়ে তার পাশে। তায় আবার সম্পূর্ণ উলঙ্গ। এ দৃশ্য দেখাও পাপ। কিন্তু কৌতূহল এমনই বস্তু তাকে জোর করে বেশিক্ষণ চেপে রাখা যায় না। তেরছা চোখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার সারা শরীর খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে থাকলো। যতই দেখে ততই মুগ্ধ হয়। দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন সুনিপুণ শিল্পীর হাতে গড়া। কোনও খুঁত নাই। সুঠাম সুন্দর এক শিল্প মূর্তি। কামার অল-জামান ভেবে পায় না তার এই রূপ কিসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। হীরা চুনি পান্না? না, তারা সবাই এর জেল্লার কাছে ম্রিয়মান হয়ে যাবে। তবে কি পারস্যের লালগুলাব—যার সুবাসে দিল মদির হয়ে ওঠে। কিন্তু না, তাও' গ্রাহ্য হয় না। এ নারীর রূপের আকর্ষণে আশমানের তারা ধরায় ধরা দিতে পারে। পর্বত নতজানু হয়ে বলতে পারে, ওগো, সুন্দরী, আমার মাথা নত করে দাও তোমার ঐ পদ্মরাঙা পায়ে। আবার সমুদ্রও হয়তো আছড়ে পড়ে মিনতি জানাবে, 'গণ্ডূষ ভরিয়া পান কর দেবী, আমি তব অন্তরে লুকায়ে রহিব চিরকাল।'

উত্তেজনায় সারা শরীর ঘেমে ওঠে জামানের। গা থেকে মাথা অবধি বদরের আগাগোড়া দেহখানার উপরে হাত বুলাতে থাকে সে। কি যে ভালো লাগে তার—কি করে বোঝাবে সে কথা। এ আনন্দ শুধু অনুভবের—প্রকাশের নয়। কামার অল-জামানের জীবনে এ অভিজ্ঞতা এই প্রথম। তাদের সমাজে নারী অসূর্যম্পশ্যা। পরপুরুষ পরনারীর মুখই দেখতে পায় না। তায় আবার নিরাবরণ সারা দেহ! জামানের দেহে সবে যৌবনের জোয়ার আসতে শুরু করেছে কিছুদিন থেকে। এতদিন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এড়িয়ে চলছিল, আজ, এই মুহূর্তে, বুঝি সকল বাধা ছাপিয়ে সে উপছে পড়তে চায়। নিজেকে নির্মম নিষ্ঠুর পীড়নে পীড়িত করতে থাকলে হয়তো বা বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। তখন হয়তো আর সংযত-সংহত থাকার সব বাঁধই উৎখাৎ হয়ে যাবে।

তাই আর দেরি নয়। এবার সময় সমাগত। দেহ যা চায় মনও যখন তাই চায় তাতে আর বাধা দিতে নাই। জামান হাত বুলাতে থাকে ওর গালে, ঠোঁটে, ওর গ্রীবা ঘাড়ে বুকে স্তনে।

অসহ্য এক যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে জামান। বদরের বুকের সঙ্গে মুখ

ঘষতে থাকে। চাঁপাকলির মতো স্তনাধার ঠোঁটের ঘর্ষণেই পলকে রক্তাভ হয়ে ওঠে।

হঠাৎ জামানের খেয়াল হয়, ওর গায়ের শেমিজ গেল কোথায়। এপাশ ওপাশ ঘুরিয়ে দেখতে থাকে। না, কোথাও নাই। আর মেয়েটাই বা কি রকম! এমন ওলোট পালোট করাতেও তার ঘুম ভাঙছে না। জামান কি করে জানবে দানাশ তাকে যাদু করে রেখেছে। এখন তার শরীর নিয়ে দলাই মলাই করলেও এ ঘুম তার ভাঙ্গবে না।

কামার অল-জামান বৃথাই চেষ্টা করে তার ঘুম ভাঙ্গানোর। যতই তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে ততই সে কামনায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বদরের অধরে অধর রাখে। দীর্ঘ চুম্বনে চুষতে থাকে। কিন্তু তবু তার সাড়া নাই। পরপর তিনবার চুম্বনে চুম্বনে ঠোঁটে রক্ত ঝরিয়ে দেয়। কিন্তু না, সে জাগে না। এবার জামান ওকে নাড়া দিয়ে ডাকে, সোনা—সোনা, চেয়ে দেখ, তোমার সামনে কে। ওঠ, সাড়া দাও। তুমি আমার দিল, কলিজা সব কেড়ে নিয়েছ, সুন্দরী। একবার চোখ মেলে তাকাও, দেখ, আমি শাহজাদা কামার অল-জামান—তোমার কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে এসেছি।

কিন্তু কে সাড়া দেবে। দানাশের মায়া বলে সে তখন অসাড় অচৈতন্য। জামান বলে, আমার গুস্তাকী মাফ কর সুন্দরী। আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না। আমি চেয়েছিলাম, আমার ডাকে তুমি সাড়া দেবে। জেগে উঠবে। আমি বড় তৃষ্ণার্ত, আমাকে স্বইচ্ছায় সুধা পান করাবে। কিন্তু তুমি ঘুমে বিভোর। আমি তোমার ঘুম ভাঙ্গাতে পারলাম না। এদিকে যৌবন জ্বরে র্ আমি। কামবানে বিদ্ধ এক তৃষ্ণার্ত কপোত। আর তুমি সেই মদালসা নারী ঘুমে অচৈতন্য। ক্ষমা কর সোনা, সাধ্য নাই ধৈর্য ধরি, তাই চুরি করে নিতে হলো তোমার সদ্যফোটা যৌবনের প্রথম কদম ফুল।

মাইমুনাহ, দানাশ আর কশকশ অলক্ষ্যে সবই প্রত্যক্ষ করছিল।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে। শারিয়ার বলে, যাঃ বাব্বা, ভালো জায়গায় রাতটা কাবার হয়ে গেল...

শাহরাজাদ আড়চোখে দুনিয়াজাদের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়ে মুচকী মুচকী হাসতে থাকে—

পরদিন সন্ধ্যা হতে না হতে বাদশাহ শারিয়ার এসে হাজির হয়। শাহরাজাদ বুঝতে পারে সুলতান কোন্ আফিঙের নেশায় ছটফট করছে। শারিয়ার কিছু বলার আগেই সে বলে, জাঁহাপনা আমার শরীরটা এখন ভালো লাগছে না। যদি মঞ্জুর করেন তবে প্রথম রাতটা একটু ঘুমিয়ে শরীরটা একটু চাঙ্গা করে নিই। তারপর আবার শুরু করবো কাহিনী।

শারিয়ার বলে, গল্প তো রোজই শুনছি শাহরাজাদ, শরীরটাই তো আগে। এসো এখন শুয়ে পড়ি। তারপর মেজাজ ভালো লাগলে, সে পরে দেখা যাবে।

শাহরাজাদের শরীর ভালোই ছিল। শারিয়ারকে একটু বাজিয়ে

দেখে নিল মাত্র। সেই রাতেই দ্বিতীয় প্রহরে আবার সে শুরু করে :

বদর চিৎ হয়ে এলিয়ে শুয়েছিল। কামকাতর জামান দুহাত দিয়ে ওর দেহখানা বুকে নিয়ে জাপটে ধরতে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই সে থমকে গেল। এতক্ষণের সব ধাঁধাঁ নিমেষে জলের মতো সহজ সরল পরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝতে আর তার বাকী রইলো না—এ সব তার বাবার কারসাজী। তা না হলে এই কয়েদখানায় এতগুলো পাহারার চোখে ধুলো দিয়ে এই বন্ধ ঘরের মধ্যে এ-মেয়ে এখানে এল কি করে? বাবা চান, জামান শাদী করে সংসারী হোক। কিন্তু জামান নারী বিদ্বেষী। তার মনের এই বিদ্বেষ ভাব কাটাবার জন্যে তিনি এই ফন্দী এঁটেছেন। কোনও জানলার ফুটোয় চোখ রেখে নিশ্চয়ই সব লক্ষ্য করছেন। কাল সকালে টিটকিরি দিয়ে বলবেন, জামান, মুখে তো অনেক বড় বড় বাত আওড়াও। 'নারী নরকের দ্বার। স্ত্রীলোকের চরিত্র স্বয়ং খোদাতালাও জানেন না। দুনিয়ার তাবৎ অনিষ্টের মূল এই মেয়ে জাত।' কিন্তু বাপজান, কাল রাতে সেই দোজকের কীট নিয়ে কি খেলায় মেতেছিলে? তখন সে কথার কী জবাব দেবো আমি? বড়মুখ করে আদর্শের কথাবার্তা বলা তো আমার খতম হয়ে যাবে। জীবনে আর তাঁর সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো না কোনও দিন। না না, এ হতে পারে না। আব্বাজানের এই ফাঁদে আমি কিছুতেই পা দেবো না। তিনি আমাকে মিথ্যেবাদী ভণ্ড ভাববেন, এ হতে পারে না।

সাপের উদ্যত ছোবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ যেভাবে ছিটকে সরে যায় কামার-অল-জামানের অবস্থাও ঠিক সেই রকম হলো। এক লাফে সে পালঙ্ক থেকে নেমে ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো। আজকের রাতটা সে কোন রকমে সংযম রক্ষা করে চলবে। জামান ভাবে, কাল বাবার কাছে সোজাসুজি প্রস্তাব পেশ করবো, এই মেয়ের সঙ্গে যদি তিনি শাদী দিতে চান আমার কোনও আপত্তি নাই। ছেলের সুমতি হয়েছে দেখে বাবা নিশ্চয়ই খুশি হয়ে শাদী দিয়ে দেবেন। তারপর তো সে আমারই হবে। তখন তাকে নিয়ে আমি যা-ই করি না কেন তিনি আড়ি পাততে আসবেন না। বরং আহ্লাদে আটখানা হবেন।

এতক্ষণ মাইমুনাহর মুখখানা কালো হয়ে গিয়েছিল। তার শাহজাদা এত কামকাতর। একটা মেয়ে—চেনা নাই জানা নাই, যেহেতু সে তার পালঙ্কে শুয়ে আছে অমনি সে তার রূপে ঢলে পড়লো? ছি, ছি, লজ্জায় মাথা কাটা গেল? বাদশাহর ছেলের রুচি প্রবৃত্তি বলে কি কিছু নাই। একটা মেয়ের ন্যাংটো শরীর দেখেই জিভে জল এসে গেল?

যাই হোক, শেষ মুহূর্তে মাইমুনাহর ইজ্জৎ বাঁচিয়েছে শাহজাদা। এবার সে সম্বিত ফিরে পেয়েছে। বাদশাহ শাহরিমানের একমাত্র পুত্র সে। এই বিশাল সলতানিয়তের সে-ই হবে সুলতান। যে-সে কথা নাকি?

আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে থাকে মাইমুনাহ। কামার অল-জামান ধীর পায়ে পালঙ্কের [illegible] দাঁড়ায়। আলতোভাবে একটু ছোট্ট চুম্বন এঁকে [illegible] বদরের গালে। [illegible]জের হাত থেকে মহামূল্যবান একটা হীরের আ[illegible]ুলে পরিয়ে দেয় [illegible] আঙ্গুলে। সেই ক্ষণে মনে মনে সে তাকে

বেগম বলে গ্রহণ করে নেয়। আজ থেকে সে তার স্ত্রী। সহধর্মিনী। এই আংটী তার সাক্ষী।

এরপর জামান্ বদর-এর দিকে পিছন ফিরে শুয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমে গলে গেল। এইবার মাইমুনাহ ধরলো মাছির রূপ। শোঁ করে উড়ে গিয়ে বদরের উরুতে বসিয়ে দিল এক কামড়। ঘুমের ঘোরেই কঁকিয়ে ওঠে সে। কিন্তু মাইমুনাহ ছাড়বার পাত্রী নয়। রাজকুমারীর ওপর রাগে তার সারা শরীর রি রি করে জ্বলছে। পায়ের তালুতে, নাভিকুণ্ডলীতে বাহুমূলে কামড়িয়ে কামড়িয়ে শেষ করতে লাগলো। রাজকুমারী যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে চোখ মেলে তাকালো। কিন্তু একি? নিজের চোখকে নিজেই সে বিশ্বাস করতে পারে না। বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। দুহাত দিয়ে চোখ দুটো রগড়ে নেয়। সে কি স্বপ্ন দেখছে? কিন্তু না, স্বপ্ন তো নয়। তন্ময় হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে সে জামানের অর্ধনগ্ন দেহ। বাঃ কি সুন্দর! এত রূপ কখনও পুরুষের হয়? কিন্তু এখানে সে এল কি করে? খোজাদের চোখ ফাঁকী দিয়ে এই অন্দর মহলে তো পুরুষের প্রবেশ সম্ভব না। তবে কি তার বাবারই এই কারসাজী? বিয়ে করবে না বলে সে পণ করে বসে আছে। সে জন্যেই কি তার বাবা এই রূপবানকে পাঠিয়েছে? তা এমন সুন্দর সুপুরুষ দুনিয়াতে আছে জানলে কি সে 'না' করতো। এমন ছেলে পেলে কি কোনও মেয়ে নিজেকে ঠিক রাখতে পারে

বদর আরও কাছে সরে আসে জামানের। যতই দেখতে থাকে ততই সে বিহ্বল হয়ে পড়ে। মুখখানা নামিয়ে এনে জামানকে একটু চুমু খায়। মনে মনে ঠিক করে, কাল সকালেই সে বাবাকে বলবে, না, তার আর কোনও অমত নাই। এই ছেলেকেই সে বিয়ে করবে। বাবাও খুশি হবে, তারও জীবন আনন্দে ভরে উঠবে। বদর ভাবে, এমন পাত্র থাকতে বাবা কেন ঐ সব হত কুৎসিত বুড়ো-হাবড়া রাজা বাদশাহদের নিয়ে আসতো। বাবা যদি অনেক আগে একে নিয়ে আসতো তাহলে তো কোনও আপত্তিই করতো না সে। যাইহোক, আর দেরি নয়, কালই সে বিয়েতে মত দেবে।

জামানের একখানা হাত তুলে নিয়ে বুক চেপে ধরে। ফিস ফিস করে ডাকে, এই—শুনছো, চোখ মেলে দেখ, আমি বদর। তোমার রূপে আমি পাগল হয়ে গেছি। ওঠ, সোনা, আমাকে আদর কর। তোমার বুকে আমি মাথা রেখে আমার দেহমন সঁপে দিয়ে জীবন সার্থক করি। ওঠ, আর ঘুমিও না।

কিন্তু জামানের ঘুম ভাঙ্গবে কি করে? মাইমুনাহ তো তাকে যাদু করে রেখেছে। বদর সে কথা জানে না। এবার বেশ জোরে জোরেই নাড়া দিতে থাকে। ভাবে ঘুম তার ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু চোখ মেলে তাকাচ্ছে না, ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। পায়ের তলায়, বগলে সুড়সুড়ি দিতে দিতে ডাকে, আমি যে আর সইতে পারছি না সোনা, এভাবে আর কত কষ্ট দেবে? ওঠ, আমার ঠোঁট শুকিয়ে গেছে, বুকের মধ্যে উথাল পাথাল করছে, আমাকে আদর কর, চুমু খাও। চোখ খোল, আমার এই ভরা যৌবনের রূপে দেশ-বিদেশের কত রাজা বাদশাহরা পাগল। আমি তাদের দিকে ফিরেও তাকাইনি। শুধু তোমার জন্যেই অতি যত্নে সঙ্গোপনে লালন করেছি আমার এই কুমারী

দেহখানা। তিল তিল করে আজ সে তিলোত্তমা হয়ে উঠেছে। আজ পর্যন্ত কোনও পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি। তোমার জন্যেই আমি এতকাল প্রতীক্ষা করেছিলাম। আজ তুমি এসেছ, তোমার হাতেই এই দেহমন সঁপে দিয়ে আমি ধন্য হতে চাই। আমার মল্লিকা বনে যখন প্রথম কলি ধরতে শুরু করেছে তখন থেকেই কত ভ্রমরের আনাগোনা, কিন্তু এ ফুলের মধু শুধুমাত্র তোমার জন্যে সযত্নে রক্ষা করে এসেছি। তুমি গ্রহণ করে তৃপ্ত হলে আমিও তৃপ্তি পাবো। আর দেরি করো না, সোনা, এই মধুযামিনী শেষ হতে চলেছে। ওঠ, আজকে রাতে আমাদের মধুর মিলন স্মৃতির পটে শুকতারার মতো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলবে চিরকাল।

কিন্তু কে সাড়া দেবে? জামান তখন ঘুমে অসাড়। এদিকে বদরের দেহে উত্তেজনা ক্রমশই বাড়ে। বাঁ নাকের নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুততর হয়। বুকের মধ্যে সমুদ্রের ঢেউ আছাড় খেয়ে পড়তে থাকে। সারা শরীরে সে এক তুফানের তোলপাড়। শান্ত স্নিগ্ধ চোখের তারারা কামবানে হয়ে ওঠে চঞ্চল। আর সারা মুখে কে যেন মাখিয়ে দিয়েছে আবীর। কপালে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু স্বেদ। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না বদর। জামানের বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে। দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরে অধরে দংশন করে। ঠোঁটে রক্ত ঝরে। কিন্তু জামান ঘুমে অচেতন। কোন সাড়া নাই। ওর সারা শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে হাত বুলিয়ে স্পর্শ সুখ অনুভব করতে থাকে বদর। এই অনুভবের কি যে আনন্দ, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ধন-দৌলত দিয়ে অনেক সুখ-সম্পদ কেনা যায় কিন্তু এই মুহূর্তের এই অনুভব কোনও মূল্যের বিনিময়েই আহরণ করা যায় না।

হঠাৎ নতুন এক আবিষ্কারের আনন্দে বদরের বুকে তোলপাড় শুরু হয়। জামানের দেহের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। ঘুমে অসাড় দেহ, কিন্তু কি আশ্চর্য, বদরের যাদু স্পর্শে জাগ্রত হয়ে ওঠে। বদর ভাবে এবার নিশ্চয়ই সে জেগে উঠবে, চোখ খুলবে। কিন্তু না, জামানের শরীর সাড়া দিলেও ঘুম তার ভাঙ্গে না। বদর ক্ষুব্ধ হয়, নিজের উপরই রাগ হয়। তারই দোষ। এ ব্যাপারে একেবারেই সে আনাড়ী। তাই সে জামানকে জাগাতে পারছে না। অথচ নিজেকেও সে আর ঠিক রাখতে পারছে না। জামানকে জড়িয়ে ধরে সে শুয়ে পড়ে। গালে ঠোঁটে ঘাড়ে বুকে চুমুতে চুমুতে ভরে দিতে থাকে। তারপর কোথা দিয়ে কি হয়ে যায় কিছুই বুঝতে পারে না বদর। কে যেন জোর করে তুলে জামানের দেহের ওপর তাকে বসিয়ে দেয়। দুহাত দিয়ে জামানের দেহটা জাপটে ধরে। তারপর সে কি ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডব। বদরের সারা শরীর ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো উথাল পাথাল হতে থাকে। অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে বদর, বাঁচাও বাঁচাও, আমি শেষ হয়ে গেলাম—

এই সময় রজনী অতিক্রান্ত হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

পরদিন একশো পঁচাশীতম রজনীতে সে শুরু করে :

তিন আক্রিদ রুদ্ধশ্বাসে রাজকুমারী বদরের কাম-কলা প্রত্যক্ষ করছিল।

মাইমুনাহ খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলো। দানাশের মুখ চুন। বললো, আমি হেরে গেছি, মাইমুনাহ, তোমারই জিৎ হলো। মেয়েদের ধৈর্য বলে কোন পদার্থ নাই, ছোঃ।

মাইমুনাহ হেসে গড়িয়ে পড়ে। —আহা রাজকুমারীর কি দোষ! আমার শাহজাদার মতো অমন সুন্দর সুরৎ দেখলে কোন্ মেয়ে চরিত্র ঠিক রাখতে পারে, শুনি?

কশকশকে অনেক সুক্রিয়া জানালো মাইমুনাহ, তোমার পরামর্শেই এত বড় তর্কের ফয়সালা হয়ে গেল। যাক, এবারে তোমরা দুজনে রাজকুমারীকে তার প্রাসাদে আবার শুইয়ে দিয়ে এস।

দানাশ আর কশকশ পালঙ্কের দিকে এগিয়ে যায়। রাজকুমারী বদর তখন কাম-ক্লেদ মুক্ত জামানের বুকের ওপর দেহখানা এলিয়ে দিয়ে অঘোর ঘুমে অচেতন। দানাশ বদরকে কাঁধে তুলে নেয়। জানলা দিয়ে বেরিয়ে নিঃসীম নীল আকাশ পথ ধরে বায়ুবেগে উড়ে চলে তারা চীনের দিকে। অল্পক্ষণের মধ্যে সম্রাট ঘায়ুরের প্রাসাদে যথাস্থানে বদরকে শুইয়ে দিয়ে নিজের নিজের ডেরার পথে পাড়ি দেয় তারা।

মাইমুনাহও শাহজাদার গালে একটা চুমু এঁকে দিয়ে নিজের কূপে গিয়ে ঢোকে।

ভোরেই ঘুম ভেঙ্গে যায় কামার অল জামানের। গত রাতের সব কথাই তার স্মরণে আছে। কিন্তু মেয়েটি কোথায় গেল? ঘরের এদিক ওদিক সে খুঁজতে থাকে। কিন্তু না, কোথাও নাই। এ-ও কি তার বাবার একটা কৌশল? যাইহোক, আজই আব্বাজানকে শাদীর কথা বলবে সে।

দরজা খুলে দেখে প্রহরীরা নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। জামান রাগে ফেটে পড়ে, এই ব্যাটা বাঁদরগুলো, তোদের কি নাক ডাকাবার জন্যে রাখা হয়েছে? পাজী বদমাইশ কোথাকার।

শাহজাদার হুঙ্কারে ধড়মড় করে উঠে বসে সকলে। কেউ জলের গামলা কেউ তোয়ালে নিয়ে এসে দাঁড়ায়। হাত-মুখ ধুয়ে রুজু করে নামাজ সেরে নেয়। তারপর কোরান খুলে পাঠ করতে থাকে।

কোরানের কয়েকটা স্তবক পাঠ করে সে উঠে পড়ে। খানসামা এসে নাস্তা সাজিয়ে দেয়। জামান নির্বিকারভাবে জিজ্ঞেস করে, মেয়েটা কোথায় গেছে, সাব্বাব।

—মেয়েটা? কোন মেয়েটা হুজুর?

সাব্বাব কিছুই আঁচ করতে পারে না। জামান ক্ষেপে যায়, ন্যাকা চৈতন, যেন কিছুই জানে না। যা জিজ্ঞেস করছি সাফ সাফ জবাব দাও।

শাহজাদার কণ্ঠ গর্জে ওঠে। সাব্বাব ভয়ে জড়সড় হয়ে কোরবানীর খাসীর মতো একপাশে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে থাকে।

—সেই মেয়েটা কোথায়? গতকাল রাতে আমার পালঙ্কে কে তাকে পাঠিয়েছিল?

সাব্বাব কাঁপতে কাঁপতে বলে, খোদা কসম, আমি কোনও লেড়কীকে এ তল্লাটে দেখিনি, হুজুর। আর তাছাড়া আমি তো দরজার সামনে আড়াআড়ি হয়ে শুয়ে ছিলাম। আমাকে ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকবে কার সাধ্য!

জামান এবার ক্ষেপে বোম হয়ে যায়। —দেখ সাব্বাব, তুমি ভুলে যেও না আমি শাহজাদা কামার অল-জামান, তোমার রসিকতার পাত্র নই। হতে পারে তুমি আমার বাবার বিশ্বস্ত নোকর। কিন্তু তাই বলে আমার সঙ্গে ধোঁকাবাজি করবে সে আমি বরদাস্ত করবো না। এখন বলছি ভালোয় ভালোয় বল সে কোথায়। না হলে কিন্তু আমার মাথায় খুন চেপে যাবে। তখন তোমার কোনও বাবা তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। আমি বুঝেছি, তারা তোমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছে। কিন্তু তাতে তুমি নিস্তার পাবে না সাব্বাব। সত্যি কথা তোমাকে বলতেই হবে।

লোকটা এবার দুহাত উপরে তুলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বলতে থাকে, খোদা, তুমি সাক্ষী, আমি কি শাহজাদার সঙ্গে মস্করা করছি ? আপনি বিশ্বাস করুন হুজুর, আপনি কি যে বলছেন আমি কিছুই আন্দাজ করতে পারছিনা।

—ওরে ভন্ড, শয়তান, এ দিকে আয়।

সাব্বাব ভয়ে ভয়ে শাহজাদার কাছে এগিয়ে যায়। প্রচন্ড এক ঘুষি মেরে মেঝের ওপর ফেলে দেয়, এখনও বল, নইলে তোকে আস্ত রাখবো না।

সাব্বাব বলে, আমি কিছু জানিনা হুজুর, কি করে বলবো ? জামান ক্যাঁক করে একটা লাথি বসিয়ে দেয় ওর পেটে। বেচারা। এমনভাবে কঁকিয়ে ওঠে মনে হলো বোধ হয় পিলে টিলে ফেটে গেল। জামান বলে চলে, তোকে কুয়োর জলে ডোবাবো। এই শীতের ঠান্ডা জলে কেমন আরাম বুঝবি।

কোমরে একগাছি রশি বেঁধে কুয়োর নিচে নামিয়ে চুবিয়ে দেয় ওকে। বেচারা সাব্বাব জলের মধ্যে খাবি খেতে থাকে। —দোহাই হুজুর, বাঁচান, মরে যাবো।

কিন্তু জামান-এর অবস্থা তখন ক্ষেপা কুকুরের মতো। বারবার ওকে জলের মধ্যে চুবাতে থাকে। —সে কোথায়। না হলে তোকে আমি আর তুলবো না।

সাব্বাব ভাবলো, শাহজাদা তাকে মেরেই ফেলবে। মরিয়া হয়ে চিৎকার করতে লাগলো, আপনি আগে আমাকে ওপরে তুলুন, হুজুর, তারপর আমি সব বলছি।

—হুম্, সোজা পথে এস।

এবার জামান ওকে ওপরে তুলে আনলো। বুড়ো সাব্বাব তখন ঠক ঠক করে কাঁপছে। সারা শরীরের এখানে ওখানে ছড়ে গেছে। কুয়োর পাটে বাড়ি খেয়ে দুটো দাঁত ভেঙ্গে গেছে। নাকটা কেটে গিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরছে। কামার অল-জামান কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়। রাগটা কিছুটা প্রশমিত হয়ে আসে।

—যাও, জামাকাপড় ছেড়ে ওষুধপত্র লাগিয়ে এস।

শাহজাদার সামনে থেকে সে প্রায় ছুটে পালায়। আর কোথাও না গিয়ে সোজা সুলতানের সামনে হাজির হয়। সেই সময় সুলতান শাহরিমান উজিরকে বলছিলেন, কাল সারাটা রাত বড় খারাপ কেটেছে উজির। এক ফোঁটা ঘুমাতে পারিনি। খালি এদিক থেকে ওদিক পায়চারী করে বেড়িয়েছি। বারবার একটা কথাই মনের মধ্যে নাড়া দিয়েছে, আমার কলিজা-জামান, না জানি কত কষ্টে, ঐ পড়ো প্রাসাদের নোংরা ঘরে রাত কাটাচ্ছে। কিছুতেই

মনকে প্রবোধ দিতে পারিনি।

উজির বলে, আপনাকে তো আমি বলে গিয়েছিলাম, জাঁহাপনা, কোনও দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনার প্রাসাদে যে সুখে তিনি থাকেন তার চেয়ে কম আরামে তাঁকে রাখা হয়নি।

এই সময় সাব্বাব এসে সুলতানের পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ে। —জাঁহাপনা সর্বনাশ হয়ে গেছে।

সুলতান এবং উজির দুজনেই চমকে ওঠেন। কেন, কী হয়েছে, সাব্বাব?

—জী হুজুর, শাহজাদার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

—মাথা খারাপ হয়ে গেছে? কি করে বুঝলে।

—জাঁহাপনা, সাব্বাব কাঁদতে কাঁদতে বলে, সকালে ঘুম থেকে উঠেই শাহজাদা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, কাল রাতে আমার পালঙ্কে যে মেয়েটা শুয়েছিল সে কোথায় গেল?' আমি যতই বলি এখানে কোন মেয়ে আসেনি—আসতে পারে না, ততই তিনি আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। আমি জেনেও তার কাছে ছুপিয়ে রাখছি মনে করে আমাকে মেরে পাট পাট করে দিয়েছেন তিনি। কোমরে দড়ি বেঁধে কুয়োর পানিতে নাকানি চোবানি খাইয়েছেন। এই দেখুন হুজুর আমার দুখানা দাঁত ভেঙ্গে গেছে। নাকটা কেটে চৌচির হয়ে গেছে।

সুলতান ভাবেন, তার আশঙ্কাই ঠিক হয়েছে। না জানি বাছা আমার কত কষ্ট পেয়েছে। উজিরের দিকে তাকিয়ে গর্জে ওঠেন তিনি, তোমার মৌৎ এগিয়ে আসছে, উজির। তুমি একটা বদমাইশ শয়তান, কুকুর। তোমার দাওয়াই-এর ব্যবস্থা আমি করছি। তোমার বদ পরামর্শেই আমি তাকে আজ-কয়েদ করেছি। নাও এখন মেহেরবানী করে গতরখানা নড়াও। দেখ গিয়ে, বাছার আমার কি দশা হলো। চটপট খবর দেবে। আমি—বেশিক্ষণ ধৈর্য রাখতে পারবো না।

উজির আর কোনও কথাটি না বলে হন হন করে পড়ো প্রাসাদের চিলেকোঠার ঘরের দিকে ছোটে। পিছনে পিছনে অনুসরণ করে সাব্বাব। কোনও দিকে না তাকিয়ে উজির সোজা গিয়ে ঢোকে জামানের কামরায়। জামান তখন তন্ময় হয়ে কোরান পাঠ করছিল। চোখ মুখ শান্ত, প্রসন্ন।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

জামানের পাশে গিয়ে বসে উজির বলে, হতচ্ছাড়া সাব্বাবের কথা শুনে আমাদের প্রাণ তো খাঁচা ছাড়া। শয়তানের জাসু মিথ্যেবাদী কোথাকার! কি সব যা তা কথা বানিয়ে বলে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। যাক, বাবা, তোমাকে দেখে স্বস্তি পেলাম।

জামান মৃদু মৃদু হাসে। কেন, কি বলেছে সে?

—সে তোমাকে বলতে পারবো না বেটা। বড় খারাপ কথা।

—তা শুনছি না, কি এমন খারাপ, কি এমন মিথ্যে কথা সে বলেছে?

—ব্যাটা বলে কি—তোমার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি

নাকি বলেছো, তোমার ঘরে কে এক মেয়ে এসেছিল। সকালে তাকে দেখতে না পেয়ে সাব্বাবকে মারধোর করেছো—যত্ত সব আজগুবি কথা?

—আজগুবি হতে যাবে কেন? এ সবই তোমাদের ষড়যন্ত্র। আমি তোমাকে এখনও সাবধান করে দিচ্ছি উজির, আমার সঙ্গে এই সব চালাকী বন্ধ কর। না হলে খুব খারাপ হবে। মেয়েটাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ এখনও সাফসাফ বাতাও না হলে তোমার কপালে অনেক দুখ আছে। আমি বুঝতে পেরেছি, আব্বাজানের সঙ্গে তোমরা সাট করে এই সব তামাশা করে যাচ্ছ। কিন্তু আমি আর এক দন্ডও এসব বরদাস্ত করবো না। সাব্বাব-এর কপালে যা জুটেছে তোমার বরাতে তার চেয়েও খারাপ জুটবে।

উজির স্তম্ভ হয়ে যায়। —খোদা হাফেজ, বেটা তুমি এসব কথা বলছ কেন? কি হয়েছে তোমার? আমার মনে হচ্ছে রাতে তোমার ভালো ঘুম হয়নি—তাই এই সব আজগুবি স্বপ্ন দেখেছো। চারদিকে কড়া পাহারা, কে আসতে পারে তোমার ঘরে—আর যদি এলই তো সে গেল কোথায়? ওসব নিয়ে তুমি মাথা খারাপ করো না বাবা, ঘুমের ঘোরে ওরকম খোয়াব দেখা যায়। মাথা ঠান্ডা কর, এসব কথা বললে, লোকে যে পাগল বলবে?

জামান গর্জে ওঠে, পাগল বলবে, কেন পাগলামীর কি করেছি আমি। পাগল যদি হই, তোমাদের মতো বেল্লিক শয়তানদের কারসাজিতেই হবে। কেন, আমি কি তাকে আমার এই চোখ দিয়ে দেখিনি? এই হাত দিয়ে তার শরীর স্পর্শ করিনি? তার দেহের খুশবু আমি নাকে শুঁকিনি? কি—কি বলতে চাও তোমরা। আমি কি বুঝি না, এ সবই তোমাদের ইতরামী!

উজির হাসতে থাকে। কি যেন বলতে যায় কিন্তু তার আগেই জামানের প্রচন্ড একটা ঘুসি এসে লাগে তার মুখে। বেচারী উজির টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে গিয়ে পড়ে মেঝের উপর।

—বদমাইশ, নচ্ছার, এখনও যদি জানে বাঁচতে চাস, বল সে কোথায়। উজিরের সাদা দাড়ির গোছা একহাতে ধরে অন্য হাতে বেদম পেটাতে থাকে জামান। বৃদ্ধ উজির নিজেকে ছাড়াবার বৃথাই চেষ্টা করে। —আমার সঙ্গে শয়তানী করে পার পাবে না। এখনও বলছি কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখেছ, বল? না হলে, ইহজন্মের সাধ তোমার ঘুচিয়ে দেবো আজ।

এক নাগাড়ে বেদম প্রহার করতে করতে হাঁপিয়ে ওঠে জামান। বৃদ্ধকে মেঝের ওপর ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। যত্ত সব শয়তানের পাল্লায় পড়েছি! এরা আমাকে পাগল না করে ছাড়বে না—?

উজির ভাবলো, শাহজাদার হাত থেকে রেহাই পাওয়া দুষ্কর। মাথাটা ওর একদম খারাপ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় কিছু বোঝাতে যাওয়া বোকামী! তাতে আরও সে ক্ষেপে যাবে। শেষে হয়তো বদ্ধ উম্মাদ হয়েও যেতে পারে।

—বাবা, তা হলে তোমাকে সত্যি কথাই বলি, উজির এক ফন্দী এঁটে বলতে থাকে, আমি তোমার বাবার মাইনে করা নোকর। তার নুন খাই, তাই তার অনুগত হয়ে কাজ করা আমার কর্তব্য। তুমি যে আমার ওপর এত ক্ষিপ্ত হয়েছ তার অবশ্য সঙ্গত কারণ আছে, আমি মানি। কিন্তু বাবা, আমি তো আজ্ঞাবহ দাস মাত্র, তোমার বাবা যা হুকুম করেছেন তার বাইরে

আমি কি করতে পারি। যে-মেয়েটিকে কাল রাতে তুমি তোমার ঘরে দেখেছিলে, তোমার বাবার কথা মতো, আমিই তাকে তোমার ঘরে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা তিনি গোপন রাখতে বলেছিলেন। তারও অবশ্য কারণ আছে। তিনি বুঝতে চেয়েছিলেন, মেয়েটি তোমাকে কতখানি মুগ্ধ করতে পেরেছে। তোমাকে কষ্ট দেওয়া বা ধোঁকাবাজি করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি যদি জানতে পারেন, মেয়েটিকে তোমার পছন্দ হয়েছে, তা হলে খুশি হয়ে শাদী দিয়ে দেবেন। তুমি শাদী করে সংসারী হও, এই তো তার একান্ত ইচ্ছা। আর সেইটে জানবার জন্যই তিনি আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমার আর বুঝতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না বাবা, মেয়েটি তোমাকে মুগ্ধ করেছে। তুমি তাকে আপন করে নিতে চাও। বেশ তো কোনও অসুবিধা নাই, এতো মহা আনন্দের কথা। সুলতানও এই-ই চান, আজই এক্ষুণি আমি তাঁর কাছে সব বিবরণ জানাচ্ছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, ঐ মেয়ের সঙ্গেই তিনি তোমার শাদী দিয়ে দেবেন।

এই ওষুধে কাজ হলো। জামান রাগত ভাবেই উজিরকে তাড়া মারে, জলদী যাও আব্বাজানের কাছে। এক্ষুণি তাঁর কাছ থেকে কথা নিয়ে এস। আমি তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে রইলাম।

উজির আর তিলমাত্র অপেক্ষা না করে ঘর থেকে বেরিয়ে সটান সুলতানের প্রাসাদে চলে আসে। আসার আগে সাব্বাবকে ইশারা করে নজরে নজরে রাখবে, যেন ছুটে কোথাও বেরিয়ে না যায়।

মাথার টুপি ছিটকে কোথায় পড়ে গেছে, এলোমেলো, দাড়ির কিছু ছিড়ে-উপড়ে গেছে,, সাজ পোশাক দুমড়ে-কুঁচকে একশা। ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা নিয়ে উজির গিয়ে হাজির হয় সুলতানের সামনে। সুলতান অবাক হয়ে উজিরের আপাদমস্তক দেখতে থাকেন।—কী ব্যাপার? কী হয়েছে, উজির? তোমার এ দশা কে করলো? মাথার টুপি কোথায়? মনে হচ্ছে, সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে!

—আমার আর এমন কি হয়েছে জাঁহাপনা? এর চেয়ে হাজার গুণ মারাত্মক ব্যাপার হয়েছে আপনার পুত্র জামানের।

—কি রকম?

—একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে সে।

—উন্মাদ? বল কি উজির? এই একটা রাতের মধ্যে এমন মারাত্মক ব্যাপার ঘটে গেছে। হায় হায়, একি হলো আমার। কেন, আমি তোমার মতো একটা উল্লুকের কথায় নেচে উঠলাম। কি করে বুঝলে, সে পাগল হয়ে গেছে?

—তার আবোল-তাবল কথাবার্তায় হুজুর। তার ধারণা গতকাল রাতে আমি আর আপনি যুক্তি করে তার ঘরে একটা মেয়েকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। মেয়েটি নাকি সারারাত তার শয্যাতেই ছিল। তাকে তার বেশ মনেও ধরেছে। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে তাকে ঘরে দেখতে না পেয়ে প্রথমে সাব্বার-এর ওপর হম্বিতম্বি করে। কিন্তু সে বেচারী কি বলবে, শেষে তাকে বেদম প্রহার করে কুয়োর জলে চুবিয়ে দেয়। তারপর আমি গেলাম। আমাকে দেখেই সে রেগে কাঁই। তার ধারণা, নাটের গুরু আমি।

আমার পরামর্শেই মেয়েটিকে সকাল হবার আগেই ঘর থেকে সরিয়ে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তাই, আমার বরাতেও কিছু সিন্নি জুটে গেল।

সুলতান রাগে ফেটে পড়েন, এ আর তোমার কি হয়েছে, উজির, আমি তোমাকে ক্রুশে গেঁথে মিনারের মাথায় ঝুলিয়ে রাখবো। আমার একমাত্র সন্তান, জানের কলিজা, তার যদি কোনও অনিষ্ট হয় তার জন্য তুমিই একমাত্র দায়ী। তোমাকে আমি রেহাই দেবো না। এখন চল, আমি নিজে তাকে একবার দেখি।

হন হন করে পড়ো প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন সুলতান। পায়ে পায়ে উজির। কামার অল-জামানের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই অত্যন্ত শান্ত বিনয়ী সুবোধ ছেলের মতো সে এগিয়ে এসে বাবার হাতে চুম্বন করে অবনত মস্তকে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সুলতান সস্নেহে জামানকে বুক জড়িয়ে ধরে কপালে, চোখে, গালে চুমু খেলেন।

তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, বেটা, চল, পালঙ্কে বসা যাক।

সুলতান নিজে বসলেন, জামান বাবার পাশে একাসনে বসতে ইতস্ততঃ করছিল, হাতে ধরে পুত্রকেও পাশে বসালেন। দাঁত কড়মড় করে উজিরের দিকে অগ্নিবান হেনে বললেন, উজির, তুমি যে কত বড় একটা মিথ্যেবাদী তা নিজের চোখেই একবার দেখ, আমার হীরের টুকরো ছেলে, কত নম্র, কত ভদ্র, বিনয়ী, আর তুমি বল কিনা—সে যাক তোমার ব্যবস্থা আমি পরে করছি।

জামানের দিকে ফিরে মুখে মধু ঢেলে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, বেটা, আজ যেন কি বার ?

জামান বললো, আজ শনিবার আব্বাজান ?

—কাল কি বার বাবা ?

—কেন, কাল রবিবার ?

জামান অবাক হয়। হঠাৎ আব্বাজান আজ এই ধরনের প্রশ্ন করছেন কেন ? মনে পড়ে খুব ছোট্টবেলায় যখন সে সবে প্রথম ভাগ পড়ছে, রাতে শুয়ে শুয়ে বাবা তাকে এই ধরনের নানা প্রশ্ন করে বুদ্ধির পরীক্ষা করতেন। কিন্তু আজ কেন এই সব প্রশ্ন ? হঠাৎ সে বুঝতে পারে। উজিরটা তাঁকে বুঝিয়েছে, তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। জামানের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে। বলে, পরশু সোমবার, তরশু মঙ্গল, তারপর দিন বুধ, তারপর দিন বৃহস্পতিবার। আর তারপর দিন শুক্র, আমাদের নামাজের দিন পবিত্র জুম্মাবার।

সুলতানের মুখে গর্বের হাসি ; উজিরের দিকে কটাক্ষ হেনে বলেন, শুনলে উজির, এর পরেও তোমার কোনও সংশয় আছে ?

এই সময় রাত্রি শেষ হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

একশো অষ্টাশীতম রজনীতে আবার সে শুরু করে :

সুলতান আবার জামানকে প্রশ্ন করেন, আচ্ছা বেটা, আরবী হিসাবে এটা কোন মাস ?

—জেলকদ, পরের মাস জেলহিজ্জা পরে মহরম, শফার, পরে রবিয়ল আউয়ল, রবিয়স্বাসি, তাপর জামাদ আউয়ল, জামাদ শ্বাসি, রজব, শাবন, রমজান, শবওয়াল।

সুলতান আনন্দের চোটে উজিরের গালে ছোট্ট একটা ঠোনা মারেন, দুনিয়াতে যদি বদ্ধ পাগল কেউ থাকে—সে তুমি নিজে। বাহাত্তর পেরিয়ে গেছে, এবার তোমার ভীমরতি ধরেছে। শাহ-দরবার তোমার জায়গা নয় উজির। এবার মক্কা-মদিনায় গিয়ে আল্লাহর নাম গান কর।

এরপর সুলতান কামার অল-জামানের দিকে চেয়ে বলেন, বেটা তোমার নামে এই বেহেড উজিরটা কি সব যা-তা কথা বলেছে, জান? তুমি নাকি ঐ বাঁদরমুখো কালো কুৎসিত হতচ্ছাড়া সাব্বাব আর এই বাহাত্তুরে বুড়ো উজিরটাকে বলেছ, গতকাল রাতে তোমার ঘরে নাকি একটা খুব-সুরৎ লেড়কী ঢুকেছিল। এবং তাকে নিয়েই তুমি সারারাত কাটিয়েছ। সকালবেলায় তাকে দেখতে না পেয়ে তুমি নাকি সাব্বাব-এর ওপর চোটপাট করেছ, মারধোর করেছ, কুয়োর জলে চুবিয়েছ। শুধু সাব্বাব নয় উজিরকেও নাকি তুমি এই কারণে পিটিয়েছ। এমন সব ডাহা মিথ্যেবাদী ওরা—আমি ওদের এমন সাজা দেবো, বুঝতে পারবে হাড়ে হাড়ে।

কামার অল-জামানের মন বিষিয়ে ওঠে। —আব্বাজান এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক লেবু কচলাকচলি হয়ে গেছে। এই ধরনের তামাশা আর আমার ভালো লাগছে না। এত দিন আপনি আমাকে শাদীর জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করেছেন। কিন্তু তখন মেয়েদের সম্পর্কে আমার খুব খারাপ ধারণা ছিল, সেজন্য আজ আমি লজ্জিত। দোহাই আব্বাজান, আপনি আমাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়েছেন, আর কষ্ট দেবেন না। আমি আর আপনার অবাধ্য হবো না। গতকাল রাতে যে মেয়েটিকে আপনি আমার বিছানায় পাঠিয়েছিলেন তাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আপনি আমাকে ঐ মেয়ের সঙ্গে শাদীর ব্যবস্থা করুন, আমি আজই তাকে শাদী করতে চাই। তাকে দেখা অবধি আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। এক মুহূর্ত তার অদর্শন আর সইতে পারছিনা। সে আমার সারা দিল জুড়ে বসেছে। তাকে ছাড়া আমি আর একটা দিনও বাঁচতে পারবো না। মেয়েদের সম্বন্ধে যে সব উক্তি আমি করেছি, সেজন্য লজ্জিত, অনুতপ্ত। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন আব্বাজান। আর দেরি করবেন না, আজই শাদীর ব্যবস্থা করুন।

ছেলের এইসব কথা শুনে সুলতান চিৎকার করে ওঠেন, ইয়া আল্লাহ, একি করলে তুমি! আমার একটামাত্র ছেলে, সবেধন নীলমনি, তার একি দশা করলে? আমি বাঁচবো কি নিয়ে?

ছেলেকে উদ্দেশ্য করে সুলতান বলতে থাকেন, খোদা তোমার মঙ্গল করবেন বাবা। তিনি তোমার উন্মাদ দশা নিশ্চয়ই কাটিয়ে দেবেন। জীবনে সজ্ঞানে আমি কোনও অন্যায় করিনি। তবে কোন পাপে আমি এত বড় শাস্তি ভোগ করবো? নিশ্চয়ই তোমার ঘাড়ে কোন শয়তান ভর করেছে। তিনিই রক্ষা করবেন তা থেকে। কাল রাতে কি তোমার খানাটা খুব বেশি হয়ে গিয়েছিল। গুরুপাক জিনিস পেটে পড়েছিল বোধ হয়। তাই হজম হয়নি। রাতে বদহজম হলে এই রকম বিদঘুটে খোয়াব দেখে

অনেকে। যাই হোক আমার ধারণা তোমার এই মাথার গোলমালটা নেহাতই সাময়িক। মন থেকে রাতের ঐ স্বপ্নের ব্যাপারটা একেবারে মুছে ফেল। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। যাই হোক, আমি কথা দিচ্ছি, আর তোমার ওপর কোনও জোর জুলুম করবো না। তোমার ইচ্ছে হয় বিয়ে শাদী করবে, না ইচ্ছে হয় করবে না। দরকার নাই আমার নাতির মুখ দেখে। ছেলেকে খুইয়ে আমি নাতি পেতে চাই না। ভবিষ্যতে আমি আর নিজে থেকে কখনও শাদীর কথা বলবো না, বাবা। শুধু তুমি নিজেকে একটু শান্ত কর।

কামার অল-জামান প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, আপনাকে আমি দুনিয়ার সব থেকে বেশি ভালোবাসি, ভক্তি করি। আপনিও আমাকে এই কথা বলছেন, আব্বাজান। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনা। তবুও আপনি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে আর একবার বলুন, গতকাল রাতে আমার শয্যায় যে মেয়ে 'ট গিয়েছিল, সে সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন না। তারপর আমি প্রমাণ দেবো, কালরাতে আমার ঘরে কোনও মেয়ে এসেছিল কি না।

সুলতান বললে, আল্লাহর নামে কসম খেয়ে আমি বলছি, বাবা এ রকম কোনও কাজ আমি করিনি।

জামান তখন বললো, গতকাল শেষরাত্রে যখন আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় সেই সময় আমি আধা ঘুমন্ত অবস্থায় বেশ বুঝতে পারছিলাম একটি মেয়ে আমার শরীরের ওপরে উথাল পাথাল করছে। তখন আমার এমন অবস্থা নয় যে ঘুম থেকে উঠে পড়ি। যাই হোক সকাল বেলায় যখন ঘুম ভাঙ্গলো দেখি আমার তলপেটের নিচে বেশ খানিকটা রক্ত জমাট বেঁধে আছে। আপনার বিশ্বাস না হয় হামামে চলুন দেখবেন, আমি পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলেছি। এখনও সেখানে সেই রক্ত দেখতে পাবেন। তা ছাড়াও, এই দেখুন আমার হাতের এই আংটিটা। এটা নিশ্চয়ই আমার হাতে আগে কখনও দেখেন নি। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন, আংটিটা কোনও মেয়ের হাতের। আর আমার এই আঙ্গুলে যে হীরের আংটিটা ছিল সেটা নাই।

সুলতান বললেন, তোমার কথা আমি মানছি, কিন্তু এই প্রমাণই তো যথেষ্ট নয়। এতেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়।

এই সময় রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

একশো নব্বইতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয়ঃ

সুলতান বললেন, ঠিক আছে, দাঁড়াও হামামে গিয়ে আমি নিজের চোখে দেখে আসি।

সুলতান হামামে ঢুকে অবাক হয়ে গেলেন। যে জলের গামলায় জামান হাত মুখ ধুয়েছে তার মধ্যে ডেলা ডেলা রক্তের ছিট। সারা জলটা রক্তে লাল হয়ে আছে।

—হুম, গম্ভীর ভাবে সুলতান অস্ফুট স্বগতোক্তি করেন, মনে হচ্ছে, লড়াকু মেয়েটা বেশ তাগড়াই। এখন বুঝতে পারছি, ওই উল্লুক উজিরটারই এই কাণ্ড।

ছেলের কাছে ফিরে এসে বলেন, হুঁ, খুব চিন্তার ব্যাপার।

আর একটিও কথা বললেন না সুলতান। ঠায় বসে বসে ভাবতে লাগলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক এই ভাবে কাটে। তারপর উজিরের দিকে তাকিয়ে হুংকার ছাড়েন তিনি। —এ সব তোমার শয়তানী—উজির। তুমিই কাল-রাতে কোনও মেয়েকে পাঠিয়েছিলে এ ঘরে।

উজির সুলতানের পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে, আপনি বিশ্বাস করুন জাঁহাপনা, আমি এর বিন্দু-বিসর্গ জানিনা। আল্লার নামে কসম খাচ্ছি, পবিত্র কোরাণ ছুঁয়ে হলফ করতে পারি, এ সবের কিছুই আমি জানি না।

সাব্বাবও সেই রকম একইভাবে কসম খেয়ে বললো, সে-ও কিছুই জানে না।

সুলতান এবারে দিশেহারা হয়ে পড়েন।—তা হলে একমাত্র স্বয়ং খোদাতালা ছাড়া এর রহস্যের জাল কেউ ভেদ করতে পারবে না।

জামান এবার সত্যিই প্রায় উন্মাদের মতো বললো, কিন্তু আব্বাজান, সে মেয়েকে না পেলে এ জীবন আমি রাখবো না। যেমন করেই হোক তাকে খুঁজে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন। আমি তাকে না দেখে আর এক মুহূর্ত বাঁচবো না।

সুলতান অসহায় ভাবে বলে, কিন্তু বেটা তা কি করে সম্ভব। এত বড় বিশ্বসংসারে সেই অজানা অচেনা মেয়ের সন্ধান কি করে পাবো আমি। তুমি তার নাম জান না, তার বংশ পরিচয় দিতে পারছ না, আন্দাজে কোথায় খুঁজে বেড়াবো তাকে? এখন একমাত্র আল্লাহ, তিনি সর্বজ্ঞ, একমাত্র ভরসা। তিনি যদি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করেন তবেই সব সমস্যার সমাধান হতে পারে। এখন তার ওপর সব ছেড়ে দিয়ে হা হুতাশ করা ছাড়া আর আমাদের অন্য কোনও পথ নাই, বাবা। তোমার মনের ব্যথা আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু, এই বিশাল সলতানিয়তের অধিপতি হয়েও আমি আজ নিরুপায়। কি করে তার হদিশ করবো?

ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান প্রাসাদে ফিরে আসেন। সারা প্রাসাদে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। সুলতান এবং জামান কারো সঙ্গে দেখা করেন না। দরবারের সব কাজ কাম মুলতুবী রাখা হয়। পুত্রের ব্যথায় ব্যথিত সুলতান, কোনও কাজে মন দিতে পারেন না। কোথায় গেলে ছেলের মানসী প্রিয়ার সন্ধান পাওয়া যাবে কিছুই বুঝতে পারেন না।

প্রাসাদে নিজের কক্ষে পুত্র জামানকে নিয়ে তিনি বিষণ্ণবদনে দিন কাটাতে থাকেন। তার একমাত্র ভাবনা কি করে পুত্র জামানের মুখে হাসি ফোটানো যায়। কিন্তু না, দিন যায় সন্ধ্যা হয়, আবার ফিরে আসে সকাল, জামান বিরহে কাতর হয়ে পড়ে থাকে। শেষে প্রাসাদের পরিবেশও বিষময় মনে হয় তাদের।

দরিয়ার মাঝখানে সুলতানের এক বিলাস ভবন ছিল। তীর থেকে সেতু বাঁধা ছিল সেই প্রাসাদ পর্যন্ত। সুলতান ঠিক করলেন, পুত্রকে নিয়ে সেই নিরালা নির্জন প্রাসাদে গিয়ে দিন কাটাবেন। প্রাসাদের এই কোলাহল আর তার ভালো লাগছিল না।

কিন্তু সেই অনিন্দ্য সুন্দর প্রমোদ প্রাসাদে গিয়েও জামান এতটুকু

সান্ত্বনা পায় না। দিনে দিনে সে আরও বেশি বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

এ দিকে দানাশ এবং কশকশ রাজকুমারী বদরকে তার শয্যায় শুইয়ে রেখে আসার ঘণ্টাদুই বাদে সকাল হয়। বদরের ঘুম ভাঙ্গে। চোখ মেলে তাকায়। দারুণ খুশি খুশি ভাব। মুখে মৃদু হাসি। গত রাতের সুখ-সম্ভোগ তাকে মোহিত করে রেখেছে। বিছানার পাশে চোখ ফেরাল, ভুরু দুটো কুঁচকে এদিক ওদিক খুজতে থাকে—কোথায় গেল সে। তখনও ভালো করে ঘুমের ঘোর কাটেনি তার। আবার চোখ বন্ধ করে। দু হাত দিয়ে কি যেন হাতড়াতে থাকে। কিন্তু না, সে তো শয্যায় নেই। তবে, এই ভোরে গেল কোথায়? এ ঘর থেকে বেরুবার তো কোনও উপায় নাই। অজানা আশঙ্কায় তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়। দিশাহারা হয়ে চিৎকার করে ওঠে। প্রধান বাঁদী ছুটে আসে। না জানি রাজকুমারীর কি বা হয়েছে। —কী হলো, মালকিন, অমন করে চেঁচালেন কেন? স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছেন?

এই সময় রাত্রি অবসান হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন একশো একানব্বইতম রজনী:

আবার সে শুরু করে:

বদর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, ন্যাকামী করছো? তুমি জান না কেন আমি চিৎকার করছি। সাফ সোফ জলদি বল, কাল রাতে আমার পাশে যে ছেলেটা শুয়েছিল সে কোথায়? ওফ্, কী তার রূপ, কী তার পৌরুষ—আমাকে সে একটা রাতে যা দিয়েছে সারা জিন্দগীভর কেউ তা দিতে পারবে না। যাক ওসব কথা শুনে তোমার কাজ নাই। এখন বল তাকে আবার কোথায় নিয়ে গেছ।

বদরের কথা শুনে বুড়ি বাঁদীর চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়, কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলে, ইয়া আল্লা, একি কথা বলছেন, রাজকুমারী? এমন অসৎ অলুক্ষণে কথা মুখে আনা পাপ। এতকাল আমি আপনার বাদীগিরি করছি, কোনও দিন তো এ মতিভ্রম আপনার হয়নি রাজকুমারী? না না, আপনি আমার সঙ্গে মস্করা করছেন, তাই না?

বদর বিছানার ওপরে ভর দিয়ে হাতের তালুতে মাথা রেখে আধ শোয়া অবস্থায় বুড়ি বাঁদীর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে বলে, দেখ বুড়ি, তোমার কপালে আজ অনেক দুঃখ আছে। আমাকে তুমি চেন না? আমার রাগ কখনও দেখনি? এখনও লক্ষ্মী মেয়ের মতো সত্যি কথা বল। কাল রাতে সে আমাকে বেহেস্তের সুখ দিয়েছে। আমি আমার এতকালের যত্ন-লালিত এই দেহ-রূপ-যৌবন সব তার হাতে তুলে দিয়েছি। সে এখন আমার ভালোবাসা। তাকে ছাড়া এক মুহূর্ত আমি আর থাকতে পারবো না। বল সে কোথায়?

বুড়ি-বাঁদী চোখে সর্ষে ফুল দেখতে থাকে। মনে হয় সারা প্রাসাদটা জ্বলছে। বুঝিবা এখুনি হুড়মুড় করে সব ধসে পড়বে। নিজের কানকে সে বিশ্বাস করতে পারে না। এ সব কী কথা শুনলো সে। আবার নিজের

কপাল চাপড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো, ওগো, আমার কী হলো গো, এমন সব্বোনাশ কে করলো গো। হায় আল্লাহ, একি করলে তুমি!

তার চেঁচামেচি চিৎকারে হারেমের অন্যান্য-দাসী বাঁদীরা সব ছুটে আসে। রাজকুমারীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে শুনে তারাও হা-হুতাশ করে চোখের জল ফেলতে থাকে।

রাজকুমারী এবার বাঘিনীর মূর্তি ধারণ করে। —দাঁড়াও তোমাদের সাট করে শয়তানী আমি ভেঙ্গে দিচ্ছি। সবগুলো এক গোয়ালের গরু। হাড়ে হাড়ে বজ্জাৎ! কিন্তু এখনও শোন বলছি, আমার মেহেবুবকে এখুনি নিয়ে এস। না হলে তোমাদের সবাইকে আমি কুকুর দিয়ে খাওয়াবো।

দাসী বাঁদীরা শিউরে ওঠে, কিন্তু রাজকুমারী, এ-কথা সম্রাটের কানে গেলে কি কাণ্ড হবে বলুন, দেখি। আমাদের যেমন গর্দান যাবে, সেই সঙ্গে আপনাকেও কোতল করে ফেলবে। এ-সব কথা এমন করে চাউর করা কি ভালো হচ্ছে মালকিন?

—ওসব ছেঁদো কথা আমি শুনতে চাই না, রাজকুমারী বদর কঠিন কণ্ঠে বলতে থাকে, আমার চোখের মণি, দিল্-কা-পিয়ারাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বল। কাল রাতে তার সঙ্গে আমি যে এক বিছানায় রাত কাটিয়েছি তার প্রমাণ আমার শরীরে এখনও জ্বলজ্বল করছে।

বুড়ি বাদী হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো, হায় আল্লাহ একি হলো, আমার সোনার বাছার মাথা খারাপ হয়ে গেল? এযে একেবারে বদ্ধ পাগলের প্রলাপ বকছে সে। এখন আমি কি করি। তখনই বলেছিলাম, মেয়ে ছেলে সোমত্ত হলে শাদী দিয়ে দিতে হয়। তা না হলেই যত বিপত্তি। এখন এই ঠ্যালা কে সামলাবে? সম্রাটের কাছে কে জানাবে এই দুঃসংবাদ। যে বলতে যাবে, তারই তো গর্দান যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

বদর এবার ক্ষেপা কুকুরের মতো তেড়ে যায়, তবে রে শয়তানী? আমার সঙ্গে মস্করা করা হচ্ছে। আমি তোর ইয়ারকীর পাত্রী?

ছুটে গিয়ে দেওয়ালে টাঙানো ঢাল-তলোয়ারের একখানা পেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারে। দাসী-বাঁদীরা আঁতকে ওঠে। আর একটু হলেই দু-এক জনের জান খতম হয়ে যেত। ভাগ্যে তারা ছিটকে সরে যেতে পেরেছিল তাই রক্ষে।

রাজকুমারী বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে—এই সংবাদ সারা প্রাসাদে মৃত্যু সংবাদের মতোই মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লো। সম্রাট ঘায়ুরেরও কানে পেঁছিতে বেশি দেরি হলো না। তিনি তৎক্ষণাৎ হারেমের তাবৎ দাসী বাদী খোজাদের তলব করলেন। বুড়ি বাদী সাশ্রু নয়নে আদ্যোপান্ত সবিস্তারে সব বর্ণনা দিল। ঘায়ুর শুনে স্তম্ভিত হলেন। এক রাতের মধ্যে এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড কি করে ঘটতে পারে, তিনি কিছুই ভাবতে পারেন না। শুধু চিন্তিতভাবে একটি কথাই বলতে পারলেন, ভয়ঙ্কর কথা!

বুড়ি-বাঁদী বললো, সে যে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে তাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। তলোয়ার ছুড়ে আমাদের খতম করতে চেয়েছিল, বরাতজোরে বেঁচে গেছি।

ঘায়ুর এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না, চিৎকার করে প্রাসাদ ফাটিয়ে দিতে চান। —তুমি যে সব কথা বলছো, তা কি সত্যি?

—এক বর্ণও মিথ্যা নয় হুজুর।

—বড় সাংঘাতিক কথা, কিন্তু কি করে হলো? আর বদর যা বলছে, তার সবটাই কি পাগলামী?

সম্রাট মহানুভব, প্রথমে আমার তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে যা দেখেছি তাতে আমার মনেও খানিকটা দ্বিধা এসেছে।

সম্রাট উত্তেজিত অধৈর্য হয়ে কৈফিয়ত তলব করেন, কি দেখেছ, বল।

হুজুর, আজ সকালে যখন রাজকুমারী ঘুম থেকে জেগেছেন, তার পরেই তার চিৎকারে আমি ঘরে ছুটে যাই। তখন তিনি মাত্র একটি শেমিজ পরেছিলেন। রোজ রাতে শোবার সময় এই পোশাকেই তিনি শুয়ে থাকেন। দেহের নিচের অংশ একেবারে নগ্ন থাকে। আমি দেখেছি, তার জঙ্ঘার দুপাশে শুকনো রক্তের ছোপ—উরু পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এ দৃশ্য আমার কাছে নতুন। আপনি সম্রাট, আপনার কাছে মেয়েদের এসব ব্যক্তিগত ব্যাপার খুলে বলা সম্ভব না। তবে জেনে রাখুন এ ধরনের রক্তপাত, স্বাভাবিক ভাবে হয় না। কোনও পুরুষ-সঙ্গ ছাড়া হতে পারে না। কিন্তু তাও একেবারে অসম্ভব। প্রাসাদের যা কড়া পাহারা—তাদের চোখে ধুলো দিয়ে কোন কাক-পক্ষীরও হারেমে ঢোকা সম্ভব নয়।

সম্রাট ঘামুর উত্তেজনায় কাঁপতে থাকেন, তাজ্জব ব্যাপার! সম্রাট আর তিলমাত্র দেরি না করে কন্যা বদরের মহলে ছুটে এলেন। কন্যাকে সস্নেহ চুম্বন দিয়ে বললেন, মা জননী, এই সব দাসী-বাঁদীরা তোমার নামে কী সব বলছে। আমি ওদের সব শূলে চাপাবো।

—কেন বাবা, কি বলছে তারা?

—ওরা বলছে, কাল রাতে নাকি তোমার ঘরে কোন্ এক অচেনা অজানা যুবক ঢুকেছিল। তুমি নাকি তাকে গ্রহণ করেছ, এক বিছানায় রাত্রি-বাস করেছ। তোমার নামে এ-সব অপবাদ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না মা। আমি ওদের শূলে দেব। শুধু একবার বল, সব মিথ্যে।

—মিথ্যে? মিথ্যে কেন হতে যাবে বাবা। এর চেয়ে বড় সত্যি আজ আর আমার জীবনে কিছু নাই, বাবা! আমি এতকাল পুরুষ বিদ্বেষী ছিলাম। তার কারণ, যে সব পাত্র আপনি হাজির করেছিলেন তাদের কাউকেই আমার যোগ্য বলে মনে হয়নি। কিন্তু কাল রাতে যে অপূর্ব সুন্দর ছেলেটিকে আমার ঘরে পাঠিয়েছিলেন, তার জুড়ি বিশ্ব সংসারে নাই। সেদিক থেকে আপনার পছন্দের তারিফ করছি বাবা। আমি কাল রাতেই তাকে আমার দেহ-মন সব সঁপে দিয়েছি। এখন আমার আর কোনও অমত নাই। তার সঙ্গে আমার শাদীর ব্যবস্থা করুন। আমি শাদী করবো। বাবা, তাকে যদি আমার ঘরে পাঠালেন তবে ভোর না হতেই আবার তাকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন কেন? সে যে আমার, সে যে আমার নয়নমনি—তাকে আমি সব দিয়েছি। সেও আমাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে। এই দেখুন, তার প্রমাণ। সে আমাকে তার হাতের আংটী পরিয়ে দিয়েছে।

সম্রাট ঘামুর মাথায় হাত দিয়ে বসলেন, মা, তুমি সত্যিই উন্মাদ হয়ে গেছ। ওরা ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু কি করবো, ঈশ্বর যা চান তাই হবে। যাক, তুমি আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না। আমি তোমার ভালো চিকিৎসার

ব্যবস্থা করছি।

বাবার কথা শুনে বদর ক্রোধে ফেটে পড়ে। নিজের সাজ-পোশাক ছিঁড়ে খুঁড়ে টুকরো টুকরো করতে থাকে। ঘায়ুর ভাবলেন, পাগল হলে কোনই কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। হয়তো সে তার প্রাণটাই শেষ করে দিতে পারে। দাসী বাদীদের হুকুম করলেন, রাজকুমারীকে ধরো।—জোর করে ওকে শুইয়ে দাও। যেন সে না ওঠে। লক্ষ্য রাখবে। আর যদি দেখ, তাকে সামলানো যাচ্ছে না, সোনার শিকল দিয়ে তাকে জানলার গরাদের সঙ্গে বেঁধে রাখবে। কোনও ক্রমেই যেন সে ছুটে না যায়।

ঘায়ুর দরবারে ফিরে গেলেন। তার একমাত্র সন্তান, নয়নের আলো—সে আজ পাগল হয়ে গেল! কি হবে এই সাম্রাজ্যে? কিসের প্রয়োজন এত বিত্ত বৈভবের? কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ। হায় ঈশ্বর একি ভয়ঙ্কর শাস্তি দিলে তুমি, কি আমার অপরাধ?

দরবারে গণ্যমান্য অমাত্য পারিষদদের ডেকে পাঠালেন। তাদের সঙ্গে একটা পরামর্শ করা দরকার। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপদের দিনে কেউ যদি আলোর রেখা দেখাতে পারে!

কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, হেকিম বদ্যি, গণৎকার সব হাজির হলেন। সম্রাট তাদের কাছে সব খুলে বললেন।

—এখন সে বদ্ধ উন্মাদ। তবে আমার বিশ্বাস এ রোগ সারানো সম্ভব। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ তার এই ব্যধি সারাতে পার আমি তার হাতেই তুলে দেবো আমার প্রাণ প্রতিমা বদরকে। তার সঙ্গে ছেড়ে দেবো আমার এই সিংহাসন—বিশাল সাম্রাজ্য। কিন্তু একটা শর্ত—যদি কেউ সারাতে পারবে বলে এগিয়ে আসে, অথচ সারাতে না পারে, তবে তার গর্দান যাবে।

সম্রাটের এই ঘোষণা নানা দেশের নগরে প্রান্তরে জারি করে দেওয়া হলো। বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক গুণীজ্ঞানী বদ্যি, হেকিম, জ্যোতিষী গণৎকার আসতে লাগলো। সবাই রাজকুমারীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললো, নাঃ, এ বড় দুরারোগ্য কঠিন রোগ। সারবে কি সারবে না বলা শক্ত। এ অবস্থায় হাড়ি কাঠে মাথা গলিয়ে দিতে বিশেষ কেউই ভরসা পেল না। যারা ধনদৌলত সাম্রাজ্য আর রাজকুমারীর লোভ সামলাতে না পেরে পতঙ্গের মতো উড়ে এল তাদের ভাগ্যে যা জুটতে পারে তাই জুটলো।

রাজকুমারী বদরের এক পাতানো ভাই ছিল। বুড়ি বাদীর একমাত্র পুত্র, ছোট থেকে এক সঙ্গেই তারা হেসে-খেলে মানুষ হয়েছে। ছেলেটি খুব ধর্মবিশ্বাসী। ছোট থেকেই সে তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে সাধনা করতো। মজার মজার যাদুবিদ্যা দেখিয়ে তাঁক লাগিয়ে দিত। হিন্দু এবং মিশরীয় তন্ত্রমন্ত্র সম্বন্ধে পড়াশুনাও করেছে সে প্রচুর। এই তার নেশা। দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। নতুন কোনও যাদু নতুন কোনও মন্ত্র যদি কোথাও শেখা যায়। সারা দুনিয়ার নানা দেশ ঘুরে ঘুরে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে। কত রাজা বাদশাহের দরবারে সে সম্মোহন বিদ্যা দেখিয়ে উপস্থিত সকলকে অবাক করে দিয়েছে তার ইয়ত্তা নাই।

ছেলেটির নাম মারজাবন। অনেক দিন বাদে, অনেক দেশ ঘুরে সে

দেশে ফিরছে। শহরে ঢোকার মুখেই দেখে, প্রবেশ দ্বারের সামনেই গোটা চাল্লশেক নরমুণ্ড ঝোলানো রয়েছে। কি ব্যাপার, কিছুই ঠাওর করতে পারে না। এক সঙ্গে এতগুলো মানুষ বলি হয়েছে। পথচারীদের জিজ্ঞেস করতে একজন বললো, রাজকুমারী পাগল হয়ে গেছেন। সম্রাট ঘোষণা করেছেন যে সারাতে পারবে তাকে রাজকন্যা ও রাজত্ব দুই-ই হাতে তুলে দেবেন তিনি। আর যে না পারবে তার গর্দান যাবে। তাই—লোভে পাপ আর পাপে মৃত্যু! বেচারীদের জন্মের সাধ মিটে গেছে। রাজকুমারীকে কেউ সারাতে পারেনি।

এই সময় রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

একশো চুরানব্বইতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু করে সে:

মারজাবন তার মা বুড়ি বাঁদীকে জিজ্ঞেস করে, আম্মা, বদর কেমন আছে?

—আর বলিস নি, বাবা, মেয়েটা পাগল হয়ে গেছে। দেশ বিদেশের কত ডাক্তারবদ্যি আসছে, কিন্তু কেউ সারাতে পারছে না। সম্রাট ঢ্যাঁড়া পিটে দিয়েছেন, যে তাঁর মেয়েকে সারিয়ে তুলতে পারবে তার সঙ্গে মেয়ের শাদী দিয়ে দেবেন। সেই সঙ্গে দেবেন তার গোটা সাম্রাজ্য। কিন্তু যারা লোভে পড়ে এল কেউই তারা প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরতে পারলো না।

মারজাবন বুঝলো, পথচারী লোকটা যা বলেছিল, কথাটা তাহলে ঠিকই। মারজাবনের মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ছোটবেলা থেকে এক সঙ্গে হেসে খেলে তারা ভাইবোনের মতো মানুষ হয়েছে। অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর সে মাকে বললো, মা, একবার তুমি তার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দাও। আমার বিশ্বাস, আমি তাকে সারিয়ে তুলতে পারবো।

মা শঙ্কিত হয়, সে বড় কঠিন ব্যামো, বাবা। দেশ বিদেশের কত নামজাদা হেকিম বদ্যি এল, কিন্তু কেউ কিছু করতে পারলো না। ওসবের মধ্যে তোমার গিয়ে কাজ নাই।

মারজাবন কিন্তু নাছোড়বান্দা। বললো, তুমি একবার তার সঙ্গে মোলাকাৎ করিয়ে দাওই না। তারপর আমি বুঝবো।

পুত্রের বায়না ঠেলতে পারে না বুড়ি বাঁদী।—ঠিক আছে, তুমি এক কাজ কর। মেয়েদের সাজপোশাক পরে আজ রাতে তুমি আমার সঙ্গে হারেমে ঢুকবে।

মায়ের কথামতো নারীর ছদ্মবেশ ধরে যথাসময়ে মায়ের কাছে আসে মারজাবন। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রাজকুমারী বদরের হারেমে ঢুকতে যায়। প্রথমে খোজারা বাধা দিল, নতুন কোনও লোকের ঢোকার হুকুম নাই।

বুড়ি বাঁদী বলে, আহা, নতুন লোক আবার কোথায় দেখলে? এ তো আমার লেড়কী। রাজকুমারী বদরের সঙ্গে এক সঙ্গে মানুষ হয়েছে। ওরা দুজনে বড় পিয়ারের সখী।

খোজা ভাবে, রাজকুমারীর সখী—সে তো সোজা কথা নয়। বাধা দিলে রাজকুমারী হয়তো তার গর্দান নিয়ে নেবে। তাই আর কথাটি না

বলে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালো।

হারেমে ঢুকে বদরকে দেখে সে বোরখা খুলে ফেলে দিল। বোরখার মধ্যে সে একখানা জ্যোতিষ দর্পণ লুকিয়ে এনেছিল। আর এনেছিল খানকয়েক যাদুমন্ত্রের বই এবং একটি মোমবাতী

মারজাবনকে দেখে ছুটে আসে বদর। ওর ঘাড়ে মাথা রেখে বলে, কোথায় ছিলে ভাই? এরা সবাই আমাকে পাগল বানিয়ে রেখেছে। ওরা যাই ভাবুক, তুমি তো আমাকে ভালো করে জান ভাই। ওদের মতো তুমিও যেন আমাকে ভুল বুঝো না।

মারজাবন বলে, সেই জন্যেই তো নিজের চোখে দেখতে এসেছি বোন। তুমি কিছু ভেবো না, আল্লা ভরসা কর, সব ঠিক হয়ে যাবে। যাক, সে কথা, আমি তোমার একখানা ঠিকুজী বানাতে চাই।

বদর বলে, তোমার যা ইচ্ছা বানাও। আমার কোনও অমত নাই। যে ভাবে চাও আমাকে পরীক্ষা করে দেখ, তাহলেই বুঝবে, সত্যি আমি পাগল, কি সুস্থ মানুষ।

মারজাবন বলে, যারা সুস্থ, জ্ঞানী তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেই পরিষ্কার বোঝা যায়। তাই আগে তোমার কাহিনী শোনাও আগাগোড়া! একটুও বাদসাদ দেবে না।

বদর সব বৃত্তান্ত হুবহু খুলে বললো তাকে। কোনও কিছু গোপন করলো না।

—এখন সারা দিনরাত শুধু আমার কেঁদে কেঁদে কাটে। কোথায় আমার ভালোবাসা, কোথায় গেলে তাকে পাবো জানি না। ভাই মারজাবন, তুমি আমার শুধু পাতানো ভাই না, তুমি আমার বন্ধু। তোমাকে আজ কাছে পেয়েছি, যে কথা কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারি না, তবু তোমাকে বলা যায়। আমি ধনদৌলত সাম্রাজ্য কিছু চাই না, ভাই। শুধু তাকে চাই। তার জন্যে আমাকে যদি ভিক্ষা করেও জীবন ধারণ করতে হয় আমি রাজি আছি। দুনিয়াতে চাইবার মতো আর কোনও বস্তুই আমার নাই—শুধু তাকে ছাড়া। সে আমার কলিজা, সে আমার সর্বস্ব।

মারজাবন মাথা নত করে বসে থাকে।—তোমার দুঃখ আমি বুঝি বোন। বিরহের যে কি ব্যথা তা ওরা বুঝবে কি করে। ওরা জীবনটাকে হীরে জহরৎ আর ধন দৌলত দিয়ে মাপতে শিখেছে। যাই হোক, তোমার সব কাহিনীই শুনলাম। সবই আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার। কিন্তু কথা হচ্ছে, এখন তার সন্ধান পাওয়া যায় কোথায়। ঠিক আছে চেষ্টার আমি কসুর করবো না। আমার বিশ্বাস আমি তোমাকে সুখী করতে পারবো। কিন্তু বোন, যথেষ্ট ধৈর্য ধরতে হবে। আমি দেশে দেশে ঘুরি, বহু রাজাবাদশাহর দরবারে আমার অবাধ গতি। আর তোমার 'ভালোবাসা' সে কোনও যে সে ঘরের ছেলে নয়। তার যা রূপের বর্ণনা দিলে তেমন রূপবান পুরুষ তো আকছার পথে-ঘাটে মেলে না। তাছাড়া, এই যে মহমূল্যবান হীরের আংটী—এ-ও যার তার হাতে থাকা সম্ভব না। এর বেশি আর কিছু তোমাকে এখন বলতে পারছি না, বোন। আজই আমি আবার পথে বেরিয়ে পড়বো। পথে প্রবাসে ঘোরাই আমার কাজ। কিন্তু

এবার যাবো শুধু তোমার জন্যে। দেখি চেষ্টা করি, যদি আমার বোনের মুখে আবার হাসি ফোটাতে পারি। মনে একটু বসন্তের রঙ ধরাতে পারি।

সেইদিনই সে মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়ে। সারাটা মাস ধরে সে এ শহর থেকে ও শহরে ঘুরে বেড়ায়। যেখানেই যায় বদরের পাগল হওয়ার কাহিনী শোনে।

চলতে চলতে অবশেষে একদিন সে সমুদ্রের ধারের বন্দর শহরে এসে হাজির হয়। শহরটার নাম তারাব। সেখানে কিন্তু কেউ বদরের কাহিনী শোনেনি। কিন্তু তার বদলে সেখানকার শাহজাদা কামার অল-জামানের অদ্ভুত দুরারোগ্য ব্যাধির কথা লোকের মুখে মুখে। কামার অল-জামান সেই দেশের সুলতানের একমাত্র সন্তান। নানা লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে কামার অল-জামানের আজব কাহিনী সব জেনে নিল। সব শুনে তার মনে হয়, কোথায় যেন বদরের কাহিনীর সঙ্গে এর একটা যোগসূত্র আছে। একজনকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা ভাইসাব, কোথায় গেলে সেই শাহজাদার দেখা পাওয়া যাবে?

লোকটি বলে, সুলতান শাহরিমানের সলতানিয়ত কি আর এতটুকু! সাত-সমুদ্র তের নদী পারেও তার শেষ নাই। সুলতান শাহরিমানের দরবার হলো খালিদানে। হাঁটাপথে ছ'মাস লাগে। আর সাগর পাড়ি দিয়ে গেলে লাগবে পুরো এক মাস।

মারজাবন একখানা নৌকা ভাড়া করে যাত্রা করলো। পালের হাওয়া অনুকূলেই ছিল। তর তর করে বয়ে চলে নৌকা। এই ভাবে প্রায় একটা মাস কেটে গেছে, খালিদান শহর আর বেশি দূরের পথ নয়। মারজাবনের প্রাণ আশায় দুলে ওঠে।

হঠাৎ ঈশান কোণে মেঘ দেখা গেল। এখনি ঝড় উঠবে। মারজাবনের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। এখন কি হবে উপায়? এই অকূল দরিয়ায় বে-ঘোরে প্রাণ হারাতে হবে!

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হলো। মাঝি হাল ঠিক রাখতে পারলো না। পালের কাছি ছিঁড়ে গেল। প্রচণ্ড শব্দে নৌকাটা গিয়ে ধাক্কা খেল এক পাহাড়ের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

মারজাবন ভালো সাঁতারু। তা হলেও তাণ্ডবের সঙ্গে লড়াই করা—সে কি চাট্টিখানি কথা। যাই হোক, কোনও রকমে একটা ভাসমান বয়া ধরে সে প্রাণ রক্ষা করতে পারলো। ঢেউ-এর সঙ্গে উথাল পাথাল হতে হতে এক সময় সে সুলতান শাহরিমানের প্রমোদ প্রাসাদের ধারে এসে ভিড়লো।

বরাতের জোরে সে-যাত্রা সে বেঁচে গেল। ঐ সময় সুলতানের উজির দরবারের দরকারী কাজকর্মে সেখানে এসেছিল। তারই নজরে পড়ে মারজাবন। প্রাসাদের একটা জানলা দিয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে তার তাণ্ডবলীলা দেখছিল। হঠাৎ দেখতে পেল, একটা বয়া এগিয়ে আসছে প্রাসাদের দিকে। সেই বয়াটা আঁকড়ে ধরে আছে একটি যুবক। তৎক্ষণাৎ নফর চাকরদের বললো, যা, দেখতো, একটা লোক বোধহয় বয়া ধরে ভাসতে ভাসতে এসে ভিড়েছে ঘাটের সিঁড়িতে। নিয়ে আয় তাকে।

চাকরবাকররা ছুটে গেল। একটু পরে প্রায় অচৈতন্য মারজাবনকে ধরাধরি করে নিয়ে এল তারা উজিরের সামনে। জামা কাপড় বদলে দেওয়া হলো। একজন এক গেলাস সরবৎ এনে ধরলো তার সামনে। সরবৎটুকু খাওয়ার পরে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলো সে।

ছেলেটিকে দেখে উজিরের বেশ ভালো লাগে। চোখে মুখে বুদ্ধি দীপ্ত ছাপ। সুন্দর চেহারা, সুঠাম দেহ। দেখে মনে হয় বহুদূর দেশের মুসাফির।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

একশো ছিয়ানব্বইতম রজনী :

শাহরাজাদ বলতে থাকে :

উজির মারজাবনকে উদ্দেশ করে বলে, এই ঘোর বিপদের দিনে আল্লাহ তোমাকে বোধহয় আমাদের কাছেই পাঠিয়েছেন।

মারজাবন একথার অর্থ বুঝতে পারে না, কেন জনাব, একথা বলছেন কেন? আমি নৌকা করে চলছিলাম—উদ্দেশ্য ছিল খালিদানের শাহজাদা কামার অল-জামানের সঙ্গে মোলাকাৎ করবো। কিন্তু আল্লাহর বুঝি তা ইচ্ছা নয়, তাই ঝড়তুফানের মধ্যে পড়ে নৌকাটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। আমি কোনরকমে ওই বয়াটা ধরে আত্মরক্ষা করেছি। তাও আপনারা না থাকলে হয়তো দরিয়ার জলে জান হারাতে হতো।

উজির অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।—শাহজাদা কামার অল-জামানের সঙ্গে তোমার কি দরকার?

—না মানে, শুনেছি তিনি খুব অসুস্থ। মানে।—মাথার নাকি—

উজির বলে ঠিকই শুনেছ, শাহজাদা কামার অল-জামান বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে। তাকে সারাবার অনেক চেষ্টাই করা হয়েছে—হচ্ছে, কিন্তু কোনও হেকিম বদ্যিই কিছু করতে পারছে না। তা—তোমার কি করা হয়?

—যে আজ্ঞে আমিও, রোগবালাই-ই সারাই। তবে কোনও দাওয়াই পত্র দিয়ে নয়।

—তবে?

তাবিজ কবজ ঝাড়ফুক মন্তর—এই হচ্ছে আমার তরিকা।

উজিরের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—আমার মনে হচ্ছে তুমিই পারবে। কারণ এত ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যেও আল্লাহ তোমাকে ঠিক জায়গাতেই পৌঁছে দিয়েছেন। এ হচ্ছে সুলতান শাহরিমানের বিলাস ভবন। তারই পুত্র কামার অল-জামানকে এখন এই প্রাসাদেই এনে রাখা হয়েছে। তুমি যদি চাও তার সঙ্গে দেখা করতে পারো।

মারজাবন বলে, নিশ্চয়ই দেখা করবো, জনাব। কিন্তু তার আগে আগাগোড়া বৃত্তান্ত সব একবার শোনা দরকার।

উজির বললো, একবার কেন, একশোবার শোনাবো। আমরা চাই, আমাদের সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী শাহজাদা জামান সুস্থ হয়ে উঠুক। তার জন্যে যে মূল্য প্রয়োজন আমরা দিতে প্রস্তুত।

এরপরে আগাগোড়া সব কাহিনী তাকে শোনালো উজির। মারজাবনের আর বুঝতে বাকী থাকে না শাহজাদা জামানের সে-রাতের সেই নায়িকা বদর ছাড়া আর কেউ-ই নয়। একটা নতুন আবিষ্কারের আনন্দে তার মন নেচে ওঠে। কিন্তু তখুনি নিজেকে সামলে নেয়। উজিরকে সে বুঝতে দিতে চায় না তার মনের ভাব। বললো, ঠিক আছে, আগে তার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিন। নিজের চোখে একবার দেখি রুগীকে। তারপর বলবো, পারবো কি পারবো না। তবে খোদা আমার একমাত্র ভরসা, কোনও দাওয়াই পত্রে আমি বিশ্বাস করি না, আশা হয় পারবো।

আর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে উজির মারজাবনকে শাহজাদা জামানের কক্ষে নিয়ে যায়। প্রথম দর্শনেই সে চমকে ওঠে। এত রূপ কোনও পুরুষের হয়? যেন মনে হয় রাজকুমারী বদরের জুটির জন্যেই সে জন্মেছে। আর বদরের মুখেও তার মেহেবুবের চেহারার যে বর্ণনা সে শুনে এসেছে তার সঙ্গে এই সুরৎ হুবহু মিলে যাচ্ছে।

কামার অল-জামান কৃশ অবসন্ন দেহে বিছানায় শুয়ে ছিল। চোখের ইশারায় মারজাবনকে বসতে বললো সে। শাহরিমান ভাবছেন, ছেলে হয়তো কিছু ব্যক্তিগত কথাবার্তা বলতে চায় ছেলেটির সঙ্গে। তাই তিনি উজিরকে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যান।

মারজাবন ফিসফিস করে বলেঃ আর কোনও ভয় নাই। আল্লাহ আমাকে দূত করে পাঠিয়েছেন এখানে। আপনার 'ভালোবাসার' খবর বয়ে নিয়ে এসেছি আমি।

জামান সন্দেহাকুল চোখে তাকায়। লোকটা এদেরই চর নয় তো। হয় তো বা কোনও নতুন ফন্দী।—ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সে মারজাবনের মুখের দিকে।

—কী, বিশ্বাস হচ্ছে না? হবে হবে। সব বলছি। সব প্রমাণ আছে আমার কাছে। স্বয়ং রাজকুমারী বদর আমাকে বলেছেন আপনাদের সেই রাতের সোহাগ-মিলনের কাহিনী।

এরপরে মাবজাবন যে সব খুঁটিনাটি বিবরণ দিতে থাকলো তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ রইলো না—ছেলেটা আর যাই হোক তার বাবা বা উজিরের কোনও গুপ্তচর নয়।

মারজাবন বললো, রাজকুমারীর নাম বদর। সম্রাট ঘায়ুরের একমাত্র সন্তান। সে আমার পাতানো বোন। ছোটবেলা থেকে এক সঙ্গে আমরা মানুষ হয়েছি।

কামার অল-জামান-এর চোখ দুটো চকচকে করে ওঠে। যেন একটা আশার আলো দেখতে পায়।—তা হলে আর দেরি নয় দোস্ত, চল আজই আমরা রওনা হয়ে যাই, সম্রাট ঘায়ুরের দেশে।

মারজারন বলে, সে দেশ তো অনেক দূরের পথ। তোমার এই শরীরে এখনই রওনা হওয়া ঠিক হবে না। সে ধকল তুমি সহ্য করতে পারবে না। আগে শরীরটাকে সারিয়ে নাও, তারপর যাওয়া যাবে। আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে তবে রাজকুমারী বদর সুস্থ হয়ে উঠবেন।

এই সময় রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে

বসে রইলো।

একশো নিরানব্বইতম রজনী :

আবার সে শুরু করে :

কৌতূহল চাপতে না পেরে সুলতান শাহরিমান আবার ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে যান। আনন্দে নেচে ওঠে তার বুক। এতদিন পরে ছেলের মুখে তিনি হাসি দেখলেন। এই মুহূর্তেই তার মুখের বিষণ্ণতা মুছে গেছে। তিনি শুনলেন, জামান বলছে, তুমি বসো, দোস্ত, আমি হামাম থেকে হাতমুখ ধুয়ে, সাজ পোশাক পালটে একটু পরিপাটি হয়ে আসি।

সুলতান ছুটে এসে মারজাবনকে জড়িয়ে ধরেন। আনন্দে তিনি আজ আত্মহারা। কি যাদু দিয়ে, কেমন করে ছেলেকে সে প্রাণবন্ত করে তুললো সে সব আর জানতে চাইলেন না তিনি। জামান যে আবার সুস্থ হয়েছে—এই-ই তার কাছে যথেষ্ট।

সবচেয়ে মূল্যবান রত্নাভরণে মারজাবনকে ভূষিত করলেন তিনি। উপহার দিলেন দামী দামী সাজ পোশাক। সারা শহরের মানুষ নাচ গান হৈ হল্লায় মেতে উঠলো। আলোর মালায় সাজানো হল প্রাসাদ। দু হাতে বিতরণ করা হতে থাকলো টাকা পয়সা, পোশাক আশাক খানা-পিনা। বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়া হলো। আবার দরবারকক্ষ গমগম করে উঠলো।

কয়েকদিন বাদে, শাহজাদা জামান তখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে, মারজাবন বললো, এবার যাত্রার আয়োজন কর দোস্ত। আমার বোনের অবস্থা যে কি, তা তো বুঝতে পারছো।

কামার অল-জামান বিমর্ষভাবে বলে, কিন্তু, আব্বাজান আমাকে যেতে দেবেন না, মারজাবন। তিনি আমাকে কাছ ছাড়া করে একটা দিনও থাকতে পারেন না। আমি আবার অসুখে পড়বো, মনে হচ্ছে। তার অদর্শন আমি সইবো কি করে।

মারজাবন তাকে সান্ত্বনা দেয়, কিছু ভাবনার নাই, দোস্ত, সব ঠিক হয়ে যাবে। উপায় আমি বাৎলে দিচ্ছি। তবে একটুখানি মিথ্যের আশ্রয় নিতে হবে। তা—শুভ কাজে একটু আধটু মিথ্যে বললে এমন কিছু গুস্তাকী হয় না। তুমি শুধু সুলতানকে বলবে, মারজাবন তোমাকে নিয়ে দিন কয়েকের জন্য শিকারে যেতে চাইছে। দেখবে কোনও অমত করবেন না। আমার ওপর এখন তিনি দারুণ খুশি। তাছাড়া অনেকদিন একটা বন্ধ ঘরের মধ্যে অসুস্থ হয়ে আটকে ছিলো। খোলামেলা মুক্ত আলো হাওয়া তোমার এখন যথেষ্ট প্রয়োজন।

মারজাবনের বুদ্ধির তারিফ করে জামান। সুলতানের কাছে গিয়ে বলতে তিনি না করতে পারলেন না। বললেন, কিন্তু বাবা, একটা রাতের বেশি তুমি বাইরে কাটাবে না। তা হলে আমি মরে যাবো। তুমি তো জান, একটা রাত তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারি না।

দুজনের জন্য দুটো সেরা তাগড়াই ঘোড়া সাজানো হলো। সঙ্গে আরও ছজন ঘোড়াসওয়ার, লোক লস্কর, উট, খানা পিনা, সাজ পোশাক তাঁবু প্রভৃতির লাট বহর নিয়ে রওনা হলো তারা। শহরের সীমান্ত মুখ

পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এলেন সুলতান। চোখের জল ফেলতে ফেলতে বিদায় জানালেন।

মারজাবন বললো, দেখ বন্ধু আজ সারাটা দিন আমরা বনে জঙ্গলে শিকার সন্ধান করে বেড়াবো। কেন জান? সঙ্গের লোকজনের মনে কোনও সন্দেহ যাতে না হয়, সেইজন্য একটা দিন আমরা যথার্থ শিকারীই না হয় হলাম। তারপরের ফন্দী আমি ভেবেই রেখেছি।

সারাদিন ধরে খুব হৈ হল্লা দৌড় ঝাপ করে শিকার সমাধা করা হল। সন্ধ্যাবেলা একটা বাগানের মধ্যে তাঁবু ফেলে খানাপিনা শেষ করে শুয়ে পড়লো সকলে।

রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর। সঙ্গের লোকজন সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সবাই তখন বেঘোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। মারজাবন জামানকে জাগালো। ফিসফিস করে ওর কানে কানে বললো, এই রাতে এখুনি আমাদের পালাতে হবে। সবাই ঘুমে অচেতন কেউ টের পাবে না। নাও, ওঠ, দুজনে দুটো ঘোড়ায় চেপে কেটে পড়ি।

তখুনি, আর কাল বিলম্ব না করে, জামান আর মারজাবন অতি সন্তর্পণে সেখান থেকে সরে পড়লো। কিছুদূর ধীরে ধীরে চলার পর জোর কদমে ঘোড়া চালিয়ে ভোর না হতেই বহু যোজন পথ পার হয়ে গেল তারা। আসার সময় তারা সঙ্গে এনেছিল একটা তোরঙ্গ। তার মধ্যে ছিল কিছু সাজ পোশাক, এক বাক্স সোনার মোহর আর খানিকটা খানা পিনা। এছাড়া এনেছিল একটা বাড়তি ঘোড়া।

সকাল হয়ে গেল। একটা চৌরাস্তার মোড়ে এসে থামল ওরা। মারজাবন বললো, দোস্ত, তোমার জামা আর পাতলুন খুলে আমার হাতে দাও। আর তোরঙ্গ থেকে একটা সাধারণ সাজ পোশাক বের করে পর।

জামান বুঝতে পারে না কিছুই শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

—কী ব্যাপার? কেন?

—যা বলছি কর, কোনও প্রশ্ন করো না।

জামান আর কথা না বাড়িয়ে সাজ পোশাক বদলে জামা পাতলুন তুলে দেয় মারজাবনের হাতে। মারজাবন বলে, এবার তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি আসছি।

এই বলে সে জামানের জামা পাতলুন কাঁধে ফেলে সেই ফালতু ঘোড়াটাকে নিয়ে পাশের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

একটু পরে সে ফিরে এল। জামান অবাক হয়ে দেখল, তার সাধের সৌখিন জামা পাতলুন রক্তে রাঙা। মারজাবন বলে ঘোড়াটাকে জবাই করে খুনে মাখিয়ে নিলাম তোমার সাজ পোশাক। এবার দেখ, এ গুলোকে এই চৌমাথার এক পাশে ফেলে রেখে আমরা উধাও হয়ে যাবো।

জামান হাসে। সব তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হলো এতক্ষণে। কি অসাধারণ বুদ্ধি মারজাবনের।

মারজাবন বলে, এসো এবার নাস্তা সেরে নিই। আবার কখন কোথায় থামবো, তারতো ঠিক নাই।

দুজনে বসে পেট ভরে খানাপিনা করলো। মারজাবন বললো, আর

দেরি নয়। এবার ঘোড়ার পিঠে ওঠ। টগবগিয়ে ছুটাবো। দুপুর হওয়ার আগেই আমাদের অনেক দূর চলে যেতে হবে। এতক্ষণে তোমার শিকারের সঙ্গী নফর চাকররা ঘুম থেকে উঠে আমাদের নিশ্চয়ই খোঁজাখুজি করছে। এরপর তারা অনেক খোঁজাখুজি করেও যখন কোনও হদিশ করতে পারবে না, সুলতানের কাছে গিয়ে জানাতেই হবে। সে খবর, আজ দুপুর নাগাদ সুলতান খবর পাবেন। তারপর কি হবে বুঝতেই পারছো, তার হুকুমে একদল সৈন্যসামন্ত ছুটাছুটি শুরু করে দেবে। এক সময় তাদের কেউ এই চৌরাস্তার মোড়েও আসবে। দেখবে, তোমার সাজপোশাক রক্তে রাঙা—পড়ে আছে পথের ধারে। জঙ্গলটার মধ্যে ঢুকবে তারা। দেখবে, তোমার ঘোড়াটা মরে পড়ে আছে। ভাববে কোনও ভয়ঙ্কর জানোয়ারের মুখে পড়ে ঘোড়াটা ঘায়েল হয়েছে। তোমাকে সে খাবার করে নিয়ে চলে গেছে। এই সাংঘাতিক বিবরণ যখন সুলতান শুনবেন, সুলতানের সে যে কি নিদারুণ অবস্থা হবে আমার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু কি করা যাবে, এছাড়া সহজ উপায়ে তোমাকে তার কাছ থেকে নিয়ে আসা যেত না। তবে এও ভাবো। বিষম শোকতাপে দগ্ধ হতে হতে একদিন যখন তোমাকে আবার ফিরে পাবেন তখন তিনি কত আনন্দ পাবেন? সে আনন্দের কোনও তুলনা নাই। জান তো, সব ভালো যার শেষ ভালো।

জামান বলে, তোমার মতো বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা। তোমার উপস্থিত বুদ্ধি, বিচক্ষণতার কোনও তুলনা নাই। ধন্যবাদ জানিয়ে তোমাকে ছোট করবো না। কিন্তু চলার পথে তো আমাদের অনেক খরচ হবে। সে পয়সা কড়ি তো আমার সঙ্গে নাই। তবে আমার হাতে মহামূল্যবান কয়েকটা আংটী আছে। বিক্রী করলে লাখখানেক মোহর দাম হতে পারে। এগুলো কোথাও বেঁচে রাহাখরচ চালাবার ব্যবস্থা কর।

মারজাবন বলে, ও নিয়ে তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না, চাঁদ। আমি সব ব্যবস্থা পাকা করেই এসেছি। আমার ওপর খুশি হয়ে তোমার বাবা আমাকে বহু ধনরত্ন এবং নগদ এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিয়েছেন। সেগুলো সব এই তোরঙ্গের মধ্যে একটা বাক্সে করে নিয়ে এসেছি আমি। সম্রাট ঘায়ুরের সাম্রাজ্যে পেঁছিতে আমাদের এত পয়সার দরকারই হবে না; জামান। আর তাছাড়া তোমার হাতের ঐ অমূল্য রত্নগুলো বেঁচতে গেলেই ধরা পড়ে যেতে হবে। জহুরীর হাতে পড়লেই তার সন্দেহ হবে। এ-সব বস্তু তো ইতর সাধারণের কাছে থাকতে পারে না। এদিকে তোমার বাবা সুলতান শাহরিমানও নিশ্চয়ই চুপ করে বসে থাকবেন না। তার নিজের দেশ ছাড়াও আশেপাশের আর পাঁচটা দেশেও হুলিয়া জারি করে দেবেন। একটা সামান্য জহুরী মোটা পুরস্কারের লোভে তোমাকে ধরিয়ে দেবে না, সে কি হতে পারে! সুতরাং ওগুলো বরং খুলে জেবের ভেতরে রেখে দাও।

একনাগাড়ে মাসখানেক চলার পর একদিন সকালে তারা সম্রাট ঘায়ুরের রাজধানীর উপান্তে এসে পেঁছিল। কামার অল-জামানের আর ধৈর্য মানে না, তখনি সে সম্রাট ঘায়ুরের সঙ্গে দেখা করতে চায়। কিন্তু মারজাবন বলে, ধৈর্যং কুরু, বন্ধু, এখানে তিষ্ঠ ক্ষণকাল।

শহরের প্রান্তমুখে একটা বনেদী সরাইখানা। মারজাবন বলে, এখানে

উঠবো আমরা। দিন তিনেক বিশ্রাম করবো আগে। বাব্বা, একটানা একমাস ঘোড়ার পিঠে—গায়ের হাড়মাংস আর নাই। বেদনায় টনটন করছে। টানটান হয়ে আগে শুয়ে কাটাবো তিনটে দিন। তারপর অন্যকথা।

সরাইখানার একটা ঘরে পাশাপাশি দুটো পালঙ্কে দুই বন্ধু তিন দিন তিন রাত্রি শুয়ে শুয়ে কাটালো। পথের ক্লান্তি কেটে গিয়ে ফোটাফুলের স্নিগ্ধতা ফুটে ওঠে জামানের মুখে। দেহমন বেশ ঝরঝরে মনে হয়। মারজাবন বলে, নাও, এবার হামামে চল, তোমাকে আমি নিজে হাতে ঘষে-মেজে সাফ করে গোসল করাবো।

স্নানাদি শেষ করে এক জ্যোতিষের বেশ ধারণ করল জামান। মারজাবন তাকে সুন্দর করে সাজালো। জামানের যা রূপ তাতে ওকে যে সাজেই সাজানো যাক, অপরূপ লাগবে।

সম্রাট ঘায়ুরের প্রাসাদের পথে পা বাড়াতেই শহরের আবাল বৃদ্ধবনিতা এসে ভিড় জমাতে থাকলো। এমন রূপের হাট তারা আগে কখনও দেখেনি। পথচারীদের কেউ কেউ জানতে চাইল, কী অভিপ্রায়ে যাওয়া হচ্ছে রাজ-দরবারে?

জামান গর্বভরে ঘোষণা করে, আমি ত্রিভুবন জয়ী জ্যোতিষ। আমার অসাধ্য কিছুই নাই। রাজকুমারী বদর-এর দুরারোগ্য ব্যাধির কথা শুনে বহু দূর দেশ থেকে আসছি। তার সব রোগ আমি সারিয়ে দেবো।

জনতার মধ্যে গুঞ্জন ওঠে। লোকটা বলে কি? সে কি জানে না, আজ পর্যন্ত যত গুণীজ্ঞানী হেকিম বদ্যি এসেছে, তাদের কি দশা হয়েছে!

কে একজন বলে, তা মরার জন্য যদি পাখা গজায়, কে আর আটকাতে পারে বল। ঐ যে ওখানে যাদের কাটা মুণ্ডু ঝুলছে ওখানে গুণতিতে আর একটা মুণ্ডু বাড়বে—এই আর কি—

মেয়েরা চুকচুক করে, আহা রে, চাঁদের মত সুরৎ, মনে হয় বড়ঘরের ছেলে। এমন রূপ এমন যৌবন—সব শেষ হয়ে যাবে।

অনেকে বারণ করে, দেখ বাপু, অমন কাজটি করতে যেও না। যা কেউ পারলো না, তা যে তুমিও পারবে না তা জানি। পাতালপুরীর রাজ-পুত্তুরের মতো তোমার মন ভোলানো রূপ আছে তাও মানছি—কিন্তু ওতে তো ভবি ভুলবে না। আমাদের সম্রাটের প্রতিজ্ঞা বড় সাংঘাতিক। মুখ দিয়ে একবার যা বের করবে তার আর নড়চড় হবে না। রাজকুমারীর রোগ যদি সারাতে না পার বাছা, তা সে তোমার যত রূপ-গুণই থাক, গর্দান তোমাকে দিতেই হবে। তাই বলছি, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। কি দরকার অত লোভে। জানেই যদি না বাঁচলে কি হবে রাজত্ব আর রাজকন্যা দিয়ে?

কামার অল-জামান সে-সব কথায় কর্ণপাত করে না।—মুড়িমিছরি এক করে দেখ না তোমরা, এই আমার অনুরোধ। আমার পীরের কাছ থেকে যে বিদ্যা আমি আহরণ করেছি, তাতে মরা মানুষকে আবার বাঁচিয়ে দিতে পারি—পাগল তো কোন্ ছার।

এই কথা শুনে চমকে ওঠে সকলে। মরা মানুষকে জীয়ন্ত করতে পারে!

মুহূর্তে লোকের মুখে মুখে সারা শহর ছড়িয়ে পড়ে এই অদ্ভুত জ্যোতিষীর কথা। শহর ভেঙ্গে পড়ে তাকে দেখতে।

মারজাবন বলে, প্রাসাদের ফটকে গিয়েই আমি কিন্তু কেটে পড়বো। তোমাকে আমার সঙ্গে দেখলে সম্রাট ঘায়ুরং অন্যরকম ভাবতে পারেন। আমি প্রাসাদের অন্দরেই থাকবো। লক্ষ্য করবো তোমার কীর্তিকলাপ। কিন্তু সাবধান, যা শিখিয়ে দিয়েছি, সেইভাবে ঠিক ঠিক করে যাবে।

হু হু করে জনস্রোত বাড়তে থাকে। সবাই দেখতে ব্যাকুল জামানকে। নতুন চিড়িয়া ফাঁদে ধরা দিতে এসেছে। প্রধান ফটকের প্রহরী পথ রুখে দাঁড়ায়।

—আপ কৌন হ্যায়? কাকে চান?

জামান বলে, আমি এক বিদেশী জ্যোতিষী। এসেছি রাজকুমারীর ব্যাধি সারাতে। তুমি মহামান্য সম্রাটকে খবর দাও। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

প্রহরীরা অবাক হয়। সব জেনে শুনে এমন সোনার চাঁদ ছেলেটি হাড়ি কাঠে মাথা দিতে চায়! প্রধান প্রহরী এগিয়ে এসে বলে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান মালিক, এখানে একবার যে ঢুকেছে, প্রাণ নিয়ে আর ফিরে যেতে পারেনি।

জামান বিরক্ত হয়। —আমি কারো উপদেশ শুনতে আসিনি। রাজকুমারীর দুরারোগ্য রোগ সারাতে এসেছি। তুমি সম্রাটকে সংবাদ দাও। আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

বাইরে কোলাহল শুনে সম্রাট উজিরকে পাঠালেন। —যাও দেখতো, বাইরে কোনও বিদেশী মুসাফীর এসেছে মনে হচ্ছে, নিয়ে এস তাকে।

দরবারে প্রবেশ করে আভূমি আনত হয়ে সম্রাট ঘায়ুরকে কুর্নিশ জানায় জামান।

কামার অল-জামানের মুখের দিকে তাকিয়েই সম্রাট চোখ বন্ধ করে ফেলেন। একি অপরূপ সুন্দর চেহারা! এমন রূপবান মানুষ তো কোথাও দেখেন নি! কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে যায়।

—শোন বাবা, সম্রাট ঘায়ুর বলেন, চাঁদের মতো তোমার এই রূপ, আর এমন কচি বয়স। পাত্র হিসাবে তুমি আমার পরমাসুন্দরী কন্যা বদরের আদর্শ জুটি হতে পার সন্দেহ নাই। কিন্তু জান তো আমার শর্ত, তাকে যদি সারাতে না পার—আমি তোমাকে কোনও ভাবেই রেহাই দিতে পারবো না। তাই এখনও বলছি, নিজের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে ফিরে যাও। অবশ্য তুমি এসেছ, আমার মেয়ের রোগ সারাতে। তোমাকে নিরস্ত করলে আমার লাভ কি! বরং একটা আশা নিয়ে কিছু সময় কাটাতে পারবো—যদি আমার নয়ন মণিকে তুমি সারিয়ে তুলতে পার। কিন্তু তা যে অসম্ভব। কত দেশের কত ডাকসাইটে ডাক্তার, কবরেজ, হেকিম উনানী এল, তাদের কেউই প্রাণে বেঁচে ফিরে যেতে পারে নি। তা তোমার যদি শখ হয়, চেষ্টা করে দেখতে পার। তবে আমার ঐ এক শর্ত বাবা, না পারলে তোমার মুণ্ডু কেটে ঝুলিয়ে রাখা হবে।

—আমি রাজি আছি মহামান্য সম্রাট। আপনার সব শর্ত জেনেই

আমি এসেছি।

সম্রাট ঘায়ুর প্রধান খোজাকে বললেন, একে অন্দর মহলে নিয়ে যা। রাজকুমারীর ব্যামো সারাতে এসেছে। যা বলবে শুনবি।

জামানকে সঙ্গে নিয়ে খোজা রাজকুমারী বদরের হারেমে যেতে যেতে বলে, তা সাহেবের, জামাই সাজার শখ হয়েছে বুঝি। এমন আহম্মক আর কতজন আছে কে জানে?

—আমি আহাম্মক নই। জেনে শুনে কেউ জান খোয়াতে আসে না—আসা উচিত না। অন্ততঃ আমি আসিনি। তোমাদের রাজকুমারীকে আমি সারিয়ে তুলবোই। আর এ-ও আমার ক্ষমতা আছে তাকে চোখে না দেখেই আমি তার সব রোগ সারিয়ে দেবো। দেখবে?

খোজাটা এবার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। —সে কি? রুগীকে না দেখেই রোগ সারবেন! তা যদি পারেন, আমরা আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো, মালিক। আমাদের সম্রাট আপনাকে মাথায় করে রাখবেন। রাজকুমারী আপনার হবে।

—দেখ পারি কি না, জামান দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলে, আমাকে শুধু একবার রাজকুমারী বদর-এর দরজার সামনে নিয়ে চল। আমি ভিতরে ঢুকবো না। পর্দার এপারে থেকেই তার সব রোগ সারিয়ে দেবো।

জামান আর খোজা রাজকুমারীর দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে, একখানা কুর্শি নিয়ে এস। এখানে আমি বসবো।

সঙ্গে সঙ্গে একখানা আরাম কেদারা এনে দেওয়া হলো। জামান জেব থেকে কাগজ কলম বের করে একখানা চিঠি লিখলো।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো চারতম রজনী:

আবার সে শুরু করে:

চিঠির বয়ান এই রকম:

খালিদানের বাদশাহ শাহরিমানের পুত্র কামার অল-জামান-এর এই পত্র মহামান্য সম্রাট ঘায়ুরের কন্যা রাজকুমারী বদর-এর উদ্দেশ্যে লিখিত হচ্ছে:

তুমি তো জান না প্রিয়া, কী ব্যথা মরমে নিয়া আমি দিন কাটাইতেছি। প্রতিনিয়ত তুষানলে দগ্ধ হইতেছি। তোমার অদর্শন আমাকে উন্মাদ করিয়াছে। আমার কলমে এমন কোন ভাষা নাই যাহা দ্বারা আমার অন্তরের বেদনা প্রকাশ করিতে পারি। সেই আশ্চর্য মিলন রাত্রির পর হইতে তোমার বিরহে আমি কাতর—লোকে বলে আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। কিন্তু কি করিয়া তাহাদের বুঝাই, জীবনে ইহার চাইতে বড় সত্য আর কিছুই নাই। সেই রাত্রে তোমার হাতে আমি একটি হীরার আংটি পরাইয়া দিয়াছিলাম। এবং তুমিও আমার হাতে পরাইয়া দিয়াছিলে এই পান্নার আংটিটি। দেখ, চিনিতে পার কি না। আমার হৃদয় অশান্ত সমুদ্রের

মতো অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। কবে দেখা পাইবো। কবে হইবে আমাদের মধুর মিলন।

ইতি—

কামার অল-জামান

পুনঃ—শহরের প্রবেশদ্বারের পাশে বড় সরাইখানায় আমি উঠিয়াছি।

চিঠিখানা ভাঁজ করে একখানা খামে ভরে তার মধ্যে পান্নার সেই আংটিটা পুরে খোজার হাতে দিয়ে বললো, তোমার রাজকুমারীকে দিয়ে এস।

বাইরে পর্দার এপারে দাঁড়িয়ে জামান শুনতে পেল, খোজাটা বলছে, মালকিন, পর্দার এপারে দাঁড়িয়ে আছেন এক জ্যোতিষী। তিনি বলেছেন, আপনাকে সামনে না দেখেই তিনি আপনার ব্যামো সারিয়ে দিতে পারবেন। এই নিন, উনি আপনাকে খুলে দেখতে বলেছেন।

বদর-এর আর তর সয় না। ক্ষিপ্রহাতে চিঠিখানা খুলে ফেলে। আংটীটা দেখেই সে চমকে ওঠে। এই তো সেই আংটী। —তার ভালোবাসার হাতে সে পরিয়েছিল। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। তবে কি আল্লাহ এতদিনে মুখ তুলে চাইলেন! চিঠিখানা পড়তে থাকে। হঠাৎ সে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে। এবার বুঝি সে সব সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে যাবে। পরদা ঠেলে সে বাইরে আসে। সামনেই দাঁড়িয়েছিল জামান। এক মুহূর্ত অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে—তারপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর বুকে। দুহাতে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। এতকাল কোথায় ছিলে, সোনা। এত কষ্ট কি করে দিতে পারলে।

জামানের চোখ দুটিও জলে ভরে আসে। বদরের মাথায় কপালে হাত বুলাতে থাকে। —আমিও তো সেই একই কথা বলতে পারি সোনা। তুমিই সেই রাতে কোথায় উধাও হয়ে গেলে?

গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে দুজনে দুজনকে চুম্বন করতে থাকে। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। যেন সব বাধাবন্ধনহীন এক জোড়া কপোত-কপোতী।

খোঁজা ছুটে গিয়ে সম্রাটকে খবর দেয়, রাজকুমারী সাফ্ -

সম্রাট ঘায়ুর অজানা আশঙ্কায় সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েন।

—কী, কী হয়েছে? রাজকুমারী সাফ কি রে?

—আজ্ঞে রাজকুমারীর মাথাটা সাফ হয়ে গেছে। আর কোনও অসুখ নাই। সব সেরে গেছে।

ঘায়ুর বিশ্বাস করতে পারে না। —কী সব যা তা বলছিস?

—না—আজ্ঞে, নিজে চোখে দেখে এলাম। রাজকুমারী জ্যোতিষী সাহেবকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছেন।

—বলিস কি রে?

—হ্যাঁ, হুজুর, সত্যি সত্যিই। বিশ্বাস না হয় চলুন, নিজের চোখেই দেখবেন।

সম্রাট আর তিলমাত্র ধৈর্য ধরতে পারেন না। মাথার মুকুট পরতে ভুলে গেলেন। পায়ের জুতা ওখানেই পড়ে রইলো। খালি পায়ে খালি মাথায় ছুটলেন হারেমে। দেখলেন, সত্যিই বদর, আগের মত হাসি খুশি

সুস্থ হয়ে গেছে। মেয়ের কপালে চুম্বন করে বললেন, যাক, এতদিনে আমার দুঃখের দিন শেষ হলো।

কামার অল-জামানকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি অসাধ্য সাধন করেছ বাবা। আমার সব দিয়েও তোমার ঋণ শোধ করতে পারবো না। এখন বল কে তুমি?

জামান বলে, খালিদানের বাদশাহ শাহরিমান আমার বাবা। আমার নাম কামার অল-জামান।

এরপর আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনী শোনালো তাঁকে।

সম্রাট বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে শুনলেন সেই অদ্ভুত কাহিনী। শুধু মুখে বলতে পারলেন, তাজ্জব ব্যাপার! এ কাহিনী সোনার অক্ষরে লিখে রাখা দরকার।

দরবারের সেরা কলমচীকে ডেকে বললেন, শাহজাদার এই কাহিনী যত্ন করে লিখে রেখে দাও। আগামী দিনের মানুষ এ কাহিনী পাঠ করে অনেক শিক্ষা লাভ করতে পারবে।

শহরের প্রধান কাজীকে ডাকা হলো। খাঁটি মুসলমান প্রথায় শাদীনামা তৈরি হয়ে গেল। আনন্দ উৎসব মুখর হয়ে উঠলো, সারা প্রাসাদ, সারা শহর। আলোর মালায় সাজানো হলো প্রাসাদ, ইমারৎ। খানা পিনা, নাচ গান হৈ হল্লায় মাতোয়ারা হয়ে উঠলো সকলে। শহরের এবং দরবারে সম্ভ্রান্ত আমির ওমরাহ সওদাগর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এসে নব দম্পতীর সুখ সুনিবিড় দীর্ঘ দাম্পত্য জীবন কামনা করে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেল।

দীর্ঘকালের প্রতীক্ষার অবসান হলো, আবার ফিরে এল সেই মধুযামিনী। বদর আর কামার অল-জামান সুখের সায়রে গা ভাসিয়ে দিল। এতদিন পরে তারা প্রাণ ভরে হাসলো, গাইলো, খানা পিনা করলো, আর গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমালো।

ভোরের দিকে জামান স্বপ্ন দেখলো, তার বাবা সুলতান শাহরিমান সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। কেঁদে কেঁদে তার দুচোখ অন্ধ হয়ে গেছে। বলছেন, জামান, বেটা, তোমার শোকে আমি আজ মৃত্যু পথ যাত্রী। একটি বার এস বাবা, যাবার আগে একবার প্রাণ ভরে দেখে যাই। তুমি ছাড়া জীবন আমার মরুভূমি হয়ে গেছে। কি হবে আমার এই অতুল ঐশ্বর্য, এই বিশাল সলতানিয়ৎ দিয়ে? একটি বার এস বাবা।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাবার বিষাদ বিষণ্ণ করুণ মুখখানাই বারবার চোখের সামনে ভাসতে থাকলো। এক অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে ওঠে জামান। তার আর্তনাদে বদর জেগে ওঠে।

—কী হলো, সোনা? শরীর খারাপ করছে? মাথা ধরেছে? টিপে দেবো। ভিনিগার লাগিয়ে বেধে দেবো? এক্ষুণি কমে যাবে।

জামান ককিয়ে ওঠে, না।

—তবে? তবে কি তোমার পেটে দরদ হচ্ছে? মৌরির তেল মালিশ করে দেবো পেটে?

জামান ছটফট করে ওঠে, না না ওসব কিছু না।

—তবে কি তোমার বদহজম হয়েছে। একটু জোয়ানের আরক

খাবে? কিংবা এক গেলাস গোলাপ জলের শরবৎ?

জামান বলে, না, সোনা সে জন্যেও না।

এই সময় রাত্রি শেষ হতে চলেছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো ছয়তম রজনীতে আবার সে গল্প শুরু করে:

কামার অল-জামান বলে, কালই আমরা দেশে রওনা হয়ে যাবো। খুব একটা খারাপ স্বপ্ন দেখলাম। বাবা শোকে তাপে একেবারে শুকিয়ে গেছেন। আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে বললেন, জামান, একটিবার আমার কাছে এস। তোমাকে না দেখে আমি মরতেও পারছিনা। তার চোখে দেখলাম জল। আমি আর কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না, সোনা। কালই আমাদের রওনা হতে হবে। তোমার কি মত?

—আমার আবার কি মত? তোমার মতই আমার মত। তোমার পথই আমার পথ। তুমি যা বলবে তাই হবে। চল, দেশেই যাই। তোমাকে না দেখে বাবার অবস্থা যে কি—তা তো আমিও বুঝতে পারছি। কাল সকালে আমি বাবাকে বলবো, তিনি সানন্দে সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

খুব ভোরে বদর প্রধান খোজাকে পাঠালো সম্রাটের কাছে। ঘায়ুর তাকে দেখেই শঙ্কিত হলেন, আবার এই সক্কাল বেলায় কী দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে এলি বাঁদর।

—আজ্ঞে রাজকুমারী আপনার সঙ্গে দুটো কথা কইতে চান। খুব দরকারী।

—দাঁড়া, আমি আমার মুকুট আর জুতো পরে নিই।

বদরের হারেমে এসে ঘায়ুর বললেন, কাল রাতে কি এক গাদা লঙ্কার ঝাল খেয়েছিলি, মা? এই সাত সকালে তোমাদের ঘুম ভাঙ্গলো কি করে? কী ব্যাপার? কেন ডেকেছ?

—না বাবা, ওসব কিছু না, বদর বলে, আজ আমরা দেশে রওনা হয়ে যাবো। তাই তোমার অনুমতি চাই।

—এ তো বড় সুখের কথা, মা। স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর ঘরে যাবে, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে? তবে একটা কথা মা, তুমিও তো আমার একমাত্র সন্তান, জীবনে কোনও একটা দিন চোখের আড়াল করিনি। আমার কষ্টটাও নিশ্চয়ই বুঝবে। তাই বলছি, একটা বছর পরে একবার আমার কাছে ফিরে এস।

বদর বাবার হাতে চুমু খেয়ে বলে, এ তুমি কি বলছো, বাবা, তোমাকে না দেখে কি আমিই থাকতে পারবে? যত তাড়াতাড়ি হয় আমি তোমাকে দেখতে আসবো।

সকাল থেকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। রাজকুমারী বদর যাবে শ্বশুরবাড়ি। গাধা খচ্চর উটের পিঠে বোঝাই হতে থাকলো সাজ-সামগ্রী। সম্রাট ঘায়ুর নানা মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য উপহার উপঢৌকনে ভরে দিলেন। সেই সঙ্গে দিলেন অমূল্য ধন-দৌলত হীরা-জহরৎ। জিনিস পত্র বাঁধা ছাঁদা করতেই দুপুর গড়িয়ে গেল। সম্রাট সাশ্রুনয়নে বিদায় দিলেন কন্যা

জামাতাকে। কামার অল-জামান আর বদর-এর চোখ ফেটেও জল গড়িয়ে পড়লো।

কিন্তু শহর ছাড়িয়ে প্রান্তরের পথে যেতে না যেতেই চোখের জল শুকিয়ে গেল। আনন্দে উদ্দাম হয় উঠলো দুজনে। তারপর চলা আর চলা।

এই ভাবে তিরিশটা দিন পথ চলার পর একটা ঘন সবুজ শস্যক্ষেত্রের পাশে এসে ওরা আস্তানা গাড়লো। এইখানে কয়েকটা দিন বিশ্রাম করবে তারা। কাছেই নদী আছে, সুতরাং জলের কষ্ট হবে না। খুঁজে পেতে খেজুর গাছের ছায়ায় তাঁবু গাড়া হলো। বদরের শরীরে এত ধকল সইবে কি করে। ফুলের ঘায়ে যে মেয়ে মূর্চ্ছা যায়, সে কি না একটানা এতটা পথ উটের পিঠে এসেছে। যদিও হাওদায় মখমলের গদী ছিল। তবুও উটের দুলকী চালের দুলনীতে সারা শরীর ব্যাথায় টন টন করছে। সামান্য একটু কিছু মুখে দিয়ে তাঁবুর ভিতরে সে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো। শোয়ার প্রায় সঙ্গেই সঙ্গেই ঘুমে গলে গেল বদর। কামার অল-জামান সঙ্গের অনুচর-দের বললো, তোমাদের তাঁবুগুলো একটু দূরে খাটাও। রাজকুমারী বড় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছেন। তোমাদের হট্টগোলে তার নিদ্রার ব্যাঘ্যাত ঘটতে পারে।

তাঁবুর ভিতরে ঢুকে জামান দেখে, একটা কাঁচুলী আর পাতলা ফিনফিনে একটা মসুল-এর তৈরি রেশমী-সেমিজ পরে বদর ঘুমে অচেতন। মাঝে মাঝে একটা হালকা হাওয়া এসে সেমিজটা ওপরের দিকে উড়িয়ে দিয়ে পালাচ্ছে। জামানের চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। একটি মাসের অতৃপ্ত কামনা দেহ কুরে কুরে খেতে থাকে। পাশে বসে বদরের সারা দেহে হাত বুলাতে থাকে জামান। দেহমন উত্তপ্ত হতে থাকে। হঠাৎ কোমরে শক্ত মতো কি একটা হাতে ঠেকে। একটা অচেনা পাথর। নিশ্চয়ই মহা মূল্যবান। তা না হলে বদর কেন শরীরে ধারণ করবে। হয়তো এর কোনও দৈব ক্ষমতা আছে। তার পাতানো ভাই মারজাবন দিয়ে থাকবে হয়তো বা। হয়তো এর গুণে অনেক বিপদ আপদ কেটে যায়—

আলগোছে পাথরটাকে খুলে নিয়ে তাবুর বাইরে চলে এল জামান। পরীক্ষা করে দেখবে, চিনতে পারে কি না। পাথরটার চারটে মুখ। কি সব আঁকিবুকি কাটা আছে চারপাশে। কিছুই বোধগম্য হয় না। তবে দেখে বোঝা যায়, পাথরটা কোনও মন্ত্রপূত।

পাথরটা হতে নিয়ে একমনে নিরীক্ষণ করছিল সে। এমন সময় একটা পাখী শোঁ করে নেমে এসে, ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে নিমেষে উধাও হয়ে গেল।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয় আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো সাততম রজনীতে আবার শুরু করে :

পাখীটা উড়তে উড়তে গিয়ে বসে অনেক দূরের এক বিশাল ঝাঁকড়া গাছের ডালে। দূরে হলেও জামান দেখতে পায়, শয়তান পাখীটা তারই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘাড় দোলাচ্ছে।

কিছুক্ষণের জন্য সে হতভম্ব হয়ে পড়ে। এমন যে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তার মাথাতেই আসেনি। কিন্তু এখন উপায় কি হবে। রাজকুমারী জেগে যখন দেখবে তার পাথরটা নাই তখন সে তাকে কি বলে সান্ত্বনা দেবে। পাথরটা নিশ্চয়ই তার প্রাণাধিক প্রিয়।

একটা পাথরের ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে যায় গাছটার দিকে। প্রচন্ড শক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারে। কিন্তু তার আগেই পাখিটা উড়ে পালায়। পালিয়ে কিন্তু বেশি দূরে যায় না। আর একটু দূরের একটা গাছের ডালে গিয়ে বসে। আর একটা ঢিল নিয়ে জামান ওকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে। কিন্তু পাখীটা মহা ধড়িবাজ। ঢিল মারার মুহূর্তেই সে শোঁ করে উড়ে যায়। গিয়ে বসে আর একটা গাছের ডালে। জামানের মাথায় খুন চেপে যায়। যে ভাবেই হোক, পাখীটাকে মেরে ফিরে পেতেই হবে পাথরটা। পাখীটাও বড় সেয়ানা। বারবারই এমন একটা দূরত্ব রেখে কোনও একটা গাছের ডালে বসছে, যেখান থেকে পাথরটা স্পষ্ট দেখা যায়—এবং জামানের মনে আশা জাগে, হয়তো সে এবার তাকে ধরাশায়ী করতে পারবে। কিন্তু না, তাড়া করতে করতে অনেক বাগ বাগিচা পার হয়ে যায়। মারতে আর পারে না কিছুতেই।

গাছ পালা ছাড়িয়ে পাখীটা গিয়ে বসে কাছেরই একটা পাহাড়ের চূড়ায়। জামান মরিয়া হয়ে উঠেছে। কোনও দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই। পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে যায়। পাথর ছুড়ে মারে পাখিটাকে। পাখীটাও টুক করে উড়ে গিয়ে বসে আর একটা চূড়ায়। এই ভাবে পাহাড়ের কন্দরে উপত্যকায় পাখীটার পিছনে পিছুনে ছুটে হয়রান হয়ে পড়ে।

কয়েক ঘন্টা কেটে গেল। সূর্য গেল পাটে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এল। ঘেমে নেয়ে একশা হয়ে গেছে সে। এখন কি করে বদরের সামনে দাঁড়াবে। কী জবাবদিহি সে করবে? হয়তো এমনও হতে পারে, তার এই অমূল্য রত্নটার শোকে সে অসুস্থও হয়ে পড়তে পারে।

ক্রমশঃ অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে থাকে। কামার অল-জামান ভাবে, এই অবস্থায় এই দুর্গম গিরি পর্বত অতিক্রম করে তাঁবুতে ফেরা সঙ্গত হবে না। অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনাই বেশি। তা ছাড়া হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের ভয়ও তাকে শঙ্কিত করে তোলে।

সামনের একটা গাছের ডালে বসে পাখিটা পাখা ঝাপটায়। সেই অন্ধকারেও জামান দেখতে পায় পাখীর ঠোঁটে পাথরটা ধক ধক করে জ্বলছে। দারুণ আক্রোশে ফেটে পড়ে সে। পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারে। পাখীটা বিশ্রী বিদঘুটে একটা আওয়াজ তুলে উড়ে গিয়ে আর একটা গাছের ডালে বসে। জামান তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গম গিরি পথ ভেঙ্গে পাখীটাকে তাড়া করতে থাকে। কিন্তু বৃথাই সে চেষ্টা। এক সময় ক্লান্ত অবসন্ন দেহটাকে আর টানতে পারে না। একটা পাথরের টিলার উপর বসে পড়ে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে দেখে সেই টিলাটার উপরই শুয়ে তার অঘোর ঘুমে রাত কেটে গেছে। পাখীটার ডানা ঝপটানিতে আবার সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মরিয়া হয়ে জামান ওর পিছু পিছু ধাওয়া করে। পাথর

ছুড়ে ছুড়ে মারতে থাকে কিন্তু পাখীটা তার নাগালের বাইরে অথচ আশে-পাশেই এগাছ ওগাছ লাফিয়ে লাফিয়ে উড়ে বসে।

জামানের তখন রোখ চেপে বসেছে। যে ভাবেই হোক পাখীটাকে ঘায়েল করে পাথরটা পেতেই হবে। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। পাখীটা একটু একটু করে উড়তে উড়তে আরও অনেকটা পথ তাকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে যায়।

সারাটা দিন পাখীটার পিছনে ধাওয়া করতে করতে আবার সন্ধ্যা নেমে আসতে থাকে। জামান ক্লান্ত দেহে বসে পড়ে। দুটো দিন দানা পানি পেটে পড়েনি। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে। এবার সে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে থাকে, কোথাও খাবার কিছু সংগ্রহ করা যায় কিনা। একটু এগোতেই কয়েকটা আপেল আর চেরী গাছ দেখতে পেল। সামনে একটা ঝরনা। গোটাকয়েক আপেল আর চেরী ফল পেড়ে গোগ্রাসে খেল। তারপর আঁজলা করে ঝরনার জল খেয়ে পাশেই একটা জায়গায় শুয়ে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

দুটো দিন দুটো রাত পার হয়ে গেছে। তিন দিনের দিন সকাল বেলায় চোখ খুলেই আবার সেই দৃশ্য। সামনের একটা চেরী গাছের ডালে পাখীটা বসে ডানা ঝাপটাচ্ছে। আবার শুরু হলো পাখী সংহারের প্রচেষ্টা। সে দিনও জামান-এর সব চেষ্টা বিফল হলো। কোনও ক্রমেই সে তাকে কব্জা করতে পারে না। অথচ তারই নাকের ডগা দিয়ে শোঁ করে উড়ে গিয়ে অন্য এক গাছের ডালে অথবা গিরিচূড়ায় বসে। জামানও নাছোড়বন্দা—পাখীটাকে তাক করে করে অজস্র অগুন্তি ঢিল ছুড়তে থাকে। কিন্তু পাখীটা এমনই ওস্তাদ তার সব নিশানাকেই অবলীলাক্রমে পাশকাটিয়ে দিতে পারে।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল হতে থাকে। গিরি পর্বত মালা পেরিয়ে এবার সে সমতল ভূমিতে এসে পড়ে। চাষীরা যব ভুট্টার ক্ষেতে কাজ করে চলেছে। পাখীটা উড়তে গিয়ে বসে কোনও খেজুর গাছের মাথায়। জামান মাটির ঢিল তুলে তাক করে মারে। কিন্তু তার আগেই সে অন্য একটা গাছে গিয়ে বসে। জামান দৌড়ে যায়। কিন্তু পাখীটা টুক করে উড়ে গিয়ে আরও একটু দূরে আর একটা গাছের ডালে বসে।

জামানের মাথায় তখন খুন চেপে গেছে। ঐটুকু পাখীর এই রকম বেয়াদপি সুলতান শাহরিমানের পুত্র হয়ে কিছুতেই সে বরদাস্ত করতে পারে না। মনে হয়, একবার যদি তাকে হাতের মুঠোয় পায়, তাহলে ওর এই ফাজিল চালাকী হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেবে। কিন্তু হাতের মুঠোয় সে আর এল না। বরং শাহজাদা জামানকে নাকে দড়ি দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে এসে ফেলল, এক সমুদ্রের ধারে। একটা আখরোটের গাছের ডালে বসে অদ্ভুত উল্লাসের আওয়াজ করতে লাগলো সে। জামানের সারা শরীর খর রৌদ্রতাপে ঝলসে গেছে। দরদর করে ঘাম ঝরছে। দৌড়াতে দৌড়াতে হাঁফ ধরে গেছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। চোখে সর্ষে ফুল দেখছে। তবু ক্ষোভ আক্রোশে জ্বলতেই থাকে। প্রায় অবসন্ন দেহে একটা মাটির ডেলা তুলে নিয়ে প্রাণপণে ছুঁড়ে মারে। পাখীটা ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে

আকাশে ওড়ে। জামানের মাথার ওপরে চক্রাকারে কয়েকটা পাক দেয়। জামান আর একটা ঢিল হাতে তুলে নেয়। কিন্তু ততক্ষণে পাখীটা অদৃশ্য হয়ে যায়।

জামানের সব আশা ভরসার ইতি হয়ে গেল। এবার সে মাটির ওপরে থপ করে বসে পড়ে। চোখ ফেটে জল আসে। এত প্রচেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে গেল। এখন সে কি করবে? কিছুই ভাবতে পারে না।

অবসাদে দেহ এলিয়ে পড়ে জামানের। সেখানেই ঘাসের উপর গা ঢেলে দিয়ে শুয়ে পড়ে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে।

ঘণ্টা দুই পরে ঘুম থেকে জেগে উঠে জামান ভাবতে থাকে এখন সে কোথায় যাবে। অচেনা অজানা বিদেশ বিভুঁই। পথ ঘাট কিছুই জানা নাই। একজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে সামনে এগোলেই কিছুদূরে একটা শহর। জামান সেই দিকে চলতে থাকে। মনে মনে ভাবে, তাঁবু থেকে কত দূর সে চলে এসেছে কে জানে। না জানি তার অদর্শনে বদর-এর কি দশা হয়েছে এ কদিনে।

শহরের প্রবেশ দ্বারে এসে হাজির হয় জামান। সড়ক ধরে সোজা ঢুকে পড়ে শহরের অভ্যন্তরে। কেউই তাকে বাধা দেয় না। কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে না। চারদিকের ঘরবাড়ি দেখে মনে হয়, শহরটা মুসলমান জনবসতি বহুল। আরও খানিকটা এগোতে একটা বিরাট বাগিচার ফটকের সামনে এসে হাজির হয়। বাগানের মালী সাচ্চা মুসলমান। জামানকে সালাম আলেকুম বলে স্বাগত জানায়। জামানও যথারীতি আলেকুম সালাম জানায়। জামান জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা জনাব, আমি যখন পথ ধরে আসছিলাম, রাস্তায় যাদের দেখলাম, কেউই আমার সঙ্গে কোনও কথাবার্তা বললো না কেন? সবারই চোখে মুখে, লক্ষ্য করলাম অদ্ভুত এক ঠাণ্ডা কৌতূহল। কী ব্যাপার?

বৃদ্ধ মালী জবাব দেয়, খোদা মেহেরবান, তাই আপনি রেহাই পেয়ে গেছেন, সাহেব। যাদের দেখলেন, ওরা সবাই শত্রু পক্ষের লোক। কিছুদিন হলো শহরটা আক্রমণ করে অধিকার করে নিয়েছে ওরা। ও-ই শয়তান কাফেরগুলো দরিয়ার ওপার থেকে এসে আচমকা আক্রমণ করে এখানকার শান্ত নিরীহ মুসলমানদের খুন জখম করে শহরটা তছনছ করে ফেলেছে। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। শয়তান তাদের একমাত্র উপাস্য। তারা অসভ্য অশিক্ষিত জংলী ভূত। ওদের প্রিয়খাদ্য পূতিগন্ধময় পচা মাংস আর চর্বি। ওরা কখনও গোসল করে না বা রুজু করে না। শুনেছি, জন্মের সময় বাচ্চার মাথায় এক কলসী জল দেয় তারা। ব্যস্, সারা জিন্দগীভর আর তারা পানি স্পর্শ করে না। তাই এ শহরে ঢুকেই প্রথমে তারা সব হামাম, পানির ফোয়ারা, ঝরনাগুলো ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আপনি হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন, মালিক, রাস্তার ধারে দোকানপাটে পসরা সাজিয়ে বসে যারা সবাই মেয়ে মানুষ। ওরা সবাই বেবুস্যা। দোকানে ঢুকলে আপনাকে গেলাসে ঢেলে দেবে হাল্কা হলদে রঙের এক ধরনের চিরতা ভিজানো পানি। দেখবেন, ফেনায় ভরে গেছে গেলাসের মাথা। ওরা পানির বদলে ওই জিনিসই খায়। ওকে ওরা বলে 'পিনেকা পানি'।

আমার মনে কি হয় জানেন সাহেব, ও জিনিসটা, গরুছাগলের মত ছাড়া আর কিছু না। কিংবা তার চাইতেও খারাপ কিছু হতে পারে। ওদের মেয়েরা গোসল করে না বটে কিন্তু এক ধরনের লেবুর রস দিয়ে হাত মুখ সাফা রাখে। ফালা ফালা করে লেবু কেটে তার টুকরোগুলো ঘাড়ে মুখে গলায় ঘসে ফসে সব ময়লা সাফ করে। ডিমের খোলা গুঁড়িয়ে ময়দার মতো করে মুখে মাখে ওরা। ওরা একেবারে বেআব্রু। বোরখা পরে না। এ শহরে আমিই বোধহয় একমাত্র জীবিত মুসলমান। ওরা আমাকে মারেনি।

এই সব ভয়ঙ্কর তাজ্জব কথাবার্তা শুনতে শুনতে জামানের মাথা ঘুরতে থাকে। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। নিজেকে আর সে ধরে রাখতে পারে না। কোনও রকমে ঘাসের উপর বসে পড়তে পারে।

মালী বুঝতে পারে, ছেলেটি অনাহারে অনিদ্রায় কাহিল হয়ে পড়েছে। জামানকে সঙ্গে করে সে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। ছোট্ট সুন্দর বাড়িখানা বাগানেরই লাগোয়া। কিছু খানা, খানিকটা শরবৎ তাকে খেতে দেয়। ক্ষুধার্ত জামান তৃপ্তি করে খায়। বৃদ্ধ মালি প্রশ্ন করে, কে বাবা, আপনি? কেন এসেছেন এই সর্বনাশা দেশে?

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দু'শো আটতম রজনীতে আবার সে শুরু করে:

বৃদ্ধ মালীর সহায়তায় জামান-এর মন ভরে যায়। এমন অচেনা অজানা দেশে এসে এমন একটি দরদী মানুষের সন্ধান পাওয়া ভাগ্যের কথা। জামান তার দুঃখের কাহিনী খুলে বললো তাকে। বলতে বলতে চোখের জলে বুক ভেসে যায়। বৃদ্ধ বুঝতে পারে জামানের মর্মবেদনা। নানা ভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে সে।

—কী করবেন বাবা, সবই খোদাতালার ইচ্ছা। তিনি যা করান তাই আমরা করি, তিনি যা বলান তাই আমরা বলি। ও নিয়ে দুঃখ করে লাভ নাই। নিয়তির লেখা খণ্ডাতে পারে না কেউ। প্রাণ ভরে শুধু তাঁকে ডাকুন, তিনিই সব সমস্যার সুরাহা করে দেবেন। তবে আমার কি মনে হয় বাবা, জানেন? রাজকুমারী এখন আর ওখানে নাই। একদিন দেখার পরই তারা খালিদানে রওনা হয়ে গেছে। ভেবেছে, আপনার সন্ধান করতে হলে, সুলতান শাহরিমানকে খবর দেওয়া দরকার। তাহলে তিনি চারদিকে লোক-লস্কর পাঠিয়ে তল্লাস করতে পারবেন। আমার এই ছোট্ট গরীবখানায় আপনি কয়েকটা দিন বিশ্রাম করুন। তারপর আমি আপনার দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দেবো। এখানকার বন্দরে মাঝে মাঝে খালিদানের সওদাগরি জাহাজ এসে ভেড়ে। কাজকাম শেষ করে আবার তারা ফিরে যায়। ওই রকম যে কোনও একটা জাহাজে চেপে দিব্যি আপনি দেশে চলে যেতে পারবেন। আমি রোজই একবার বন্দরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসবো। খালিদানের জাহাজ এলেই আপনি চলে যাবেন। কিন্তু মুসকিল হচ্ছে, কখনও বা দেখা যায় হামেশাই জাহাজ আসছে যাচ্ছে। আবার কখনও বা বছর ঘুরে যায় তবুও একখানার পাত্তা মেলে না।

বৃদ্ধ মালী তার কথা রাখে। প্রতিদিন সে বন্দরে খোঁজখবর নিতে যায়। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে যেতে থাকে, জামান জামাই-আদরে তার বাড়িতে দিন কাটাতে থাকে।

আসুন এবার আমরা রাজকুমারী বদর-এর দিকে চোখ ফেরাই।

তাঁবুর ভিতরে বদরের ঘুম ভেঙ্গে যায়। এদিক ওদিক তাকিয়ে কামার অল-জামানকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু এদিক ওদিক কোথাও না দেখতে পেয়ে উঠে বসে। হঠাৎ সে বুঝতে পারে তার কোমরের পাথরটা নাই। বদর ভাবে হয়তো তার স্বামী দেখার জন্যে খুলে নিয়ে গেছে। এখুনি এসে পড়বে।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেও যখন সে ফিরে আসে না বদর চিন্তিত হয়ে ওঠে। উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। আরও অনেক সময় কেটে যায়, কিন্তু জামান ফিরে আসে না। ক্রমে সন্ধ্যা নেমে আসে, অজানা শঙ্কায় বদর-এর বুক কেঁপে ওঠে। ঐ মন্ত্রপূত পাথরটার উপরেই তার রাগ হতে থাকে। রাগ হয় তার পাতানো ভাই মারজাবনের ওপর। কেন সে ঐ হতচ্ছাড়া পাথরটা তাকে পরতে দিয়েছিল? হয়তো ওটা হাতে ধরাতেই জামানের কোনও বিপদ আপদ ঘটেছে।

সারাটা রাত বিনিদ্র ভাবে কাটে। তারপর দিনও সে দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে কাটায়। কিন্তু জামান ফিরে আসে না। ভয়ে কাউকে কিছু বলতে সাহস করে না। সঙ্গের চাকর নফররা যদি শোনে, শাহজাদা নাই তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তবে তাদের মনে বদ মতলব মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। এই চরম সংকটের সময়ে নিজেকে খুব শক্ত সহজ করে রাখার চেষ্টা করে, বদর তার বাঁদীকে বলে, খুব হুঁসিয়ার, শাহজাদা তাঁবুতে নাই, একথা যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ টের না পায়।

আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে সে তার আশু কর্তব্য ঠিক করে ফেলে। নিজের সাজপোশাক ছেড়ে ফেলে বদর পরে নেয় জামানের সাজ-পোশাক। মাথায় পরে একটা বাহারী রেশমী টুপী। কোমরে বেঁধে নেয় একখানা ইয়াবড় তলোয়ার। আর বাঁদীটাকে পরিয়ে দেয় তার নিজের পোশাক। এমনভাবে সাজিয়ে তোলে, দেখলে কে বলবে সেই বদর নয়।

দুজনে তাঁবু ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। আগে আগে বদর আর পিছন পিছন বাঁদী। সকলে দেখলে, শাহজাদা জামান তার বেগম বদরকে নিয়ে বেরিয়েছেন। আভূমি আনত হয়ে সকলে কুর্নিশ জানিয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে। বদর বলে, এবার আমরা রওনা হবো, আজই, এখুনি। সবাই তৈরি হয়ে নাও।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বাঁধাছাঁদা শেষ করে আবার, তারা যাত্রা শুরু করে। সমুদ্রতীরে এসে একখানা বড়সড় জাহাজ ভাড়া করা হলো। সাগর পাড়ি দিয়ে যেতে হবে এবার।

একটানা প্রায় দশ দিন চলার পর এবনি দ্বীপের বন্দরে এসে জাহাজ নোঙর করা হলো। শহরের প্রধান প্রবেশ দ্বারের মুখে তাঁবু গাড়ার হুকুম দিলো বদর। সেখানকার লোকের কাছ থেকে জেনে নিল, সেই দ্বীপটার নাম —এবনি দ্বীপ।

—এখানকার অধিপতির কি নাম ?

লোকটি জানালো, আমাদের সম্রাট আরমানুস। তার একটিমাত্র পরমাসুন্দরী কন্যা—তাঁর নাম হায়াৎ-অল-নাফুস।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামায়।

পরদিন দুশো নয়তম রজনীঃ

গল্প শুরু হয়ঃ

বদর সেখানকার সম্রাটের কাছে একখানা চিঠি পাঠায়। নিজেকে পরিচয় দেয়—সে খালিদানের সুলতান শাহরিমানের পুত্র কামার অল-জামান।

সম্রাট আরমানুসের সঙ্গে সুলতান শাহরিমানের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। তাঁর পুত্র এসেছে তাঁর রাজধানীতে, সুতরাং যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে তাকে আদর অভ্যর্থনা করে রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হলো। শহরের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলেন সম্রাট। জামানের সম্মানে বিরাট এক ভোজসভার আয়োজন করা হলো। সারা শহর সুন্দর করে সাজানো হলো। তিন দিন ধরে নানা মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে তাকে বিস্তর আদর অভ্যর্থনা জানানো হলো।

চতুর্থ দিন সকালে উঠে বদর একাই হামামে চলে গেল। সঙ্গে কোনও গোছল করাবার লোক নিল না। নিজেকে ভাল করে ঘসেমেজে নতুন সাজপোশাক পরে তৈরি হয়ে নিয়ে সম্রাট আরমানুসের পাশে এসে বসলে। সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, এখন তোমার কি অভিপ্রায়, বল। এখান থেকে কোথায় যাবে ?

বদর বলে, তেমন কোনও হিসেব করে বেরুই নি। দেখি, যে দিকে যেতে ইচ্ছে হয়, যাবো।

সম্রাট আরমানুস বুলেন, তোমার বাবার সঙ্গে আমার বহুকালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। তোমার কথাও তার মুখে অনেক শুনেছি। রূপে গুণে তুমি সেরা, শুনেছিলাম। এখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করে মুগ্ধ হয়েছি, বাবা। আমার ইচ্ছা, আমার একমাত্র কন্যা হায়াৎ-অল-নাফুসকে তুমি শাদী কর। তার মতো সুলক্ষণা সুন্দরী মেয়ে বড় একটা হয় না। আমি বাবা, মেয়ের গুণের কথা বড়াই করে বলতে নাই, কিন্তু সত্যিই বলছি বাবা, তার মতো গুণবতী কন্যা—সে একমাত্র তোমারই যোগ্য। নানা দেশের নানা শাহজাদা রাজকুমাররা তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল। কিন্তু কাউকেই আমার মনে ধরেনি। তোমাকে দেখার পর, তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার পর আমি মনে মনে ভেবেছি, তোমার জন্যেই সে বুঝি জন্মেছে। এই সবে সে পনেরোয় পা দিয়েছে। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আর ভোগবিলাস ভালো লাগে না, তুমি যদি রাজি হও বাবা, তবে তোমার হাতে মেয়েটাকে তুলে দিয়ে তোমাকে আমার সিংহাসনে বসিয়ে আমি বাণপ্রস্থ নিতে চাই।

রাজকুমারী বদর সম্রাটের কথায় বিচলিত বোধ করে। অনেকক্ষণ মুখে কোনও কথা সরে না। হাত পা হীম হয়ে আসতে থাকে। বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব করতে থাকে। তখনকার সেই শীত শীত হিমেল হাওয়ার

দিনেও সে ঘেমে নেয়ে ওঠে। হাড়ে কাঁপুনি ধরে। মনে মনে ভাবে, এখন যদি তাকে বলি, আমি রাজকুমারী বদরকে শাদী করেছি, আমার পক্ষে তাঁর এ প্রস্তাব আর গ্রহণ করা সম্ভব না, তখন তিনি নিশ্চয়ই বলবেন, মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে নির্দেশ আছে—একজন পুরুষ এক সঙ্গে চারটি বিবি রাখতে পারে। বদর যদি তার প্রথমা হয়, হায়াৎ না হয় হবে দ্বিতীয়া বেগম। তাতে কি অসুবিধা? আর যদি আসল কথা তাকে খুলে বলা যায়, আমি ছদ্মবেশী কামার অল-জামান। আসলে আমিই রাজকুমারী বদর। তখন এই বৃদ্ধ বয়সেও সম্রাটের কামনা বাসনা চেগে উঠবে। তিনি বলবেন, তাহলে আর তোমাকে ছাড়ছি না, সুন্দরী। তুমি হবে আমার পিয়ারের বেগম। আমি হবো তব মালঞ্চের মালাকর। কামের ব্যাপারে বুড়োদের ঘাড়ে ভীমরতি চেপে বসে। আর আমি যদি কামার অল-জামানের ছদ্মবেশেই তার কন্যার পাণিগ্রহণে অক্ষমতা জানিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করে চলে যাই তবে, এই মুহূর্তেই যত সব স্নেহ ভালোবাসা পলকে প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়বে। হয়তো বা এমনও হতে পারে, তাঁর রাজধানী ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করবেন। সুতরাং নান্য পন্থা, এই অবস্থায় তার প্রস্তাবে আপাতত রাজি হওয়া ছাড়া উপায় নাই। এরপর নিয়তি আমাকে নিয়ে যে-খেলা খেলবে তাই খেলতে হবে। কে বলতে পারে কার ভাগ্যে কি লেখা আছে। সেই বিধি লিপি কেউ কি খণ্ডাতে পারে! সুতরাং ও নিয়ে আর দুর্ভাবনা করে কোনও লাভ নাই। যা হবার তাই ঘটবে। এতে মানুষের কোনও হাত নেই।

বদর মাথা তুলে সম্রাট আরমানুসের দিকে তাকালো। মুখে সলজ্জ স্নিগ্ধ হাসির আভাষ। সম্রাট বুঝলেন, শাহজাদা স্বভাবসুলভ ভব্যতায় এই কথার সোজাসুজি জবাব দিতে কুণ্ঠা বোধ করছে। বিনয় বিনম্র কণ্ঠে সে বলতে পারে, এ সব ব্যাপারে আমার আর নিজের কি মতামত থাকতে পারে। তাছাড়া, আপনি আমার বাবার পরম বন্ধু। আপনার ইচ্ছা আমার পিতার আদেশতুল্য। আমি তা অপূর্ণ রাখতে পারি না।

বদরের কথায় আনন্দে নেচে ওঠেন আরমানুষ, এই তো সুলতান শাহরিমানের পুত্রের মতো কথা। তাঁর শিক্ষাদীক্ষার কায়দাই আলাদা। তোমাকে যেভাবে তিনি গড়ে তুলেছেন তার নজির মেলা ভার। আজকাল-কার দিনে তোমার মতো আচার ব্যবহার আদব কায়দা আমি খুব কম ছেলের মধ্যেই দেখছি, বাবা।

সম্রাট আর ধৈর্য ধরতে পারেন না। তৎক্ষণাৎ দরবার-এ সভা ডাকা হলো। শহরের গণ্যমান্যরা এসে জড়ো হলো। মন্ত্রী, পারিষদ এবং সেনাপতিদের সামনে তিনি ঘোষণা করলেন, খালিদানের বাদশাহ শাহরিমানের একমাত্র পুত্র কামার অল-জামানের সঙ্গে আমার একমাত্র কন্যা হায়াৎ অল নাফুসের বিবাহ আজ সন্ধ্যায় সম্পন্ন হবে। এই দরবারের উপস্থিত থেকে পাত্রপাত্রীর শুভকামনা করতে আহ্বান জানাচ্ছি।

দরবারকক্ষ করতালি-মুখরিত হয়ে উঠলো, সম্রাট আরমানুষের দ্বিতীয় ঘোষণা: আমি বৃদ্ধ হয়েছি, এখন অবসর গ্রহণ করে ঈশ্বরের উপাসনা করে দিন কাটাতে চাই। তাই মনস্থ করেছি, এখন থেকে এই

সিংহাসনের অধিকারী হবে আমার জামাতা কামার অল-জামান। আপনারা আমার প্রতি এতকাল যে আনুগত্য দেখিয়েছেন, আমি আশা করবো, আমাদের এই নতুন সম্রাট-এর প্রতি সেরূপ আনুগত্য এবং মর্যাদা প্রদর্শন করবেন।

এবার ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হলো দরবার মহল। সবারই চোখে বিস্ময়—মুহূর্তে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলো অভ্যাগতরা। করতালী ধ্বনীতে ফেটে পড়লো দরবার কক্ষ। জনে জনে এসে শাহজাদাকে আতর গোলাপ জল আর ফুল মালা দিয়ে বরণ করতে লাগলো।

রাজধানীতে সেদিন সে কি সমারোহ! খানা পিনা, নাচ গান হৈ হল্লায় সবাই মত্তোয়ারা হয়ে উঠলো। ধনী দরিদ্র সবার কাছেই সেদিন রাজপ্রাসাদের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। যে যা পারলো—খেলো। পোশাক আসাক দুহাতে বিতরণ করা হতে লাগলো। পাত্রী পাত্রীর রূপে সবাই মুগ্ধ। দুহাত তুলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকে সকলে—তারা যেন সুখে থাকে, শতায়ু হয়। শহরের সেরা কাজীকে ডেকে শাদীনামা লেখানো হলো। সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় যথারীতি আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুজনের শাদী হয়ে গেল। কামার অল-জামানের ছদ্মবেশে বদর হলো হায়াৎ অল নাফুসের নকল স্বামী।

বিবাহ পর্বের শেষে বৃদ্ধা মহারানী উলু-উলু-উলু ধ্বনি করতে করতে নিজে হাতে ধরে কন্যা হায়াৎ অল নাফুসকে বদরের শয্যাকক্ষে পৌঁছে দিয়ে এলেন। এ দেশের এ-ই প্রচলিত রীতি। বদর এগিয়ে এসে পাত্রীকে সাদরে বরণ করে নিল। তার কুসুমের মতো পেলব একখানা হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসালো পুষ্পপালঙ্কে—নিজেও বসলো তার পাশে। মুখের নাকাব উঠিয়ে শুভদৃষ্টি বিনিময় করে নিল। এ-ও প্রচলিত রীতি।

মেয়েটির মুখ আনত, চোখ নিমীলিত। বদর দেখলো, মেয়েটির মুখে এক অজানা আশঙ্কা। চোখে মুখে কোনও হাসি আনন্দের ছাপ নাই, —যেন পাণ্ডু-বিবর্ণ। বদর মৃদু কণ্ঠে সোহাগ মাখিয়ে বলে, কই, মুখ তোল, চেয়ে দেখ। আমি তোমার মতো এত রূপসী না হতে পারি তবে হত-কুৎসিৎ নই।

এবার হায়াৎ চোখ মেলে তাকায়। বদরের রূপের তুলনায় তার নিজের রূপ নগণ্য মন হয়। এমন বেহেস্তের রূপে সে রূপবান, অথচ কত বিনয় —বলে কিনা, তার মতো রূপ নাকি তার নাই? খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠে সে। আনন্দে নেচে ওঠে হৃদয়। মনে মনে তার শঙ্কা ছিল, না জানি তার স্বামী দেখতে কেমন হবে। হয়তো কোনও বুড়ো হাবড়ার হাতেই তুলে দেবেন তার বাবা। কিন্তু না, সে আশঙ্কা তার কেটে গেছে। এরকম সুন্দর স্বামী সে পাবে তাও অবশ্য আশা করতে পারে নি।

এমন সময় রাত্রি শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন দুশো দশতম রজনীর মধ্যভাগে আবার সে শুরু করে:

বদর তার সারা দেহ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে থাকে। তার

টানা টানা কাজল কালো আয়ত চোখ, টিকলো নাক, আপেলের মতো গাল, পাকা আঙ্গুরের মতো ঠোঁট, সুগঠিত স্তন, ভারী নিতম্ব বড় সুন্দর। এক-কথায় হায়াৎ-অল নাফুসকে তার পরমা সুন্দরী বলে মনে ধরে। ক্ষণিকের জন্য মনের নিভৃত কোণে এক টুকরো হিংসার কালো মেঘ উঁকি মেরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বদর তার একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে আদর করে। এত-ক্ষণ ভীত চকিত হরিণীর মতো গুটিয়ে রেখেছিল। না জানি তাকে তার স্বামীর পছন্দ হয়েছে কিনা। এবার সে কিছুটা সাহস পায়। বদর আরও কাছে সরে এসে হায়াৎকে চুমু খায়। হায়াতের সারা দেহ পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। এক অভূতপূর্ব উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে দেহমন। চুম্বনের স্বাদ যে-এমন সে এই প্রথম বুঝলো। খুব ভালো লাগলো। সে ভালো-লাগা কোনও ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। একতরফা বদরের চুম্বন সে প্রাণভরে আস্বাদ করলো। কিন্তু প্রতিদানে সে তাকে ফিরিয়ে দিতে পারলো না আর একটা। ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু দুস্তর লজ্জা এসে তাকে নিরস্ত করে দিল।

আলতো করে দুহাত ধরে হায়াৎকে সে বিছানায় শুইয়ে দিল। কপালে ঠোঁটে, গালে, গ্রীবায় স্তনে চুমুতে চুমুতে ভরে দিল বদর। সারা গায়ে হাত বুলিয়ে আদর-সোহাগ করতে থাকলো। এক সময়ে সে দেখলো, হায়াৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। মুখে তার পরম প্রশান্তি। বদরও এক পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই হামামে ঢুকে নিজেকে তৈরি করে নিলো বদর। আজ থেকে তার দরবারে বসতে হবে। তার হাতেই শাসন দণ্ড তুলে দিয়েছেন সম্রাট আরমানুষ। যথা সময়ে সে সুলতানি গাম্ভীর্য নিয়ে দরবারে আসে। মন্ত্রী ছুটে এসে তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিয়ে সিংহাসনে বসায়। দরবারে উপস্থিত আমীর অমাত্য সেনাপতিরা আভূমি আনত হয়ে তাকে অভিবাদন জানায়। বদব সকলকে নিজের নিজের আসন গ্রহণ করতে বলে। তারপর শুরু হয় দরবারের কাজ কর্ম।

দরবারের মন্ত্রী আমীর অমাত্যরা দেখে মুগ্ধ হয়, শাহজাদা কি অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে সব কাজ কত স্বল্প সময়ে চটপট সমাধা করে দিল। বদর বললো, আদালতের বিচার পদ্ধতির সংস্কার করতে হবে। অপরাধীকে শুধুমাত্র শাস্তি দিলেই সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। কেন মানুষ অপরাধ করে, কারণ অনুসন্ধান করে তার প্রতিকার করতে হবে। অপরাধী বলেই তার প্রতি নির্মম নিষ্ঠুর আচরণ করা অন্যায়। অপরাধীকে শাস্তি অবশ্যই দিতে হবে। কিন্তু সেই শাস্তির বিধান দেওয়ার সময় বিচারকের হৃদয় ব্যথায় মথিত হবে—এই-ই হওয়া উচিৎ। বিচারে সন্দেহের অবকাশ থাকলে কারো প্রাণদণ্ড হবে না। মনে রাখতে হবে, দেশের প্রতিটি মানুষ তার প্রজা। প্রজা যদি অবিনয়ী, উদ্ধত, স্বৈরাচারী হয়ে পড়ে তার জন্য মূলত প্রশাসনই দায়ী।

এদিকে আরমানুষ তার মহারানীকে সঙ্গে নিয়ে কন্যা হায়াৎ অল-নাফুসের মহলে এসে উপস্থিত হন। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে আদর করে

মা জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁরে বর পছন্দ হয়েছে তো?

হায়াৎ সলজ্জভাবে সাড়া দেয়, খুব পছন্দ হয়েছে মা। আমাকে কত আদর করেছে। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে।

মা জিজ্ঞেস করেন, শুধু এই। আর কিছু করেনি?

—আর আবার কী করবে? বললাম তো খুব আদর করেছে।

—দূর বোকা মেয়ে, সে কথা জিজ্ঞেস করিনি।

—তবে?

ঘুমুবার আগে সে তোকে গ্রহণ করেনি?

হায়াৎ বুঝতে পারে না মা তাকে কী বোঝাতে চাইছেন। —গ্রহণ মানে কী মা?

মা বুঝলেন মেয়ে একেবারে অর্বাচ্চীন। সোজাসুজি কিভাবে তাকে সে-কথা জিজ্ঞেস করবেন বুঝতে পারেন না। শোবার আগে সাজ পোশাক খুলেছিল?

মেয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু পরে বলে, না। কিন্তু মা, কেন একথা জিজ্ঞেস করছো?

মহারানী গম্ভীরভাবে বলে, ও কিছু না। ঠিক আছে, তুমি বিশ্রাম কর। আমরা আবার পরে আসবো।

মা-বাবা দুজনে চোখে চোখে কি যেন কথা বলে। হায়াৎ বুঝতে পারে না। চিন্তিত মুখে তারা দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

দরবারের কাজকর্ম সেরে বদর হায়াতের কাছে আসে। হায়াৎ-এর মনে তখন মা-এর ঐসব হেঁয়ালীভরা প্রশ্নগুলো তোলপাড় করছিল। বদর কাছে এসে হায়াতের ঘাড়ে হাত রাখে, কী ভাবছো, হায়াৎ?

—না—না, কিছু না তো—

হায়াতের অন্যমনস্কতা কেটে যায়। বদর জিজ্ঞেস করে, বাবা মা দেখা করতে এসেছিলেন?

হায়াৎ ঘাড় নাড়ে, হ্যাঁ।

—কী জিজ্ঞেস করলেন তাঁরা?

হায়াৎ বললো, রাতে শোবার আগে তুমি আমার সাজ-পোশাক খুলে দিয়েছিলে কিনা? কিন্তু ওকথা তারা কেন জানতে চাইলো, বলতো?

বদর মুচকী হাসে, ওই রকমই রীতি। শাদীর পরে বাসর ঘরে পাত্র নিজে হাতে খুলে দেয় পাত্রীর সাজ-পোশাক। তারপর তারা একসঙ্গে শোয়। কিন্তু কাল রাতে তুমি বড় ক্লান্ত ছিলে। শোবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লে। তাই আর তোমাকে বিরক্ত করিনি। তা এস, আজ তোমাকে সেই ভাবে শুইয়ে দিই।

বদর এক এক করে হায়াতের সব সাজ-পোশাক খুলে দুহাতে চ্যাংদোলা করে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিল। খুব আলতো ভাবে সে তার গালে একটা ছোট্ট চুমু একে দেয়। জিজ্ঞেস করে পুরুষ মানুষকে খুব ভালো লাগে তোমার?

হায়াৎ জবাব দেয়, জীবনে হারেমের খোজা ছাড়া অন্য কারো মুখ দেখিনি আমি। কিন্তু তাদের দেখে কি পুরুষ বলা যায়? মনে হয় তারা

পুরোপুরি মানুষই না। একটা পুরুষ বা নারীর যা যা দরকার তার কোনওটাই তাদের নাই। আচ্ছা বলতো, সবাই ওদের আধা মানুষ বলে কেন? কী তাদের নাই?

বদর হাসে, কেন, জান না? তোমার যা নাই—তাদেরও তা নাই।

—সে আবার কী?

—বোকা মেয়ে, সে তুমি পরে ধীরে ধীরে বুঝবে।

হায়াৎকে জড়িয়ে ধরে চুমায় চুমায় ভরে দেয়। হায়াৎ সারা দেহে কি এক রোমাঞ্চ অনুভব করে। উত্তেজনায় কেঁপে উঠতে থাকে। বদর তার গায়ে মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দেয়। একসময় তারা দুজনেই কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

প্রভাত সমাগত দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো এগারতম রাত্রে আবার কাহিনী শুরু হয়ঃ

সকালে উঠে নিজেকে তৈরি করে নিয়ে বদর দরবারে চলে যায়। সম্রাট আরমানুস মহারাণীকে সঙ্গে নিয়ে হায়াতের মহলে আসেন। আজ রাত কেমন কাটলো মা?

হায়াৎ বলে, খুব ভালো, বাবা, খুব সুন্দর।

আরমানস বলে, এখনও তুমি শুয়ে আছ—দেখছি, মা। সারা রাতে কি অনেক ধকল সইতে হয়েছে?

—না বাবা, মোটেও না। বড় আরামে ঘুমিয়েছি। সে আমাকে খুব আদর সোহাগ করেছে। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। কাল সে নিজে হাতে আমার সব সাজ-পোশাক খুলে দিয়েছিল। সারা শরীর চুমায় চুমায় ভরে দিয়েছিল। কি যে ভালো লেগেছিল, তোমায় কি করে বোঝাবো বাবা। মনে হচ্ছিল, আমি স্বর্গে চলে যাচ্ছি।

মহারানী জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু তোমার রাতের সেই তোয়ালেটা কোথায়, দেখি। খুব কি রক্ত ঝরেছিল?

হায়াৎ অবাক হয়ে বলে, তোয়ালে তো নিইনি, মা; আর রক্ত ঝরবে কেন?

মেয়ের এই কথা শুনে মা-বাবা দুজনেই কপাল চাপড়াতে লাগলেন, হায় আমার কপাল, তোমার স্বামী এভাবে তোমাকে বঞ্চিত করছে কেন, মা?

সম্রাট আরমানুসের মুখের পেশী কঠিন হতে কঠিনতর হয়ে ওঠে। মহারানীকে উদ্দেশ করে বলেন, এতো খুব খারাপ কথা মহারানী। সে যদি তার কর্তব্য না করে, আমাকে তো অন্য রকম ভাবতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্কই যদি তৈরি না হয়, এ বিয়ে দিয়ে কি ফয়দা হলো? কাল সকালে যদি শুনি, হায়াৎ তখনও কুমারীই রয়ে গেছে তাহলে আমি কিন্তু আর চুপ করে থাকবো না, মহারানী। কামার অল-জামানের হাত থেকে কেড়ে নেবো আমার সিংহাসন। আমার মেয়েকে সে বঞ্চিত করবে আর আমি তাকে মাথায় করে নাচবো, তা হতে পারে না।

মহারানী বলেন, অত উত্তেজিত হয়ো না। ঠাণ্ডা মাথায় ভালো করে আগে ভেবে দেখ সব। তার হাত থেকে সিংহাসন কেড়ে নিয়ে দেশ থেকে

তাড়িয়ে দিলে তার পরিণাম কি হবে ভেবে দেখেছ?

—কী আবার হাতী ঘোড়া হবে। হায়াতের আবার আমি বিয়ে দেব। একটা মাত্র মেয়ে আমার। একটা অপদার্থ রাঙামুলোর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সারাটা জীবন তো সে বরবাদ করে দিতে পারে না।

—কিন্তু মহারানী বলেন, এতে জামানের বাবা সুলতান শাহরিমান যদি ক্রুদ্ধ হন?

সম্রাট আরমানুস উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, ওসবে আমি ভয় করি না। যা হবার তা হবে।

দরবারের কাজ শেষ করে রাত্রে আবার হায়াতের কাছে আসে বদর। গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ রেখে হায়াৎকে সে আদর সোহাগ করতে থাকে। হায়াতের চোখে জল দেখে সে অবাক হয়, কী ব্যাপার কাঁদছো, কেন হায়াৎ? আসতে আমার দেরি হয়েছে বলে?

হায়াৎ ঘাড় নাড়ে, না। আজ সকালে মা বাবা এসেছিলেন। বাবা খুব রেগে গেছেন। তিনি বললেন, তোমার হাত থেকে সিংহাসন তিনি কেড়ে নেবেন।

বদর হাসে, কী আমার গুস্তাকী?

হায়াৎ বলে, বিয়ের পর দুটো রাত কেটে গেল, এখনও তুমি আমাকে কুমারী করেই রেখেছ, তাই তাঁরা ভীষণ রেগে গেছেন। বাবা বলে গেছেন, আজ রাতে যদি তুমি আমার দেহ গ্রহণ না কর, শুধু সিংহাসনই তিনি কেড়ে নেবেন না, আরও মারাত্মক ঘটনা ঘটতে পারে। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। শাহজাদা। বাবার রাগ তো আমি জানি, রেগে গেলে তাঁর আর কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। তোমার যদি কোনও অনিষ্ট হয়—

—আমার অনিষ্ট হলে তোমার খুব কষ্ট হবে?

—বারে, কি যে বল?

বদর মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করে, তুমি আমাকে ভালবাসো, না?

হায়াৎ বদরের বুকে মুখ লুকায়, তুমি যে খুব ভালো, তোমাকে পেলে কেউ ভালো না বেসে থাকতে পারে? সারাদিন আমি তোমার বিপদের আশঙ্কায় কেঁদেছি। যাইহোক, আমার একটা কথা শোন, সোনা। বাবা-মা যা চান তুমি সেই ভাবেই চল। আমার কুমারীত্ব খোয়া গেলে যদি তাদের মুখে হাসি ফোটে, তাই না হয় করলে! কাল সকালে মা এসে আগে আমার তোয়ালে দেখতে চাইবেন। রক্তের দাগ যদি না দেখতে পান তা হলে আর রক্ষা থাকবে না তোমার। সেই ভেবেই আমার বুক কাঁপছে। আমি আর ভাবতে পারছি না, প্রিয়তম। এই দেহ মন প্রাণ—আমার বলতে যা, সবই তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। তুমি যা ভালো বোঝ, তাই কর। আমার নিজের মত বলতে আলাদা কিছু নাই। তোমার মতই আমার মত, তোমার পথই আমার পথ।

বদর মনে মনে বলে, এই মওকা, এখন হায়াৎকে যা বোঝানো যাবে তাই বুঝবে, যা বলা যাবে তাই সে করবে। মহব্বতের মায়া জালে সে এখন আবদ্ধ। হায়াৎকে আরও নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নিয়ে বদর বলে, শোন, নয়ন তারা, তুমি যেমন আমাকে ভালোবাস, আমি তার কিছু অধিক তোমাকে

ভালোবেসেছি। এ ভালোবাসার মধ্যে কোনও গলদ নাই, এ-কথা তো মান?

হায়াৎ বলে, একশোবার। ফুলের নির্যাসের মত নিখাঁদ আমাদের মহব্বৎ।

বদর বলে, আমি একটা কথা বলবো হায়াৎ?

হরিণীর মতো কাজল কালো ডাগর চোখ মেলে তাকায় হায়াৎ—কী? কী এমন কথা?

—ধর যদি আমাদের সম্পর্কের মধ্যে কামনা বাসনার কোনও গন্ধ না-ই থাকে?

—খুব ভালো হয়। আমি বুঝতে পারি না, মা-বাবা কিসব বলছেন। তোমার আমার সম্পর্ক তো সুন্দর, ভালোবাসায় কোনও খাদ নাই।

বদর বলে তোমার সঙ্গে যদি আমার ভাই-বোনের সম্পর্ক হয়—তুমি কি দুঃখ পাবে?

—মোটেই না। খুব ভালো হবে। এক সাথে হেসে খেলে আমাদের দিন কাটবে। তুমি আমাকে তোমার মনের কথা বলবে। আমি খুলে দেব আমার মনের দরজা। আমার নিঃসঙ্গ জীবন ফিরে পাবে এক অন্তরঙ্গ দোসর।

বদর এবার আরও এক ধাপ এগোয়, আচ্ছা, হায়াৎ সুন্দরী, ধর, আমি যদি তোমার ভাই না হয়ে বোন হই? তখন তুমি আমাকে কিভাবে নেবে? তখনও কি তুমি আমাকে এমনিভাবেই ভালো বাসতে পারবে?

হায়াৎ উচ্ছল আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে, আরও মজা হবে, আরও বেশি করে তোমাকে ভালবাসবো তাহলে। তুমি হবে আমার সব সময়ের সখী। কেউ আমাদের ভালোবাসায় চিড় খাওয়াতে পারবে না। কোনওদিন আমরা ছাড়াছাড়ি হবো না।

বদর ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলে, হায়াৎ, তোমাকে একটা মজার জিনিস দেখাবো। কিন্তু তার আগে তোমাকে কসম খেয়ে বলতে হবে, কাউকে সে-কথা বলবে না।

হায়াৎ অবাক হয়, ওমা, এতে সন্দেহ অবিশ্বাসের কি আছে। আমি তো আগেই বলেছি, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। তুমি যা বলবে তাই আমি করবো। তুমি যা বারণ করবে তা আমি বলবো কেন? তবু যখন বলছো, কসম খেয়েই বলছি, কাউকে বলবো না—হলো তো!

বদর আর একটা দীর্ঘ চুম্বন এঁকে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এক এক করে নিজের দেহ থেকে সব সাজ-পোশাক খুলতে থাকে। হায়াৎ বিস্ময় বিস্ফারিত চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে। নিজের সুডৌল স্তন দুটি দুহাতের থাবায় পুরে বদর হাসতে হাসতে বলে, কী, কী দেখছো? ভাবছো, আমি কি মহা ধড়িবাজ শয়তানী? না?

হায়াৎ বলে, ধুৎ, কি যে যা তা বল। কিন্তু কেন তুমি এখানে পুরুষের বেশে এসেছিলে দিদি? কিসের জন্য এই রকম মারাত্মক ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়েছে তোমায়?

বদর বললো, বলবো, সবই বলবো তোমাকে বোন, একবার যখন আমরা ভালোবেসেছি, অন্তরের কোনও গোপন কথাই আর লুকিয়ে রাখা সম্ভব

না। তবে সে দুঃখের কাহিনী শুনলে তুমিও কাঁদবে। তা কাঁদো, আমি আর কোন কথা লুকাবো না। আজ সারা রাত ধরে আমার কাহিনী শোন তুমি।

পালঙ্কে উঠে এসে হায়াতের পাশে বসে কামার অল-জামানের সঙ্গে তার প্রথম রাত্রির মিলন থেকে শুরু করে তাঁর থেকে রহস্যজনক অন্তর্ধান পর্যন্ত আদ্যোপান্ত সব কাহিনীই সবিস্তারে বলে গেল।

কিশোরী হায়াৎ মুগ্ধ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে বদরের বুকে মাথা রাখে। বদর ওর কপালে হাত বুলাতে বুলাতে বলে, নিয়তির কি নির্মম পরিহাস, বোন। আবার কবে কামার অল-জামানকে ফিরে পাবো, কে জানে। তবে এ বিশ্বাস আছে, আমাদের অন্তরের বন্ধন কেউ ছিঁড়তে পারবে না। একদিন না একদিন তার সঙ্গে আমাদের মিলন হবেই। তাঁর কাছে সদাসর্বদা প্রার্থনা জানাচ্ছি। সে যেন সত্বর ফিরে আসে। আমার মনের কি বাসনা জান বোন? জামান-এর হবে তুমি দ্বিতীয়া বেগম। আমরা দুই বোন এক সাথে সারাটা জীবন কাটাবো, এই আমার একান্ত ইচ্ছা।

হায়াৎ বলে, কিন্তু তিনি যদি আমাকে গ্রহণ না করেন।

—সে ভার আমার। আমার কথা সে ফেলতে পারবে না। তাছাড়া তোমার মতো রূপসী মেয়েই বা কটা মেলে। তোমাকে পেলে সে খুব খুশিই হবে।

আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়ে হায়াৎ। বদরের নগ্ন দেহখানা নিয়ে খেলা শুরু করে। এবার আর কোনও জড়তা নাই, নিজেই বদরকে চুমু খায়। হাতের মুঠিতে তার সুগঠিত স্তন দুটি পিষ্ট হতে থাকে। হায়াৎ বলে, আচ্ছা দিদি তোমার দুটো তো বেশ বড় বড়। আমার দুটো এত ছোট ছোট কেন?

বদরের চোখে দুষ্টু হাসি, সবুর কর, সময়ে ওরাও এই রকম ডাঁসা হয়ে উঠবে।

বদরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সে তার নিজের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে থাকে। হায়াৎ বলে, জান দিদি, আমি আমার দাসী বাঁদীদের কাছে অনেকবার জানতে চেয়েছি, শরীরের কোন অঙ্গটা কী জন্যে তৈরি, তা সে বেটিরা আমার কথার সোজাসুজি কোনও জবাব দেয়নি। সব সময়ই আকারে ইঙ্গিতে কি সব বোঝাতে চেয়েছে। সেগুলো আমার মাথায় ঢোকেনি। তুমি আমাকে সব বুঝিয়ে দাও তো, কোন্ অঙ্গটা কি দরকারে লাগে? একদিন একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। আমি হামামে গোসল করছি, গায়ে সাবান মাখিয়ে দিচ্ছে আমার এক বাঁদী। তাকে আমি চেপে ধরলাম, আজ তোমাকে বলতেই হবে, আমার শরীরের এই সব অঙ্গগুলো, কী দরকারে লাগে। তা সে বেচারী ভয়ে লজ্জায় কোনও জবাব দিতে পারে না। রাগি না রাগি না, কিন্তু রাগলে আমি আর মানুষ থাকি না। বাঁদীরা আমার কথার জবাব দিচ্ছে না দেখে আমার জেদ চেপে গেল। দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চিৎকার করতে লাগলাম, বল্ শিগ্গির, বলতেই হবে তোকে। চুপ করে থাকলে আমি ছাড়বো না।

আমার চিৎকারে সারা মহলে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। মা ছুটে

এলেন, কী? কী হয়েছে? অমন চেঁচাচ্ছো কেন?

আমি তো চুপ। বাঁদীর মুখেও কথা নাই। মা কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নন। বাঁদীকে প্রশ্ন করতে সে বললো, রাজকুমারী জানতে চাইছেন, শরীরের এই সব অঙ্গ দিয়ে কি হয়?

মা-র মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। আর একটিও কথা বললেন না। ঠাস করে আমার গালে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলেন, বাঁদর মেয়ে কোথাকার। ফের যদি শুনি তুমি এই সব নিয়ে দাসী বাঁদীদের সঙ্গে আলোচনা করেছ, কেটে ফেলবো।

তারপর থেকে আমি আর কখনও কাউকে জিজ্ঞেস করতে সাহস করিনি।

বদর বললো, ঠিক আছে, তোমাকে আমি সব শিখিয়ে দিচ্ছি, কোন্‌টা কি কাজে দরকার হয়।

বাকী রাতটুকু বদর তাকে কামসূত্রের প্রতিটি স্তর বিষদভাবে বুঝিয়ে দিতে থাকে। এক সময়ে ভোর হয়ে আসে। হায়াৎ উৎকণ্ঠিতভাবে বলে, কিন্তু দিদি সকাল হলে মা বাবা আসবেন। মা আমার তোয়ালে দেখতে চাইবেন। কি হবে?

বদর বললো, কিচ্ছু ভেবো না, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

মহলের এক পাশে পাখীর খাঁচা ছিল। বদর উঠে গিয়ে একটা পাখী বের করে নিয়ে এসে হামামে গেল। একটুক্ষণ পরে খানিকটা খুন এনে বললো, এসো, তোমার দুই জংঘায় খানিকটা লাগিয়ে দিই। আর একটা তোয়ালে দাও। মাখিয়ে রাখি। কাল সকালে যখন মা দেখতে চাইবেন এই রক্তমাখা তোয়ালেটা তাকে বের করে দেখিয়ে দিও। তোমাকে যদি পরীক্ষা করতে চান, দেখতে পাবেন তোমার জংঘায় শুকনো রক্তের ছোপ। বাস, কেল্লা ফতে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়বেন তিনি। খুব বেশি আনন্দ বা দুঃখ হলে মানুষ তার বিচক্ষণতা হারিয়ে ফেলে। এ ক্ষেত্রেও তাই হবে। তোমার জংঘায় রক্তের দাগ দেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠবেন। আর তোমাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখবেন না।

হায়াৎ বলে, কিন্তু এ সবের কি দরকার? পাখীর রক্ত না লাগিয়ে আমার শরীরের রক্ত তো তুমিই বের করে দিতে পার, দিদি।

—পারি, কিন্তু দেব না। ওটা কামার অল-জামানের সম্পত্তি। ওখানে আমি হাত লাগাবো না।

পরদিন সকালে বদর যথারীতি কামার অল-জামানের ছদ্মবেশে আবার দরবারে চলে যায়। সম্রাট আরমানুস আর মহারানী এসে হাজির হন হায়াতের মহলে। রাগে ক্ষোভে সাপের মত ফুঁসতে থাকেন সম্রাট। আজ একটা হেস্তনেস্ত তিনি করবেনই। এভাবে মেয়ের জীবনটা তিনি নষ্ট হতে দেবেন না। কিন্তু পলকেই সব রাগ জল হয়ে গেল তাঁর। হায়াৎ রক্তমাখা তোয়ালেখানা বের করে মা-কে দেখালো। মা দেখলেন, মেয়ের জংঘায় উরুতে শুকনো রক্তের দাগ।

—ওগো শুনছো, মহারানী আনন্দে চিৎকার করে ওঠেন, আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। জামাই আজ মেয়েকে গ্রহণ করেছে।

সারা প্রাসাদে আনন্দের হিল্লোল বইতে লাগলো। শুভ সংবাদ মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়লো শহরময়। নাচ-গান হৈ-হল্লায় মেতে উঠলো সকলে। সম্রাট ঘোষণা করলেন, আজ ছুটির দিন, দরবার দপ্তর সব বন্ধ থাকবে। আজ শুধু খানাপিনা আর আমোদ-আহ্লাদ করে কাটাবে সকলে।

রাজকুমারীর রক্তমাখা তোয়ালে নিয়ে জাঁকজমক করে শোভাযাত্রা বেরুলো। শহরের নানা পথ-পরিক্রমা করে বিকেল নাগাদ আবার প্রাসাদে ফিরে এল। উটের বাচ্চা কাটা হলো, অসংখ্য ভেড়া পোড়ানো হলো। ইতর জনের আজ অবাধ নিমন্ত্রণ। গরীব দুঃখীরা পেটপুরে খেয়ে দুহাত তুলে প্রার্থনা জানিয়ে গেল, রাজকুমারী যেন চাঁদের মতো সুন্দর পুত্র লাভ করে।

প্রতিদিন যথাসময়ে দরবারে গিয়ে বসে বদর। দারুণ বিচক্ষণতার সঙ্গে শাসন কাজ চালাতে থাকে। তার ন্যায়বিচারে প্রজারা খুব খুশি। প্রজাদের শুভেচ্ছা আর ভালোবাসায় তার মন ভরে ওঠে। কিন্তু এত উল্লাস আনন্দের মধ্যেও একটি চিন্তাই তাকে কুরে কুরে খেতে থাকে। কামার অল-জামান কবে আসবে? তার নয়নের মণি, তার বুকের কলিজা কোথায় চলে গেল। সকলের অলক্ষ্যে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

খালিদানে ফিরতে হলে জাহাজ পথে যেতে হবে। আর সব জাহাজই এই এবনী দ্বীপে নোঙর করে। বদর বন্দর সর্দারকে জানিয়ে রেখেছে, যদি কোনও জাহাজ খালিদানের দিকে যেতে থাকে; খুব ভালো করে খোঁজখবর নিয়ে সে যেন তাকে জানায়।

এদিকে শাহজাদা কামার অল-জামান সেই বৃদ্ধ মালীর ছোট্ট বাড়িতে বসে বসে দিন গোনে। কবে খালিদানের জাহাজ আসবে। কবে সে দেশে পেঁছিবে, তার প্রাণপ্রতিমা বদরকে বুকে পাবে।

আর খালিদানে—শোকার্ত সুলতান শাহরিমান তখন মৃত্যু পথযাত্রী। এবার তিনি সব আশা পরিত্যাগ করেছেন। তার পুত্র কামার-অল-জামান আর বেঁচে নাই। সমস্ত আরব দুনিয়ার প্রতিটি সলতানিয়তে—প্রতিটি শহরে বন্দরে, গঞ্জে গ্রামে তিনি লোক পাঠিয়েছেন। কিন্তু কেউই কোনও খবর আনতে পারেনি। তাই অবশেষে সুলতান শাহরিমানের হুকুমে সারা দেশ-ব্যাপী শোকদিবস পালন করা হলো। পুত্রের স্মৃতির উদ্দেশে তৈরি করা হলো একটা সুউচ্চ মিনার। এই মিনারের একটি স্বল্পপরিসর কামরায় কাটতে লাগলো তাঁর বিষাদ বিষন্ন জীবনের শেষের দিনগুলো।

বৃদ্ধ মালীর অন্তরঙ্গ সাহচর্য সত্ত্বেও কামার অল-জামান বিষাদে দিন কাটায়। মালী রোজই সমুদ্র তীরে যায়। যদি কোনও খালিদানের জাহাজ এসে ভিড়ে। কিন্তু শহরটা পশ্চিমীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হওয়ার পর থেকে ভয়ে আর এপথ মাড়ায় না কেউ। তবু মালী আশা ছাড়ে না। নিশ্চয়ই কোনও না কোনও জাহাজ একদিন আসবেই।

একদিন বিকালে, মালী তখন সমুদ্র তীরে গেছে, কামার অল-জামান জানলার ধারে বসে বাগানের দিকে তাকিয়ে নিবিষ্ট মনে তার অতীতের সুখস্মৃতি রোমন্থন করছিল। এমন সময় পাখীর ঝটপটানীতে সে সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখলো, দুটো পাখীতে প্রচণ্ড লড়াই বেঁধেছে। একটি আর একটিকে পাখার বাড়ি মেরে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে। ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে

গায়ের পালক ছিঁড়ে খুঁড়ে দিচ্ছে। এই ভাবে কিছুক্ষণ লড়াই চলার পর একটি পাখী ঝুপ করে নিচে পড়ে গেল। জামান ছুটে গিয়ে পাখীটাকে হাতে তুলে নেয়। কিন্তু না, সব শেষ হয়ে গেছে।. ওপরে তাকিয়ে দেখলো, অন্য পাখীটা উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। পাখীটাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে আবার সে এসে জানলার ধারে বসে। একটু পরে দেখলো, আরও দুটো পাখী উড়ে এসে মৃত পাখীটার পাশে বসলো। ওদের ভাষা বুঝতে পারে না জামান, তবে এটা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারলো, শোকে তারা মুহ্যমান। অনেকক্ষণ ধরে তারা পাখীটার পাশে চুপচাপ বসে রইলো। তারপর ঠোঁট দিয়ে মাটি ঠুকরে ঠুকরে একটা গর্ত খুঁড়লো। মরা পাখীটাকে টেনে এনে গর্তের মধ্যে রেখে মাটি চাপা দিয়ে আবার তারা উড়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ কেটে গেছে। আবার একটা বিকট চেঁচামেচির শব্দে জামানের তন্ময়তা কেটে যায়। সেই পাখী দুটো ঐ খুনী পাখীটাকে তাড়া করতে করতে বাগানের ভিতরে নিয়ে এসেছে। পাখীটা পালাতে চেষ্টা করছে, কিন্তু ওদের দুজনের সাঁড়াশী আক্রমণে তা সম্ভব হচ্ছে না। একটি সামনে থেকে অন্যটি পিছন দিক থেকে পাখার ঝাপটা মারতে মারতে এক সময় মাটিতে ফেলে দিল তাকে। তারপর খুনী পাখীটার মৃতদেহটা টানতে টানতে নিয়ে এল তারা সেই নিহত পাখীটার কবরের পাশে। দুটিতে মিলে ধারালো ঠোঁট দিয়ে চিরে ফেললো তার পেট। বেরিয়ে পড়লো নাড়িভুঁড়ি। তারপর ওরা উড়ে চলে গেল।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দুশো ষোলতম রজনী :

আবার সে গল্প শুরু করে :

এতক্ষণ অবাক বিস্ময়ে এই দৃশ্য সে প্রত্যক্ষ করছিল। এবার সে উঠে দাঁড়ালো। আবার বাগানের ভিতরে এসে দাঁড়ালো। ঐ খুনী পাখীটার কাছে। পেটের নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে পড়েছে। কি বীভৎস দৃশ্য। চোখে দেখা যায় না? হঠাৎ কামার-অল-জামানের বুক দুলে ওঠে। পাখীটার পেটের নাড়িভুঁড়ির মধ্যে লাল রঙের কি যেন একটা বস্তু ঝকমক করছে। আরও একটু কাছে আসতেই পরিষ্কার দেখতে পায়, বদরের সেই গ্রহরত্ন পাথরখানা। কামার-অল-জামানের মাথাটা বোঁ করে ঘুরে ওঠে। কোনও রকমে বসে পড়ে সে পাথরখানা তুলে নিয়ে শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে। ভাবখানা, আবার যদি কেউ ছিনিয়ে নিয়ে পালায়। কোন রকমে টলতে টলতে দেহখানা টেনে নিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সহজ স্বাভাবিক করতে পারে কামার অল-জামান। নতুন একটা কারে বেঁধে নিজের গলায় পরে নেয় পাথরখানা। আল্লাহ আমার দুঃখ ব্যথা বুঝেছেন। তাই তিনিই আমাকে ফেরৎ দিয়ে দিলেন। আর আমার কোনও দ্বিধা নাই। এবার আমি বদরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবো। বদর—আমার চোখের মণি—আমার কলিজা।

কামার-অল-জামানের চোখ বেয়ে নামে জলের ধারা। পাথরখানায়

বার বার চুমু খায় সে। ভাবে, না, এভাবে গলায় ঝুলিয়ে রাখা ঠিক হবে না। তাতে লোকের নজর লাগবে। গলা থেকে খুলে একখানা রেশমী রুমালে ভালো করে জড়িয়ে বাঁ হাতের বাহুতে তাগার মতো করে বাঁধে।

বৃদ্ধ মালী বলেছিল, জ্বালানীর কাঠ নাই। বাগানের মধ্যে একটা মরা গাছ আছে। ওটা কাটা দরকার। তার গায়ে এখন তেমন শক্তি নাই, কুড়ুল চালাতে পারে। অথচ শহরের সব মানুষ কোথায় ছন্নছাড়া হয়ে পালিয়েছে। একটা জনমজুরও পাওয়া যায় না।

জামান বলেছিল, তার জন্যে আপনি কেন চিন্তা করছেন, চাচা। আমি তো আছি, হতে পারি সুলতানের ছেলে, তা বলে কি শরীরে তাগদ নাই? নিজেদের কাজ নিজেরা করবো তাতে লজ্জা কিসের। আপনি কিছু ভাববেন না, বিকেলে আমি কেটে দেবো আপনার গাছ।

জামান একখানা কুঠার হাতে নিয়ে আবার বাগানের ভিতরে আসে। মরা গাছটার গোড়ায় কুঠারের কয়েক ঘা মারতেই ঝন ঝন করে একটা আওয়াজ বাজে। ঠিক যেন—কোনও লোহার পাতের উপর আঘাত করলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি। মাটি আর পাথরের টুকরো সরাতেই চোখে পড়লো একখানা ব্রোঞ্জের মোটা পাত। ক্ষিপ্র হাতে পাতখানা টেনে তুলে ফেললো সে। একটা সিঁড়ি নেমে গেছে মাটির নিচে। শাহজাদা জামান-এর আর তর সয় না। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যায় সে। দশটা ধাপ নামার পর সে দেখতে পায়, একটা বিরাট পাতালপুরীর গুহা। গুহার সামনে খোদাই করে লেখা আছে আদ এবং থামুদের নাম আর সাল তারিখ। জামান ঝুঁকে পড়ে দেখলো, গোটা কুড়ি ইয়া বড় বড় তামার জ্বালা। ভিতরে ঢুকে একটা জ্বালার ঢাকনা তুলে দেখতে পেল, সোনার মোহরে ঠাসা। আর একটার ঢাকনা খুললো। সেটাতে সোনার তাল। এইভাবে সব কটা জালারই সে মুখ খুলে দেখলো, দশটায় মোহর আর দশটায় সোনার তাল-এ ভর্তি।

শাহজাদা অবাক হয়ে ভাবে। এত বিশাল ধন-দৌলত মাটির তলায় গচ্ছিত রেখে এখানকার সুলতানরা দেহ রেখেছে। এখন এ শহর বিদেশী স্লেচ্ছদের কবলে। তারা সন্ধান পেলে এখুনি ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে। জামান উপরে উঠে এসে গর্তটার মুখ ব্রোঞ্জের পাতখানা দিয়ে ঢেকে মাটি চাপা দিয়ে বাগানের এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে ফুলের গাছে জল দিতে থাকে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে মালী ফিরে আসে। আজ তার মুখ হাসিতে ভরা।

—সুখবর আছে বাপজান, খুব শিগগিরই আপনি দেশে ফিরে যেতে পারবেন। আমি একটা জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে কথা বলে এলাম। তিনি আপনাকে এবনী দ্বীপ অবধি নিয়ে যেতে পারেন। সেখান থেকে হামেশাই খালিদানের জাহাজ ছাড়ে। এবনি পেঁছিতে তিন দিন লাগবে। তারপর ওখান থেকে খালিদানের জাহাজে চেপে বসবেন। ব্যাস, একেবারে দেশে পেঁছে যাবেন।

জামান আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, চমৎকার। এদিকেও একটা সুখবর আছে, চাচা। অবশ্য আপনি এখন এই দুনিয়ার ভোগ লালসার অনেক উর্দ্ধে চলে গেছেন। এ সংবাদ আপনাকে হয়তো পুলকিত করবে না। আসুন আমার সঙ্গে।

জামান বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে সেই মরা গাছতলায় এসে দাঁড়ায়। মাটি সরিয়ে ব্রোঞ্জের পাতখানা সরিয়ে গর্তের নিচে নেমে গেল দুজনে।

এই সময় রজনী অতিক্রান্ত হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো ঊনিশতম রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে আবার সে গল্প শুরু করে:

কুঁড়িটা জালা ভর্তি সোনার মোহর আর সোনার তাল দেখে বৃদ্ধের চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠে। —কী সর্বনাশ! এত ধনদৌলত দিয়ে মানুষ কি করে বাবা?

জামান বলে, কেন, ভোগ করে। এগুলো সব আপনার। যে কটা দিন বাঁচেন দুহাতে দেদার খরচাপাতি করে ওড়ান।

—না বাবা, এসবে আমার কোনও লোভ নাই। এ জঞ্জাল অশান্তিই বাড়ায়। আজ বাদে কাল মরে যাবো। এখন আর ভোগবাসনার দরকার নাই আমার। আপনার এখনও কাঁচা বয়স। অনন্ত ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে সামনে। আপনি ওগুলো নিয়ে যাবেন, বাবা। আমার অভাব আছে সত্যি, কিন্তু দৌলতের দেমাক আমার সহ্য হয় না। আপনি বরং যাবার আগে গোটা কয়েক পয়সা দিয়ে যাবেন। একখানা কফিন কিনে রাখবো। আমার মরার পরে যাতে ওরা ওই কাপড়ে জড়িয়ে কবর দেয়। সেই আমার যথেষ্ট পাওয়া হবে।

জামান বলে, কিন্তু অর্ধেকটাও যদি আপনি না নেন, আমিও কিছু নেব না। বৃদ্ধ বলে, যা ভালো বোঝেন করুন।

কামার অল-জামান সারা রাত ধরে গোটা কুড়ি কাঠের বাক্স বানায়। হাতে বাঁধা বদরের গ্রহরত্নটার দিকে তাকায়। নাঃ, এই অমূল্য রত্ন এমন ভাবে হাতে বেঁধে রাখা ঠিক না। একটা বাক্সের নিচে পাথরটা সযত্নে রেখে তার উপর সোনার মোহর ঢেলে দেয়। প্রায় ভর্তি হয়ে এলে উপরে কতক গুলো জলপাই দিয়ে ডালা এঁটে দেয়। লোকে ভাববে ফলের বাক্স। এই ভাবে সব বাক্স গুলো সোনার তাল আর মোহরে ভর্তি করে ডালা এঁটে দেয়। প্রথম বাক্সটার ওপরে এক টুকরো চামড়া এঁটে দিয়ে চিহ্ন রাখে—এইটায় আছে সেই গ্রহরত্ন পাথর খানা। তারপর প্রতিটি বাক্সের গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লিখে দেয় জামানের নাম-ধাম। বৃদ্ধ মালীকে বলে, চাচা, খুব ভোরে আপনি জাহাজের খালাসীদের কয়েকজনকে ডেকে নিয়ে আসবেন। তারা না এলে এই ভারি ভারি বাক্স নিয়ে যাবে কে?

বৃদ্ধ বলে, আপনি কিছু ভাববেন না, মালিক। আমি ভোরেই তাদের ডেকে আনবো।

জামান তখন যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত। বৃদ্ধ মালীর জ্বর এসেছে তা সে বুঝতেই পারলো না। মালীও কিছু বললো না। সারারাতে জ্বর আরও বাড়তে থাকে। মালী কিন্তু জামানকে কিছু বলে না। আহা বেচারী, কতকাল দেশ ছাড়া, এতদিন বাদে একটা আশার আলো দেখা গেছে, এই শুভ সময়ে নিজের অসুখের কথা বলে তার মন খারাপ করে দিতে চায় না সে। জীবনে তার কবে অসুখ করেছিল মনে পড়ে না। আজ সে

বুঝতে পারে, যাবার ডাক পড়েছে।

খুব ভোরে উঠে বৃদ্ধ চলে যায় বন্দরে। কুড়িজন খালাসীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে। জামান ওদের বাক্সগুলো দেখিয়ে বলে, ভালো জাতের দামী জলপাই আছে বাক্সগুলোয়। দেখ, ভাই, একটু যত্ন করে নিয়ে গিয়ে জাহাজে নামাবে। আছড়ে দিয়ে ফেলো না, তা হলে সব যাবে। তোমাদের যা ন্যায্য ইনাম তার চেয়ে অনেক বেশিই দেব আমি।

খালাসীদের সর্দার সেলাম ঠুকে বললো, ঠিক আছে, হুজুর। আপনি বেশি দেরি করবেন না। তাড়াতাড়ি জাহাজে চলে আসুন। মনে হচ্ছে, কাল সকাল নাগাদ হাওয়ার নিশানা আমাদের পথের দিকে ঘুরে যাবে। হাওয়া পেলে আমরা আর অপেক্ষা করবো না। সঙ্গে সঙ্গে পাল তুলে দেব, হুজুর। তাই বলছি, আপনি তাড়াতাড়ি জাহাজে চলে আসুন।

জামান বললো আমার জন্য তোমাদের জাহাজ ছাড়তে এক পলকও দেরি হবে না সর্দার। আমি একটু বাদেই আসছি, তোমরা যাও।

খালাসীরা বাক্সগুলো মাথায় নিয়ে চলে গেল।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো বাইশতম রজনী :

আবার কাহিনী বলতে থাকে সে।

বৃদ্ধ মালীর ঘরে ঢুকে দেখে জ্বরে ঠক ঠক করে কাঁপছে সে। চোখ মুখ কেমন পান্ডুর হয়ে গেছে। জামান কাছে এসে মাথায় হাত রাখে, সেকি, আপনার এত জ্বর—কখন এল ?

—ও কিছু না বাবা, আপনি তৈরি হয়ে জাহাজে চলে যান।

—আপনি এই জ্বর গায়ে খালাসী ডাকতে গিয়েছিলেন অতটা পথ হেঁটে ?

—তাতে কি হয়েছে বাবা। এতদিন বাদে একটা জাহাজ পাওয়া গেল, কত আনন্দের কথা। তার জন্য আমার কী কষ্ট। আপনি রওনা হয়ে যান বাবা। আমার কোনও অসুবিধে হবে না। আর তা ছাড়া আজ বাদে কাল তো তাঁর কাছে যেতেই হবে। এ ডাক যত তাড়াতাড়ি আসে ততই ভালো।

জামান বলে, আপনি ও সব কথা ভাববেন না। আমি কিছু টোটকা জানি। গাছগাছড়ার রস করে আপনাকে খাইয়ে দিচ্ছি। আজ রাতেই আপনার জ্বর ছেড়ে যাবে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হলো না। রাত যত বাড়ে জ্বরও তত বাড়তে থাকে। সারারাত ধরে জামান বৃদ্ধের পাশে বসে শুশ্রূষা করে। কিন্তু নিয়তির লেখা কেউ এড়াতে পারে না। ভোর হতে না হতেই বৃদ্ধ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো জামান। এতদিন তার স্নেহছায়ায় সে কাটিয়েছে। আজ দেশে ফিরে যাওয়ার সময় সে-ই আগে চলে গেল।

নিজে হাতে কবর খুঁড়ে জামান তাকে যথাবিহিত রীতি অনুসারে

সমাহিত করলো। বেলা তখন অনেক। সূর্য মাথার উপরে এসে পড়েছে। এতক্ষণ জামানের অন্য কোনও দিকে খেয়াল ছিল না। আজ সকালে যে তার জাহাজ ছাড়ার কথা, তাও তার মনে ছিল না। এবার খেয়াল হলো সময় উৎরে গেছে। হাওয়ার নিশানা ফিরেছে। হয়তো বা জাহাজটা ছেড়েই চলে গেছে।

হন হন করে সে হেঁটে চলে সমুদ্রের ধারে। কিন্তু হায়, বডড্ দেরি হয়ে গেছে। সমুদ্র-সৈকতে সে যখন পেঁছিল জাহাজ তখন মাঝ দরিয়ায় পাল তুলে দিয়ে তর তর করে বয়ে চলেছে।

একরাশ হতাশা আর দুঃখ চেপে বসলো তার বুকে। ক্লান্ত-অবসন্ন দেহখানা টেনে নিয়ে ফিরে এল সে বাগানে। এখন এই বাগিচা এই ছোট্ট বাড়িখানা সবই তার দখলে। ঘরে গিয়ে বিছানায় পড়ে অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকে জামান, এমনই তার দুর্ভাগ্য, বদরকে সে আর ফিরে পাবে না। বদরের পাথরখানা পেয়েও সে আবার হারালো।

কামার অল-জামান বুঝতে পারে, এই অজানা অচেনা বিদেশে বেঘোরে তাকে প্রাণ হারাতে হবে। অথবা কতকাল এই নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হবে কে জানে। জামান মনে মনে ভাবে, ঐ পাথরটা হারাবার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ভাগ্যও তার পিছনে লেগেছে। যখন ওটা ফিরে পাওয়া গেল, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে উঠলো। কিন্তু আবার সে হাতের নাগালের বাইরে চলে গেল। না জানি এখন তার ভাগ্যে কি বিপদের খাড়া ঝুলছে। এখন মেহেরবান আল্লাহর দোয়া ছাড়া কোনও ভরসা নাই।

বাজারে গিয়ে কুড়িটা বাক্স কিনে আনলো জামান। জালার অর্ধেকটা সোনা সে বৃদ্ধমালীর জন্য সেই গুহার মধ্যেই রেখে দিয়েছিল। প্রতিটি বাক্সের অর্ধেকটা মোহর আর সোনার তাল-এ ভর্তি করে, বাকী অর্ধেক জলপাই সাজিয়ে ডালা এঁটে দিল।

মনে মনে আশা করতে থাকলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুখ তুলে চাইবেন। দুএক দিনের মধ্যেই একটা জাহাজ তিনি পাঠাবেন।

এরপর আবার সে আগের মতো বাগানের টুকিটাকী কাজকর্ম ফুলের গাছে জল দেওয়ার কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিল। বাকী সময় বদর-এর বিরহে গান গেয়ে গেয়ে কাটায়।

পালের হাওয়া অনুকূলে ছিল। জাহাজখানা তর তর করে বয়ে এবনি দ্বীপের বন্দরে এসে ভিড়ে নোঙর ফেলা হলো।

বন্দর-সর্দার বদরকে খবর পেঁছে দিল, একটা জাহাজ এসে ভিড়েছে। জাহাজে কুড়িটা বাক্স আছে—প্রতিটি বাক্সে কামার অল-জামানের নাম লেখা।

আনন্দে বদর-এর বুক দুরুদু দুরুদু করে। এতদিন পরে তার প্রিয়তম স্বামী ফিরে এসেছে! দরবারের পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে সে জাহাজে এল। কাপ্তেনকে একান্তে ডেকে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, কামার অল-জামান কোথায়?

কাপ্তেন বললো, তিনি জাহাজে নেই। তাঁর আসার কথা ছিল, কিন্তু কেন জানি না, আসেন নি। আমরা তার জন্য—অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। জাহাজ ছাড়ার কথা ছিল খুব সকালে, শুধু তাঁর জন্যেই আমরা

অনেক দেরিতে ছেড়েছি।

বদর জিজ্ঞেস করে কী ধরনের সওদা আছে জাহাজে?

কাপ্তেন বলে, নানা দেশের সুন্দর সুন্দর সুতী আর রেশমী কাপড়, কাজ করা মখমল, চমৎকার সব দেখতে সেকেলে এবং আধুনিক ঢংএর ছবি আঁকা কাপড়। চীনা এবং ভারতীয় দাওয়াই পত্র, হীরা, মুক্তা, নানা জাতের সুগন্ধী আতর, নানা রকম ফুলের নির্যাস, কর্পূর আর আছে কয়েক বাক্স উৎকৃষ্ট জাতের জলপাই,—ভারি সুন্দর খেতে।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো পঁচিশতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে।

বদর কাপ্তেনের ফর্দ শুনতে শুনতে বাধা দিয়ে বলে, আমি ঐ জলপাই-ই কিনতে চাই কিছুটা। কতটা আছে।

কাপ্তেন বলে, কুড়িটা বাক্স।

—সবগুলো বাক্সতেই কি একই ধরনের জলপাই আছে।

—তা বলতে পারবো না। তবে মনে হয়, ভিন্ন ভিন্ন বাক্সে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জালপাই-ই থাকতে পারে।

বদরের জিভে জল এসে যায়। বলে, আমি একটা বাক্স কিনতে চাই।

কাপ্তেন বলে, কিন্তু অন্যের জিনিস আমি কি করে বিক্রী করবো, হুজুর। যে মালিক সে জাহাজ ধরতে পারেনি। অবশ্য জাঁহাপনা যদি ইচ্ছে করেন তবে যা খুশি নিয়ে যেতে পারেন।

খালাসীদের সে হুকুম করলো, এই—জালপাই-এর বাক্সগুলো সব এদিকে নিয়ে আয়।

তৎক্ষণাৎ বাক্সগুলো সামনে এনে রাখা হলো। কাপ্তেন একটা বাক্সের ডালা খুলে জলপাই-এর চেহারা দেখালো।

বদর আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, আমি সবগুলো বাক্সই কিনবো। বাজারে কি দাম হতে পারে?

—আপনার দেশে জলপাই-এর খুব চাহিদা, জাঁহাপনা। আমার মনে হয় এক একটা বাক্স একশো দিরহাম হবে।

বদর তার এক কর্মচারীকে বললো, প্রত্যেকটা বাক্সের জন্য এক হাজার দিরহাম করে ইনাম দিয়ে দাও কাপ্তেনকে।

বদরের পিছনে পিছনে খালাসীরা বাক্সগুলো মাথায় নিয়ে জাহাজ থেকে নামে। বদর কাপ্তেনকে উদ্দেশ্য করে বলে, ফলের মালিকএর সঙ্গে দেখা হলে দামটা তাকে দিয়ে দিও।

প্রায় ছুটতে ছুটতে বদর হায়াতের কাছে আসে। বাক্সগুলো সব নিয়ে আসা হলো হারেমে।

দুখানা রেকাবী এনে দিল বাঁদীরা। একটা বাক্সের ডালা খোলা হলো। টসটসে পাকা জলপাই। পাকা সোনার মত রং। দাসীরা খোসা ছিলে ছিলে রেকাবী সাজিয়ে দিতে থাকে। কিন্তু কি আবাক কাণ্ড, জালপাই গুলোর গায়ে সোনার গুঁড়ো মাখামাখি হয়ে আছে। মুখে দিতে গিয়েও

নামিয়ে রাখে বদর। বলে, অন্য দুখানা রেকাবী নিয়ে এস। আর একটা বাক্স খোল।

সে বাক্সটাও খুলে দেখা গেল সেই একই অবস্থা। তখন বদর হুকুম দেয়, সব বাক্স খুলে সব জলপাই ঢেলে দেখ।

এক এক করে সবগুলো উপুড় করে ঢালা হতে থাকে। সোনার তাল আর সোনার মোহর গুলো দেখে তো সবারই চোখ ছানাবড়া। একি তাজ্জব কান্ড। সব শেষের বাক্সটা যখন উপুড় করা হলো, বদর চিৎকার করে ওঠে, একি ব্যাপার! আমার এই দৈব পাথরখানা এর মধ্যে এল কি করে?

হলুদবর্ণ জলপাইগুলোর মধ্যে লাল রঙের গ্রহরত্নখানা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই পাথরখানাই একটা কারে বাধা ছিল তার কোমরে। বদর নির্ভুলভাবে চিনতে পারে। আর সে ভাবতে পারে না। মাথাটা কেমন ঘুরে ওঠে। হায়াতের কাঁধে মাথা রেখে বদর চোখ বন্ধ করে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়ে মাথা তুলে দাসী বাঁদীদের চলে যেতে ইশারা করে। দৈব পাথরখানা তুলে নিয়ে চুমু খেয়ে হায়াৎকে বলে, জান হায়াৎ, এটা কী

হায়াৎ কিছুই বুঝতে পারে না। বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

বদর বলে, মন্ত্রপূতঃ দৈব পাথর। এই পাথরখানা যেদিন খোয়া যায় সেই দিনই আমার স্বামীকেও হারিয়েছি আমি। আজ আবার ফিরে পেলাম। তুমি দেখে নিও, সে-ও এবার ফিরে আসবে আমার কাছে। আবার আমাদের জীবনে বসন্তের ফুল ফুটবে, হায়াৎ।

জাহাজের কাপ্তেনকে ডেকে পাঠালো বদর। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে এসে কুর্নিশ জানালো, বদর জিজ্ঞেস করে, এই ফলের মালিককে তুমি চেন? সে কোথায় থাকে? কী করে। সে কি এখানকার আদি বাসিন্দা?

কাপ্তেন বলে, তা তো বলতে পারবো না, হুজুর। তবে এটুকু জানি তিনি ওখানকার একটা বাগানের বৃদ্ধমালীর সঙ্গে থাকেন। আমার জাহাজে তাঁর আসার কথা ছিল। কিন্তু সময়মতো তিনি এসে পেঁছতে পারেন নি। আমি জাহাজ ছেড়ে চলে এসেছি।

বদর বললো, বেশির ভাগ জলপাইই বেশ টসটসে পাকা। খেয়ে দেখেছি, ভারি মিষ্টি। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে, আমার বাবুর্চিটা কদিন হলো বেপাত্তা হয়ে গেছে। লোকটা কাজ জানে ভালো, কিন্তু বড্ড কামাই করে। এখন এমন সুন্দর জলপাইগুলো ভালো করে বানানোর মতো লোক নাই। বদমাইশটা ফিরে আসুক, তারপর তাকে এমন শায়েস্তা করবো, বাছাধন জীবনে ভুলতে পারবে না। কিন্তু সে তো পরের কথা, এখন লোক অভাবে এই সুন্দর জলপাইগুলো সব নষ্ট হয়ে যাবে যে। তুমি এক কাজ কর, আজই জাহাজ ছেড়ে চলে যাও। যে-ভাবে পার ফলওয়ালাকে এখানে ধরে নিয়ে এস। যদি আমাকে খুশি করতে পার, অনেক ইনাম পাবে, আর যদি না পার তবে আর কোনও দিন আমার বন্দরে জাহাজ ভেড়াতে পারবে না; এই বলে দিলাম। আর যদি আমার কথা গ্রাহ্য না করে জাহাজ ভেড়াও, তোমার গর্দান যাবে। শুধু তোমার না তোমার জাহাজের সঙ্গী-সাথী সকলের।

দুশো আটাশতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয়ঃ

বদরের এই হুকুম কাপ্তেনকে শিরোধার্য করে নিতে হলো। এ ছাড়া উপায় নাই। সম্রাটের আদেশ অমান্য করলে নির্ঘাৎ প্রাণদণ্ড।

আল্লাহ দোয়ায় হাওয়া অনুকূলে ছিল। জাহাজে পাল তুলে কাপ্তেন আবার সেই ম্লেচ্ছাক্রান্ত শহরটার দিকে যাত্রা করলো। কয়েকদিন পরেই জাহাজ গিয়ে ভিড়লো। কাপ্তেনের আর তর সয় না। প্রায় দৌড়তে দৌড়তে চলে গেল সেই বাগিচায়। বৃদ্ধমালীর বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তে থাকে। চিন্তায় ভাবনায় কামার অল-জামানের চোখের কোণে কালী পড়েছে। নাওয়া খাওয়া প্রায় করে না বললেই চলে। দেহ কৃশ হয়েছে। সারা মুখে বিষাদের ছায়া। ঘরের একপাশে চুপচাপ বসে নিজের নসীবের কথা ভাবছিল সে। কড়া নাড়ার শব্দে, বসে থেকেই সে হাক দেয়, কে?

কাপ্তেনের মনে আশা হয়। বোধ হয় এখনও সে আছে এখানে। ক্ষীণ স্বরে জবাব দেয়, আমি এক দীন ভিখারী, জনাব।

গলার স্বর কেমন যেন চেনা চেনা ঠেকে। কথার টানে মনে হয়, এ যেন তার নিজের দেশের কেউ? জামান উঠে এসে দরজা খোলে। অবাক হয়ে তাকায়।

কাপ্তেন বলে, আমার জাহাজে আপনার যাওয়ার কথা ছিল সেদিন। আমরা অপেক্ষাও করেছিলাম অনেক বেলা অবধি। কিন্তু আপনি আর এলেন না দেখে আমরা জাহাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম, জনাব। আমার কোন অপরাধ নেবেন না।

জামান খুব খুশি হয়, না না, তোমাদের কি দোষ। আমিই সময় মতো পেঁছিতে পারলাম না।

কাপ্তেন বলে, আপনি যেতে পারলেন না, তাই আবার নিতে এসেছি আজ।

জামান বলে, খুব আনন্দ পেলাম। ঠিক আছে চল। হ্যাঁ, আরও কুড়িটা বাক্স জলপাই আছে আমার ঘরে। ও গুলোও নিয়ে যাবো।

কাপ্তেনের ইশারায় খালাসীরা বাক্সগুলো মাথায় তুলে নিল।

জাহাজে বসে কাপ্তেন বললো, এবনি দ্বীপের সম্রাটের রসুইখানার বাবুর্চি ভেগে গেছে। আপনার জলপাইগুলো বানাবার লোক মিলছে না সেখানে। অথচ সম্রাটের ভারি পছন্দ হয়েছে ফলগুলো। ভালো দাম দিয়ে কিনেছে সে সবগুলো। এই নিন, প্রতিটা বাক্সের জন্য এক হাজার দিরহাম দাম দিয়েছে সে। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে। ওখানকার রসুইখানার প্রধান বাবুর্চির কাজ পেয়ে যাবেন আপনি।

এমন একটা সুখবর দিয়ে কাপ্তেন গর্বের সঙ্গে জামানের মুখের দিকে তাকায়। ভাবে, নিশ্চয়ই সে খুশিতে গদগদ হয়ে উঠবে। কিন্তু জামানের কোনও ভাব-বৈলক্ষণ্য না দেখে সে যেন চুপসে যায়। জামান কোনও জবাব দিল না।

একটু পরে জাহাজ ছাড়া হলো। কাপ্তেন আবার তার কাছে এসে বলে, প্রাসাদের রসুইখানার মালিক হবেন আপনি, আপনার তো পোয়া বারো। এতক্ষণ জামান কোনও কথা বলেনি, এবার সে আর থাকতে পারলো

না। —আমি নেবো না ও চাকরী। আর এ সব কথা বলতে তোমার একটুও বাধছে না কাপ্তেন? এখন দরিয়ায় তোমার জাহাজ, আল্লাহর নাম কর।

কাপ্তেন বলে, অনেক আগেই আমি তার দোয়া মেঙেছি, সাহেব। তিনি যেন আমাদের যাত্রা পথ শুভ করেন। আপনার যেন প্রাসাদের রসুইখানার চকরীটা হয়ে যায়।

জামান কোনও জবাব দেয় না। নির্বিকার ভাবে দূরে সমুদ্রের নীল জলরাশির দিকে চেয়ে থাকে। কাপ্তেন আরও কাছে এসে বলে, মনে হচ্ছে, আপনি এই চাকরীটা নিতে খুব ইচ্ছুক না। তবে কি সম্রাটের ধারণা ভুল। আপনি কি রসুইখানার কাজ কাম জানেন না?

জামান বলে, আমি এখন আল্লার পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছি। তোমাদের কোনও কথা আমি শুনবো না। এর বেশি কিছু বলবোও না।

কাপ্তেন বলে, সে আপনার যা অভিরুচি। আমার কর্তব্য সম্রাটের সামনে হাজির করা—তা করতে পারলেই রেহাই পেয়ে যাবো আমি।

এবনি বন্দরের এলাকার মধ্যে জাহাজ ঢুকছে। কাপ্তেন বললো, নিন সাহেব, নিজেকে ঠিক ঠাক করে নিন, এবার আপনাকে সম্রাটের কাছে নিয়ে যাবো। এখুনি জাহাজ বন্দরে ভিড়বে।

জাহাজ ভিড়ার সঙ্গে সঙ্গে জামানকে সঙ্গে নিয়ে সে প্রাসাদে এসে সম্রাট সমীপে হাজির হলো। বদরের মাথায় একটা বদ বুদ্ধি চেগে উঠেছিল। কাপ্তেনের সঙ্গে কামার অল-জামানকে দেখামাত্র বদর-এর চিনতে কোনও অসুবিধা হয় না—এই তার প্রাণেশ্বর। জামানের পরণে ছিল বৃদ্ধমালীর দেওয়া সাধারণ সাজ-পোশাক। তার এই দীন ভিখারীর দশা দেখে বদরের বুক ব্যথায় টন টন করে ওঠে। জামান কিন্তু বদরকে একদম চিনতে পারে না। এই তার প্রাণ প্রতিমা—এরই জন্যে সে দিন রজনী চোখের জল ফেলছে।

নিমেষে নিজেকে সহজ করে নিতে পারে বদর। কাপ্তেনকে বলে, ওকে ফলের দাম বুঝিয়ে দিয়েছ?

—জী হুজুর। জাহাজে আরও কুড়িটা জালপাইএর বাক্স আনা হয়েছে।

বদর বলে, ঠিক আছে, ওগুলো প্রাসাদে নিয়ে এস। একহাজার সোনার দিনার দাম পাবে।

কাপ্তেন কুর্নিশ করে চলে যায়।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দুশো তিরিশতম রজনী:

আবার সে শুরু করে।

জামান মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। বদর তার একজন কর্মচারীকে বললো, একে হামামে নিয়ে যাও। ভালো করে গোসল করাও। কাল সকালে আমার সামনে হাজির করবে।

বদর হায়াতের কাছে গিয়ে বলে, এই—সে এসেছে। আমি কিন্তু তার কাছে পরিচয় দিচ্ছি না কিছুতেই।

হায়াৎ খুশিতে উপচে পড়ে। বদরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। সে রাত্রে তারা দুজন আর জড়াজড়ি করে শোয় না। সহজভাবে পাশাপাশি শুয়ে সুখস্বপ্ন দেখে দেখে রাত কাটায়।

পরদিন সকালে দামী সাজপোশাক পরে কামার অল-জামান দরবারে এসে হাজির হয়। চোখে মুখে ফোটা ফুলের প্রসন্নতা। বদর উজিরকে বলে, এই যুবকের জন্য একখানা বড় ইমারৎ, একশোটা নফর চাকর এবং উজিরের যোগ্য মাসোহারার বন্দোবস্ত করে দিন। আজ থেকে সে হবে আমার দরবারের আর একজন উজির। তার জন্যে দামী দামী ঘোড়া, খচ্চর উট প্রভৃতি যা যা দরকার সব ব্যবস্থা করে দিন।

এই কথা বলে সেদিনের মতো দরবার ছেড়ে চলে গেল বদর। পরদিন যথা সময়ে আবার সে কামার অল-জামানের ছদ্মবেশে দরবারে আসে। জামানকে কাছে ডাকে। সিংহাসনের পাশে যেখানে রাজকুমারদের বসার আসন সেখানে তাকে বসায়। জামান অবাক হয়ে ভাবে, হঠাৎ তাকে সম্রাট এত সম্মান দেখাচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই এর পিছনে কোনও মতলব আছে। কিন্তু বুঝে উঠতে পারে না—কী সে মৎলব? কাপ্তেনের কথাবার্তা শুনে তো এরকম কিছু মনে হয়নি! মনে হচ্ছে, এর পিছনে গূঢ় কোনও রহস্য আছে। খোদা ভরসা, কারণটা আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে। ভাবতে ভাবতে কারণও একটা খুঁজে পায়। সম্রাট বয়সে নেহাৎই কাঁচ। একেবারে তরুণ বলা যায়। এই বয়সে সুঠাম সুন্দর যুবকদের সাহচর্য খুব ভালো লাগে। তাই কি সে আমাকে তার পাশে পাশে রাখতে চায়? ওর কি ধারণা হয়েছে কাঁচ বয়সের লালটুস ছেলে দেখলেই আমার জিভে জল ঝরবে? আর এই জন্যেই কি সে আমাকে হুট করে এমন উঁচু আসনে বসালো? তা যদি ভেবে থাকে সে, খুব ভুল। ওসব বিকৃতির মধ্যে আমি নাই। আমাকে কলের পুতুল বানিয়ে যা খুশি করাবে সে-টি হচ্ছে না। ওর মতলবটা কি, আগে আমাকে জানতে হবে। তারপর যদি বুঝি ব্যাপারটা গোলমেলে, আমি কিন্তু ঐসব ধন-দৌলত ইনাম সম্মানের পরোয়া করি না। লাথি মেরে সব ফেলে রেখে আবার আমার সেই বাগানে ফিরে যাবো।

জামান বদরকে উদ্দেশ করে বলে, জাঁহাপনা, অনেক দামী দামী জিনিসপত্রে আমার বাড়ি ভরে দিয়েছেন। ধন-দৌলত এবং প্রয়োজনের সামগ্রী এত দিয়েছেন, অত আমার কোনও কাজে আসবে না। আর তাছাড়া আপনার দরবারে আমাকে যে আসনে বসিয়েছেন তাতে আমি অত্যন্ত কুণ্ঠা বোধ করছি। কারণ এ আসনে কেবলমাত্র আপনার একান্ত বিশ্বাসভাজন প্রাজ্ঞ, প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরাই বসতে পারেন। বয়সে আমি নিতান্তই যুবক। সাদা দাড়ি গোঁফওয়ালা জ্ঞানী-গুণী উজিরের যোগ্যতা আমি পাবো কোথায়? এসব জেনে শুনেই আপনি আমাকে এই আসনে বসিয়েছেন। এর পিছনে যদি অন্য কোনও উদ্দেশ্য আপনার না থাকে তাহলে তো ব্যাপারটা আরও তলিয়ে ভেবে দেখতে হয়।

বদর মৃদু মুচকী হাসে। বিলোল কটাক্ষ হেনে জামানের দিকে তাকায়। বলে, শোন, প্রিয়দর্শন উজির, তুমি যা বললে তা খুব সত্যি, এর পিছনে কারণ একটা অবশ্যই আছে। তোমার রূপের আগুনের ঝলকানীতে

আমার হৃদয় দগ্ধ হয়েছে? তোমার লাল টুকটুকে গাল দুটো দেখে, বলতে লজ্জা নাই, আমি মুগ্ধ হয়ে পড়েছি।

জামান বলে, আল্লা আপনাকে শতায়ু করুন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আপনি এই সিংহাসনে আসীন থাকুন। কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিন সম্রাট, আমার একটি বিবি আছে। তাঁকে আমি প্রাণাধিক ভালোবাসি। আজ আমি ভাগ্য বিড়ম্বিত। তার সঙ্গে অমার আপত-বিচ্ছেদ ঘটেছে। কিন্তু প্রতিটি দিন রজনীর প্রতিটি মুহূর্ত তার বিরহেই আমি আকুল। অধীর প্রতীক্ষায় দিন গুণছি। আবার কবে তার সঙ্গে দেখা হবে—তাকে আমার বুকে পাবো। আপনার এই হতভাগ্য দাসানুদাসকে অব্যাহতি দিন। আমি আবার সাগর পেরিয়ে সেই শহরেই চলে যেতে চাই। আপনি আমার ভোগ বিলাসের জন্য যে-সব বিধিব্যবস্থা করেছিলেন, তার জন্যে আমি ধন্য। যাবার আগে আপনার যাবতীয় দান সামগ্রী আপনাকে আমি ফিরিয়ে দিয়ে যাবো, সম্রাট।

বদর জামানের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়। অধীর হয়ো না, উজির, শান্ত হয়ো বসো। যাবার কথা মুখে আনতে নাই। বরং এখানেই থাক। তুমি তো বুঝতে পারছো, তোমার ঐ সুন্দর চোখের তারায় যে নিরুত্তাপ আগুন তার দহনে দগ্ধ হচ্ছে একটি অশান্ত হৃদয়। তাই বলছি, তার পাশে বসেই না হয় কিছু সময় তোমার কাটলো। তোমার এই বাহুলতা যদি তাকে দু দন্ডের শান্তি দিতে পারে, দেবে না তুমি?

বদরের এবম্বিধ প্রেমালাপ শুনে জামানের গা রি রি করে ওঠে। মহানুভব সম্রাট, আমি আপনার দাস, আপনার মুখে এসব কথা শোনাও আমার পাপ। আপনি আমাকে মাফ করবেন, আমার দ্বারা এসব কাজ হবে না।

জামানের কথা শুনে বদর হাসে, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, এতে ঘাবড়াবার কি আছে। তোমার মতো এমন খুব সুরৎ নওজোয়ান ভয় পাচ্ছো কেন? আচ্ছা শোন, তুমি কি এখনও নবালক? যদি নাবালকই হও, তোমার নিজের কোনও দায়-য়ায়িত্ব থাকছে না। আর যদি শক্ত সমর্থ সাবালক হও (আমার ধারণা তুমি তাই) তাহলে পিছপা হচ্ছ কেন? তোমার ইচ্ছে মতো তুমি যা খুশি করতে পার। একটা কথা তো মান, কপালে যা লেখা থাকে না তার কিছুই ঘটতে পারে না জীবনে। পিছাতে হলে বরং আমারই পিছনো উচিৎ। কারণ আমি তোমার থেকে অনেক ছোট।

কামার অল-জামানের মুখ কালো হয়ে ওঠে। মিনতি করে বলে, আপনি মহামান্য সম্রাট। আপনার হারেমে অনেক সুন্দরী মেয়েছেলে আছে। কুমারী দাসী বাঁদীর অভাব নাই। তাদের সকলকে ছেড়ে আমার দিকেই আপনার নজর পড়লো কেন? আপনি তো জানেন, প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য যেকোন মেয়েকে যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে গ্রহণ করা আইন সম্মত। তাকে নিয়ে আপনি নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারেন। অজানা কৌতূহল মেটাতে পারেন। তাতে কোনও দোষ হয় না।

বদর মুচকী হেসে চোখ মারলো। —তুমি যা ভাবছো, তার কোনওটাই ঠিক নয় গো প্রিয়দর্শন, কোনওটা ঠিক নয়। ভিন্ন ভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন রুচির। রুচির সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তি-ও পালটায়। যখন মানুষের

অনুভূতি সূক্ষ্মতর হয় তখন রসবোধেরও অনেক তারতম্য ঘটে। সে ক্ষেত্রে কি উপায় ?

কামার অল-জামান ভাবলো, সম্রাটের মতি গতি খারাপ। এখন তাকে কিছু বোঝাতে যাওয়া নিরর্থক। অবশ্য তার কথায় সে যে কিছুমাত্র বিচলিত হয়নি—তাও বলা ঠিক না। নতুন কোনও বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করুক—কে না চায় !

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দুশো চৌত্রিশতম রজনীর মধ্যভাগে আবার সে শুরু করে :

সুতরাং জামান বলে, মহামতি সম্রাট, আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি হতে পারি একটা শর্তে। আপনি আমাকে কথা দিন, আমাকে নিয়ে আপনি যে খেলাই খেলতে চান আমার কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু শুধু একটি বারের জন্য। দ্বিতীয়বার আমি আপনার প্রবৃত্তি মেটাতে পারবো না।

বদর স্মিত হেসে বলে, কথা দিলাম।

জামান বলে, আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের আলোর পথ দেখান।

হারেমের নিরালা নিভৃত কক্ষ। জামানকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে বদর। এক ঝটকায় মখমলের শয্যায় ফেলে দেয় জামানকে। বদরের এই অতর্কিত আক্রমণে হকচকিয়ে যায় জামান। নিজেকে রক্ষা করার জন্য বাধা দিতে গিয়ে কি মনে হতেই হাত সরিয়ে নেয়, নাঃ, ঠিক আছে, কথা যখন দিয়েছি, বাধা দেব না। খোদা ভরসা, যা হয় হবে। তাঁর ইচ্ছাতেই এ-সব হচ্ছে। তিনিই করাচ্ছেন।

গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বদর জামানকে চুমায় চুমায় ভরে দিতে থাকে। এতক্ষণে জামানের সন্দেহ হয়, সম্রাট-এর শরীরে খুঁৎ আছে। যতই সে তাকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে ততই তার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হতে থাকে। নাঃ, এতো কোনও পুরুষের দেহ নয়। বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে জামান। তখন বদর উত্তেজনায় উন্মত্ত। —সোনা, আমাকে তুমি এখনও চিনতে পারছো না ? আমি যে তোমার বদর। আমাদের সেই শাদীর রাত তারও আগে আর একটি রাতের স্মৃতি কি তোমার মন থেকে মুছে গেছে ?

বদর এবার তার ছদ্মবেশের সকল সাজ খুলে ফেলতে থাকে।

কামার অল-জামান দেখলো, ছদ্মবেশের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল সম্রাট ঘায়ুরের কন্যা বদর। তার নয়নের মণি, বুকের কলিজা।

বহুদিন বাদে আবার তাদের এই মিলনে আনন্দের বন্যা বয়ে যেতে থাকলো। বদর তার কাহিনী বললো জামানকে। জামান শোনালো, তার দুঃখের কিস্‌সা।

জামান বললো, কিন্তু আজ যা করলে তার কিন্তু জবাব নাই বদর।

দেহমন একাকার করে আনন্দে বিভোর হয়ে সারাটা রাত সুখ শয্যায় কাটিয়ে দিল ওরা।

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে বদর এল আরমানুসের কাছে। অকপটে সমস্ত কাহিনী সবিস্তারে বললো তাকে। আর এও বললো, আপনার কন্যা হায়াৎ এখনও কুমারী। কামার অল-জামানকে আপনি জামাই করতে চেয়েছিলেন। সেই জামান আপনার প্রাসাদেই অপেক্ষা করছে। আপনি ইচ্ছা করলে তার সঙ্গে হায়াতের শাদীর ব্যবস্থা করতে পারেন।

—কিন্তু মা, তুমি, আরমানুস আকুলভাবে প্রশ্ন করে, তোমার কোনও অমত নাই।

—আমার মত আছে বলেই বলছি। হায়াৎকে আমি ছোট বোনের মতো, বন্ধুর মতো ভালোবেসে ফেলেছি। ওকে ছাড়া আমি আর বাঁচতে পারবো না। জামানের সঙ্গে তার শাদী হলে আমরা দুই বোন সব সময় এক সঙ্গেই থাকতে পারবো। এতে আমার চেয়ে আর কেউই বেশি খুশি হবে না।

এই সময় কামার অল-জামানকে নিয়ে হায়াৎ এল সেখানে। আরমানুস বললেন, বাবা, জামান, তুমি আমার মেয়েটিকে গ্রহণ করে আমার এই সাম্রাজ্যের অধিকারী হও। সে তোমার দ্বিতীয়া বেগম হয়েই সুখে থাক।

জামান বললো, আপনার ইচ্ছা আমি অপূর্ণ রাখবো না, সম্রাট। তাছাড়া আমার বদরও যখন চায়, আমার কোনও অমত থাকতে পারে না।

এই বলে সে বদরের দিকে তাকায়। বদর বলে, আমি এতকাল এখানে পড়ে আছি শুধু এই জন্যই। তুমি আসবে, তোমার সঙ্গে হায়াতের শাদী হবে। সে হবে তোমার খাস বেগম। আমি দ্বিতীয়া—তার সেবা দাসী।

আরমানুসের দিকে ফিরে কামার অল-জামান বলে, আপনি তো নিজের কানেই শুনলেন, বদর বলছে, আপনার মেয়েই হবে প্রধান বেগম সে হবে তার বাঁদী।

বৃদ্ধ সম্রাট আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। অনেকদিন পরে আবার একবার তিনি সিংহাসনে গিয়ে বসলেন। উজির আমীর ওমরাহদের উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন, কামার অল-জামান আর বদরের বিচিত্র কাহিনী।

দরবারে উপস্থিত সকলে সেই পরমাশ্চর্য কাহিনী শুনে তাজ্জব হয়ে গেল। সম্রাট ঘোষণা করলেন, আমার একমাত্র কন্যা হায়াৎ অল-নাফুস-এর পাণি গ্রহণ করবে শাহজাদা কামার অল-জামান। এবং আজ থেকে জামান এই এবনী দ্বীপের অধিপতি হচ্ছে।

সম্রাট আরমানুসের ঘোষণা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলে আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানালো। এবং সমস্বরে শপথ উচ্চারণ করলো, আজ থেকে কামার অল-জামান আমাদের সম্রাট—আমরা তাঁর একান্ত অনুগত ভৃত্য। তাঁর আজ্ঞাবহ দাস।

সম্রাট আরমানুস সন্তুষ্ট হয়ে সবাইকে আসন গ্রহণ করতে বললেন। তার নির্দেশে শহরের প্রধান কাজী এসে শাদীনামা তৈরি করলেন। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর করলেন সেই শাদীনামায়। এ সবই কামার অল-জামান এবং হায়াৎ অল-নাফুসের সম্মতিক্রমে তাদের সমক্ষেই সমাধা

করা হলো।

সম্রাট আরমানুসের আদেশে দরবার দপ্তর সব বন্ধ রাখা হল। আজ কোনও কাজ নয়। শুধু আমোদ-আহ্লাদের দিন। খানা-পিনা নাচ-গান বাজনায় মুখর হয়ে উঠলো সারা এবনী দ্বীপ। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের আজ অবাধ নিমন্ত্রণ। হাজার হাজার জন্তু-জানোয়ার জবাই করা হলো। দেশের যত মানুষ আছে, সকলকে আজ পেটপুরে খাওয়াতে হবে। এই-ই সম্রাটের হুকুম। গরীবজনে অর্থ পোশাক বিতরণ করা হতে লাগলো। সেনাবাহিনীর মধ্যেও নানা উপহার উপঢৌকন এবং নগদ অর্থ বন্টন করা হলো।

আপামর জনসাধারণ ধন্য ধন্য করতে লাগলো। নতুন সম্রাটের শতায়ু কামনা করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকলো।

কামার অল-জামান দুই বেগম নিয়ে সুখে-সচ্ছন্দে ঘর করতে লাগলো। তার ন্যায় বিচার এবং অনুশাসনে প্রজারা মহা খুশি হলো।

কামার অল-জামান তার বাবা শাহরিমানের কাছে দূত পাঠিয়ে জানালো, এবনি দ্বীপের সুলতান হয়ে সে বেশ বহাল তবিয়তেই আছে। খুব শিগিগরই সে তাকে দেখতে যাবে। তার আগে সে একবার যুদ্ধ যাত্রা করবে। এখানকার সমুদ্রতীরের এক শহর পশ্চিমী বর্বর ম্লেচ্ছরা আক্রমণ করে তছনছ করে দিয়েছে। তাদের সে শায়েস্তা করতে যাবে।

বছর খানেক বাদে বদর এবং হায়াৎ একটি করে পুত্র লাভ করলো। দুটি শিশুই দেখতে হলো চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর। একই সঙ্গে হেসে খেলে তারা মানুষ হতে থাকলো। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাদের আর কেউ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেনি।

এই হলো কামার অল-জামান আর বদরের কাহিনী।

শাহরাজাদ স্মিত হেসে চুপ করলো।

কাহিনী শুনতে শুনতে দুনিয়াজাদের ধবধবে সাদা চাঁদের মতো মুখে আবীরের ছোঁয়া লেগেছে। চোখে মুখে খুশির বন্যা।

শাহরাজাদ একটানা বলতে বলতে কিছুটা বা ক্লান্ত। এক গেলাস শরবৎ খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিল। দুনিয়াজাদ লজ্জা জড়ানো কণ্ঠে বলে, দিদি, কি গল্পই তুমি শোনালে। সারা শরীর-এ আমার তুফান লেগে গিয়েছিল। এ সব গল্প শুনলে কি নিজেকে ঠিক রাখা যায়, বল? দিদি, এবার তুমি আলা অল-দিন এর কাহিনীটা শোনাও!

শাহরাজাদ বললো, কিন্তু আলা অল-দিন তো একটা ছেলে!

শাহরাজাদের কাহিনী তন্ময় হয়ে শুনেছে সুলতান শাহরিয়ার। শুনতে শুনতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে—কামার অল-জামানের সুখ-দুঃখের সায়রে। শাহরিয়ার বললো, সত্যিই শাহরাজাদ, তোমার কিস্‌সা বলার কায়দা বড় অসাধারণ। বড় ভালো লেগেছে। আর একটা এই রকম গল্প শোনাও।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ বলে আজ আর সময় নাই, জাঁহাপনা, এবার বিশ্রাম করুন, কাল রাতে আবার নতুন কিস্‌সা শুরু করবো।

❖ ❖ ❖ ❖

দুশো সাঁইত্রিশতম রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে আবার সে শুরু করে:

কোনও এক সময়ে কুফা শহরে এক সওদাগর বাস করতো। তার নাম বাহার। যথাকালে শাদী করার এক সাল বাদে তার একটি পুত্র সন্তান হয়। আদর করে ছেলের সে নাম রাখলো, খুশ বাহার।

ছেলের জন্মের সাতদিন পরে বাহার বাঁদী বাজারে গেল। উদ্দেশ্য—একটি কাজ-কাম করার জন্য বাঁদী কেনা। বিবির সদ্য বাচ্চা হয়েছে, তার সেবা যত্ন তথা ঘরের কাজ-কাম করানোর জন্য একটা লোক না হলে চলছে না। বাজারে ঢুকে সে পছন্দসই মেয়েছেলে খুঁজতে থাকে। নানা জাতের নানা বয়সের হরেক কিসিমের ছেলে-মেয়ে আনা হয় বিক্রী করতে। বাহার ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে। দেখতে দেখতে একটা আধাবয়েসী মোটামুটি সুশ্রী মেয়েকে দেখে তার পছন্দ হয়। মেয়েটির পিঠে বাঁধা ছিল একটা ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চা মেয়ে। ওয়াদা হলো—যে তাকে কিনতে চাইবে ঐ বাচ্চা সুদ্ধই কিনতে হবে। দালালকে দাম জিজ্ঞেস করে বাহার। দালাল বলে, দরাদরি নাই, বাচ্চা আর মেয়েটার জন্য পঞ্চাশ দিনার লাগবে।

বাহার বলে, ঠিক আছে, চুক্তিনামা তৈরি কর।

চুক্তিতে সই করে পঞ্চাশ দিনার দিয়ে মেয়ে আর মেয়ের মাকে ঘরে নিয়ে আসে সওদাগর।

বিবি দেখে খুশি হলো, কিন্তু কুণ্ঠিতভাবে বললো, কী দরকার ছিল অতগুলো পয়সা খরচ করার। আমি তো আর রুগী হয়ে পড়িনি। আস্তে আস্তে আমিই সব কাজ চালিয়ে নিতে পারতাম। শুধু শুধু ফালতু একটা খরচের ফেরে পড়ার কী দরকার ছিল।

সওদাগর বলে, আসল কথা কি জান, বিবিজান, ঐ বাচ্চা মেয়েটাকে দেখে বড় মায়া হলো। দেখ না, কী সুন্দর সুরৎ। ওর ওই টলটলে মুখ, ড্যাবড্যাবে চোখ দুটো দেখে আমি আর ঠিক থাকতে পারলাম না। বড় হলে কী অপূর্ব সুন্দরী হবে ভাবো। আমার খুশ বাহারের সঙ্গে মানাবে কেমন বল? ওরা দুটিতে একসঙ্গে হেসে খেলে মানুষ হবে। তারপর সময়কালে ওদের শাদী দিয়ে দেব। ভালো হবে না?

—সে তো খুবই ভালো হবে। কিন্তু ভালো করে মানুষ করতে পারলে তবে তো!

বাহার বলে, সে আমার কোনও কষ্ট হবে না। ওজন্যে তুমি ভেবো না বিবিজান। বড় হলে মেয়েটা তামাম আরব পারস্য তুরস্কের মধ্যে সেরা হবে, তুমি দেখে নিও।

সওদাগর বিবি জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ গা বাছা, তোমার নাম কী?

মেয়েটি নম্র কণ্ঠে জবাব দেয়, আমার নাম হাফিজা।

—বাঃ, বেশ নাম তো। তা তোমার মেয়েটার কী নাম?

মেয়েটি জবাব দেয়, নসীবা।

—চমৎকার। তোমার নাম হাফিজা আর তোমার মেয়ের নাম নসীবা!

তোমরা আমার ঘরে এলে—আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার ঘরে মঙ্গলবাতি জ্বলতে থাকবে। আমাদের নসীব ফিরে যাবে—এই কামনা করি।

তারপর স্বামীর দিকে ফিরে বললো, কিন্তু ঘরে নতুন কোনও দাসী বাঁদী কিনে আনলে নামকরণ করতে হয়। আর সে নামকরণ ঘরের মালিকই করে। তাই ওদের পুরনো নামে তো চলবে না, নতুন নামকরণ কর তুমি।

সওদাগর বলে, না, তুমি ঘরের মালকিন, তুমিই নামকরণ কর।

—আমাকে যদি বল আমি বাচ্চাটার নাম রাখবো, খুশ নাহার।

সওদাগর বলে, বাঃ চমৎকার, খুশ বাহার আর খুশ নাহার বেড়ে মিলিয়েছ তো।

খুশ বাহার আর খুশ নাহার একসঙ্গে মানুষ হতে থাকে। দিনে দিনে তারা বড় হয়। ঠিক যেন দুটি ফুটন্ত গুলাব। নাওয়া খাওয়া বেড়ান, খেলা-ধুলা সব সময়েই তারা এক আত্মা। লোকে দেখে বাহবা দেয়, কি সুন্দর দুই ভাই-বোন। খুশ বাহারও জানে খুশ নাহার তার বোন। ওদের মা বাবা কখনও দুটিকে আলাদা চোখে দেখে না।

খুশ বাহারের বয়স যখন পাঁচ, তার বাবা খুব ঘটা করে তার ছুন্নৎ করে দিল। এই উৎসবে আত্মীয় বন্ধু পাড়াপড়শীদের পেট পুরে ফলার খাওয়ালো সে। সবাই সবুজ পতাকা হাতে কুফা শহরের পথে পথে পরিক্রমা করতে করতে সওদাগর সন্তানের শতায়ু কামনা করলো। একটা সুসজ্জিত খচ্চরের পিঠে বাদশাহী সাজে সাজানো হয়েছিল। আর একটা খচ্চরে চেপে খুশ নাহার যাচ্ছিল তার পাশে পাশে। হাতে তার পাখা। খুশ বাহারকে সে হাওয়া করতে করতে চলছিল। মেয়েদের উলুধ্বনি আর ছেলেদের আনন্দ উল্লাসে সেদিন সারা শহর উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল। রাস্তার দুধারে শতশত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল এই ছুন্নৎ মিছিল দেখার জন্য। সেদিন গর্বে বুক ফুলে উঠেছিল সওদাগরের।

পথ পরিক্রমা শেষ করে আবার মিছিল ফিরে আসে সওদাগরের বাড়ির ফটকে। এবার যে যার মতো ঘরে ফিরে যায়। যাবার আগে সবাই কামনা করে সওদাগর সন্তানের সুখের জীবন।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দুশো আটত্রিশতম রাত্রে আবার শুরু করে :

খুশ বাহারের বয়স যখন বার, তার বাবা একদিন বললো, বেটা, এবার তুমি বড় হয়েছ, এখন থেকে তুমি আর খুশ নাহারকে বোনের মতো দেখবে না। সে তোমার সহোদরা বোন নয়। আমাদের বাঁদী হাফিজার মেয়ে সে। কিন্তু বাঁদীর মেয়ে বলে তাকে তোমার চেয়ে কম আদরে মানুষ করা হয়নি। তার এখন দেহে যৌবন আসছে। আমরা ঠিক করেছি, তোমার বয়স কালে তার সঙ্গে তোমার শাদী দেব। তাই এখন থেকে তার সঙ্গে সহজভাবে মেলা-মেশা বন্ধ রাখতে হবে। খুশ নাহার বোরখা পরে পর্দানসিন হয়ে থাকবে।

সে রাতেই খুশ বাহার খুশ নাহারের সঙ্গে সহবাস করলো। এইভাবে আরও পাঁচটা বছর কেটে যায়। দিনে দিনে খুশ নাহারের দেহে যৌবনের

ঢল নামে। সে-সময়ে কুফা শহরে তার মতো সুন্দরী মেয়ে আর একটাও ছিল না। শুধু রূপসীই না, তার মতো নম্র বিনয়ী শিক্ষিতা মেয়ে খুব কমই দেখা যেত। অবসর সময়ে সে কোরান, সাহিত্য এবং নানা প্রকার বিজ্ঞান দর্শন পড়ে দিন কাটাতো। এছাড়া তার ছিল গানের সাধনা। খুশ নাহারের মধুর সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হোত সকলে।

খুশ বাহার আর খুশ নাহার প্রতিদিন বাগিচায় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত। সেই নিরালা কুঞ্জবনে প্রাণ খুলে তারা মনের কথা বলতো। কখনও বা পুকুরের সান বাঁধানো সিঁড়ির ধাপে বসে তারা জল নিয়ে খেলা করতো। খিদে পেলে, সঙ্গে আনা তরমুজ, ভুট্টার খই, বাদাম পেস্তা খেত। বাগিচার গুলাব যুঁইএর গন্ধে দুটি তরুণ হৃদয় মাতোয়ারা হয়ে উঠতো। বসন্তের ছোঁয়া লাগতো প্রাণে। অনর্গল আবৃত্তি করে কবির ভাষায় নিজেদের মনের ভাব ব্যক্ত করতো তারা। কখনও খুশ বাহার আব্দার ধরতো, এবার তোমার বেহালা শুনবো, সোনা।

এইভাবে তাদের প্রথম যৌবন-বসন্তের সুমধুর দিনগুলো প্রকৃতির শোভা দেখে তার গান গেয়ে গেয়ে কেটে যেতে থাকে।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ বেশি দিন কারো সয় না। আল্লাহ কারো ভাগ্যে বুঝি চিরকালের জন্য সুখ-ভোগ লিখে দেন না। তাই খুশ বাহার আর খুশ নাহারের সুখের দিনও একদিন শেষ হয়ে যায়।

কুফার সুবাদার খুশ নাহারের রূপ আর গুণের কথা শুনে মনে মনে ঠিক করলো, এই পরমাসুন্দরী গুণবতী মেয়েটাকে যদি সে ভাগিয়ে এনে খলিফা আবদ-অল মালিক ইবন মারবানকে ভেট দিতে পারে তাহলে তার আখেরে অনেক উন্নতি হবে। একদিন সে এক বুড়িকে পাঠালো খুশ নাহারের কাছে। এই শয়তানী বুড়িটা মেয়ে পটানোর কাজে ওস্তাদ। সুবাদার বললো, দেখ বুড়ি, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

—বলুন, হুজুর, কী-এমন কঠিন কাজ। জিন্দগীভর অনেক কঠিন কাজইতো দেখলাম। সবই আমার কাছে অতি সাধারণ মনে হয়েছে।

সুবাদার বলে, কিন্তু এবারের কাজটা অত সহজ নাও হতে পারে। সওদাগর বাহার-কে জান?

খুব জানি, হুজুর।

—তার বাঁদী হাফিজার একটা পরমা সুন্দরী লেড়কী আছে—খুশ নাহার।

বুড়ি ঘাড় নাড়ে, তাও জানি হুজুর। কী আমার জানা নাই, তামাম কুফা শহরটা আমার নখ দর্পণে। কার ঘরে কি জিনিস আছে তা কি আমার জানতে বাকী আছে। খুশ নাহার যে খালি দেখতেই সুন্দরী তাই না, তার মতো নাচ গান লেখা পড়া জানা মেয়ে সারা তল্লাটে কোথাও খুঁজে পাবেন না, হুজুর।

সুবাদার বলে, বাঃ, তুমি তো সবই জান দেখছি। ঠিক আছে এখন তোমার কাজ হলো, যেন তেন প্রকারে ঐ মেয়েটাকে আমার কাছে হাজির করতে হবে। আমি খলিফাকে ভেট দেব।

বুড়ি বলে, আর বলতে হবে না, হুজুর। আমি সব বুঝতে পেরেছি।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কাজ আমি হাসিল করে দেবই।

পরদিন সকালে শয়তানীটা কিম্ভূতকিমাকার বেশে সাজলো। গায়ে চাপালো একটা মোটা পশমের আলখাল্লা। গলায় পরলো একটা অজানুলম্বিত হাড়ের মালা। হাতে নিল ইয়া বড় একখানা চিমটি। তারপর রওনা হলো সওদাগর বাহারের বাড়ির পথে।

বাড়ির কাছাকাছি পেঁীছে সে পাড়া কাঁপিয়ে আওয়াজ তুললো, খোদা হাফেজ। আল্লাহ মেহেরবান। আল্লাহ ছাড়া কোনও গতি নাই।' এই রকম নানা ধ্বনি তুলতে তুলতে সে এগোতে থাকে। রাস্তার দুপাশে লোকজন জড়ো হতে লাগলো। সবারই কৌতূহল, হয়তো কোন পীর পয়গম্বর এসেছে, বাড়ির দরজা খুলে সবাই বেরিয়ে এল। এইভাবে সে সওদাগরের বাড়ির দরজার সামনে এসে থামে। মুখে তখনও বলে চলেছে, খোদা হাফেজ, খোদা মেহেরবান।

সওদাগরের ছেলে খুশ বাহার বেরিয়ে এসে দেখলো, এক ধর্মাত্মা বৃদ্ধা তার দরজায় দাঁড়িয়ে পড়েছে।

—আপনি কী চান বুড়ি মা?

বৃদ্ধা বলে, বাবা, নামাজের সময় বয়ে যাচ্ছে। আমি তোমার বাড়িতে আমার সকালবেলার নামাজটা সেরে নিতে চাই।

—এতো খুবই আনন্দের কথা বুড়িমা? আসুন ভিতরে আসুন। হাত-মুখ ধুয়ে রুজু করে নিন। আমি আপনার নামাজের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বুড়িটাকে সঙ্গে করে খুশ বাহার বাড়ির অন্দরে নিয়ে আসে। খুশ নাহারের ঘরে এনে বসায়। বুড়ি খুশ নাহারকে দেখে হাসে—আশীর্বাদের ঢংএ হাত তুলে বলে, খোদা তোমার ভালো করবেন, বেটি।

খুশ নাহার বুড়িকে দেখে শ্রদ্ধাবনতা হয়ে বলে, আপনি একটু জিরিয়ে নিন বুড়ি মা। আমি আপনার শোবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

—না মা, থাক। এখন নামাজের সময়, আগে নামাজ সারতে দাও আমাকে।

আর কথাটি না বলে—শয়তানীটা মক্কার দিকে মুখ করে হাঁটু গেড়ে বসে ঢিব ঢিব করে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগলো।

নামাজের ভণ্ডামী শেষ হলো। বুড়ি যাবার নাম করে না। খুশ বাহার এবং খুশ নাহার ধর্মাত্মা বৃদ্ধার অবস্থানে খুশিই হয়। খুশ নাহার বলে, বুড়ি মা, আপনি আজকের দিনটা এখানেই বিশ্রাম করুন।

বুড়িটা বলে, মা, বিশ্রাম কাকে বলে আমি জানি না। সংসারের দুঃখ তাপে যারা কাতর তারাই বিশ্রাম চায়। কিন্তু আমি তাঁর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছি। ক্লান্তি আমাকে ছুঁতে পারে না। একবার যে আল্লাহর পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে সে বেহেস্তের আনন্দ পায়।

বৃদ্ধার মুখে ধর্মকথা শুনে নাহার মুগ্ধ হয়।—আমাদের ইচ্ছা আজ রাতে আপনি আমাদের সঙ্গে একটু কিছু খানা পিনা করুন।

—কিন্তু মা, তা তো হবে না। আমি তো এখন রোজা করছি। রোজা করলে আত্মার শুদ্ধি হয়। তুমি তোমার স্বামীকে নিয়ে খানা পিনা কর, আমি দেখেই আনন্দ পাবো।

খুশ নাহার তার স্বামী খুশ বাহারের কাছে গিয়ে বললো, দেখ, মনে হচ্ছে, আমাদের ঘরে আল্লার পয়গম্বর এসেছেন। তুমি তাঁকে আদর যত্ন করে এখানেই রেখে দাও। আমাদের মঙ্গল হবে।

খুশ বাহার বললো, সে কথা আমি আগেই ভেবেছি নাহার। তার জন্যে —ঐ পাশের ঘরটায় সব বন্দোবস্ত করে রেখেছি। তার থাকা খাওয়া, নামাজের যাতে কোনও রকম অসুবিধে না হয় তার সব ব্যবস্থাই আমি করেছি। সে-ঘরে কেউ তাকে বিরক্ত করতে পারবে না—সে দিকে আমি নজর রাখবো।

সারারাত ধরে বুড়িটা নামাজের ভণ্ডামী করে আর তারস্বরে কোরান পড়ে কাটালো। খুব সকালে হাতমুখ ধুয়ে খুশ বাহারকে সে বললো, এবার তা হলে চলি, বাবা। আল্লাহ তোমাদের ভালো করবেন।

খুশ নাহার বললো, কিন্তু বুড়ি মা, আপনি এই ভাবে আমাদের ফেলে চলে যাবেন? আমরা চেয়েছিলাম, আমাদের এই গরীব খানাতেই বরাবরের জন্য থাকুন। আপনাকে পেয়ে আমরা বড় খুশি হয়েছি। সেই জন্যে আমাদের সব চাইতে ভালো ঘরখানা আপনার থাকার উপযোগী করে সাজিয়ে গুজিয়ে দিয়েছি। আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করুন বুড়ি মা। আপনি এখানেই থাকুন।

—আল্লাহর দোয়া সব সময়েই তোমরা পাবে বাছা। আদৎ মুসলমানের প্রকৃত গুণের অধিকারী হয়েছ তোমরা। দয়া ধর্মই তোমাদের অন্তর জুড়ে আছে, আমি তা বুঝতে পেরেছি। সেই জন্যেই আমি তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম। এর পরে যখন আসবো, তোমাদের আশ্রয়েই উঠবো। কিন্তু এখন আমাকে যেতে হবে। কুফার ধর্মস্থান গুলো ঘুরে ঘুরে দেখবো। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো বাছা। আমি সদাই তোমাদের ভালোর জন্যে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাবো। সব দরগা মসজিদগুলো দেখা শেষ হলে আবার আমি তোমাদের আশ্রয়েই ফিরে আসবো। কিন্তু এখন আমাকে যেতে দাও, বাছা।

হায় রে বোকা মেয়ে খুশ নাহার, তুমি চিনতে পারলে না এই শয়তানীকে। বুঝতে পারলে না তার বদমাইশী? সে যে তোমার সর্বনাশ করার ফিকিরে ঘুরছে। তোমাদের সুখের সংসার সে ছারখার করতে এসেছে! কিন্তু তুমি সরল মেয়ে, কি করে বুঝবে এই কুটিলতা! আর তাছাড়া তোমার নসীবের লেখাই বা তুমি এড়াবে কি করে কোনও মানুষই তার অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না।

শয়তান বুড়িটা সোজা সুবাদারের কাছে আসে। বুড়িকে দেখে সুবাদারের চোখ নেচে ওঠে, কি গো, খবর কী? ভালো তো?

বুড়ি বলে, খবর খারাপ হবে কেন হুজুর?

—তা কি রকম দেখলে, মাল কেমন?

—আহা, কি করে তার অমন রূপের বর্ণনা দিই। এমন রূপসী মেয়ে এর আগে কখনও দেখিনি, হুজুর। যেন একেবারে বেহেস্তের ডানা কাটা হুরী।

সুবাদার আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, ইয়া আল্লাহ। তারপর বল, বল বুড়ি। আর কি দেখলে?

—তার সুরেলা কন্ঠের কথা যদি একবার শুনতেন, হুজুর, একেবারে মধু-ঢালা। কথা তো নয়, যেন ঝরনার কলকল আওয়াজ। আর কী তার হরিণীর মতো কাজল কালো আনত চোখ!

সুবাদার বলে, বুহুৎ আচ্ছা, তোমাকে তো বলেছি বুড়ি, খলিফাকে ভেট দেব, যেমন করেই পার তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আনতেই হবে।

বুড়ি বলে, কার্জ আমি হাসিল করে দেব, হুজুর। কিন্তু মাসখানেক সময় লাগবে। হুট করে বললেই তো আর তাকে ঘরের বাইরে আনতে পারি না। তার জন্যে নিত্যি আমাকে সেখানে যাতায়াত করতে হবে। আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে মেলামেশা করতে হবে। আমাকে তারা যথেষ্টই শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়েছে। তবুও সেটা আরও দড় করতে হবে। তাদের মনে বিশ্বাস জন্মাতে হবে যাতে খুশ নাহার আমার সঙ্গে বাইরে বেরুতে কোনও রকম ইতস্ততঃ না করে।

সুবাদার বললো, তা ঠিক। তাড়াহুড়া করতে গেলে গোটা ব্যাপারটাই হয়তো কেঁচে যেতে পারে। এই নাও, হাজার খানেক দিনার রাখো। কাজ হয়ে গেলে আরও দেবো।

দিনারগুলো কোমরে বেঁধে বুড়িটা বলে, যাই, আর দেরি করবো না।

প্রতিদিন সে খুশ বাহারের বাড়ি যায়। নামাজের ভড়ং করে। কোরান পাঠের ঢং করে। বড় বড় বুলি আওড়ায়। বাণী দেয়। এই ভাবে গোটা একটা মাস কেটে যায়। বুড়িটা একদিন নাহারকে বললো, কুফার সুবাদারকে জান, মা? আল্লাহর পয়গম্বর—অমন পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ জন্মায় না। তাঁর কাছে দুদণ্ড বসলে জীবন জুড়িয়ে যায়। আল্লাহর গুণগানে তিনি সদাই ব্যাকুল। তাঁকে দেখার জন্য কত দূর দেশ থেকে মানুষজন আসছে। তুমি যদি চাও মা, আমি তোমাকে তাঁর দর্শন করিয়ে আসতে পারি। একবার তাঁর দোয়া পেলে, জীবনে অনেক শান্তি পাবে।

খুশ নাহার বলে, কিন্তু আমার স্বামী এখন ঘরে নাই। তাকে না বলে যাই কি করে। সে ফিরে আসুক, তার কাছ থেকে মত নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে যাবো, বুড়ি মা।

শয়তান বুড়ি বলে, তোমার শাশুড়িকে বলে চল, তাহলেই হবে। তাছাড়া, এই তো যাবো আর আসবো। আমরা তো সেখানে বসবো না। শুধু একবার দর্শন করেই চলে আসবো। তোমার স্বামী ফেরার আগেই আমরা আবার ফিরে আসবো।

খুশ নাহার শাশুড়ির কাছে গিয়ে বলে, মা, এখানকার সুবাদার নাকি আল্লাহর পয়গম্বর। তাকে দেখার জন্যে সারা দেশের লোক ভেঙ্গে পড়েছে। বুড়ি মা আমাকে দর্শন করাতে নিয়ে যেতে চান। আপনি যদি মত করেন তবে যেতে পারি।

—কিন্তু বাছা, খুশ বাহার বাড়িতে নাই। সে যদি ফিরে এসে দেখে তুমি ঘরে নাই, বড্ড আঘাত পাবে। তার চেয়ে বরং অপেক্ষা কর—সে আসুক তার মত নিয়েই যাওয়া ভালো।

শয়তান বুড়িটা এগিয়ে এসে বলে, তুমি মা নিশ্চিন্ত থাক ওর স্বামী ফেরার অনেক আগেই তাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবো।

খুশ বাহারের মা আর আপত্তি করতে পারে না—ঠিক আছে যাও।

বেশি দেরি করো না। সকাল-সকাল ফিরে এস।

খুশ নাহারকে সঙ্গে নিয়ে বুড়িটা সুবাদারের প্রাসাদ সান্নিহিত নিরালা বাগিচার একপ্রান্তে এসে দাঁড়ায়। বুড়িটা বলে, তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি আসছি।

হন হন করে সে প্রাসাদের অন্দরে ঢুকে সুবাদারকে খবর দেয়, মাল হাজির, হুজুর।

সুবাদার বাইরে এসে নাহারকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ে। মনে মনে সে তার একটা ছবি এঁকেছিল। কিন্তু সে কল্পচিত্রের সঙ্গে এ মেয়ের রূপের জৌলুসের অনেক ফারাক। এ যেন কল্পলোকের হুরী।

এই সময় রাত্রির অবসান হয়। শাহরাজাদ চুপ করে বসে থাকে।

দুশো একচল্লিশতম রজনী :

আবার সে শুরু করে।

খুশ নাহার বদখদ চেহারার এই লোকটাকে এগিয়ে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি নাকাবে মুখ ঢেকে জড়সড় হয়ে পড়ে। সেই বুড়িটা কিন্তু আর ফিরে আসে না। ধীরে ধীরে তার সামনে সব পরিষ্কার হয়ে ওঠে। শয়তান বুড়িটা তাকে ধোঁকা দিয়ে ভুলিয়ে এনেছে এই বাঘের খাঁচায়। এখান থেকে তো পালাবার আর পথ নাই। কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে তার।

সুবাদার-এর চোখ খুশিতে নেচে ওঠে। নাহারকে বলে, ভিতরে এস।

কলের পুতুলের মতো নাহার প্রাসাদের অন্দরে যায়। সুবাদার কাগজ কলম নিয়ে খলিফা আবদ-অল মালিক ইবন মারবানকে একখানা চিঠি লেখে। প্রহরীদের প্রধান সর্দারকে ডেকে বলে, এই লেড়কীকে দামাসকাসে খলিফার কাছে নিয়ে যেতে হবে। এই নাও খৎ, তাকে দিয়ে বলবে, আমি পাঠিয়েছি।

—জো হুকুম হুজুর।

সর্দার সেলাম ঠুকে নাহারকে নিয়ে চলে যায়। জোর জবরদস্তি করে ঘোড়ার পিঠে চাপায়। সামনে পিছে আরও ছজন জাঁদরেল ঘোড়াসওয়ার চলে পাহারায়।

সারাটা পথ নীরবে চোখের জল ফেলতে থাকে নাহার। দামাসকাসে পৌঁছে প্রহরী সর্দার চিঠিখানা আর নাহারকে জমা করে দেয় খলিফার একান্ত সচিবের হাতে। সচিবের কাছ থেকে রসিদ নিয়ে আবার সে ফিরে যায় কুফায়।

পরদিন সকালে খলিফা হারেমে আসে। বেগম আর বোনকে বলে, কুফার সুবাদার একটি খুবসুরৎ বাঁদী পাঠিয়েছে। সে এক সওদাগরের কাছ থেকে কিনেছে আমার জন্য। দূর দেশের কোন এক সুলতানের নাকি মেয়ে।

বেগম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, খোদা আপনাকে আনন্দে রাখুন। কী নাম তার ? দেখতে কেমন ? কালো না ফর্সা ?

খলিফা বললো, আমি এখনও তাকে চোখে দেখিনি।

খলিফার বোনের নাম দাহিয়া। বললো কোথায় তাকে রাখা হয়েছে, দাদা ? চলো তো গিয়ে দেখি, কেমন সে সুন্দরী।

প্রাসাদেরই একটা কামরায় নাহারকে তোলা হয়েছে। দাহিয়া দেখলো, মেয়েটি বয়সে কচি, সত্যিই অপরূপ সুন্দরী। পথের ধকলে সে বড় কাহিল

হয়ে পড়েছে। দারুণ গ্রীষ্মের খরতাপে চোখ মুখ ঝলসে তামাটে হয়ে গেছে। পালঙ্কের এক পাশে বসে অঝোর নয়নে কাঁদছিল। দাহিয়া অবাক হয়। কাছে এগিয়ে আসে। নাহারের মাথায় হাত রেখে বলে, কাঁদছো কেন বোন? কেউ তোমাকে তকলিফ দিয়েছে?

নাহার কথা বলে না, শুধু ঘাড় নেড়ে জানায়—না।

তবে কান্নার কী আছে। জান তুমি এখন কোথায় এসেছ?

নাহার এবারও ঘাড় নেড়ে জানায়—হ্যাঁ সে জানে।

দাহিয়া আরও অবাক হয়, তুমি এখন খলিফার পিয়ারের বাঁদী হতে চলেছ। যে-কোনও মেয়ের কাছে এটা কত সৌভাগ্যের ব্যাপার। আর তুমি কাঁদছো? কেন, কীসের দুঃখ তোমার? এখানে তুমি যে রকম সুখ বিলাসের মধ্যে থাকবে তা পেলে যে কোনও মেয়েই বর্তে যায়। আমি বুঝতে পারছিনা বোন, কেন তুমি কাঁদছো? এই ভাগ্য হলে অন্য যে কোনও সুন্দরী মেয়েরই মুখে হাসির খৈ ফুটতো।

এবার খুশ নাহার তার আয়ত চোখ মেলে তাকায়। —মালকিন, এ শহরটার নাম কী

দাহিয়া বলে, দামাসকাস। কেন, সওদাগর তোমাকে বলেনি, কোথায় কার বাঁদী করে তোমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? খলিফা আবদ-অল মালিক-ইবন মারবানের ভোগবিলাসের জন্য তোমাকে কেনা হয়েছে—সে কথা তো তোমাকে তার জানানো উচিত ছিল! এখন তুমি আমার বড় ভাই খলিফার সম্পত্তি। উচিৎ দাম দিয়ে তোমাকে কেনা হয়েছে। সুতরাং চোখের জল মোছ বোন। কী করে খলিফার মুখে হাসি ফোটাতে পারবে—সেই হবে তোমার একমাত্র কাজ। তোমার নাম কী— ?

—বাড়িতে আমাকে সবাই খুশ নাহার বলে ডাকে।

এই সময়ে খলিফা ঘরে ঢুকলো। সঙ্গে সঙ্গে নাহার নাকাবে মুখ ঢাকে। হাসি মুখে সে নাকাবের পাশে এগিয়ে এসে বললো, আহা, লজ্জা কেন, নাকাব তোল, তোমার সুরৎ দেখবো বলেই তো এলাম।

কিন্তু নাকাব সরানো দূরে থাক। বোরখাখানা আরো টেনেটুনে নিজেকে আরও গুটিয়ে নিল নাহার।

খলিফা রুষ্ট হলো না বরং উচ্চৈস্বরে হো হো করে হেসে উঠলো। বোনের দিকে তাকিয়ে বললো, লেড়কীকে তোমার হেপাজতে রেখে যাচ্ছি বোন। দিন কয়েকের মধ্যে ঠিক মতো তালিম দিয়ে একে তৈরি করে দেবে। এই রকম জবুথবু হয়ে থাকলে তো চলবে না।

খলিফা আর একবার বোখরায় জড়ানো পাকানো নাহারের দেহটা লক্ষ্য করে। কিন্তু শুধুমাত্র তার শশাঙ্ক শুভ্র হাতের দুখানা কব্জী ছাড়া আর কিছুই নজরে আসে না। দেখতে না পাওয়ার অদম্য কৌতূহল বুকের মধ্যে দাপাদাপি করতে থাকে। মনের যন্ত্রণা মনেই চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় খলিফা।

দাহিয়া নাহারকে সঙ্গে করে হামামে নিয়ে যায়। ভালো করে ঘষে মেজে তাকে গোসল করাতে বলে।

স্নান সমাপন করে যখন সে দামী সাজ পোশাকে সেজে গুজে বাইরে

আসে দাহিয়ার দেখে তাক লেগে যায়। আহা মরি মরি—একি রূপ! যেন আশমানের বিজলী বাঁধা পড়ে গেছে ধরায়।

নাহারের গলায়, কানে, মাথায় মুক্তা হীরা চুনী পান্নার জড়োয়া গহনা ঝলমল করতে থাকে। পাতলা ফিনফিনে হালকা পোশাকের তলায় চাঁপার কলির মতো তার নিষ্কলুষ শরীরের স্বর্ণাভা যে কোনও পুরুষের বুকে তুফান তুলতে পারে। দাহিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে নাহারকে দেখতে থাকে।

এমন সুন্দর সাজ পোশাকে সেজে দামী দামী অলঙ্কার পরেও কিন্তু নাহারের মুখে হাসি ফোটে না। বরং কান্না আরো বেড়ে যায়। চোখের জলে বুক ভাসতে থাকে। দাহিয়ার মনে সন্দেহ জাগে। এই কান্নার কোনও হদিশ করতে পারে না সে।

ঘরের নিরালা কোণে বসে নাহার তার অদৃষ্টের কথা ভাবে। নিজের নীড়ে এতকাল সুখের সায়রে ডুবে ছিল সে। কিন্তু বিধাতা বুঝি তার এত সুখ সহ্য করতে পারলেন না। নাহার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। না জানি তার নসীবে কি লেখা আছে। খুশ বাহারের জন্য তার মনটা পুড়ে যেতে থাকে। দিন রাত শুধু তার সোহাগ ভরা চাঁদের মতো মুখখানাই ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে। খানা পিনা বন্ধ করে নিঃসঙ্গ ঘরে সে দিন কাটায়। চিন্তা জীয়ন্ত মানুষকে দহন করে। খুশ নাহার শয্যা আশ্রয় করে, দিনে দিনে তার শরীর অবসন্ন হতে থাকে। প্রথমে ঘুস ঘুসে কিন্তু কয়েকদিন পর হাড় কাঁপিয়ে জ্বর এল তার। সারা দামাসকাসের নামজাদা হেকিমকে ডাকা হলো। পুরোদমে চিকিৎসা পত্র চলতে থাকলো। কিন্তু জ্বর আর ছাড়ে না।

এদিকে সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে খুশ বাহার এ ঘর ও ঘর খুঁজতে থাকে—নাহার গেল কোথায়। নাহার—নাহার বলে দু তিন বার ডাকে। কিন্তু কেউ সাড়া দেয় না। খুশ বাহার ভাবে নাহার বোধ হয় তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় মেতেছে। আবার ডাকে, নাহার সোনা, কোথায় লুকিয়ে আছ, বেরিয়ে এস, মানিক।

কিন্তু সাত রাজার ধন মানিক তখন ঘরে থাকলে তো সাড়া দেবে! খুশ বাহারের আর ধৈর্য মানে না। মা এর কাছে ছুটে যায়, মা-মাগো, নাহার কোথায়?

মা এতক্ষণ একলা ঘরে বসে প্রাণপণে কান্না চাপার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আর সে নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে, এখন খোদাই একমাত্র ভরসা বাছা, তাকে বোধ হয় আর ফিরে পাবো না। রোজকার মতো সেই বুড়িটা আজও এসেছিল। নাহারকে সঙ্গে নিয়ে সে সুবাদারের কাছে গেছে। যাবে আর ফিরে আসবে এই ওয়াদা করে সে নাহারকে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল সে ফিরলো না। সেই থেকে আমি তোর অপেক্ষায় বসে আছি, বাবা। যা একবার গিয়ে খোঁজ কর। বুড়িটা কোথায় নিয়ে গেল তাকে কিছুই বুঝতে পারছিনা।

খুশ বাহার আর তিলমাত্র অপেক্ষা করে না। প্রায় দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে পেঁছায় সুবাদারের প্রাসাদে। কোনও রকম আদব কায়দা না দেখিয়ে

সে সোজা সুবাদার-এর সামনে এসে বলে, আমার নাহার কোথায় ? কোথায় সেই বুড়ি ?

—নাহার ? বুড়ি ? তারা কে ? এখানে আসবে কেন ?

খুশ বাহার আরও গলা চড়িয়ে বলে, নাহার আমার বিবি। আর বুড়িটাকে ভেবেছিলাম আমরা সাধুসন্ত মানুষ। পরণে মোটা পশমের আলখাল্লা আছে। গলায় একটা হাড়ের মালা, আর হাতে একখানা মস্ত বড় চিমটি আছে তার। আপনার কাছে আসবে বলে সে আমার বিবিকে নিয়ে বেরিয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, ঐ পীরের ছদ্মবেশে বুড়িটা মহা শয়তান।

সুবাদার যেন আকাশ থেকে পড়ে, তাই নাকি! আহা-হা রে ঐ সব শয়তান বদমাইশদের বাড়ির অন্দরে ঢুকতে দিতে আছে কখনও ?

—আপনি দেখলে আপনার মনেও ভক্তি আসবে। এমনি তার সাজের ভড়ং। প্রহরে প্রহরে নামাজ পড়ে। কোরান-এর পাতা থেকে মুখ তোলে না। যেন সাক্ষাৎ আল্লাহর পয়গম্বর।

সুবাদার বলে, তোমার বাবা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু লোক। আমার পক্ষে যতখানি করা সম্ভব আমি নিশ্চয়ই করবো। তুমি এক কাজ কর বাবা, আমার কোতোয়ালের সঙ্গে দেখা করে সব খুলে বল তাকে। সে নিশ্চয়ই খুঁজে বের করে দেবে তোমার বিবিকে। আর ঐ বুড়িটাকে পেলে আমার কাছে নিয়ে আসতে বলবে। কি করে ধোলাই দিতে হয় আমি বুঝিয়ে দেব তাকে হাড়ে হাড়ে।

খুশ বাহার কোতোয়ালের কাছে যায়। তখন সে ইয়ার বক্সী নিয়ে পায়ের উপর পা তুলে মৌজ করে চরস টানছিল। হঠাৎ এই অসময়ে আচমকা ঘরের ভিতরে খুশ বাহারকে ঢুকতে দেখে ভ্রু দুটো কপালে তুলে কোতোয়াল প্রশ্ন করে, কী চাই ?

খুশ বাহার বলে, আজ সকালে আমার বাড়ি থেকে আমার বিবিকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে একটা বুড়ি।

বুড়িটার চেহারা এবং বেশভুষার যথাসাধ্য বর্ণনা দিতে চেষ্টা করলো সে।

কোতোয়াল ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলে, তাতো বুঝলাম। তারা গেছে কোন পথে ?

—বুড়িটা বলে গেছে, সে সুবাদারের প্রাসাদেই তাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু সুবাদার সাহেব বললেন, ধাপ্পাবাজরা কখনও সত্যি কথা বলে না।

কোতোয়াল বললো, তা হলে, এই এতবড় শহরটায় কোথায় খুঁজবো তাঁদের ? আমাকে যদি নিশানা বলে দিতে পার, আমি সেই মতো লোক পাঠাতে পারি।

—নিশানা কি করে বলবো আমি। আমি তো জানিনা কোন পথে তাকে নিয়ে গেছে সে।

—তবে ? আমিই বা জানবো কি করে ? আমি তো আর হাত গুণতে জানিনা। যাদুবিদ্যাও আমার জানা নাই। যাও, এখন আর বিরক্ত করো না।

খুশ বাহার সুবাদারের কাছে এসে নালিশ জানায়, কোতোয়াল আমার কথা গ্রাহ্য করলো না, হুজুর। আমি বললাম, আপনি নিজে পাঠিয়েছেন আমাকে। তাতেও তার কোনও ভাব বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। আমার

কথা শুনে সে কি কথা বলে জানেন? আমি তো আর যাদু জানিনা যে মন্ত্র-বলে তোমার বিবিকে উদ্ধার করে দেবো।

সুবাদার নকল গাম্ভীর্য মুখে টেনে বলে, হুম! দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি। এই—কে আছিস, কোতোয়ালকে ডেকে নিয়ে আয়—এক্ষুণি।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই হন্তদন্ত হয়ে কোতোয়াল এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়ায়।

সুবাদার গলাটা বেশ চড়িয়ে বলতে থাকে, শোন কোতোয়াল, দেশের লোকের ধন সম্পত্তি রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের। চুরি, ছিনতাই, রাহাজানী ধাপ্পাবাজি বন্ধ করার দায় তোমার। আমার দোস্ত সওদাগর বাহারের ছেলে। আজ সকালে একটা শয়তান বুড়ি এর বিবিকে ভুলিয়ে কোথায় নিয়ে গেছে। যেমন করেই হোক, তাদের খুঁজে বার করতেই হবে। আমার শহরে এই সব শয়তানী আমি কিছুতেই বরদাস্ত করবো না। তুমি আর দেরি করো না। দিকে দিকে ঘোড়াসওয়ার পাঠাও। প্রতিটি সম্ভাব্য জায়গা তাল্লাসী করে দেখ। আমার শহরের সব ঘোঁচ ঘাঁচ তো তোমার অজানা নাই—ধূর্ত শয়তানরা সেই সব গর্তের কোথাও না কোথাও লুকিয়ে থাকে। যদি সে এই শহরের মধ্যেই গা ঢাকা দিয়ে থাকে তবে তোমার পক্ষে টেনে বের করা আদৌ অসম্ভব হবে না। কিন্তু সে-যদি শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চালান হয়ে যায় তা হলে তোমার করার কিছুই থাকবে না। যাই হোক, আর দেরি না করে চারদিকে লোক পাঠাও।

কোতোয়াল এতক্ষণ ঠিক বুঝতে পারছিল না, সুবাদার সাহাব এ সব কি বলছেন! সে লেড়কী তো দামাসকাসের পথে চালান হয়ে গেছে। সুবাদার খুশ বাহারের অলক্ষ্যে কোতোয়ালকে ইশারা করে জানালো, ওসব কথায় কান দিও না। বলতে হয় বললাম। এবার কোতোয়াল ধাতস্থ হয়। সুবাদারের চালটা ধরতে পারে।

—ঠিক আছে, হুজুর, আপনি কিছু ভাববেন না হুজুর। শহরের যে গর্তেই তারা থাকুক টেনে বের করবোই। কিন্তু শহর ছেড়ে অন্য কোথাও সরিয়ে দিলে আমার কোনও হাত থাকবে না।

সুবাদার সান্ত্বনা দিয়ে বললো, তুমি বাড়ি যাও, বাবা। যা করার আমরা করছি। নসীব যদি সাথ দেয় তবে তোমার বিবিকে ঠিকই ফিরে পাবে। তা না হলে খোদার নাম জপ কর।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো বিয়াল্লিশতম রাত্রে আবার সে শুরু করে :

খুশ বাহার বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে শান্ত রাখতে পারে না। সারা রাত ধরে কুফার পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। যদি কোথাও নাহারের সন্ধান মেলে।

পরদিন সকালে বাড়ি ফিরে এসে শয্যা নেয়। দারুণ কাঁপিয়ে জ্বর আসে। এক দিন দুই দিন—এই ভাবে অনেক কয়দিন কেটে যায়। জ্বর ক্রমশই বাড়তে থাকে। অনেক হেকিম বদ্যিকে ডাকা হলো। কিন্তু কেউই কিছু করতে পারলো না। সবাই বলে, এ রোগের একটাই দাওয়াই। বিবি

ফিরে এলেই রোগ সেরে যাবে।

এই সময় কুফায় এক পারসী-সাহেব এলেন। তিনি রসায়ন এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। সওদাগর তার নামযশ শুনে ডেকে এনে ছেলেকে দেখালো। বললো, এই আমার এক মাত্র পুত্র, একে যদি আপনি সুস্থ করে তুলতে পারেন হেকিম সাহেব, আপনাকে আমি দুহাত ভরে ইনাম দেব—যা চাইবেন তাই দেব। শুধু আমার বুকের কলিজা, আমার চোখের মনিকে সারিয়ে তুলুন।

পারসী সাহেব কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না। গম্ভীর ভাবে খুশ বাহারের নাড়ী পরীক্ষা করতে লাগলেন। একটু পরে স্মিত হেসে সওদাগরকে বললেন, অসুখ ওর দেহে নয়, অসুখ ওর দিল-এ। এবং কোনও আপনজনের বিরহেই তা ঘটেছে। ঠিক আছে, আমি মন্ত্রবলে জেনে নিচ্ছি, এখন সে কোথায় অবস্থান করছে।

এই বলে সেই পারসী-সাহেব মেঝের উপরে বসে সামনে কিছুটা বালী ছড়িয়ে দিলেন। বালীর মাঝখানে সাজিয়ে দিলেন পাঁচখানা সাদা পাথরের নুড়ি, আর তিন খানা কালো পাথরের নুড়ি, দুখানা কাঠি আর একটা বাঘের মাথা। বেশ অনেকক্ষণ ধরে এইগুলো সাজাতে সাজাতে তিনি পারসী ভাষায় কি সব মন্ত্র তন্ত্র আওড়াতে থাকলেন। আরপর বললেন, আপনারা যারা এখানে হাজির আছেন, সবাই মন দিয়ে শুনুন, যার বিরহে এই ছেলে কাতর, তাকে পাওয়া যাবে বসরাহয়—...না না, হলো না, হলো না। এই তিনটি নদীই আমার সব গোলমাল করে দিচ্ছে। হ্যাঁ হয়েছে—তাকে পাওয়া যাবে দামাসকাসের—সুলতানের প্রাসাদে। এবং তারও এই একই অবস্থা। সে-ও অসুখে শয্যাগত হয়ে আজ অনেকদিন।

সওদাগর আকুলভাবে জিজ্ঞেস করে, তাহলে কি উপায় হবে সাহেব? আপনি ছাড়া তো এর কোনও সুরাহার পথ জানা নাই আমার। মেহেরবানী করে আপনি না বাঁচালে ওরা কেউ বাঁচবে না, আমিও মরে যাবো। আপনি যা চান, আমি দেব সাহেব। আপনি আমার ছেলেকে বাঁচান, আমাকে আর আমার ছেলের বিবিকে বাঁচান।

পারসী সাহেব বলে, ধৈর্য ধরুন, শান্ত হোন। অধীর হলে চলবে না। তাড়াহুড়ার কাজ নয় এটা। তবে আমি কথা দিচ্ছি, ওদের দুজনের মিলন ঘটিয়ে দেব। এখন আপনি আমাকে মাত্র চার হাজার দিনার দিন। তারপরে কাজ সমাধা হয়ে গেলে আপনার যা প্রাণ চায় দেবেন।

সওদাগর তৎক্ষণাৎ পাঁচ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা এনে পারসী সাহেবের হাতে দিল।

পারসী সাহেব বললেন, বাস বাস, এই যথেষ্ট। এখন আমি দামাসকাসের পথে রওনা হয়ে যাচ্ছি। আপনার ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো। আল্লাহর কৃপায় আপনার ছেলের বিবিকে সঙ্গে নিয়েই ফিরবো।

তারপর তিনি খুশ বহার-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, কি গো বাছা, তোমার নাম কী?

—খুশ বাহার।

—ঠিক আছে, এবার উঠে পড় বাবা, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

তোমার বিবিকে সঙ্গে নিয়ে আবার আমরা ফিরে আসবো।

পারসী সাহেবের ভরসায় দেহ মনের অবসাদ অনেকখানি কেটে যায় তার। সাহস করে উঠে বসে। বাড়ির সবাই বলে, আর ভাবনা কি, উনি যখন কথা দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই তাকে ফিরে পাবে। খানাপিনা কর। হাসো, কথা বল, দেখো, দেহ মনে জোর পাবে।

পারসী সাহেব বললেন, আমি এক সপ্তাহ বাদে আসবো। এর মধ্যে খেয়ে দেয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নাও। তারপর দুজনে দামাসকাসের পথে বেরিয়ে পড়বো।

এই বলে তিনি সেদিনের মতো চলে গেলেন। এদিকে সওদাগর তার ছেলের যাত্রার তোড়জোড় করতে থাকলো।

সওদাগর তার ছেলের হাতে পাঁচহাজার দিনার দিল। একটা ভালো দেখে উট কিনে আনলো। নানারকম সওদাগরী জিনিসপত্র চাপালো তার পিঠে। তার মধ্যে সব চেয়ে নামকরা কুফার রেশমী কাপড় দিল অনেকগুলো।

সপ্তাহখানেক পরে খুশ বাহারের শরীর যখন মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠলো তখন তারা দিনক্ষণ—দেখে একদিন রওনা হয়ে গেল।

শাহরাজাদ বলতে থাকে, আপনার হয়তো খেয়াল আছে জাঁহাপনা, এই সময়ে খুশ বাহার সতেরয় পা দিয়েছে তখন তার দেহে সবে যৌবনের জোয়ার আসতে শুরু করেছে।

খুশ বাহারের আদব কায়দা আচার ব্যহারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন পারসী সাহেব। সারাটা পথ তার যাতে কোন তকলিফ না হয় সেই দিকেই পারসী সাহেবের চোখ। নিজের সুবিধা অসুবিধা গ্রাহ্যও করলেন না।

এইভাবে তারা একদিন নিরাপদেই দামাসকাসে এসে পেঁছিয়। প্রথমে একটা দোকান ঘর ভাড়া নিলেন পারসী সাহেব। দামাসকাসের বড়বাজারের দোকানটিকে তিনি মনোহর করে সাজালেন। নানা রকম বাহারী প্রসাধন সামগ্রী এবং সুন্দর সুন্দর ঘর সাজানো জিনিসে দোকান ঝলমল করতে লাগলো। একদিকে নানা রকম হেকিম ওষুধপত্রও রাখলেন।

যথাযোগ্য সাজগোজ করে মাথায় একটা সাত প্যাচের পাগড়ী পরলেন। এবং খুশ বাহারকে পরালেন নীল রঙের রেশমী কামিজ তার উপর চাপালেন কাজকরা কাশ্মীরি কুর্তা। হাতের বন্ধে বেঁধে দিলেন একখানা গুলাব রঙের সোনার জরির কাজ করা রেশমী রুমাল। হাতে তুলে দিলেন একটা ওষুধের বাক্স। ঠিক যেন হেকিমের সাগরেদ। পারসী-সাহেব বললেন, এখন থেকে বেটা, তুমি আমাকে বাবা বলবে আর আমি তোমার পরিচয় দেব ছেলে বলে।

দোকান খুলতেই নানা রকমের মেয়ে পুরুষ এসে ভিড় জমাতে লাগলো। কেউ বা দাওয়াই-এর জন্য আসতে লাগলো। আবার কেউ কেউ খুশ বাহারের রূপে মুগ্ধ হয়ে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে থাকলো। কয়েক দিনের মধ্যেই সারা শহরে ছড়িয়ে পড়লো তাদের নাম।

রুগীরা আসে। পারসী সাহেব রুগীর চোখের দিকে তাকান। তারপর একটা কাঁচের বাটি সামনে ধরে বলেন, থুথু ফেলুন। রুগী থুথু ফেলে। বাটিটাকে তুলে ধরে কি যেন পরীক্ষা করেন তিনি। তারপর রোগ বাৎলে দেন।

রুগী অবাক হয়। কী আশ্চর্য ক্ষমতা! নাড়ী না ধরে, বুক পিঠ না দেখে শুধু শুধু পরীক্ষা করে রোগ দাওয়াই বাৎলে দিতে পারেন? এমন অদ্ভুত হেকিম তারা জীবনে দেখেনি কখনও। এমন ধন্বন্তরী মানুষ-এর কথা শোনেও নি তারা।

কয়েকদিনের মধ্যে পারসী সাহেবের নাম যশের খ্যাতি খলিফার কানে পেঁছয়। একদিন সকালবেলা পারসী সাহেব দোকানে বসে আছেন, এমন সময় এক খানদানী বৃদ্ধা মহিলা সুসজ্জিত এক খচ্চরের পিঠে চেপে এসে সামনে দাঁড়ালো। বৃদ্ধা নামতে চায়। পারসী সাহেবকে সে ইশারায় ডাকে। তাকে ধরে নামাতে বলে। পারসী সাহেব তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বৃদ্ধাকে নামিয়ে দোকানের ভিতরে নিয়ে এসে বসতে অনুরোধ করেন। খুশ বাহার একখানা আসন এগিয়ে দেয়। বৃদ্ধা বসে। বোরখার ভেতর থেকে একটা বোতল বের করে। জলে ভরা। পারসী সাহেবের হাতে তুলে দিতে দিতে বলে, প্রস্রাব আছে। আচ্ছা সাহেব, আপনিই তো ইরাক থেকে এসে এখানে নতুন দাওয়াইখানা খুলেছেন?

—জী হ্যাঁ, আমিই আপনার সেই নফর।

—ও কথা বলতে নাই সাহেব, কেউ কারো নোকর নয় এ দুনিয়ায়। আমরা সবাই একজনেরই দাসানুদাস। তিনি পরম পিতা খোদাতালা। থাক ওসব কথা, আমি যে জন্যে এসেছি, বলি। এই বোতলে যে প্রস্রাব দেখছেন তা আমাদের খলিফার সদ্য কেনা বাঁদীর। অনেকদিন, এখানে আসার পর দিন থেকে তার জ্বর—কিছুতেই ছাড়ে না। আমাদের প্রাসাদের ডাক্তাররা দেখে হাল ছেড়ে দিয়েছে। এখন আপনিই শেষ ভরসা। আপনার নাম যশ শুনে খলিফার বোন আমাকে পাঠালেন আপনার কাছে। এখন দেখুন আপনি যদি সারাতে পারেন—

—তার নামটা না জানলে তো হবে না। আমি তো শুধু দাওয়াই দিয়েই রোগ সারাই না। ঝাড়ফুকও করি—প্রয়োজন হলে।

বৃদ্ধা বলে, তার নাম খুশ নাহার।

পারসী সাহেব একখন্ড কাগজে এক নাগাড়ে অনেকগুলো সংখ্যা লিখে ফেলেন। কতকগুলো লিখলেন লাল কালীতে, কতকগুলো সবুজ কালীতে। তারপর তিনি লালকালীর সংখ্যাগুলোর সঙ্গে সবুজ কালীর সংখ্যাগুলো যোগ করলেন। সেই যোগফলের সঙ্গে আরও কিছু যোগ-বিয়োগ গুণ ভাগ করে কি সব হিসেব করলেন।

—শুনুন মালকিন, রোগ আমি ধরে ফেলেছি। বুকের ধড়ফড়ানিই তার একমাত্র রোগ।

বৃদ্ধা আঁৎকে ওঠে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বটে। বুকের মধ্যেই তার যত রোগ। হরদম ধড়ফড় করে ব্যাথা করে।

পারসী সাহেব বলে, সুতরাং দাওয়াই ঠিক করার আগে রুগী সম্পর্কে আরও কিছু বিশদভাবে জানা দরকার। কোন্ দেশের মেয়ে সে? কোথা থেকে এসেছে? এটা জানা বিশেষ দরকার। কারণ সেখানকার জল হাওয়া আর এখানকার জল হাওয়ার সঙ্গে কতটা কি ফারাক আছে, বুঝতে হবে। তাছাড়া তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধরণ-ধারণ বোঝার জন্য তার সঠিক বয়সটাও জানা

দরকার। আর কতদিন হলো সে এ শহরে এসেছে?

বৃদ্ধা বলে, তার মুখ থেকে যা শুনেছি, তাতে মনে হয়, সে কুফাতেই জন্মেছে, সেখানেই মানুষ হয়েছে। তার বয়স এখন, আমি যতদূর জানি, বছর ষোল হবে। সেই যেবার কুফা শহরে আগুন লেগেছিল সেই সালে তার জন্ম। সে আজ মাত্র কয়েক সপ্তাহ হলো দামাসকাসে এসেছে।

পারসী সাহেব খুশ বাহারের দিকে তাকায়। খুশবাহারের অবস্থা তখন কাহিল। বুক ধড়ফড় করতে শুরু করেছে। কপালে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

—বেটা, সাত নম্বর দাওয়াই বানাও। ইবন সিনার সূত্র ধরে বানাতে হবে। খুব সাবধান, কোনও উল্টো পাল্টা যেন না হয়।

বৃদ্ধা ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলে, যার জন্যে দাওয়াই নিচ্ছি সেও তোমার মতোই খুব সুরৎ। আচ্ছা হেকিম সাহেব, এটা আপনার লেড়কা?

—জী হাঁ, আমার বেটা, আপনার নফর।

বৃদ্ধা বিগলিত হয়ে গেল। বললো, আপনার ধন্বন্তরী দাওয়াই-এর খ্যাতি আজ সারা দামাসকাসে ছড়িয়ে পড়েছে। আর আপনার ছেলের রূপ গুণের কথাও চাপা থাকবে না। কালে আপনার ছেলেও নামজাদা হেকিম হবে।

ওরা দুজনে যখন কথা বলতে ব্যস্ত সেই সময় খুশ বাহার দাওয়াই বানিয়ে কয়েকটা পুরিয়া তৈরি করলো। পুরিয়াগুলো একটা ছোট্ট বাক্সে ভরে বাক্সটার গায়ে কুফার স্থানীয় ভাষায় দুর্বোধ্য হরফে খুশ বাহারের নাম ঠিকানা লিখে বৃদ্ধার হাতে তুলে দিল।

বটুয়া খুলে দশটা সোনার মোহর বের করে বৃদ্ধা পারসী সাহেবের হাতে দেয়। খোদা হাফেজ, এবার তাহলে আসি?

বৃদ্ধা আর তিলমাত্র দাঁড়ায় না। খচ্চরের পিঠে চেপে প্রাসাদের পথে রওনা হয়ে যায়।

খুশ নাহারের ঘরে ঢুকে দেখে অঝোর নয়নে কাঁদছে সে। কাছে এসে রুমাল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দেয় বৃদ্ধা। বলে, ছিঃ কাঁদে না। এই দেখ, আমি তোমার জন্যে কি দাওয়াই এনেছি। একবারে ধন্বন্তরী। নির্ঘাৎ সব অসুখ সেরে যাবে তোমার। যেমন হেকিম সাহেব, তেমনি তার খুব সুরৎ লেড়কা—দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এই নাও তোমার দাওয়াই-এর বাক্স।

খুশ নাহার এই বৃদ্ধাকে চটাতে চায় না। যাই হোক, সারা প্রাসাদের মধ্যে এই একটি মাত্র মানুষই তার সঙ্গে দরদ দিয়ে কথা বলে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাত পেতে বাক্সটা নেয়। হঠাৎ বাক্সটার গায়ে লেখাটার ওপরে নজর পড়তেই পলকে মুখের চেহারা পালটে যায় তার। নাহার পরিষ্কার পড়তে পারে, "আমি খুশ বাহার। কুফার সওদাগরের পুত্র।" নাহারের মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। বুক ঢিব ঢিব করে ওঠে। সব যেন কেমন তাল গোল পাকিয়ে যেতে থাকে। নিমেষেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কয়েক মুহূর্ত ঝিম মেরে পড়ে থাকার পর আবার সে চৈতন্য ফিরে পায়। ধীরে ধীরে মাথাটা তুলে একটু হেসে প্রশ্ন করে, সেই ছেলেটি সত্যিই কেমন দেখতে? খুব সুন্দর?

—খুব—ব। তার রূপের বর্ণনা আমি দিতে পারবো না। তবে তার মতো সুন্দর নওজোয়ান আমি খুব কম দেখেছি। কী তার চোখ, কী তার নাক, ইয়া আল্লাহ। তার মুখের বাঁদিকে একটা কালো তিল—ভারি সুন্দর লাগে দেখতে। আর যখন সে হাসে বড় সুন্দর টোল খায় তার ডান গালে।

তার এই সব বর্ণনা শুনে নাহারের আর বুঝতে বাকী থাকে না, ছেলেটি তার প্রাণ-প্রতিম ছাড়া আর কেউই নয়। বাক্সটা খুলে একটা পুরিয়া বের করে মুখের মধ্যে ঢেলে দেয়। পুরিয়ার কাগজখানার দিকে চোখ পড়তেই দেখে, একখানা চিঠি।

খুশ নাহার আনন্দে বৃদ্ধাকে জড়িয়ে ধরে, বুড়িমা, এ দাওয়াই কোথায় পেলেন। আমার এতদিনের অসুখ এক পুরিয়াতেই সেরে গেল। ওঃ, কী যে ভালো লাগছে, কী করে বোঝাবো। আজ একমাস আমি কিছু খাইনি, ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে ; যাহোক কিছু খানা এনে দিন। আজ আমি পেট ভরে খাবো, আর প্রাণ-ভরে ঘুমাবো।

বারকোষে সাজিয়ে খাবার নিয়ে আসে বৃদ্ধা। মাংসের চাপ তন্দুরী রুটি, ফল এবং সরবৎ। তারপর খলিফার কাছে গিয়ে জানায়, খুশ নাহার-এর অসুখ বিলকুল সেরে গেছে। দামাসকাসে এক পারসী সাহেব এসে দাওয়াখানা খুলেছেন। তাঁর এক পুরিয়াতেই খুশ নাহার ভালো হয়ে গেছে।

খলিফা বললো, বাঃ দারুণ গুণী মানুষ তো। ঠিক আছে, এই এক হাজার দিনার নিয়ে যাও। তাকে দিয়ে এস।

পারসী সাহেবের কাছে যাওয়ার আগে বৃদ্ধা খুশ নাহারের সঙ্গে দেখা করতে এল। খুশ নাহার বললো, দাঁড়ান বুড়িমা, আমিও তাকে একটা উপহার পাঠাবো।

একটা ছোট বাক্সের মুখে মোহর করে বৃদ্ধার হাতে দিয়ে বলে, এই বাক্সটা তাঁর হাতে দেবেন।

বৃদ্ধা দোকানে গিয়ে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আর সেই বাক্সটা খুশ বাহারের হাতে তুলে দেয়।

খুশ বাহার বাক্সটা খুলে দেখে, একখানা চিঠি। কী করে কুফার সুবাদার খুশ নাহারকে ধোঁকা দিয়ে ভুলিয়ে এনে দামাসকাসে খলিফার ভোগের জন্য পাঠিয়েছে, তারই মর্মন্তুদ কাহিনী লিখে পাঠিয়েছে সে। চিঠিখানা পড়ে খুশ বাহার ফুঁপিয়ে ফুঁপয়ে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

বৃদ্ধা অবাক হয়। —আপনার ছেলে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়লো কেন, সাহেব?

পারসী সাহেব বলে, এছাড়া আর কী হতে পারে, মা? আপনি যাকে খলিফার বাঁদী ভাবছেন, আমার দাওয়াই খেয়ে যার অসুখ সেরে গেল, আসলে সে এই ছেলের বড় পিয়ারের বিবি। কুফার শয়তান সুবাদার কার-সাজী করে এক বুড়িকে দিয়ে তাকে ভাগিয়ে এনে এই দামাসকাসে চালান করে দিয়েছে—খলিফার ভোগের জন্য। মেয়েটির বিরহে এই ছেলেটির মৃতকল্প দশা দেখে আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি এখানে। আপনি জানেন, ও আমার ছেলে। কিন্তু না, ওর সঙ্গে আমার কোনও রক্তের সম্পর্ক নাই। এই খুশ বাহার কুফার এক সম্ভ্রান্ত সওদাগর বাহার সাহেবের পুত্র।

দামাসকাসে আমরা কোনও ব্যবসাবাণিজ্য করতে বা রোজগারের ধান্দায় আসিনি, মা। আমার একটিমাত্র উদ্দেশ্য—ওর চোখের মণি বিবি খুশ নাহারকে উদ্ধার করা।

পারসী সাহেব একটু থেমে আবার বলেন, সবই তো শুনলেন, এখন আপনি আমাদের সাহায্য না করলে তাকে তো ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে না, মা। এই নিরপরাধ ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে এই উপকারটুকু আপনাকে করতেই হবে। খলিফা আমাকে সহস্র মুদ্রা ইনাম পাঠিয়েছেন, আমি মাথায় ঠেকিয়ে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। এ টাকায় আমাদের কোনও দরকার নাই। এটা আপনিই রাখুন। আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হলে আমরা আপনাকেও খুশি করে যাবো, মা।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো পঁয়তাল্লিশতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয়ঃ

বৃদ্ধা বলে ; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সাহেব, আমার তরফ থেকে যতটা করা সম্ভব আমি করবো। এরপর তাকে উদ্ধার করতে পারা-না-পারা আপনাদের নসিব আর আমার হাত-যশ।

এই বলে সে আর সেখানে দেরি না করে তাড়াতাড়ি প্রাসাদে ফিরে আসে। খুশ নাহার হাসি খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। তার আর মনে কোনও সংশয় নাই, এবার সে তার প্রিয়তমের কাছে ফিরে যাবে। বৃদ্ধা নাহারের কাছে এসে মাথায় হাত রাখে, মা, এই বুড়িটাকে বিশ্বাস করতে পারনি এতদিন, তাই না? তা না হলে আমার কাছে মনের গোপন কথা খুলে বল নি কেন? আমাকে কি দেখে মনে হয়েছিল, আমি তোমার কোনও অনিষ্ট করতে পারি? কেন যে তুমি দিন রাত ঐভাবে কান্নাকাটি করতে এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু তখন যদি বলতে, তাহলে অনেক আগেই তোমার দুঃখ ঘুচিতে দিতাম।

খুশ নাহার বৃদ্ধার মুখের দিকে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে। বৃদ্ধা বলে, মা, তুমি আমার ওপর ভরসা রাখ, আমি তোমাকে ঠকাবো না। এক মা মেয়ের ভালোর জন্য যা করতে পারে, আমিও তোমার জন্য তাই করবো। আমি আল্লাহর নামে কসম খাচ্ছি, যেভাবেই হোক, তোমার স্বামীর সঙ্গে তোমার মিলন আমি ঘটিয়ে দেবই। তার জন্যে যদি আমার জান কবুল করতে হয় সে-ভি আচ্ছা। মন থেকে সব চিন্তাভাবনা মুছে ফেল, মা। এই বুড়ি তোমার কি করে, একবার শুধু দেখ।

খুশ নাহার আনন্দে জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধাকে। দুচোখ জলে ভরে ওঠে। তার ঊষর মরুময় জীবনে এই বৃদ্ধা এক সবুজ বৃক্ষের আচ্ছাদন।

বৃদ্ধা আবার পারসী সাহেবের দোকানে আসে। কাপড়ে বাঁধা একটা পুটলি হাতে দিয়ে খুশ বাহারের কানে কানে ফিস ফিস করে কি যেন বলে। পুঁটলিটা নিয়ে বুড়িকে সঙ্গে করে খুশ বাহার পিছন দিকে পর্দার আড়ালে চলে যায়। খুশ বাহার পুঁটলিটা খুলে ফেলে। মেয়েছেলের বাহারী সাজ পোশাক, জড়োয়া গহনা, প্রসাধন ইত্যাদি নানারকম টুকিটাকি জিনিস-

পত্র। বৃন্ধা নিজে হাতে তাকে মেয়েছেলের সাজে সাজায়। নিখাদ নিখুঁত ভাবে। পর্দার আড়াল থেকে যখন সে বেরিয়ে আসে পারসী সাহেব হাঁ করে চেয়ে থাকে। ভাবতে কষ্ট হয়, এই সেই খুশ বাহার। দিব্যি এক পরমা সুন্দরী রমনী। কাজলটানা চোখ, আঁকা ভুরু। ঠোঁটে গালে লাল গুলাবী আভা। গলায় সাতনরী হার, হাতে বাজুবন্ধ, মাথায় টায়রা কপালে টিকলি, কানে দুল, নাকে নাকছাবি কোমরে বিছা, পায়ে মল-একেবারে মোহিনী রূপা। মসুলের বিখ্যাত রেশমী বোরখায় দেহখানা ঢেকে নিয়ে খুশ বাহার বৃন্ধাকে অনুসরণ করে পথ চলতে থাকে। যেতে যেতে কয়েকটি অল্পবয়েসী যুবতীকে দেখিয়ে বৃন্ধা বলে, জোয়ান মেয়েরা কেমন করে পাছা দুলিয়ে চলছে একবার সামনের দিকে তাকিয়ে দেখ। ঠিক ওমনি ঢং-এ পা ফেল। দেখবে, পাছাটা সুন্দর দুলতে থাকবে।

খুশ বাহার অল্পক্ষণের মধ্যেই মেয়েদের হাঁটার কায়দা রপ্ত করে ফেলে। বৃন্ধা বাহবা দেয়, বাঃ, এই তো শিখে ফেলেছ। চমৎকার। -এবার কী করে পুরুষের দিকে তাকাতে হবে আর আধো আধো নাকি সুরে কথা বলতে হবে—শিখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। কখনও কোনও পুরুষের দিকে সোজাসুজি তাকাতে নাই। সব সময়ই একটু তেরছা চোখে তাকাবে। তাতে আরও সুন্দর দেখায়। লাস্যময়ী মনে হয়।

হারেমের সামনে এসে দাঁড়াতেই খোজা-সর্দার পথ রুখে দাঁড়ায়। বাইরের অচেনা কোন মেয়েছেলেকে সে ঢুকতে দেবে না। বলে, হুকুম নাই। যদি একে অন্দরে নিয়ে যেতে হয় খলিফার চিঠি চাই। না হলে ফিরে যেতে হবে। অথবা একে বাইরে রেখে তুমি একা ভিতরে যেতে পার।

বৃন্ধা বলে, একি কথা বলছো গো, ভালো মানুষের পো। এতকাল আমি সুলতানের নকরী করছি। আমাকে তোমার বিশ্বাস নাই?

—বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, বুড়ি মা। সুলতানের কড়া হুকুম: —বাইরের কোনও মেয়েকে ঢুকতে দেব না।

—কিন্তু তুমি কি জান, এ মেয়েটি কে? সুলতানের বোন দাহিয়ার জন্য সদ্য কেনা হয়েছে এই বাঁদীকে। এখন তুমি যদি একে আটকাও। তাহলে কি কাণ্ড হবে একবার ভেবে দেখ। রেগে-মেগে তিনি হয়তো তোমাকে শূলেই চাপাবেন। অথবা গলা ধাক্কা দিয়ে দূর করে দেবেন। এখন ভেবে চিন্তে বল, কী করবে।

বৃন্ধার কথায় খোজা-সর্দার থতমত খেয়ে যায়। মুখে কথা সরে না। এই ফাঁকে বৃন্ধা খুশ বাহারের হাত ধরে বলে, এস বাছা, ভিতরে এস। বুড়ো খোজা-সর্দারের বাহাত্তুরে রোগ হয়েছে। ওর কথায় কিছু মনে করো না, মা।

খোজা-সর্দারকে আর কোনও বাধা দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে খুশ বাহারকে প্রায় টানতে টানতেই অন্দরে নিয়ে যায় সে। হারেমের নিরাপদ মহলে এসে বৃন্ধা বলে, বাবা, এই হারেমে তোমার জন্য আলাদা একখানা কামরা আমি ঠিক করে রেখেছি। তোমাকে নিশানা বাৎলে দিচ্ছি, তুমি সোজা চলে যাও সেই ঘরে। আমি তোমার সঙ্গে যাবো না॥

এই বলে বৃন্ধা বোঝাতে থাকে, ঐ যে দরজাটা দেখছ, ঐ দরজা দিয়ে

ভিতরে ঢুকে যাও। দেখবে একটা লম্বা দোড়াতি বারান্দা। সেই বারান্দার শেষে গিয়ে বাঁদিকে ঘুরে যাবে। তারপর দেখবে পথটা ডানদিকে ঘুরে গেছে। তুমিও ঘুরে যেতে থাকবে। আবার ডানদিকে ঘুরতে হবে। এবার দেখবে পাশাপাশি অনেকগুলো দরজা। গুণে গুণে প্রথম পাঁচখানা ছেড়ে দিয়ে ছয়ের দরজাটা খুলবে। ঐখানেই তোমার ঘর। কী? মনে থাকবে তো? তুমি যাও, ঘরে বিশ্রাম করগে। আমি খুশ নাহারকে যথা সময়ে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব'খন। তারপর সুযোগ মতো খোজা আর প্রহরী-দের অলক্ষ্যে তোমাদের দুজনকে প্রাসাদ থেকে পাচার করে দেব এক সময়। তাহলে ঠিক আছে, এবার তুমি যাও, কেমন?

খুশ বাহার ঘাড় নেড়ে বলে, আচ্ছা।

দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই সে দেখে বিরাট লম্বা একটা বারান্দা। বারান্দাটার শেষ প্রান্তে এসে সব গুলিয়ে যায়। বাঁদিকেও একটা পথ ডান দিকেও একটা পথ। কোন দিকে বাঁক নিতে হবে কিছুতেই আর মনে পড়ে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবে। তারপর ডানদিকের পথ ধরে চলতে থাকে এবার পথটা বাঁদিকে ঘুরে গেছে। খুশ বাহার মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই পথে চলে। যেতে যেতে দেখতে পায় পাশাপাশি অনেকগুলো দরজা মুখে তার হাসি ফুটে ওঠে। যাক, বাবা, এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ পাওয়া গেল। গুণে গুণে প্রথম পাঁচটা দরজা ছেড়ে দিয়ে ছয়-এর দরজাটা খুলে ভিতরে ঢকে পড়লো সে।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

পরদিন দুশো ছেচল্লিতম রজনী:

আবার সে বলতে শুরু করে।

সে দেখল, বিরাট বিশাল একটা মহল-সদৃশ ঘর। মাথার ওপরে একটা ঘেরা-টোপ গম্বুজ। তার চারপাশে সূক্ষ্ম কাজ করা। নানা বর্ণের। নানা ঢং-এর। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। মাঝে মাঝে সোনার অক্ষরে বিখ্যাত সব সায়ের লেখা। চারপাশের দেওয়াল লালগুলাবী রেশম কাপড়ে মোড়া। জানলাগুলোয় জাফরীকাটা চিকনের পরদা। আর মেঝে জুড়ে অসংখ্য হিন্দুস্তানের কাশ্মীরি গালিচা। মেহগনি কাঠের টুলগুলোর ওপরে গামলা ভরা নানা জাতের মিষ্টি মিষ্টি ফল, হালওয়া, বরফী ইত্যাদি। সারা ঘরময় দামী আতরের খুশবু। ঘরের যেদিকেই চোখ ফেরায় সে, সেরা শিল্পীর হাতের ছাপ নজরে পড়ে।

খুশ বাহার বুঝতে পারে সে ভুল ঘরে ঢুকে পড়েছে। এতবড় প্রকাণ্ড ঘর কেউ নিভৃত শয়ন কক্ষ মনে করতে পারে না। ঘরে বসার মতো একটিই মাত্র আসন—মখমলের চাদরে ঢাকা একখানা সিংহাসন।

এ অবস্থায়, এত বড় প্রাসাদের হাজার হাজার ঘর দরজার মধ্যে কোথায় সে হাতড়ে বেড়াবে তার ঘর। বাইরের বারান্দায় ঘোরা-ফেরা করায় বিপদও থাকতে পারে। তাই সে আর অনর্থক সে-চেষ্টা নাকরে সিংহাসনের ওপরেই বসে পড়লো। ভাবলো, নসীবে যা আছে, হবে।

কিছুক্ষণ পরে খুশ বাহার কান খাড়া করে শোনে—কার যেন পায়ের চটির শব্দ ক্রমশ এই দিকেই এগিয়ে আসছে। বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব করতে থাকে। পলকের মধ্যেই এক বৃদ্ধা মহিলা এসে দরজার সামনে দাঁড়ায়। এই মহিলা—দাহিয়া, সুলতানের বোন।

দাহিয়া দেখতে পায়, একটি মেয়ে বোরখায় আপাদমস্তক ঢেকে সিংহাসনে বসে আছে। অবাক হয়ে সে কাছে এসে দাঁড়ালো। নরম গলায় খুশ বাহারকে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাগো মেয়ে, কে তুমি? আর এই হারেমের মধ্যে বোরখা ঢাকা দিয়েই বা বসে আছ কেন? এখানে তো আর পরপুরুষ আসতে পারবে না কেউ?

খুশ বাহার হকচকিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ভয়ে কাঁপতে থাকে। মুখে কথা সরে না।

দাহিয়া বেশ নরম গলাতেই আবার জিজ্ঞেস করে, কি গো বাছা, কথা বলছো না কেন? শরম কিসের? নকাব তোল, বোরখা খুলে ফেল। আহা, কী সুন্দর কাজল কালো ডাগর তোমার চোখ। অমন করে ঢেকে রাখতে আছে?

তবু খুশ বাহার কথা বলে না।

দাহিয়া কিন্তু রাগ করে না। বরং আরও মোলায়েম কণ্ঠে বলে, তুমি সুলতানের বাঁদী? কোনও কারণে কী তিনি তোমার ওপর চটে গিয়ে বরখাস্ত করে দিয়েছেন তোমাকে? তা যদি হয়ে থাকে, তুমি কিছু চিন্তা করো না, খলিফাকে বলে আবার তোমাকে বহাল করে দেব আমি। আমি কে জান? আমার নাম দাহিয়া—খলিফার সহোদরা বোন। আমার কোনও কথাই তিনি ঠেলতে পারেন না। সুতরাং কী হয়েছে, খুলে বল দেখি, বাপু।

তথাপি খুশ বাহার নিরুত্তর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

দাহিয়া ভাবে, এমন কোনও কথা সে বলতে চায়, যা অন্য কোনও দাসী চাকরানীর সামনে বলা যায় না। সঙ্গের দাসীটাকে চোখের ইশারা করতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দাহিয়া আশা করতে থাকে, এবার নিশ্চয়ই সে মুখ খুলবে। কিন্তু খুশ বাহার রা কাড়ে না। দাহিয়া আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে খুশ বাহারের। এক রকম প্রায় জোর করেই টেনে বোরখা খুলে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। খুশ বাহার প্রাণপণে শক্ত করে চেপে ধরে থাকে—বোরখা সে খুলতে দেবে না। দাহিয়ার সঙ্গে এক রকম ধস্তাধস্তি করতে হয় তাকে।

দাহিয়ার ভুরু কুঁচকে ওঠে, জাপটা জাপটি করার সময় সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে, তার বুকটা একেবারে ছেলেদের মতো সমান। এই বয়সের মেয়েদের বুক ডাঁসা ডালিমের মতো হয়। কিন্তু ডালিম দূরে থাক ডুমুরেরও চিহ্ন নাই।

দাহিয়া গম্ভীর হয়ে বলে, বোরখা খুলে ফেল। তা না হলে খুব খারাপ হবে।

খুশ বাহার ভাবে, আর উপায় নাই। এবার সে চুপ করে থাকলে দাহিয়া তাকে ছেড়ে দেবে না। হয়ত খোজাকে ডেকে জোর করে খোলাবে। তখন সব জানাজানি হয়ে যাবে। খুশ বাহার আর কালক্ষেপ না করে হাঁটু গেড়ে বসে দাহিয়ার পা দুটো জড়িয়ে ধরে, আপনি আমাকে বাঁচান।

—আহা-হা, ওঠ। আমি তো তোমাকে আগেই ভরসা দিয়েছি, বাছা, তোমার কোনও ভয় নাই। যাক, সব সত্যি কথা খুলে বল দেখি, তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? এবং কেন?

খুশ বাহার কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, মালকিন, আমি মেয়ে নই—আমার নাম খুশ বাহার। মেয়েছেলের ছদ্মবেশ না ধরলে হারেমে ঢুকতে পারবো না তাই আমার এই সাজ।

—কিন্তু পর পুরুষ হয়ে হারেমে ঢোকার কি সাজা জান?

—জানি, প্রাণদণ্ড। কিন্তু এছাড়া আমার কোনও উপায় ছিল না। তাই নিজের জান কবুল করতে হতে পারে জেনেও আমি এখানে এসেছি।

—কিন্তু কেন?

—আমার বিবি আমার চোখের মণি, বুকের কলিজা এই হারেমে বন্দী হয়ে আছে। তাকে উদ্ধার করতে না পারলে সেও বাঁচবে না, আমিও মরে যাবো।

দাহিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকায়, তার মানে?

খুশ বাহার কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলতে থাকে, আমার বিবির নাম খুশ নাহার। আমার বাবা বাঁদীবাজার থেকে নাহার আর তার মাকে কিনে এনেছিলেন। সে অনেক দিনের কথা—আমার সবে জন্ম হয়েছে, তখন নাহারও তার মা-এর কোলের সন্তান। ছোট থেকে আমরা এক সঙ্গে হেসে খেলে মানুষ হয়েছি। বাবা মা-র বাসনা ছিল, বড় হলে আমাদের শাদী দিয়ে দেবেন। যখন আমার বার বছর বয়স তখন আমাদের শাদী হয়।

নাহারের মতো সুন্দরী রূপসী সারা কুফাতে আর দুটি নাই। বোধহয় এই জন্যেই সুলতানের সুবাদারের 'সুনজর' পড়েছিল তার উপর। ছলে কৌশলে সে তাকে চুরি করে দামাসকাসে চালান করে দেয়। এখন সে খলিফার এই হারামে বন্দী হয়ে আছে। সুবাদার ভেট হিসাবে নাহারকে পাঠিয়েছে খলিফার কাছে। লোকটা এমনই মিথ্যেবাদী, খলিফাকে মিথ্যে করে জানিয়েছে, নাহারকে সে এক সওদাগরের কাছ থেকে নায্য দামে কিনেছে। নাহার নাকি কোনও শাহ বাদশাহর ঘরের মেয়ে। সব ঝুট্‌!

—হাতে তুড়ি বাজাতেই সেই দাসটা দাহিয়ার পাশে এসে দাঁড়ায়।
—জলদি, ছুটে যা, খুশ নাহারের কামরায়। গিয়ে বল, আমি ডাকছি, সে যেন এক্ষুণি এসে দেখা করে।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো সাতচল্লিশতম রজনী:

দ্বিতীয় প্রহরে আবার সে বলতে শুরু করে।

দাহিয়া রোরুদ্যমানা খুশ বাহারের মাথায় হাত রেখে বলে, চোখের পানি মুছে ফেল, বেটা। আমি যতক্ষণ জিন্দা আছি, তোমার কোনও ডর নাই। সব আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার বিবিকে তুমি ফিরে পাবে। আমার ভাই খলিফা, তিনি ধর্মপ্রাণ সুলতান। এতবড় অধর্ম তিনি সইবেন না। অন্যের বিবি বোন তিনি কেড়ে এনে ভোগ করেন না। এত

বড় অপবাদ তাকে কেউ কোনও দিন দিতে পারেন নি। আজ যদি কুফার সুবাদারের শয়তানীর জন্য তার নাম যশে এতটুকু আঘাত লাগে, আমি বলে দিচ্ছি বাছা, সে-সব তিনি বরদাস্ত করবেন না।

এদিকে যখন এই সব কান্ড চলছে বুঢ়া তখন খুশ নাহারকে বলছে, আমার সঙ্গে চল, বেটা। তোমার চোখের মণিকে আমি হারেমের অন্দরে এনে একটা ঘরে লুকিয়ে রেখেছি। দেখবে চল।

খুশ নাহারের আর তর সয় না। আনন্দে দিশাহারা হয়ে পড়ে। কিন্তু খুশ বাহারের জন্য যথানির্দিষ্ট কামরায় গিয়ে যখন দেখে, সে-ঘরে সে নাই ভয়ে শিউরে ওঠে।

বুঢ়া বলে, সর্বনাশ—নিশ্চয়ই সে নিশানা ভুলে গেছে। হয়তো সারা হারেমে চরকীর মতো ঘুরপাক খাচ্ছে! এখন কী হবে? এত বড় মহল—কী করে তাকে খুঁজে বের করা যাবে? তুমি বাছা ঘরে ফিরে যাও। আমি দেখছি, কোথায় গেল সে।

দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে খুশ নাহার আবার ঘরে ফিরে আসে। একটুক্ষণ পরে দাহিয়ার দাসী এসে বলে, শাহজাদী দাহিয়া আপনাকে তলব করেছেন।

এবার সে আরও ভয় পায়। নির্ঘাৎ খুশ বাহার দাহিয়ার হাতে ধরা পড়েছে। আর রক্ষা নাই, তার গর্দান যাবে। যাই হোক, দাহিয়া ডেকেছেন, দেরি করা চলে না। খুশ নাহার অসংবৃত বেশবাস নিয়েই, খালি পায়ে, উদ্‌ভ্রান্তের মতো মেয়েটির পিছনে পিছনে অনুসরণ করে চললো। সেই প্রকাণ্ড ঘরটায় ঢুকতেই হাসতে হাসতে ছুটে এসে দাহিয়া খুশ নাহারকে জড়িয়ে ধরে। প্রায় হিড় হিড় করে টানতে টানতে সিংহাসনের পাশে নিয়ে গিয়ে বলে, কী? চিনতে পারছ?

খুশ নাহার সলজ্জভাবে ঘাড় নাড়ে। দাহিয়া বলে, এইতো যুগলে মিলন ঘটিয়ে দিলাম, এবার মিঠাই খাওয়াও।

খুশ বাহারের মুখে হাসি ফোটে। দাহিয়া বলে, আমরা আর কেন পথের কাঁটা হয়ে থাকি। তোমরা এবার বিশ্রম্ভালাপ কর। আমি এখন চলি।

দাসীকে সঙ্গে নিয়ে দাহিয়া বিদায় নিল। সঙ্গে সঙ্গে খুশ নাহার খুশ বাহারের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলো। কাঁদলো খুশ বাহারও। অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে বুকের বোঝা হালকা করলো দুজনে।

প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে দাহিয়া ফিরে এসে দেখে দুজনে দুজনের কাঁধে মাথা রেখে গভীর আবেশে নিথর নিস্পন্দ হয়ে আছে। দুজনের গাল বেয়ে ঝরে পড়ছে আনন্দাশ্রুধারা। দাহিয়া বললো, নাও, এবার একটু চাঙ্গা হয়ে নাও। তোমাদের জন্যে দামী সরাব এনেছি। খাও মৌজ কর। তোমাদের পুনর্মিলন সুখের হোক—আনন্দের হোক।

খুদে দাসীটা মদের পেয়ালা ভর্তি করে দুজনের হাতে তুলে দেয়।

দাহিয়া বলে, আজ শুধু খানা-পিনা আর গান বাজনা চলবে, কি বল? তোমরা নিশ্চয়ই ভালোবাসার গান গাইতে জান?

দুজনেই ঘাড় নেড়ে জানালো, হ্যাঁ জানে পেয়ালায় চুমুক দিয়ে

ওরা গুনগুন করে গান ধরে।

গানের মূর্ছনায় সকলেই বিভোর। কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নাই। আরও কতক্ষণ কাটতো তার ঠিক নাই—হঠাৎ দরজার পর্দা সরে গেল, ঘরে ঢুকলো খলিফা। গান থেমে গেল মুহূর্তে তিনজনেই তড়াৎ করে উঠে দাঁড়িয়ে আভূমি আনত হয়ে খলিফাকে কুর্নিশ জানাতে থাকলো।

সুলতান স্মিত মুখে সিংহাসনে বসে বললেন, বেশতো চলছিল গান, থামালে কেন, সুন্দরীরা?

তারপর দাসীটিকে ইশারা করে বললেন, আমাকেও এক পেয়ালা দে। মদের আসরে মদ না খেয়ে মজা দেখতে নাই।

দাসী পেয়ালা পূর্ণ করে সুলতানের সামনে বাড়িয়ে দিল। সুলতান সরাবের পেয়ালা ঠোঁটে স্পর্শ করে বললো, এতদিন বাদে আমার খুশ নাহার সেরে উঠেছে—সেই আনন্দে আজ আমি মৌজ করবো।

সুলতান ছোট ছোট চুমুকে কাপটা শূন্য করে দিল। দাসী আবার পূর্ণ করে দেয় এবার সুলতানের নজর পড়ে বোরখা-ঢাকা সুন্দরীর দিকে। নাকাবের ফিনফিনে পরদার নিচে তার কুসুম পেলব গাল, কাজল কালো ডাগর চোখ, আঙ্গুরের মতো অধর পরিষ্কার দেখা যায়। দাহিয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, মেয়েটি তো ভারী খুব সুরৎ! কে?

দাহিয়া বলে, খুশ নাহারের প্রাণের বন্ধু। ওরা কেউ কাউকে না দেখে দুদণ্ড থাকতে পারে না। একজনের বিরহে দুজনেরই নাওয়া খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

সুলতান খুশ বাহার-এর মুখ থেকে নাকাব সরিয়ে দেয়। অদ্যাবধি তার দাড়ি গোঁফ ওঠেনি। মুখে মেয়েলী ভাবটা ষোল আনাই বজায় আছে। তার ওপরে প্রসাধনের প্রলেপ পড়েছে। সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। আপনাদের হয়তো স্মরণ আছে, খুশ বাহারের বাঁ গালে একটা তিল আছে। সারা মুখের গোলাপী আভার মধ্যে ঐ এক বিন্দু কালো তিল কী অপূর্ব সুন্দর-ই যে মনে হয় চোখে না দেখলে বোঝানো যায় না। সুলতান এক ভাবে খুশ বাহারের মুখের দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে। নির্মেঘ নীল আকাশের গায়ে শুকতারার মতো জ্বলজ্বল করতে থাকে ঐ বিন্দুসম কৃষ্ণ-কালো তিলটি।

ইয়া আল্লাহ, সুলতান উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, আজ থেকে এই নতুন বাঁদীকে আমার রক্ষিতা করলাম। খুশ নাহারের পাশে, ভালো করে সাজিয়ে একটা ঘরে ওর থাকার ব্যবস্থা করে দাও। এখন থেকে সে পাবে শাদী করা বেগমের মর্যাদা।

দাহিয়া বলে, বাঃ, চমৎকার। এর যা রূপের জৌলুস তাতে এই মর্যাদা দিয়ে তুমি সুবিচারই করেছ, ভাই জান।... এই ব্যাপারে তোমাকে একটা ছোট্ট কিসসা শোনাই,—গল্পটা পড়েছিলাম এক নামজাদা লেখকের কিতাবে।

গল্পটা কী, শুনি।

দাহিয়া বলতে শুরু করে:

শুনুন ধর্মাবতার, কুফা শহরে এক সম্ভ্রান্ত সওদাগর বাস করতো—।

তার একটি মাত্র পুত্র সন্তান—নাম খুশ বাহার। ছোট বেলা থেকে সে তাদের বাড়ীর বাঁদীর এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে খেলা-ধুলো করে মানুষ হতে থাকলো। এইভাবে একদিন তারা কৈশোর—কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিল। এতদিনে খুশ বাহারের সাথীর দেহে যৌবনের ঢল নেমেছে। তার রূপের জেল্লায় কুফার সুবাদার লুব্ধ হয়ে এক বজ্জাৎ বুড়িকে তার পিছনে লাগালো। ধূর্ত শয়তান বুড়িটা ছল চাতুরী করে মেয়েটিকে সুবাদারের প্রাসাদে নিয়ে আসতে পারলো। তারপর সেই বদমাইশ সুবাদার তার নিজের কাজ হাসিল করার জন্য তাকে সুলতানের কাছে ভেট পাঠিয়ে দিল।

সাথীকে হারাবার পর থেকে খুশ বাহার-এর নাওয়া খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলো, সাথীকে খুঁজে পাওয়ার জন্য।

অবশেষে একদিন সে দামাসকাসে এসে সন্ধান পেল তার প্রিয়তমা সুলতানের হারেমে বন্দী হয়ে দিন কাটাচ্ছে। নানা ফিকির করে সে একদিন হারেমের মধ্যে ঢুকে পড়লো। তার ভালোবাসার সঙ্গে মিলনও হলো। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে ওরা যখন আনন্দে আত্মহারা সেই সময় সুলতান খবর পেয়ে উম্মত্ত তলোয়ার হাতে ছুটে এসে এক কোপে দুজনেরই মাথা নামিয়ে দিল। কোনও কথাই সে শুনতে চাইলো না, শুনলো না।

লেখক গল্পটা এখানেই শেষ করেছেন। কোনও মন্তব্য করেন নি। তাই ভাইজান, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, ঐ অবস্থায় তুমি থাকলে, তোমার বিচারে তুমি কী করতে?

সুলতান আবদ্ অল মালিক ইবন মারবান বললো, এ ব্যাপারে আমার কোন দ্বিধা নাই, সেই সুলতান ভীষণ অন্যায় কাজ করেছে। যে কোনও লোকেরই গর্দান নেবার আগে কতবার চিন্তা করা উচিৎ। কারণ প্রয়োজন হলে সহস্রবার চেষ্টা করেও আবার আমরা তার প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারি না। সুতরাং প্রাণ নেবার সময় অত তাড়াহুড়া করা তার সঙ্গত হয়নি। যদি ওদের বলার সুযোগ দিতেন, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, তলোয়ারের বদলে ওদের গলায় পুষ্পহার পরিয়ে দিতেন তিনি। প্রথমতঃ তারা আশৈশব গভীর প্রেমে আবদ্ধ। দ্বিতীয়ত তারা তখন তার প্রাসাদে মেহেমান। তৃতীয়তঃ সুলতান সব সময়ই স্থিতধী, বিচক্ষণ, ন্যায় বিচারক হবেন। এই সব কথা বিবেচনা করে আমি ঐ সুলতানকে অযোগ্য অপদার্থ ছাড়া কিছুই বলতে পারি না।

শাহজাদী দাহিয়া সুলতানের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে। ধর্মাবতার, তুমি না জেনে, তোমার নিজের মামলার রায় তুমি আজ নিজেই দিয়ে দিলে! আমাদের পুণ্যাত্মা পিতার তুমি যোগ্য সন্তান—তোমার মুখেই এই সব কথা সাজে।

সুলতান অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, কী? কী ব্যাপার? কিছুই তো বুঝতে পারছি না বোন! ওঠ, কী হয়েছে, নির্ভয়ে বল, তুমি তো জান, কোনও অন্যায় অবিচার আমি সইতে পারি না।

খুশবাহারকে দেখিয়ে দাহিয়া বলতে থাকে, বোরখা ঢাকা এই মেয়েটি আসলে ছদ্মবেশী খুশ বাহার। প্রিয়তমার বিরহে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে নিজের

জীবন তুচ্ছ করে দুর্ভেদ্য পাহারা পেরিয়ে সে এই হারেমের অন্দরে ঢুকে পড়েছে। জানে, ধরা পড়লে নির্ঘাৎ মৃত্যু, তবু, ভালোবাসার টান এমনই বস্তু, কিছুই সে পরোয়া করেনি। কুফার শয়তান সুবাদার ইউসুফ অল থাফাকী খুশ বাহারকে চুরি করে তোমার কাছে ভেট পাঠিয়েছে। তার দুরাশা, তুমি তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আরও-উঁচু পদে বহাল করবে। লোকটা ডাহা মিথ্যেবাদী। সে তোমাকে লিখেছিল, খুশ নাহারকে সে দশ হাজার দিনারে এক সওদাগরের কাছ থেকে কিনেছে। আমি চাই তুমি তাকে সমুচিৎ সাজা দিতে কসুর করবে না। আর এই বাচ্চাদের ক্ষমা করে দেবে। এদের তো কোনও গুনাহ নাই, একটাই এদের অপরাধ, দুজনে দুজনকে গভীরভাবে ভালোবাসে এরা। যাই হোক, এখন এরা তোমার মেহেমান। তোমার আশ্রয়ে এসেছে।

খলিফা বললো, আমার জবান একটাই। তার কোনও নড়চড় হয় না। খুশ নাহার, যা শুনলাম সব সত্যি? এই খুশ বাহার তোমার ভালোবাসা?

খুশ নাহার মাথা হেঁট করে ঘাড় নেড়ে বলে, এর চেয়ে বড় সত্যি আমার কাছে আর কিছুই নাই, জাঁহাপনা।

খলিফা চিৎকার করে উঠলেন, সাবাস্! তোমাদের পুনর্মিলনে আমিই সবচেয়ে খুশি হলাম। যাও তোমরা মুক্ত।

তারপর খুশ বাহারের দিকে তাকিয়ে খলিফা বললো, আমি শুধু জানতে চাই, বাছা, কি করে তুমি হারেমের পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে দুর্ভেদ্য হারেমের অন্দরে ঢুকতে পেরেছ। আর কি করে বা জানলে, তোমার বিবি বন্দী হয়ে আছে এই হারেমে?

খুশবাহার করজোড়ে বললো, আমি অকপটে সব কথাই আপনাকে খুলে বলছি, আমার গুস্তাকী মাফ করবেন, হুজুর।

এই বলে সে আদ্যোপান্ত সব কথাই সবিস্তারে সুলতানকে খুলে বললো। বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হলো সুলতান। পারসী সাহেবের কাছে লোক পাঠালো। বললো, খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে কাড়া নাকাড়া বাজিয়ে বাদশাহী কেতায় তাকে এখানে নিয়ে এস।

খুশ নাহার আর খুশ বাহারকে সাতটা দিন মহা আদর যত্নে প্রাসাদে রেখে নানা মূল্যবান উপহার উপঢৌকন সঙ্গে দিয়ে কুফায় স্বদেশে পাঠিয়ে দিল সুলতান। কুফার সুবাদারকে বরখাস্ত করে তার জায়গায় খুশ বাহারের বাবা সওদাগর বাহারকে বহাল করলো।

শাহরাজাদ চুপ করলো। সুলতান শাহরিয়ার মুগ্ধ হয়ে বলে, কী সুন্দর তোমার কিস্‌সা, শাহরাজাদ। কিন্তু একটা জিনিস একটু খটকা লাগলো। ভালোবাসার সোহাগ অনুরাগের বিশদ বিবরণগুলো তুমি পাশ কাটিয়ে গিয়েছ। এবং তা ইচ্ছে করেই।

শাহরাজাদ স্মিত হাসে, পরের যে কাহিনীটা বলবো তার মধ্যে ওসব মালমসলা পুরোদস্তুর পাবেন, জাঁহাপনা। যদি ধৈর্য ধরে শোনেন তবে এরপর আলা-অল-দিন আবু সামাতের কাহিনী শোনাবো। কিন্তু তাতে আপনার চোখ থেকে ঘুম বিদায় নেবে।

—তা হোক, তুমি বল। অনিদ্রা রোগে ভুগে মরবো সে-ভি আচ্ছা,

এমন মজাদার কিস্‌সা আমি না শুনে ছাড়বো না।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ বলে, আজ আর নতুন কাহিনী শুরু করার সময় নাই। এখন ঘুমান। কাল রাতে শুরু করা যাবে।

দুশো পঞ্চাশতম রজনী:

নতুন কাহিনী বলতে শুরু করে সে।

কোনও এক সময়ে কায়রো শহরে এক সদাশয় সম্ভ্রান্ত সওদাগর বাস করতো। শহরের সমস্ত সওদাগররা তাকে খুব মান্য করে চলতো। তার সরলতা সততা বিনম্র ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করেছিল।

এক জুম্মাবারে নামাজ-এর আগে সে হামামে গিয়ে গোসলাদি সেরে নাপিতের কাছে গিয়ে ক্ষৌরকর্ম সেরে নিল। মাথা ন্যাড়া করে, গোঁফ চেঁছে ফেলে সে শাস্ত্রাচার পালন করতো সদা সর্বদা। নাপিতের কাছ থেকে আরশী নিয়ে মাথামুণ্ড সব ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখলো, যথারীতি কামানো হয়েছে কিনা। প্রায় সাদা লম্বা দাড়ির দিকে নজর পড়তে মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ মনে ভাবতে থাকে; বয়স বিকেল হতে চলেছে। এখনও, খুঁজলে কাঁচা দাড়িও পাওয়া যাবে অনেক। কিন্তু আরও কিছুকাল পরে, চেষ্টা করেও হয়তো আর কাঁচা দাড়ি খুঁজে বের করা যাবে না। পলিত কেশ বার্দ্ধক্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর বার্ধক্যই মৃত্যুকে কাছে টেনে আনতে থাকে। সে ভাবে, হায় বেচারী সামস্‌-অল-দিন, দিন ফুরিয়ে এল, সন্ধ্যা হতে চললো। এখন কবরে শয্যা নিতে হবে। অথচ জীবনে কী তুমি পেলে? সারা জীবন ধরে যদি একটা ছেলে-মেয়েরই মুখ না দেখলে তবে কার জন্যে এই বিত্ত-বৈভব রেখে যাচ্ছো? কে খাবে! মোমের শিখার মতো জ্বলতে জ্বলতে একদিন তুমি নিঃশেষ হয়ে যাবে। বাস্‌ সেখানেই তোমার জমানার ইতি হয়ে গেল। আর কেউ মনে রাখবে না তোমাকে। কেউ বইবে না তোমার বংশের ধ্বজা।

বেদনা বিধুর চিত্তে সে-দিনের মতো সে মসজিদে নামাজ সারে। তারপর বাড়ি ফিরে আসে। বিবি বসেছিল তার প্রতীক্ষায়। যথারীতি সে খানা-পিনা বানিয়েছে। এক সঙ্গে বসে দুজনে খাবে। স্বামীর পায়ের শব্দ পেয়ে সে ছুটে যায়। হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে, আজ এত দেরি হলো কেন, গো?

সওদাগর বিবির উচ্ছলতায় সাড়া দিতে পারে না। গম্ভীর মুখে বলে, কী হবে অত তাড়াহুড়া করে। আমার জীবনে আনন্দ বলতে আর কী আছে? যে-কটা দিন বাঁচি, কোনওরকমে দিনগত পাপক্ষয় করে কাটানো ছাড়া আর কি বা গতি আছে।

সওদাগর বিবি স্বামীর এই উদাস-বিবাগী কথায় কেমন যেন ঘাবড়ে যায়। বলে, তোমার কী হয়েছে গো, হঠাৎ এইরকম কথাবার্তা বলছো কেন?

—কেন বলছি? জান না? তুমিই তো আমার সব দুঃখের একমাত্র কারণ। প্রতিদিন আমি বাজারে যাই, দেখি আমারই সমব্যবসায়ীরা তাদের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে আসে দোকানে। কত আনন্দ স্ফূর্তি করে। আমার বুকের মধ্যে হু হু করে যায়। মনে হয়, আমার এই নিঃসন্তান

জীবন উষর এক মরুভূমি। এই ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো।

সওদাগর বিবি সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে, ওসব নিয়ে মন খারাপ করতে নাই। আল্লাহ যাকে যে ভাবে রাখেন তাতেই সুখী থাকতে হয়। এস, টেবিলে খানা সাজিয়েছি। হাত মুখ ধুয়ে খাবে চল।

সওদাগর প্রায় চিৎকার করে ওঠে, আল্লাহর দোহাই, আমাকে বিরক্ত করো না। আমার কোনও ক্ষিদে তেষ্টা নাই। আর তাছাড়া তোমার মতো আঁটকুড়ির হাতে আমি খেতেও চাই না। আজ আমি নিঃসন্তান—সে শুধু তোমার কারণে। শাদীর পর চল্লিশটা বসন্ত বয়ে গেল। একটা ছেলে বা মেয়ে বিয়াতে পারলে না তুমি। আর একটা বিবি আনবো ঘরে, তাতেও তুমি সব সময় বাদ সেধেছ। আমি নরম প্রকৃতির মানুষ। তোমার বারণ আমি ঠেলতে পারিনি। তুমি বরাবরই আমাকে ধোঁকা দিয়ে এসেছ, 'আর কিছু দিন সবুর কর, আল্লাহ নিশ্চয়ই মুখ তুলে চাইবেন।' কিন্তু তুমি জন্মাবধি বন্ধ্যা আল্লাহ কি করে মুখ তুলে চাইবেন! সব জেনে শুনেও তুমি আমাকে অন্য মেয়ে ঘরে অনতে দিলে না। তোমার কি উচিৎ ছিল না—আমার মুখে হাসি ফোটানো? তুমি কি নিজে থেকেই বলতে পারতে না—'না আর কোনও আশা নাই, এবার তুমি আর একবার শাদী কর।' আজ থেকে কসম খাচ্ছি, তোমার সঙ্গে আর শোব না। সহবাস করবো না। তার চেয়ে বরং লিঙ্গটা কেটে ফেলব। তোমাকে ছুঁতে আমার ঘেন্না হয়। তুমি আর আমার সামনে এস না। তোমার মতো বাঁজা-মেয়ের মুখ দেখলেও পাপ হয়।

সওদাগরের এই অপমানকর কথায় তার বিবি রণমূর্তি ধারণ করলো, মুখ সামলে কথা বল, বলে দিচ্ছি। নিজের মুরোদে কুলায় না, সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপাতে লজ্জা করে না তোমার। তুমি একটা ধ্বজভঙ্গ ক্লীব। আমার জীবনটা ছারখার করে দিয়েছ। একটা দিনের জন্য মিলনের আনন্দ দিতে পারনি। আজ তুমি আমাকে বাঁজা আঁটকুড়ি বলে গালাগাল দিচ্ছ। কিন্তু কেন আমি বাঁজা, কেন আমি আজ নিঃসন্তান, সে কথা ভেবে দেখেছ কখনও। সে সবই তোমার হীন বীর্যতার কারণে। আমার কোনও দোষ নাই। তোমার যদি ক্ষমতা থাকতো, সন্তান আমি পেটে ধরতাম। মুখে লম্বা লম্বা বাত ছাড়ার আগে নিজের চিকিৎসা কর। শুক্রসঞ্জীবনী দাওয়াই এনে খাও। হয়তো অসুখ সেরেও যেতে পারে। যদি সারে, যদি বীর্যে জীয়ন্ত বীজ বেরোয়, তাহলে দেখে নিও, আমি মা হতে পারি কি না।

বিবির বচনে সওদাগর চুপসে গেল। আমতা আমতা বললো, হ্যাঁ, তা কথাটা নেহাৎ মিথ্যে বলনি বোধ হয়। হয়তো আমারই দোষ। মনে হয় আমার বীর্যের তেজ মরে গেছে। তুমি কি জান বিবিজান, তেমন কোনও দাওয়াই কোথাও পাওয়া যায় কিনা, যা খেলে শরীর চনমন করে ওঠে, এবং বীর্য দৃঢ় হয়?

বিবি পরামর্শ দেয়, তুমি হেকিমের কাছে যাও। সে-ই তোমাকে বাৎলে দিতে পারবে।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দুশো একান্নতম রজনীতে আবার সে শুরু করে :

—খোদা হাফেজ, সওদাগর বলে, কাল সকালেই আমি দাওয়াখানায় যাবো। দেখি কোনও দাওয়াই পাই কিনা।

পরদিন সকালে দোকান খোলার সঙ্গে সঙ্গে সওদাগর এক দাওয়াখানায় এসে দাঁড়ালো। তার হাতে একটা চিনে মাটির বাটি—ওষুধ নেবে বলে নিয়ে এসেছে। দোকানের মালিক সালাম আলেকুম জানিয়ে বললো, আজ সকালে আপনিই আমার প্রথম খদ্দের হতে এলেন, কী আমার সৌভাগ্য! তা সওদাগর সাহেব, কী দাওয়াই দেব?

সওদাগর তার চিনে মাটির বাটিটা পাশে রেখে বললো, আমি এমন একটা দাওয়াই চাই—যা খেলে শরীরে তাগদ আসে, বাচ্চা পয়দা করার ক্ষমতা জন্মায়।

দোকানী সওদাগরের মুখে এ ধরনের কথা শুনবে কল্পনা করতে পারেনি। তাঁর মতো ধর্মানুরাগী ভাব-গম্ভীর ব্যক্তির মুখে একি কথা। না, এই সকালে তিনি রসিকতা করতে এসেছেন? ঠিক আঁচ করতে পারে না সে। যাইহোক, একটা লাগসই জবাব দিতে হবে। দোকানী বলে, ইস্, আপনি যদি কালকেও আসতেন, সওদাগর সাহেব! কাল পর্যন্ত অনেকখানি ছিল, অনেকগুলো খদ্দের এসে সবটুকু নিয়ে গেছে। দাওয়াইটার চাহিদা খুব বেশি। আপনি বরং এক কাজ করুন, পাশের দাওয়াখানায় দেখুন, হয়তো পেয়ে যাবেন।

সওদাগর আর একটা দাওয়াখানায় গেল। কিন্তু সে-ও ঠিক একই কথা বলে অন্য দোকানে খোঁজ করতে বললো। এই ভাবে এক এক করে বাজারের সব কয়টা দাওয়াখানাতেই সে খোঁজ করলো। কিন্তু সবাই মুচকী হেসে একই কথা বলে বিদায় করলো তাকে।

খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে ব্যর্থ মনে সে তার নিজের দোকানে এসে বসে। কিছুক্ষণ পরে সামসাম নামে এক দালাল এল তার কাছে। লোকটা মদ গাঁজা ভাঙ আফিং চরস খেয়ে সব সময় চুর হয়ে থাকে। এবং লোচ্চামীতে গুরুদেব। কিন্তু সামস অল-দিনকে সে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। তার সঙ্গে কখনও, ভাঁড়ামী বা বেলেল্লাপনা কিছু করতো না। তার সদাশয় বিনম্র ব্যবহার-এ সে মুগ্ধ না হয়ে পারতো না। কিন্তু আজকের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে সওদাগরের মেজাজ ঠিক নাই। কেমন যেন তিরিক্ষিভাব, কোনও কথারই ভালো করে জবাব দিচ্ছে না। নিশ্চয়ই কোনও অঘটন ঘটেছে। সামসাম জিজ্ঞেস করে, আজ অমন মন মরা হয়ে বসে আছেন কেন সওদাগর সাহেব?

সওদাগর বলে, আমার পাশে এসে বস সামসাম, শোন আমার দুঃখের কাহিনী। আমি শাদী করেছি আজ চল্লিশ বছর। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, একটা সন্তানের মুখ দেখলাম না আজ পর্যন্ত। আমার বিবি বলে, সব দোষ নাকি আমার। আমার বীর্যের দোষ আছে। সন্তান পয়দা করার ক্ষমতা নাই। আজ সারাটা সকাল সমস্ত দাওয়াখানায় খুঁজেছি, কিন্তু কোনও-খানেই সেই দাওয়াই পেলাম না। সবাই বলে কাল ছিল, আজ ফুরিয়ে গেছে। তাই খুব বিষাদ মনে বসে আছি। কিছুই ভালো লাগছে না।

সওদাগরের কথা শুনে সামসাম অবাক হলো না, মজাও পেল না। গম্ভীরভাবে বললো, কিছু চিন্তা করবেন না, দাওয়াই আমার বিলক্ষণ জানা আছে। আপনি আমাকে একটি দিনার দিন। আমি মালমসলা কিনে এনে নিজে হাতে বানিয়ে দিচ্ছি।

—ইয়া আল্লা, সওদাগর প্রায় চিৎকার করে ওঠে, তাও কি সম্ভব? আল্লাহর নামে হলফ করে বলছি, তুমি যদি সত্যিই আমাকে সন্তানের বাবা করে তুলতে পার তাহলে তোমার ভাগ্য আমি ফিরিয়ে দেব, শেখ। ঠিক আছে একটা কেন, এই নাও দুটো দিনার দিলাম। মশলাপাতি নিয়ে এস। বানাও দেখি কেমন সে ধন্বন্তরী দাওয়াই!

চিনে মাটির বাটিটা আর দুটি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে সামসাম বেরিয়ে গেল। লোফার সামসাম নিজেকে ভাবে সে একটা দিগগজ হেকিম। যা যা মসলাপত্র মনে করলো, কিনে নিয়ে ফিরে এল সে সওদাগরের দোকান। তারপর চললো তার দাওয়াই বানানোর পর্ব ঃ

একটার সঙ্গে আর একটা মশলা সে মিশিয়ে ফেলে পিষে গুঁড়ো করলো। সব শেষে খানিকটা মধু দিয়ে মেড়ে এক রকমের থক-থকে খানিকটা গোলা বানালো। দাওয়াই-এর বাটিটা সওদাগরের হাতে তুলে দিয়ে বললো, এই নিন একেবারে মোক্ষম জিনিস। খেলেই আবার নতুন যৌবন ফিরে পাবেন। রাতে শুতে যাবার ঠিক দুঘণ্টা আগে একমাত্রা খাবেন। কিন্তু তার আগে তিনদিন আপনাকে রোজ একটা করে পায়রার দোপিয়াঁজী খেতে হবে। বেশ ঝাল মসলা দিয়ে বানাতে বলবেন। আর খাবেন পাকা পোনার কালিয়া, ভেড়ার অণ্ডকোষ ভাজা। এর পর যদি আপনার শের-এর মতো তাগদ না আসে, যদি বাচ্চা পয়দা করার ক্ষমতা না জন্মায়, আপনি আমার এই দাড়ি উপড়ে ফেলবেন—আমার মুখে থুথু দেবেন।

এই বলে সামসাম বিদায় নিল। সওদাগর ভাবলো, লোকটা মদ ভাং খেয়ে আর মেয়ে-মানুষ নিয়েই সারাটা জীবন কাটাচ্ছে। এ ব্যাপারে তার ওপর ভরসা রাখা যায়। নিশ্চয়ই সে আনতাবড়ি কিছু একটা বানিয়ে দেয় নি। হয়তো কাজ হলেও হতে পারে। আর দেরি না করে সে তক্ষুণি বাড়ি চলে এল। বিবিকে সব কথা বললো। আগের রাগ সব জল হয়ে গেছে। আবার তারা এক সঙ্গে বসে খানাপিনা করলো। এক শয্যায় রাত কাটালো।

সামস অল-দিন যথাযথভাবে সামসামের নির্দেশ মেনে চলতে থাকলো। পায়রার দোপিয়াঁজী, পাকা পোনার কালিয়া, ভেড়ার অণ্ডকোষ ভাজা—প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় এই কয়টি খানাই প্রধান হয়ে উঠলো। তিনদিন পরে সে শোবার দুঘণ্টা আগে একমাত্রা দাওয়াই খেল। বেশ সুস্বাদু। কিছুক্ষণের মধ্যে শরীর গরম হয়ে উঠলো। যেন সে আবার তার হারানো যৌবন ফিরে পেয়েছে। ধাঁ করে বয়সটা তার চল্লিশ বছর কমে গেছে। সেদিন তার বিবি প্রথম বুঝতে পারলো যৌবনের স্বাদ। লোকটা যেন একটা বীর পুরুষ—শেরের মতো, তার শরীরটা থাবার মধ্যে পুরে নিল। সেই রাতে সওদাগর বিবি সত্যিই সন্তান সম্ভবা হলো। কিন্তু নিঃসংশয় হলো মাস তিনেক বাদে—সে যখন দেখলো, পরপর তিনটি মাস তার মাসিক ধর্ম আর হলো না।

যথা সময়ে সওদাগর বিবি একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করলো। ছেলেটি এমন হৃষ্টপুষ্ট চেহারার হলো, ধাই তো দেখে অবাক। বললো, সারা জীবন এই করে আসছি, কিন্তু এমন ডাগড়াই বাচ্চা কারো হতে দেখিনি। দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না—সদ্য হয়েছে। মনে হয়, বছরখানেক বয়স হবে।

বৃদ্ধা ধাই আল্লাহর নামগান করতে করতে বাচ্চাকে ধোয়ালো মোছালো। তারপর মায়ের কোলে দিয়ে বললো, ছেলেকে মাই খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও।

তিনদিন তিন রাত পরে পাড়াপড়শীর সকলকে মিঠাই বিতরণ করা হলো। বৃদ্ধা ধাই ইনাম নিয়ে চলে গেল। সাতদিনের দিন ঘরে নুন ছড়ানো হয়। সওদাগর ঘরে এসে বিবিকে বললো, কই গো ছেলের মা, দেখাও, আল্লাহর আশীর্বাদটা একবার নয়ন ভরে দেখি।

সওদাগর বিবি ছেলেকে তুলে ধরে। মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকে সওদাগর। —ইয়া আল্লাহ, কী সুন্দর! যেন আসমানের চাঁদ নেমে এসেছে আমার ঘরে। আর দেখ, বিবিজান, কত বড়টা হয়েছে! আচ্ছা, ছেলের কী নাম রাখবে?

—যদি মেয়ে হতো, সওদাগর বিবি বলে, তাহলে আমি একটা নাম দিতাম। ছেলের নাম তুমিই দাও।

বাচ্চাটার বাঁ উরুতে একটা ছোট্ট তিল দেখে সওদাগর আনন্দে লাফিয়ে ওঠে।—আমরা একে আলা অলদিন আবু সামাত বলে ডাকবো, কেমন?

সেই থেকে ছেলের নাম আলা-অলদিন আবু সামাতই হয়ে গেল। কিন্তু নামটা বেশ বড়সড় বলে সকলে ওকে আবু সামাত বলেই ডাকে। চার বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেকে দুটো ধাই আর তার মা বুকের দুধ খাওয়ালো। ঐ বয়সে সে ডাগড়াই সিংহ শাবকের মতো লাফাতে থাকে। পাড়ার আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাকে দেখে মুগ্ধ হয়। ভালোবাসে। কারণে অকারণে সওদাগরের বাড়ি এসে তারা ভিড় জমায়। ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করতে চায়। কিন্তু ঐ শিশু সামাতের ওসব বিলকুল পছন্দ নয়। কারো কোলেই সে থাকতে চায় না। কারো আদর চুম্বনই সে বরদাস্ত করতে পারে না। সওদাগর আর তার বিবিও পাড়া-পড়শীদের এই আদর-সোহাগ ভালো চোখে দেখে না। সওদাগর বলে, সামাতকে সামলে রাখবে। অন্য লোকের নজর লাগতে পারে।

সেইদিন থেকে আবু সামাতকে আর সকলের সামনে বের করা হলো না। অন্দরের এক নিভৃত কক্ষে রাখা হলো তাকে। আদর যত্নের কোনও ত্রুটি রাখলো না সওদাগর। একটা ছেলের জন্য পাঁচটা বাঁদী চাকরের ব্যবস্থা করা হলো। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করে। নামজাদা মৌলভীর হাতে তার শিক্ষা দীক্ষার ভার দেওয়া হয়। যথা সময়ে সে কোরান এবং নানা বিদ্যায় বিশারদ হয়ে ওঠে। শুধু লেখাপড়া নয় খেলা-ধুলাতে সে বেশ চৌকস হতে লাগলো। কিন্তু সবই তার একা একা—সবই লোক চক্ষুর আড়ালে—সেই নিভৃত কক্ষে।

এই ভাবে চৌদ্দটা বছর কেটে গেছে। আবু সামাতের গোঁফের রেখা

ফুটছে। একদিন চাকর খানা সাজিয়ে দিয়ে চলে গেছে। যাওয়ার আগে ঘরের দরজায় শিকল তুলতে সে ভুলে গিয়েছিল। দরজা খোলা পেয়ে সামাত এক পা এক পা করে ঘরের বাইরে আসে। এই নিভৃত বন্দী জীবন তার আর ভালো লাগে না। সে চায় মুক্ত আলো হাওয়া—মানুষের সাহচর্য।

এঘর ওঘর করতে করতে এক সময় সে চলে আসে তার মা-এর ঘরে। সেখানে তখন তার মা পাড়ার কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে খোশ গল্পে মশগুল। মেয়েগুলোও তন্ময় হয়ে গল্প শুনছিল। হয়তো কারো বেশ-বাস অসংবৃত হয়েও থাকতে পারে। হঠাৎ এক উঠতি বয়সের ছেলেকে ঘরে ঢুকতে দেখে সকলে সম্বিত ফিরে পায়। ক্ষিপ্র হাতে যে যার মতো বোরখা টেনে নিয়ে দেহ মাথা মুণ্ড ঢেকে ফেলে।

—ইয়া আল্লাহ, কী বে-সরম বে-ইজ্জতের কথা। বলা নাই কওয়া নাই, হুট করে মেয়েদের ঘরে ঢুকে পড়লো!

আবু সামাতের মা বলে, এ আমার ছেলে, আমার চোখের মণি। একে লজ্জা করার কী আছে? এতদিন সে দাসদাসীদের পরিচর্যায় মানুষ হয়েছে। বাইরের কোনও ছেলে মেয়ের সঙ্গে মিশতে দিইনি।

এই কথা শুনে মেয়েরা নাকাব সরিয়ে দেয়, তাই বলুন! তা এতদিন তো আপনার ছেলেকে দেখিনি কখনও। আপনার মুখে তার কথা শুনিওনি কোনওদিন।

সওদাগর বিবি উঠে গিয়ে ছেলেকে আদর করে চুমু খায়। বলে, বেটা, এখন তোমার ঘরে যাও।

বান্ধবীরা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েছে দেখে ছেলেকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিল।—ওর বাবা, ওকে বাইরে বেরুতে দেয় না। বদ ছেলেদের সঙ্গে মিশে খারাপ হয়ে যেতে পারে, এই তার ভয়। তাই সে একা একাই মানুষ হচ্ছে। ঘরের মধ্যেই তার নাওয়া খাওয়া খেলাধুলা লেখাপড়ার সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। যতদিন না সে বড় হয়—দাড়ি গোঁফ গজায়, ততদিন সে এইভাবেই মানুষ হবে—এই আমাদের ইচ্ছা। ছেলের যা রূপ তাতে ভাই সত্যিই ডর লাগে, হয়তো কোন খারাপ মেয়ের পাল্লায় পড়ে নিজেকে নষ্ট করে ফেলবে। আজই এই প্রথম দেখলাম সে আমার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিল। হয়তো ঘরের দরজায় শিকল তুলে দিতে ভুলে গেছে চাকরগুলো।

সওদাগর বিবির বান্ধবীরা বিদায় নেবার সময় ছেলের প্রসংশায় পঞ্চমুখ হয়ে বললো, খুব সুন্দর ছেলে হয়েছে আপনার। চাঁদের মতো দেখতে। আহা—চোখ জুড়িয়ে যায়। আল্লাহ তাকে শতায়ু করে বাঁচিয়ে রাখুন।

কিছুক্ষণ পরে আবু সামাত আবার মা-এর কাছে ফিরে আসে। বাইরের আঙ্গিনায় সে দেখতে পায়, একটা খচ্চরের পিঠে জীন লাগাম পরাচ্ছে চাকরেরা।

—আচ্ছা মা, আবু সামাত প্রশ্ন করে, এই জানোয়ারটাকে ঐভাবে সাজাচ্ছে কেন ওরা?

—তোমার বাবাকে বাজার থেকে আনতে যাবে। তার ফেরার সময় হয়ে এসেছে কিনা, তাই।

আমার বাবা কী করেন মা, কীসের ব্যবসা তার?

মা ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে, তোমার বাবা মস্তবড় সওদাগর—সারা কাইরো শহরে তার খুব নাম ডাক। আরবের সুলতান এবং নানা দেশের রাজা বাদশাহদের সঙ্গে তার কারবার। একটা মোটামুটি ধারণা কর: কোনও ছোটখাটো খদ্দের তার কাছে সোজাসুজি সওদা করতে পারে না। কমপক্ষে এক হাজার দিনারের লেন দেন না হলে দালাল ধরে যেতে হয় তার কাছে। তা যদি নশো নিরানব্বই দিনারও হয়—তবু। তোমার বাবা সওদাগর সমিতির প্রধান। তার কথা ছাড়া কাইরোর কোনও সওদাগরই শহরের বাইরে বাণিজ্য করতে যেতে পারে না। আল্লাহর দোয়ায়, তোমার বাবা শহরের সেরা ধনী। সবাই খুব মান্য গণ্য করে।

—খোদা মেহেরবান, তিনি আমাকে সম্ভ্রান্ত সওদাগরের ঘরে জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু মা, আমি ঐ ঘরে বন্দী হয়ে আর কতকাল কাটাবো। আমার জীবন হাঁফিয়ে উঠেছে। কাল থেকে আমি বাবার সঙ্গে দোকানে গিয়ে বসবো।

—ঠিক আছে বাবা, অধৈর্য হয়ো না, তোমার বাবা ফিরলে আজ সন্ধ্যাবেলা তার সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলবো আমি।

সন্ধ্যাবেলা খেতে বসে সওদাগর বিবি কথাটা পেশ করলো, দ্যাখ, ছেলেটা বড় হচ্ছে, এভাবে তাকে আর ঘরে আটকে রাখা ঠিক না। তুমি বরং সঙ্গে করে দোকানে নিয়ে যাও তাকে। নিজের ব্যবসা বাণিজ্য নিজে দেখে শুনে বুঝে নিতে হবে তো।

—কিন্তু আবু সামাতের মা, সওদাগর বলে, তুমি তো জান, চার-পাশের মানুষের কি শকুনের দৃষ্টি। ছেলেটা যদি কারো কুনজরে পড়ে।

সওদাগর বিবি বলে, কিন্তু তাই বলে ছেলেটাকে এইভাবে বন্দী করে রাখাও কি ঠিক?

—তুমি কি কিছুই খোঁজ রাখ না, বিবি? ওপাড়ার একটি ছেলে একটা ডাইনীর বিষ নজরে পড়ে সেদিন মারা গেছে। যতগুলো বাল বাচ্চা মারা যায় তার প্রায় সবই এই একই কারণে।

সওদাগর বিবি বাধা দিয়ে বলে, তাই বলে ছেলেকে তুমি বাইরে বেরুতে দেবে না। সবাই নিজের নিজের ভাগ্য নিয়ে জন্মায়। শিকল দিয়ে বেঁধে খাঁচায় পুরে রাখলেই কি নিয়তির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়? নসীবের লেখা পালটানো যায় না। যা হবার তা হবেই। ও নিয়ে অহেতুক বাড়াবাড়ি করে কোনও ফয়দা নাই। এইভাবে তাকে যদি সবারই কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখ তাহলে আখেরে তার কী ভালোটা হবে, শুনি? তুমি বুড়ো হয়েছ। মরতে একদিন হবেই। তোমার মরার পর এই বিশাল ব্যবসা বাণিজ্যের একমাত্র মালিক হবে সে। কিন্তু সারা কাইরো শহরে তোমার চেনাজানা বন্ধু-বান্ধব সম-ব্যবসায়ী কেউই তোমার ছেলের সুরৎ দেখেনি। হঠাৎ দুম করে সে যদি তোমার অবর্তমানে দোকানে গিয়ে বসতে চায় কেউ তাকে স্বীকার করবে? তোমার দোকানের কর্মচারীরাও যদি বলে বসে, কে সে, তাকে তারা জানে না, তখন? আর তাছাড়া এত বড় ব্যবসা—কী তার হালচাল, কী তার তরিকা কিছুই তার জানা থাকবে না। কেমন করে সে চালাবে তখন? তুমি বলবে, আমি তো আছি। আমিই সবাইকে বলবো, 'এই হচ্ছে সওদাগর

সামস অল-দিনের একমাত্র সন্তান—তার ব্যবসার একমাত্র উত্তরাধিকারী।' কিন্তু আমার কথা শুনবে কেন তারা? আমি বানিয়েও বলতে পারি। তারা হয়তো অবিশ্বাস করতে পারে—আবু সামাত তোমার ঔরসের সন্তান নয়। তখন? তখন কী হবে? সরকারের ফৌজদার এসে তোমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আটক করে নিয়ে যাবে। তোমার ছেলে আর আমি তখন কি আঁটি চুসবো? আমি যদি শহরের পাঁচজন সম্ভ্রান্ত লোককে সাক্ষী মানতে যাই—বেইজ্জৎ হয়ে যাবো। তারা বেমালুম বলে দেবে, 'কই সওদাগর সাহেবের কোনও সন্তানাদি ছিল বলে তো আমরা শুনিনি কখনও!' সে-অবস্থায় তাদেরও দোষ দেওয়া যাবে না। সত্যিই তো তারা কখনও শোনেনি তোমার ছেলের কথা। বা চোখেও দেখেনি কখনও?

বিবির কথায় সওদাগরের চৈতন্য উদয় হয়। হুঁ, ঠিক সাচ্চা বাত বলেছো বিবি। অতটা তো সে তলিয়ে দেখেনি। হাজার হলেও মেয়ে-মানুষের সম্পত্তি জ্ঞান টনটনে হয়।

—খোদা হাফেজ, তুমি ঠিক বলেছ, বিবিজান। আমি কাল থেকে আবু সামাতকে সঙ্গে করে দোকানে নিয়ে যাবো। চেনা জানা সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেব। নাঃ, তুমি যথার্থ কথা বলেছ। বিষয় সম্পত্তির ব্যাপার! আর আমার শরীর স্বাস্থ্যের কথাও কিছু বলা যায় না। তাছাড়া এখন থেকে কেনা বেচার তরিকাগুলো না শেখালে পরে ব্যবসাই বা চালাবে কি করে?

তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে সামস অল দিন বললো, বেটা, কাল থেকে তুমি আমার সঙ্গে দোকানে বেরুবে। কথাটা শুনে হয়তো পুলকে প্রাণ নেচে উঠছে তোমার কিন্তু বাবা, খুব সাবধান, দুনিয়ায় দুষ্ট লোকের অভাব নাই। মানুষই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। সেই ধূর্ত শয়তানদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলাই সব চেয়ে কঠিন কাজ। এতদিন ধরে তুমি তোমার গুরুর কাছে যে বিদ্যা শিখেছ, তা এবার কাজে লাগাতে হবে। মানুষের সঙ্গে সব সময়ই সদ্ব্যবহার করবে। আর নজর রাখবে কে তোমার অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট। তাকে সযত্নে পরিহার করে চলবে।

এমন সময় প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দুশো চুয়াত্তরতম রাতে আবার সে বলতে শুরু করে:

পরদিন সকালে সামস অল-দিন ছেলেকে নিয়ে হামামে গোসল করতে যায়। খুব ভালো করে স্নানাদি শেষে সম্ভ্রান্ত সওদাগরের সাজ-পোশাকে সাজগোজ করে দুজনে। নাস্তা পানি সেরে খচ্চরের পিঠে চাপে সামস অল-দিন, আর ছেলেকে পিছনে বসায়। রাস্তার লোক সামাতকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এমন সুন্দর চেহারা সচরাচর চোখে পড়ে না। যেন একেবারে পূর্ণ চাঁদের হাট। কে বটে ছেলেটা-এর আগে তো কখনও দেখিনি। মোট কথা যেই দেখে, প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

দোকানের কাছে আসতে সেই মদ ভাঙ্গ আফিঙ চরস খোর বেহেড মাতাল সামসামের সঙ্গে দেখা হয়। লোকটা তখন তুরীয় মার্গে বিচরণ

করছিল। সওদাগরের সঙ্গে আবু সামাতকে নামতে দেখে চোখ দুটো কপালের ওপর টেনে তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করে ঠোঁট বাঁকিয়ে এক বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে বলে, কে বাবা, আসমানের চাঁদ—মাটিতে নেমে এলে ?

সারা রাত ধরে গাঁজা চরস-এ দম দিতে দিতে সব কিছু তার তাল-গোল পাকিয়ে গেছে। এখন আর লঘু গুরু কোনও জ্ঞান নাই। যা মুখে আসছে বলে যাচ্ছে। সব ভুলে মেরে দিয়েছে, সে-ই একদিন মহা তোড়জোড় করে সওদাগরকে এক মোক্ষম দাওয়াই বানিয়ে দিয়েছিল। এবং সেই দাওয়াই-এর কল্যাণেই আজ সে এই চাঁদের মত ফুটফুটে ছেলেকে পেয়েছে। বৃদ্ধ সওদাগরের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে সে তামাশা করতে থাকে, দেখ, দেখ সবাই, অমাবস্যায় চাঁদের উদয় হয়েছে। বুড়োর চুল দাড়ি সব সফেদ হলে কি হবে, শরীরে এখনও মজবুত জোয়ানের মত তাগদ আছে তা নাহলে, হুঁ হুঁ বাবা, এই বুড়ো হাড়ে ভেল্কী খেলাতে পারে ?

গাঁজা চরসের পাজী নেশা। একটা কথা মুখে এলে, বারবার সেই কথাটা নিয়েই সে নাড়াচাড়া করতে থাকে। সামসামের অবস্থা তখন তাই। যাকে সামনে পায় তাকেই ডেকে ডেকে বলে, দেখ, দেখ তোমরা, অমাবস্যায় পূর্ণচাঁদের উদয় হয়েছে। বুড়ো হাড়ে বসন্ত জেগেছে।

নিজের কাঁচা রসিকতায় নিজেই সে হাসতে থাকে। কিন্তু কথাটা মাতালের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিতে পারলো না সকলে। চারদিকে চাপা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লো নিমেষে।

প্রধান-সওদাগররা এক জায়গায় জড়ো হয়ে আলোচনায় বসে। ব্যাপারটা বিষদভাবে খতিয়ে দেখতে চায় তারা। সত্যিই তো এতদিন তারা বৃদ্ধ সওদাগর সামস অল-দিনের কোনও সন্তানাদির সংবাদ জানে না। আজ হঠাৎ একটা ছেলেকে সঙ্গে এনে নিজের ছেলে বলেই বা পরিচয় দিচ্ছে কেন ? তারা সামসামকে ডেকে পাঠালো।

সমবেত সওদাগরের সামনে সামসাম ঠাট্টা বিদ্রুপ ভরা কণ্ঠে বলতে থাকে: আমি আমাদের মাননীয় সভাপতি সাহেবকে ছোট করে দেখতে চাই না। তাঁর মান-ইজ্জত খোয়া যাক, মরে গেলেও তেমন কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না। কিন্তু আপনারাই বিচার করুন সাহেব, হঠাৎ একটা চৌদ্দ বছরের ছেলেকে তিনি পেলেন কোথায় ? আমার মনে হয়, এইরকম একটা অসৎ লোক এই সভার সভাপতি হয়ে থাকার অযোগ্য। তাকে বরখাস্ত করে অন্য কাউকে এই ভার দেওয়া হোক, এই আমার আর্জি।

সামসামের অকাট্য-যুক্তি কেউ খন্ডন করতে পারলো না। সকলে একবাক্যে স্বীকার করে নিল, না, এরকম অসৎ-লোককে এইরকম দায়িত্বশীল পদে রাখা উচিৎ নয়।

দোকান খোলার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু বান্ধব এবং সমব্যবসায়ীরা প্রতিদিন এসে শুভেচ্ছা জানিয়ে যায় সামস অল-দিনকে। কিন্তু আজ এতটা বেলা হলো কেউ এদিক মাড়াল না। সামস অল-দিন ভেবে পায় না, হঠাৎ আজ কেন এমন হলো। একজনের পর একজন চেনা লোক দোকানের সামনে দিয়ে সটকে পড়ে। কেউ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে না, কথা বলে না। দালাল

সামসামও দোকানের দিকে পিছন ফিরে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সামস অল-দিন আর চুপ করে থাকতে পারে না। বেশ একটু চড়াগলাতেই হাঁক দিল। ও ভাই সামসাম, এদিকে শোন না ?

সামসাম এই ডাকার অপেক্ষাতেই ধীর কদমে চলছিল। এবার সে মুখ ফিরিয়ে দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়।

—কী ব্যাপার, সামসাম, তোমরা সব পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছো কেন ? রোজ সকালে সকলে এসে আমাকে ফতিয়াহ শুনিয়ে যায়। আজ কেউ এল না কেন ?

সামসাম খুক খুক করে কাশে, হুম, আমি তো কিছুই জানি না সাহেব। কিন্তু সারা বাজারে একটা চাপা গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। কান পেতে শোনা যায় না—এমন নচ্ছার সব কথা। আজ সকালে বাজারে এক সভা ডাকা হয়েছিল, আপনি জানেন না, কী সব জঘন্য নোংরা কথাবার্তা আপনার নামে উঠেছিল। আমি তো তাজ্জব বনে গেছি, আপনার মতো সদাশয় ধর্মপ্রাণ মানুষকে ওরা বাতিল করে দিয়ে নতুন সভাপতি ঠিক করে ফেলেছে।

সামস-অল দিনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কিন্তু মুখের কথায় কোনও চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে বলে, আচ্ছা সামসাম, কারণ-টা কী বলতে পার। কী আমার গুস্তাকী

সামসাম কোমরটা ঈষৎ হেলিয়ে সওদাগরের কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিস ফিস করে বলে, আমার কাছে তো আপনার কোনও লুকোচাপা কিছু নাই, সাহেব, আচ্ছা সত্যি করে বলুন তো এই চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর ছেলেটাকে আপনি এই দোকানে এনেছেন কী কম্মে ? ওকে দিয়ে মাছি তাড়াবেন, তা তো কেউ বিশ্বাস করবে না। মনে রাখবেন সাহেব, ওদের এই নোংরা কথার আমি ভীষণভাবে প্রতিবাদ করেছি। মনে করুন ঐ এক ঘর ব্যবসাদারের সভায় একমাত্র আমিই ছিলাম আপনার পক্ষে। আর সবাই আপনার কুৎসায় মেতে উঠেছিল। আমি ছাড়িনি, বলেছি—ওদের জোর গলায় বলেছি সাহেব, যদি সওদাগর সামস অল-দিন এই বুড়ো বয়সে কোন অল্প বয়সের কচি ছোকরায় আসক্ত হয়ে থাকে—সে খবর সবার আগে আমিই জানবো তো ? কারণ কায়রো শহরে যে-সব বুড়ো কর্তার এই রোগ আছে তার দাওয়াই-পত্র তো আমিই দিয়ে থাকি। আমি ছাড়া অল্পবয়সের সুন্দর চেহারার লেড়কা জোগাড় করে দেবে কে ? আপনি কিচ্ছু ভাববেন না সাহেব, আমি তাদের আচ্ছা করে ঠুকেছি। বলেছি, ছেলেটি নিশ্চয়ই তাঁর বিবির কোনও নিকট আত্মীয় হবে। অথবা বাগদাদ কিংবা তাঁতার শহরের কোনও বন্ধু বান্ধবের ছেলেও হতে পারে। তবে আপনার রুচির প্রশংসা না করে উপায় নাই, কর্তা। দারুণ ছেলে জোগাড় করেছেন আপনি। লাখে একটা মেলে।

এই সময় রজনী অতিক্রান্ত হতে চলেছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো পঞ্চান্নতম রজনী :

আবার সে বলতে থাকে।

—চুপ কর বেয়াদপ, সওদাগর গর্জে ওঠে, ওহে চরসখোর তুমি কি ভুলে গেছ সব কথা। তুমি না একদিন আমাকে ছেলে পয়দা করার দাওয়াই বানিয়ে দিয়েছিলে।

সামসাম বলে, কিন্তু এই চোদ্দবছরের লেড়কা এতদিন ধরে কি মায়ের গর্ভেই ছিল, সাহেব? আগে তো কখনও দেখিনি একে?

—শোন সামসাম, তোমার দাওয়াই খাওয়ার পর আমার বিবি এই ছেলের জন্ম দেয়। তারপর এই চোদ্দটা বছর ধরে তাকে ঘরের মধ্যে আমি কয়েদ করে মানুষ করেছি। আমার শুধু ভয় হতো, না জানি কোন দুষ্ট মানুষের কুনজর পড়ে তার ওপর। সেইজন্যে তাকে বাইরে বের করিনি। আজ এতদিন বাদে তাকে দোকানে নিয়ে এসেছি—এই প্রথম। ব্যবসা-বাণিজ্য তাকে শেখাতে হবে তো। আমার এতবড় ব্যবসার এ-ই তো একমাত্র মালিক। তোমাকে এতদিন বলার তেমন সুযোগ হয়নি। যাক, এই নাও তোমার ইনাম। রাখ, এই এক হাজার দিনার।

সামসামের সব মনে পড়ে। আর কোনও সংশয় নাই, এ ছেলে এই বুদ্ধ সওদাগরেরই। তাড়াতাড়ি সে ছুটে গিয়ে বাজারের সব দোকানে আগাগোড়া সব বৃত্তান্ত খুলে বলে। দোকানীরা বুঝতে পারে, অনুতপ্ত হয়। সওদাগর সামস-অল দিনের কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, তাদের ভুলের জন্য তারা লজ্জিত। সওদাগর-সন্তানের দীর্ঘায়ু কামনা করে। বলে, তা এমন সুন্দর ছেলের বাবা হলেন আপনি, আমাদের মিষ্টিমুখ করাবেন না?

—নিশ্চয়ই করাবো। একশোবার করাবো। শুধু আসিদার মধুই না, পেটপুরে ফলার খাওয়াবো সকলকে। কাল সকালে আপনারা সবাই আসুন আমার বাগান বাড়িতে। সেখানেই খানাপিনার ব্যবস্থা করছি আমি।

সামস-অল দিন আর দেরি না করে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। পরদিন সকালে অভ্যাগত অতিথিরা আসবে তার বাগান বাড়িতে। তারই তোড়জোড় করতে থাকে। চর্বিওলা তাগড়াই ভেড়া কেনা হয়। জাইনি গলির মিঠাইওলাকে মুখরোচক মিঠাই মণ্ডার বায়না দেওয়া হয়। ঝুড়ি ঝুড়ি শব্জী, ফল আসে। সারা বাড়িতে উৎসবের ধুম পড়ে যায়।

পরদিন সকালে সওদাগর পুত্র আবু সামাতকে সঙ্গে নিয়ে বাগান-বাড়িতে চলে যায়। সেখানে দাস দাসী চাকর নফররা আগে থেকেই হাজির ছিল। বাবুর্চি খানা পাকাতে ব্যস্ত। খানসামারা খাবার জায়গা ঠিক করছে। এলাহী ব্যাপার।

যথাসময়ে অভ্যাগতরা আসতে থাকে। সওদাগর বয়স্কদের আপ্যায়ন করে বসায়। আর ছোট ছোট ছেলেদের তদারকির ভার পড়ে আবু সামাতের উপর।

সবাই বেশ আনন্দ করে খানা পিনা করলো। গান বাজনায় জমে উঠলো আসর। আতর আর ধুপের গন্ধে ভরপুর হয়ে গেল চারদিক। খানা শেষ হয়ে গেল, চাকররা শরবতের গেলাস বাড়িয়ে দিল নিমন্ত্রিতদের সামনে।

এই সব অভ্যাগতদের মধ্যে সামস-অল দিনের এক বিত্তশালী খদ্দেরও এসেছিল। তার নাম মাহমুদ।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো ছাপান্নতম রাতে আবার সে কাহিনী শুরু করে:

মাহমুদ কিশোর আবু সামাতকে দেখে মুগ্ধ হয়। আবু সামাত তখন মুক্ত বিহঙ্গের মতো ছুটাছুটী খেলায় মেতে উঠেছে। আজ চৌদ্দটা বছর সে ঘরের মধ্যে বন্দী হয়েছিল।

মাহমুদ তাকে ইশারায় কাছে আসতে বলে। সামাত খেলা বন্ধ করে সামনে এসে দাঁড়ায়। মাহমুদ বলে, ইস, কী-সব মজাদার কিসসা আমরা বলছিলাম, তুমি শুনতে পেলে না?

আবু সামাত সপ্রশ্ন নয়নে তাকায়, কিসের কিসসা?

—আঃ সে বড় চমৎকার। দামাসকাস, আলেপ্পা, বাগদাদের সব কাহিনী। তোমার বাবা তো বহুৎ বড় সওদাগর। তার সঙ্গে নিশ্চয়ই অনেক দেশ ঘুরেছ? দু একটা কিসসা আমাদের শোনাও না।

—আমি? আপনারা বোধ হয় জানেন না, জন্মের পর থেকে আমার মা বা আমাকে ঘরের বাইরে বেরুতে দেননি। কোনও মানুষের সঙ্গে মিশতে দেন নি। এই সবে দুদিন হলো আমি বাইরে বেরুবার অনুমতি পেয়েছি। তাও শুধু মা-এর জন্যে সম্ভব হয়েছে। বাবা আসলে কিছুতে দোকানে নিয়ে যেতে রাজী ছিলেন না। শুধু মা-এর চাপে পড়ে বাধ্য হয়েছেন।

—বেচারী! এই দুনিয়ার এত রূপ রস গন্ধ, সব থেকে তোমাকে বঞ্চিত করে রেখেছিল তোমার বাবা? ঘর ছেড়ে বাইরে না বেরুলে কি করে বুঝবে বেড়াবার কি আনন্দ!

আবু সামাত বলে, হয়তো আপনার কথা ঠিক, তবু ঘরেরও তো একটা আলাদা আকর্ষণ আছে।

—তুমি কুয়োর ব্যাঙ-এর মতো কথা বলছো। তারা ভাবে ঐ কুয়োর সীমানা ছাড়া আর বুঝি কিছুই নাই। আর তাছাড়া তোমার বোধহয় ভয়, বাইরের নানা দেশের নানারকম জল-হাওয়ায় তোমার এই মেয়েলী ধাঁচের মাখনের মতো শরীর হয়তো গলে যাবে। শুধু মেয়েরাই ঘর ছাড়া পাখীর মতো নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা ভাবতে পারে না।

আবু সামাতের পৌরুষে আঘাত লাগে। তৎক্ষণাৎ সে বাড়ি চলে আসে। মা-এর কাছে ছুটে যায়। ছেলের সেই উদভ্রান্ত চেহারা দেখে মা উৎকণ্ঠিত হয়। বলে, কী হয়েছে বাবা? কেউ তোমাকে কিছু বলেছে নাকি?

আবু সামাত তখন ঐ সব ঠাট্টা-তামাসার কথা বলে। —মা, এ-রকম খাঁচায় পোরা বন্দীজীবন আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তোমরা আমাকে দুনিয়ার সব কিছু সুন্দর রূপ-রস-গন্ধ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছ। আমি আর তোমার আঁচলের তলায় থাকবো না। তোমরা যদি বাধা দাও, নিজের বুকে নিজেই আমি ছুরি বসিয়ে দেব।

মা কাঁদতে কাঁদতে বলে, অমন অলুক্ষণে কথা মুখে আনতে নাই, বাবা। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করবো। তোমার বাবাকে বুঝিয়ে বলবো সব। তিনি তোমা-অন্ত-প্রাণ—হয়তো চোখের আড়াল করতে রাজি হবেন

না। তবু আমি কথা দিচ্ছি, বাবা, তোমার বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা আমি করবো। আমার নিজের পয়সা দিয়ে তোমার সওদাগরি সামানপত্র কিনে দেব। তুমি বড় হয়েছো, এখন তোমাকে ঘরে বন্ধ করে রাখলে চলবে কেন? যেখানে প্রাণ চায়, যাব।

আবু সামাত বলে, ঠিক আছে, বাবা ফিরে আসুন, দেখি কি বলেন।

মা বললো, তিনি যা-ই বলুন আমি তোমার যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

তারপর বাড়ির চাকরদের ডেকে বললো, গুদোম ঘরটা খোল। যে-সব কাপড়-পত্র আছে বের কর।

চাকররা ঘর থেকে অনেকগুলো কাপড়ের গাঁট আঙ্গিনায় বের করলো।

এদিকে অভ্যাগত অতিথিরা বিদায় নিলে বৃদ্ধ সামস অল-দিন বাড়ি ফেরার আগে ছেলে আবু সামাতের খোঁজ করলো। কিন্তু যখন শুনলো, অনেক আগেই সে বাড়ি চলে গেছে, চিন্তিত হয়ে পড়লো। একা একা পথ চলা অভ্যাস নাই, না জানি রাস্তা ভুল করে অন্য কোনও দিকে হারিয়ে গেল কিনা। আর তিল মাত্র না দাঁড়িয়ে একটা খচ্চরে চেপে পিঠে চাবুক কষলো। খচ্চরটা রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে বাড়ি এসে পেঁছয়। সামস অল-দিন সদর দরজার কাছে একটা চাকরকে পেয়ে জিজ্ঞেস করে, হ্যারে, আবু সামাত ফিরেছে?

—জী হাঁ। ভিতরে গিয়ে দেখুন না, গুদোম থেকে কাপড়ের গাঁট বের করাচ্ছে। ছোট সাহেব নাকি বাণিজ্যে যাবেন।

সামস অল-দিন হনহন করে বাড়ির অন্দরে ঢোকে। তবে তো চাকরটা ঠিকই বলেছে। আঙিনার চারপাশে অনেকগুলো কাপড়ের গাঁট দাঁড় করানো হয়েছে।

—কই গো, ছেলের মা, কোথায় গেলে?

আবু সামাতের মা বেরিয়ে আসে।

—কী, ডাকছো কেন?

—বলি এ সব কী?

এই সময়ে রাত্রি অবসান হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দুশো সাতান্নতম রাত্রে আবার সে কাহিনী শুরু করে:

সওদাগর বিবি বলে, তোমার ছেলে লায়েক হয়েছে। এখন সে আর ঘরে কয়েদ হয়ে থাকতে চায় না। সে বাণিজ্যে যাবে। তাই আমি সামান-পত্র বের করতে বলেছি।

—কোথায় যেতে চায়?

—আলেপ্পা, দামাসকাস, বাগদাদের পথে যাবে সে।

সওদাগর মাথা নেড়ে বলে, না না, এ হতে পারে না, বিবি। আমি তাকে যেতে দেবো না। আমি তাকে বুঝিয়ে বলবো, এই বয়সে বিদেশ বিভুঁই-এ যাওয়া তার উচিত হবে না।

আবু সামাতকে ডেকে সে বোঝাতে চেষ্টা করলো, বাছা, তোমার মনে

হয়তো বিদেশ বেড়াবার বাসনা হয়েছে। কিন্তু আমি তোমাকে বারণ করছি সামাত, এসব খেয়াল তুমি ছাড়। আমাদের পয়গম্বর বলেছেন, যে মানুষ তার জন্মভূমিতে বাস করে সুখের সন্ধান করে সে-ই প্রকৃত সুখ পায়। স্বদেশ ছেড়ে এক পা-ও বাইরে যাওয়া উচিৎ নয়। আশা করি এর পরে তুমি মত পাল্টাবে।

আবু সামাত বলে, আপনি হয়তো আমাকে অবাধ্য সন্তান ভাববেন, কিন্তু এ ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নাই। একবার আমি যখন ভেবেছি বিদেশে যাবো, যাবোই। তাতে যদি আমাকে কপর্দক শূন্য অবস্থায় এক বস্ত্রে বাড়ি থেকে বেরুতে হয়, সেও ভালো।

ছেলের এক গুঁয়েমী দেখে সওদাগর চিন্তিত হয়। ভাবে, আর বাধা দিয়ে লাভ নাই। ফল ভালো হবে না।

—ঠিক আছে যাবে যাও। আমি তোমাকে পঞ্চাশটা কাপড়ের গাঁট সঙ্গে দিচ্ছি। পঞ্চাশটা উঠের পিঠে চাপিয়ে তুমি রওনা হয়ে যাও। কোন্ শহরে কি ধরনের কাপড় বিকোবে, আমি তোমাকে বলে দেব। যে সওদা আলেপ্পার বাজারে বেচা সহজ হবে, দামাসকাসের বাজারে তার কোনও চাহিদাই নই। আবার দামাসকাসে মানুষ যা লুফে নেবে বাগদাদে তার কদর হবে না। আমার এই কথাগুলো মনে রেখে বাণিজ্য করলে তোমার বেশ লাভ হবে। যাও বাবা দেখে শুনে পথ চলবে, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। চলার পথে সব দিকে সতর্ক চোখ রাখবে। মরুভূমির মারাত্মক কুকুরগুলো প্রাণ-সংশয় করে তোলে। আর সাবধান থাকবে, বাদাবী ডাকাতদের হাতে পড়ে যেন ধন-প্রাণ সব খোয়া না যায়। ওরা বড় সাংঘাতিক। দয়ামায়া বলে কিছু জানে না। দরকার হলে নির্মমভাবে খুন জখম করে লুঠপাট রাহাজানি করে।

আবু সামাত বলে, ঠিক আছে আব্বাজান, আপনার উপদেশ আমি মনে রাখবো। তবে শয়তানের শাস্তি আল্লাহই দেন। আমার কাজ আমি করে যাব ; ফল যা দেবার তিনিই দেবেন।

ছেলের এই দার্শনিক কথাবার্তায় সওদাগর মুগ্ধ হয়।

সওদাগর বিবি কিন্তু তার হাজার দফা নামাজ শেষ করার আগে ছেলেকে রওনা হতে দেয় না। গরীব মানুষদের দান-ধ্যান করে। একশো ভেড়া পোড়ান হয়। হাজীদের ডেকে খাওয়ায়। তারা আবু সামাতের বিদেশ-যাত্রা নির্ভয় নিরাপদ হোক—এই কামনা করে। মা ছেলেকে সঙ্গে করে পীর আবদ অল-কাদির-এর দরগায় নিয়ে যায়। তার দোয়া মেঙে আনে।

মা চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ছেলেকে বিদায় দিল। উট চালকদের সর্দার—কামালকে বললো, আমার বুকের কলিজাকে, তোমার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি ওকে চোখে চোখে রেখ। আল্লাহ ভরসা, পথে যেন তোমাদের কোনও বিপদ-আপদ না ঘটে।

তারপর ছেলেকে উদ্দেশ করে বললো, বাবা, কামালের কথা শুনো। বাবার মতো মান্য করো তাকে।

ছেলের হাতে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা তুলে দিয়ে মা বলে, এই দিনার-গুলো যত্ন করে রেখ, সময় অসময়ে খরচ করো। যদি দেখ, বাজার মন্দা,

বিক্রিবাটা সুবিধের হচ্ছে না, তখনই এই টাকায় হাত দেবে। তাই বলে, ঠিক মতো দাম না পেলে সওদা বিক্রি করবে না।

আবু সামাত মা বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে কাইরো শহরের সীমানা পার হয়ে যায়।

এদিকে মাহমুদ খবর পেয়েছিল, আবু সামাত বিদেশ সফরে বেরুচ্ছে। তাড়াতাড়ি সে নিজেকে তৈরি করে নিয়ে আবু সামাতকে অনুসরণ করে। কাইরো থেকে ক্রোশ তিনেক দূরে তার দেখা পায়। মাহমুদ সঙ্গে নিয়েছে খচ্চর, উট আর ঘোড়ার এক বাহিনী। চলতে চলতে নিজের মনেই স্বগতোক্তি করে, ওহে মাহমুদ, এই মরুপ্রান্তরে কেউ তোমাকে বাধা দিতে আসবে না। কেউ আড়ি পেতে দেখবে না তোমার গতিবিধি। তুমি এখন স্বাধীন মুক্ত বিহঙ্গের মতো যেদিকে প্রাণ চায় উড়ে চলবে। সঙ্গে তোমার এক শান্ত সুবোধ বালক। তাকে নিয়ে যত খুশি আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে থাক, কে কি বলতে পারবে।

এক জায়গায় এসে আবু সামাত প্রথম তাঁবু গাড়লো। মাহমুদও তার পাশেই তাঁবু ফেললো। আবু সামাতের বাবুর্চিকে ডেকে বললো, দেখ, তোমাদের আর উনুন জ্বালাবার দরকার নাই। আমার লোক যা পাকাবে তাই আমরা সবাই মিলে খাবো, কেমন? তোমাদের সাহেবকে একবার আমার তাঁবুতে আসতে বল না?

আবু সামাত এল। কিন্তু একা নয়। সঙ্গে এল সেই কামাল—উট চালকদের সর্দার। মাহমুদ অস্বস্তি বোধ করলো। প্রাণ-খুলে আবু সামাতের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারলো না। পরদিনও ঠিক একই ঘটনা ঘটলো। এইভাবে প্রতিদিন তাঁবু ফেলে তারা। প্রতিদিনই মাহমুদ আবু সামাতকে তার নিজের তাঁবুতে আমন্ত্রণ জানায়। আবু সামাত আসেও। কিন্তু কোনও সময়ই একা নয়। সব সময় ছায়ার মতো আসে কামাল। মাহমুদ মুখে কিছু বলতে পারে না। বুকের ব্যথা বুকেই চেপে মামুলী কথাবার্তায় সময় কাটায়।

এই ভাবে একদিন তারা দামাসকাসে এসে পেঁছিয়। কাইরো, আলেপ্পা, দামাসকাস এবং বাগদাদে মাহমুদের বাড়ি আছে। মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবদের এই সব বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে এসে দেদার আনন্দ স্ফূর্তি করে সে।

দামাসকাস শহরের উপান্তে আবু সামাত তাঁবু গাড়ে। মাহমুদ ওঠে তার নিজের বাড়িতে। চাকর দিয়ে খবর পাঠায়, আবু সামাত যেন একা আসে তার বাড়িতে। এক সঙ্গে খানা-পিনা করবে।

সামাত বলে, তুমি একটু দাঁড়াও, আমি আমাদের বুড়ো সর্দার কামালকে জিজ্ঞেস করে আসি একবার।

একটু পরে আবু সামাত তাঁবু থেকে ফিরে এসে মাহমুদের লোককে বলে, না, আমার যাওয়া হবে না। তুমি মাহমুদ সাহেবকে বলো, কামাল আমাকে একা ছাড়বে না।

দামাসকাসে বেশিদিন না কাটিয়ে আবু সামাত আবার পথে বেরিয়ে পড়ে। আলেপ্পার পথে বেরিয়ে পড়ে। আলেপ্পাতে এসেও মাহমুদ

একই নিমন্ত্রণ জানায় আবু সামাতকে। কিন্তু বুড়ো সর্দার কামাল বলে, না বেটা, আমি তোমার মা-র কাছে জবান দিয়েছি—একা কোথাও ছাড়বো না।

আবু সামাতেরও ব্যাপারটা ভালো লাগে না। বারবার লোকটা তাকেই বা কেন ডেকে পাঠায়। মাহমুদের লোককে বলে, না, আমি যেতে পারবো না। তুমি মাহমুদ সাহেবকে গিয়ে বল, কামাল আমাকে একা যেতে দেবে না।

বারবার প্রত্যাখ্যানে মাহমুদেরও রোখ চেপে যায়। আলেপ্পা ত্যাগ করার পর প্রথম যেখানে তাঁবু ফেলা হয়, মাহমুদ নিজে আবু সামাতের তাঁবুতে এসে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। হয়তো কোনও দ্বিধা ছিল, কিন্তু মাহমুদ নিজে আসায় মুখ ফুটে 'না' সে বলতে পারলো না। মাহমুদ বললো, বহুৎ কিসিমের মজাদার খানা পাকানো হচ্ছে। আজ তোমাকে যেতেই হবে। আমি কিছুতেই ছাড়বো না।

আবু সামাত হাসলো, বেশ তো, যাবো।

সাজ-গোজ সেরে মাহমুদের তাঁবুতে যাবার উদ্যোগ করছে সামাত; এমন সময় কামাল বললো, তুমি বড় অবিবেচক, বেটা। আমি তোমাকে বারবার বারণ করছি কেন, তা একবার ভেবে দেখলে না? ঐ মাহমুদ লোকটার কি মৎলব তা কি জান? ওকে কাইরোর সবাই হাড়ে হাড়ে চেনে। লোকে ওকে 'দুমুখো' বলে ডাকে।

—কিন্তু, আবু সামাত বলে, আমি জবান দিয়েছি, তার নিমন্ত্রণ মেনে নিয়েছি, এখন না যাওয়াটা কথার খেলাপ হবে না? লোকে ওকে যে নামেই ডাকুক আমাকে তো সে গিলে ফেলবে না। তবে অত ডর কিসের।

কামাল বলে, কে বলে গিলে ফেলতে পারবে না? এর আগে আরও অনেককে সে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে, তা জান?

আবু সামাত হো হো করে হেসে ওঠে। তার হাসির তোড়ে কামালের কথা তলিয়ে যায়। হয়তো সে আরও কিছু বলতে চেয়েছিল, আরও বিশদ ভাবে বোঝাতে চেয়েছিল কিন্তু আবু সামাত সেদিকে কর্ণপাত করলো না। এক রকম প্রায় ছুটেই মাহমুদের তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেল।

খানসামারা যে তাঁবুতে খানা-পিনা সাজিয়ে অপেক্ষা করছিল সামাতকে সঙ্গে নিয়ে মাহমুদ সেই তাঁবুর ভিতরে এসে দাঁড়ায়। ধবধবে সাদা কাপড় বিছানো হয়েছে। তার উপর সদ্য পাকানো নানা রকম খানা সাজানো। একপাশে সরাবের পাত্র-সম্ভার।

খুব পরিতৃপ্তি করে দুজনে পেটপুরে পানাহার সারলো। মদের গোলাবী নেশায় তখন দুজনেই মাতোয়ারা। হঠাৎ মাহমুদ আবু সামাতের গোলাপী গাল দুটো দুহাতে ধরে মুখটা বাড়িয়ে ঠোঁটে চুমু খেতে যায়। কিন্তু সামাতের নেশা হলেও জ্ঞান বেশ টনটনে ছিল। তাছাড়া কামাল ওর মনে যে সন্দেহের চারা পুঁতে দিয়েছিল তাতে সে সব সময়ই বেশ সতর্ক ছিল। এক ঝটকায় মাহমুদের হাত দু'খানা ছুঁড়ে দিতে দিতে বলে, এসব কী?

মাহমুদ তখন মত্ত। এক হাতে আবু সামাতের ঘাড় বেষ্টন করে আর এক হাত দিয়ে তার দেহটাকে কাছে টেনে আনতে চেষ্টা করে। আবু সামাত প্রায় চেঁচিয়েই বলতে থাকে, কী ব্যাপার? কী চান আপনি?

আবু সামাত এক রকম প্রায় জোর করেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে

বেরিয়ে আসে। কামাল দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে বসেছিল।

—আল্লাহর কসম খেয়ে বল বেটা, কি হয়েছে?

—না, কিছুই হয়নি তো। কিন্তু আর দেরি নয়, এখুনি তাঁবু গোটাও। আমরা বাগদাদে রওনা হবো। ঐ লোকটার সঙ্গে আর যেতে চাই না। লোকটার মতিগতি আমার ভালো লাগলো না।

কামাল বলে, আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম বেটা। কিন্তু তুমি যে বলছো কিছুই হয়নি। যাই হোক, ওকে এখানে রেখে একা একা পথ চলা আমাদের ঠিক হবে না, ছোট সাহেব। এই মরুভূমির পথটা বড় খারাপ। বাদাবী ডাকাতের ভীষণ হামলা। ঐ খুনী ডাকাতগুলো কোথায় ওৎ পেতে বসে আছে কে জানে।

কিন্তু আবু সামাত সে-কথায় দমলো না। সেই রাতেই তারা বাগদাদের পথে রওনা হয়ে গেল। সারা রাত সারা দিন পথ চলার পর তারা বাগদাদের প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে এসে যখন পেঁছিল তখন সূর্য পাটে বসেছে। সামাত বললো, আর নয়, আজকের রাতটা এখানেই কোথাও তাঁবু গেড়ে কাটানো যাক। কাল সকালে আবার যাত্রা করা যাবে।

কামাল বললো, কিন্তু জায়গাটা সুবিধের নয়। আমি বলি কি, তাঁবু না ফেলে একটু কষ্ট করে আজ রাতেই বাগদাদে পেঁছে যাই। তারপর একটানা বিশ্রাম নিলেই হবে। এই জায়গাটায় কুকুরের ভীষণ হামলা হয়। আর ঐ মানুষ-খেকো কুকুরগুলোর মুখে পড়লে কারো নিস্তার নাই। নির্ঘাৎ মৃত্যু। তাই বলছি, একটু হাঁকিয়ে চললে শহরের সদর দরজা বন্ধ হওয়ার আগেই আমরা বাগদাদে পেঁছে যেতে পারবো।

এই পরামর্শ আবু সামাতের ভালো লাগলো না। —খোদা মেহেরবান, এই গভীর রাতে আমি কিন্তু বাগদাদ শহরে ঢুকবো না, চাচা। বরং কাল সকালে বাগদাদের সূর্য ওঠা প্রাণ-ভরে দেখতে চাই। আজকের রাতটা আমরা এখানেই কাটাবো। অত তাড়াহুড়ো করার কি আছে, আমরা তো আর বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যেই আসিনি। এসেছি দেশ দেখতে। আনন্দ পেতে। জীবনে যে সৌন্দর্য দেখিনি তাই দেখবো বলে পথে বেরিয়েছি।

কামাল আর কিছু জোর করে না। হাজার হলেও সে তার মনিব।

সে রাতে আবু সামাত হাল্কা একটু খানাপিনা সেরে তাঁবুর বাইরে মুক্ত বাতাসে এসে পায়চারি করতে থাকে। চাকর নফররা তখন যে যার মতো শুয়ে পড়েছে।

আবু সামাত পায়ে পায়ে বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে যায়। মরুভূমির মাঝে একখণ্ড শস্য সবুজ প্রান্তর। একটা ঝাকড়া গাছের তলায় গিয়ে বসলো। চাঁদিনী রাত। ঝিরঝির করে দখিনা হাওয়া বইছে। প্রাণে বসন্তের ছোঁয়া লাগে। হৃদয় কাব্যময় হয়ে ওঠে:

ইরাকের রাণী ওগো,
বাহারী বাগদাদ,
এসেছি দুয়ারে তোমার
পেতে শুধু—
রূপে-রসে-গন্ধে ভরা যৌবনের স্বাদ

হঠাৎ একপাল ঘোড়ার চিঁহিহি রবে সামাতের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যায়। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ধেয়ে আসছে বাদাবী ডাকাতের একটা দল। সামাত দেখলো, পলকের মধ্যে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো তার তাঁবুগুলোর উপর। এলোপাথাড়ী চালাতে লাগলো তরোয়াল। প্রাণ ভয়ে পালাবার চেষ্টা করলো চাকর নফররা। কিন্তু হায়, কেউই রক্ষা পেল না। খুনী বাদাবী ডাকাতের হাতে প্রাণ হারালো সবাই। তাঁবুগুলো ভেঙ্গেচুরে ছত্রখান হয়ে পড়লো। ডাকাতগুলো যখন বুঝতে পারলো আর একজনও জীবন্ত নাই। খচ্চর, ঘোড়া উটগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেল তারা।

এতক্ষণ আবু সামাত গাছের তলায় বসে বসে অসহায়ভাবে নিরীক্ষণ করছিল এই মর্মন্তুদ দৃশ্য। এবার সে তাঁবুর কাছে এগিয়ে এল। না, একজনও বেঁচে নাই। তার বৃদ্ধ সহচর কামালও মরে পড়ে আছে। আবু সামাত আর চোখমেলে চেয়ে দেখতে পারে না এই নারকীয় দৃশ্য। কান্নায় চোখ ফেটে জল আসে।

যাই হোক, আর এখানে অপেক্ষা করা সমীচীন নয়, হয়তো আবার কোনও ডাকাতের দল হানা দিতে পারে। সামাত ভাবলো, এই রাতেই সে বাগদাদের পথে রওনা হয়ে যাবে। পরনের দামী সাজপোশাক সে খুলে ফেললো। শুধু রইলো একটা কামিজ আর ইজের। দীনহীন দারিদ্র্যের ছাপ ফোটানো দরকার। নইলে হয়তো পথের মধ্যে আবার কারো নজরে পড়ে যেতে পারে। জামাটাকে মাঝে মাঝে ছিঁড়ে ধুলো বালী মাখিয়ে নোংরা করলো। মাথার চুল এলোমেলো উস্কোখুস্কো করে দিল। একেবারে ভিখিরির সাজ।

সারা রাত ধরে পথ চলার পর ভোরবেলা সে বাগদাদে এসে পেঁছয়। ক্লান্ত অবসন্ন দেহ এলিয়ে পড়তে চায়। শহরের প্রবেশ দ্বার দিয়ে ঢুকতেই একটা ছোট বাগিচা। তার মধ্যে একটা জলের ফোয়ারা। আবু সামাত ফোয়ারার জলে হাত মুখ ধুয়ে পাশের একটা শান বাঁধানো চবুতরার ওপর শুয়ে পড়ে। এবং নিমেষের মধ্যে সে ঘুমে গলে যায়।

মাহমুদও সেই রাতেই তাদের পিছু ধাওয়া করেছিল। অন্য একটা পথ ধরে সে বাগদাদে আসতে থাকে। এই পথটায় যেতে পারলে আরও কম সময়ে বাগদাদে পেঁছন যায়। কিন্তু বিদেশীদের এ পথ অজানা। মাহমুদ সব পথই জানে। সে আবু সামাতকে ধরবে বলে এই পথে জোরকদমে চলে এসেছে। বাদাবী ডাকাতরা এই পথটা এড়িয়ে চলে। কারণ মালকড়িওলা বিদেশীরা এপথে চলে না। তাই মাহমুদ নির্বাধায় বাগদাদে এসে পেঁছল। আবু সামাতের একটু পরেই। শহরে ঢুকে সব লোকই এই ছোট্ট বাগিচার ফোয়ারার জলে হাতমুখ ধুয়ে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে নেয়। মাহমুদও বাগিচায় ঢুকে পড়ে। হঠাৎ তার নজরে এল, কে যেন শুয়ে আছে ওপাশের চবুতরায়। কাছে যেতেই আনন্দে লাফিয়ে ওঠে সে, আরে, এযে দেখি সেই যাদুমনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাহমুদ ভাবে, ছেলেটার এই হাল হলো কি করে। নিশ্চয়ই রাহাজানি হয়েছে। হয়তো সর্বস্ব খুইয়ে ফেলেছে। তা একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। এবার নিশ্চয়ই সে একা। সেই গাব্দামুখো সর্দারটা আর আড়াল করে দাঁড়াবে না। তাছাড়া এই বিদেশ

মিশুই-এ দাঁড়াবার মতো আশ্রয় তো চাই। মাহমুদের এখানে বাড়ি আছে। সামাত তা জানে। সে বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলে নিশ্চয়ই সে আপত্তি করবে না। কারণ অন্য কোনও উপায় তো নাই।

মাহমুদ এই সব যখন ভাবছে, আবু সামাত চোখ মেলে তাকালো। কি একটা স্বপ্ন দেখে ঘুমটা তার কেটে গেল। মাহমুদ আরও কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার? কী হয়েছে? এখানে এই অবস্থায় শুয়ে আছ কেন?

সামাত তখন গত রাতের সব ঘটনা বললো তাকে। মাহমুদ বললো, যাক, যা নসীবে ছিল তাই ঘটেছে। ও নিয়ে হাহুতাশ করে লাভ নাই। তোমার সামান-পত্র যা গেছে, তার জন্য ভেবো না। আমি তোমাকে তার অনেক বেশি দামের সওদা দেবো। চল, আমার বাড়িতে চল।

সামাত কিন্তু কিন্তু করছিল, কিন্তু মাহমুদ আর কোনও সুযোগ দিল না। সামাতকে তার পিছনে বসিয়ে বললো, শক্ত করে আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকবে, জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দেবো।

বাড়িতে পেঁৗছে প্রথমেই আবু সামাতকে সে হামামে নিয়ে যায়। আচ্ছা করে নিজে হাতে তার সর্বাঙ্গ ডলাইমলাই করে সাফ করে। গামলা গামলা জল ঢেলে গোসল করায়। দামী সাজপোশাক-এ সুন্দর করে সাজায়। তারপর সঙ্গে করে বসার ঘরে নিয়ে যায়। নানারকম মুখোরোচক খাবার আর দামী সরাবে খানাপিনা জমে ওঠে। ঢুলুঢুলু নেশায় দুজনেরই চোখ ছোট হয়ে আসতে থাকে। মাহমুদ হেড়ে গলায় গান ধরে। খিস্তি-খেউড়ের গান। আবু সামাত সহ্য করতে পারে না। লোকটা কী ভীষণ নোংরা। সারা দেহ মন রি রি করে ওঠে। না, আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। পালাতে হবে। সামাত উঠে দাঁড়ায়। মাহমুদ হাঁ হাঁ করে ওঠে। ধরতে যায়। কিন্তু ততক্ষণে সামাত ছুটে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে হন হন করে হাঁটতে শুরু করেছে।

সারাদিন ধরে শহরের পথে পথে ঘুরে ঘুরে সামাত ভীষণ ক্লান্ত। এবার সে একটু বিশ্রাম চায়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, রাতের মতো একটা আস্তানা জোগাড় করতে হবে। উপায়ন্তর না দেখে সামনের একটা মসজীদের আঙ্গিনায় ঢুকলো সামাত। পায়ের চটি খুলে মসজীদের ভিতরে গেল। একটু পরে দুটি লোক লণ্ঠন হাতে ঢুকলো। তাদের পথ করে দেবার জন্য সে একটু সরে বসতে যায়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ লোকটি সামাতের কাছেই এগিয়ে এসে সালাম জানায়, খোদা হাফেজ; সালাম আলেকুম। সামাতও আলেকুম সালাম জানায়। দুজনেই সামাতের পাশে বসে পড়ে। বৃদ্ধটি জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বেটা, তুমি কি মুসাফীর?

—জী-হাঁ। আমি কাইরো থেকে আসছি। আমার বাবা সওদাগর সামসুদ্ অল দিন কাইরোর বণিক সমাজের সভাপতি।

বৃদ্ধ তার সঙ্গীটির দিকে মুখ ফিরিয়ে খাটো গলায় বলে, খোদা বোধহয় মুখ তুলে চাইলেন। এত তাড়াতাড়ি এরকম এক বিদেশীকে পাওয়া যাবে আশা করিনি।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দুশো একষট্টিতম রাতে আবার সে শুরু করে :

আবু সামাতের আরও কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বৃদ্ধ।—মনে হচ্ছে, আল্লাহ আমাদের জন্যেই তোমাকে এই শহরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তোমার কাছ থেকে একটু অনুগ্রহ চাই, বাবা। একটা কাজ তোমাকে করে দিতে হবে। অবশ্য বিনি পয়সায় নয়। তার জন্যে পাঁচ হাজার নগদ, এক হাজার মোহরের সওদাপত্র আর এক হাজারী একটা ঘোড়া তোমাকে আমরা ইনাম দেবো।

আবু সামাত অবাক হয়। এই বিদেশে আজ সে কপর্দক শূন্য। পয়সার তার প্রচুর প্রয়োজন। কিন্তু তার মতো একটি আনাড়ী অনভিজ্ঞ ছেলেকে দিয়ে কি এমন কাজ করিয়ে নিতে পারবে তারা, যার বিনিময়ে এত ইনাম পাওয়া যাবে? সামাত বলে, কিন্তু আপনি ভুল করেছেন। আমার কোন কাজের অভিজ্ঞতা নাই। আমি আপনার কোনও উপকারে আসতে পারবো না। টাকাপয়সার খুব দরকার আছে, কিন্তু আমাকে দিয়ে কাজ না হলে শুধু শুধু দেবেন কেন?

বৃদ্ধ বলে, ও নিয়ে তোমাকে কোনও মাথা ঘামাতে হবে না, বাবা। আমি দেখেই বুঝেছি, তোমাকে দিয়েই আমাদের কাজ উদ্ধার হবে। তা হলে শোন বাবা, বলি :

তুমি তো জান, মুসলমান ধর্মের বিধান—বিবিকে একবার তালাক দিলে তিন মাস বাদে আবার তাকে ঘরে নেওয়া যায়। দ্বিতীয়বার তালাক দিলেও বিধিসম্মত সময়ের ব্যবধানে আবার সে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু তিন-তালাক হয়ে গেলে আর তাকে ফিরে পাওয়া যায় না। তবে শাস্ত্রে তারও ব্যবস্থা দেওয়া আছে। সে ক্ষেত্রে যদি বয়ান-তালাক দেওয়া বিবিকে আবার ফিরে পেতে ইচ্ছা হয়, তবে সেই বিবির অন্য কারো সঙ্গে শাদী হওয়া দরকার। শাদীর পরে অন্তত একটি রাত্রি তার সঙ্গে সহবাস করতে হবে। তার পর সে যদি তাকে তিন-তালাক দিয়ে দেয়, তখন সে আবার তার প্রথম স্বামীর সঙ্গে নিকা করতে পারে।

এখন, এই ক'দিন আগে আমার মেয়ের সঙ্গে এই ছেলের খুব ঝগড়া-ঝাঁটি হয়। এই ছেলেটির সঙ্গে তার শাদী দিয়েছিলাম। রাগের মাথায় বাবাজীবন আমার মেয়েটিকে এক সঙ্গেই তিন-তালাক দিয়ে দেয়। মুসলমান ধর্মে জবানই সার। মুখ দিয়ে একবার বের করলেই হলো, আমি তোমার সঙ্গে আর ঘর করবো না। আজ থেকে তুমি আমার আর কেউ না। এই দিলাম এক তালাক—দুই তালাক—তিন তালাক। বাস্ সব খতম। এর পর তো আমার মেয়ে বোরখায় সারা শরীর ঢেকে ফেললো। কারণ তখন তো তার স্বামী তার কাছে পরপুরুষ। সেইদিনই সে তার দেনমোহর নিয়ে আমার কাছে ফিরে এসেছে। এদিকে বাবাজীবনের মাথা যখন ঠাণ্ডা হলো, তখন সে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে লাগলো। আর তো কোনও উপায় নাই। এখন সে দিন রাত হাহুতাশ করছে। কীভাবে তাকে আবার নতুন

করে নিকা করা যায় তার ফিকির খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমিও বুঝতে পারছি, ব্যাপারটা রাগের মাথায় ঘটেছে। আসলে ওদের দুজনের ভালোবাসা ঠিকই ছিল। না হলে বয়ান-তালাক দেওয়া মেয়েকে কেউ আবার ফিরে পেতে চায়?

এখন বাবা, তুমিই ভরসা, জানি পথে যখন বেরিয়েছ, পয়সার তোমার দরকার আছে। তুমি বিদেশী, পথ চলতে চলতে একটা রাতের জন্য যদি একটি খুবসুরৎ লেড়কী আর তার সঙ্গে কিছু স্বর্ণমুদ্রা মিলে যায় নেবে না কেন? তোমাকে তো কোন বন্ধনে আটকাতে চাই না। পথ চলতে ঘাসের ফুলের মতো পথেই ফেলে চলে যাবে তুমি। শুধু বাড়তি লাভ টাকাপয়সাগুলো নিয়ে যাবে।

দারিদ্র্য এমনই বস্তু, তার চাপে পড়ে অনেক শুভবুদ্ধির বলি দিতে হয়। বাধ্য হয়ে সামাত তাদের এই অ-মানুষিক প্রস্তাবে রাজি হলো।

—তা হলে আমি পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা, এক হাজার দিনারের সামান-পত্র এবং এক হাজার দিনার দামের মতো একটা তেজী ঘোড়া পাবো তো?

—আলবৎ পাবে।

এর জন্যে আমাকে এক রাতের জন্য আপনার কন্যাকে শাদী করতে হবে। এবং সারা রাত তার সঙ্গে সহবাস করতে হবে। এই তো?

—ঠিক এই। এর বেশী আর কিছু করতে হবে না, বেটা। পরদিন সকালে উঠে যে দিকে তোমার খুশি, চলে যাবে। বাস্। আর পিছনে তাকাবার কোনও দরকার নাই। কোনও দায় দায়িত্ব, কোনও ঝঞ্ঝাট তোমাকে পোয়াতে হবে না।

সামাত বলে বেশ আমি রাজি। আপনারা সব ব্যবস্থাপত্র করুন।

এবার বৃদ্ধের পাশে বসে-থাকা ছেলেটি মুখ খুললো; আপনি আমাদের কত বড় মুসকিল আসান করলেন কি আর বলবো। এ ঋণ শুধু কিছু পয়সা দিয়ে শোধ করা যায় না। আমি আমার বিবিকে প্রাণাধিক ভালোবাসতাম। কিন্তু রাগের মাথায়, হঠাৎ কি হয়ে গেল, একেবারে তিন-তালাক দিয়ে দিলাম তাকে। মুখ থেকে জবান বেরিয়ে গেছে। সাচ্চা মুসলমানের বাচ্চা। কথা তো আর উলটানো যায় না।

ছেলেটি একটুক্ষণের জন্য দম নিয়ে আবার বলতে থাকে, আমি সবই বুঝতে পারছি, আপনি বিদেশী পথিক। আজ এখানে কাল সেখানে করে চলতে থাকবেন। কিন্তু তবুও আমার মন থেকে ভয় যেতে চায় না। ধরুন সবই কথাবার্তা পাকা হলো, কিন্তু মানুষের মন, কিছুই তো বলা যায় না, শাদীর পর সকালে হয়তো আপনার মতিগতি পালটে গেল। সদ্য শাদী করা বিবির রূপে গুনে আপনি মুগ্ধ হয়ে পড়লেন। মায়া মোহ কখন কাকে কিভাবে জড়িয়ে ফেলে কেউই বলতে পারে না। তাই বলছিলাম, শাদীর আগে একটা চুক্তিনামা করে নিলে আপনার কি আপত্তি আছে?

সামাত বুঝতে পারে না, কেমন চুক্তি?

—ধরুন আপনি যদি শাদীর পর আর তাকে না ছাড়েন। ফিরিয়ে না দেন। সেই জন্যে আপনাকে একটা খেসারত দিতে হবে। শর্তভঙ্গের সাজা বলতে পারেন। দশ হাজার দিনারের খেসারতনামা সই করে দেবেন।

শর্ত না মানলে, বিবিকে না ছাড়লে আমি ঐ টাকা আপনার কাছে দাবী করে আদায় করবো।

সামাত হো হো করে হেসে ওঠে, ও, এই কথা! আমি একশোবার রাজি। শর্তভাঙলে তো সাজা—তা ওপথে যাবে না এ মক্কেল।

তখনি তিনজনে কাজীর বাড়ি গেল। শাদী-নামার সঙ্গে খেসারৎ নামার চুক্তিপত্রও তৈরি করা হলো। সই-সাবুদও হয়ে গেলে বৃদ্ধ তার নতুন জামাতা সামাতকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে মেয়েকে বললো, বেটি তোমার জন্যে এক নওজোয়ান ছেলেকে পছন্দ করে নিতে এসেছি। আমার বিশ্বাস, সে তোমাকে সুখী করতে পারবে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আজকের শুভরাত্রি তোমাদের সুখের হোক। তবে শুধু আজকের রাতের জন্যেই তার সহবাস তুমি পাবে। কাল সকালেই সে আবার চলে যাবে।

এর পর মেয়ের মা এবং বাবা দুজনে এসে সামাতকে প্রচুর আদর আপ্যায়ন করলো। বৃদ্ধ বললো, তুমি একটু অপেক্ষা কর বাবা, মেয়ে এখুনি আসবে তোমার ঘরে।

এই বলে তারা অন্দরে চলে গেল। সামাত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে।

এদিকে মেয়েটির আসল স্বামী দারুণ হিংসায় জ্বলছে। তার বিবিকে অন্য লোকে ভোগ করবে। কিছুতেই প্রবোধ মানে না মন। সে একটা ডাইনী বুড়িকে বকশিসের লোভ দেখিয়ে নিযুক্ত করে। তাকে খুব আদর সোহাগ জানিয়ে মাথায় তুলে বলে, বুড়িমা, তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমার ঘরের বিবিকে অন্য লোক নিয়ে শোবে এ কেমনতর কথা, বুড়িমা। তুমি এর একটা মতলব বের কর। যেমন করেই হোক, ওদের দুজনের লদকালদকী বন্ধ করতেই হবে।

বুড়িটা বলে, তুমি কিচ্ছু ভেব না, আমি সব ভণ্ডুল করে দিচ্ছি।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চুপ করে বসে থাকে।

দুশো বাষট্টিতম রজনীতে আবার সে শুরু করে:

সারা শরীর বোরখায় ঢেকে সে বুদ্ধের বাড়ি আসে। এদিক ওদিক উঁকিঝুঁকি মেরে টুক করে আবু সামাতের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সামাত তখন শয্যায় অর্ধশায়িত হয়ে তার সদ্য-শাদী করা বিবির প্রতীক্ষা করছিল। বুড়িটা জিজ্ঞেস করে, যে মেয়েটাকে তার স্বামী তালাক দিয়েছে সে কোন্ ঘরে আছে বলতে পার, বাবা? আমি রোজ তার শরীরে দাওয়াই মালিশ করতে আসি। যদিও জানি, দাওয়াই দিয়ে কুষ্ঠব্যাধি সারানো যায় না, তবু কি করবো, তার মা-বাবাকে বোঝানো দায়।

আল্লাহ রক্ষা করুন, সামাত আঁৎকে ওঠে, বল কী? মেয়েটার কুষ্ঠব্যাধি আছে নাকি? আজ রাতে যে তার সঙ্গে আমার সহবাস করার ওয়াদা আছে! সর্বনাশ, জেনেশুনে তো এ-কাজ আমি করতে পারবো না।

বুড়িটা না বোঝার ভান করে, কেন? সহবাস করতে হবে কেনো?

সামাত বলে, তার আগের স্বামীর সঙ্গে সেইরকমই চুক্তি হয়েছে আমার।

সে আবার তার তিন তালাক দেওয়া বিবিকে ঘরে নিতে চায়। তাই এক রাতের জন্য তাকে আমি শাদী করেছি, শাস্ত্রমতে একটা রাত তার সঙ্গে সহবাস করতে হবে। তারপর কাল সাকালে তাকে আমি বয়ান তালাক দিয়ে চলে যাবো।

—সে কি বাবা, অমন কাজটি করো না। কুষ্ঠ দুরারোগ্য ছোঁয়াচে ব্যারাম। একবার ধরলে আর সারে না। আর যাই কর তাকে স্পর্শ করো না। তোমার এই সুন্দর নতুন জোয়ান বয়স। এইভাবে নষ্ট করো না।

বুড়িটা আর তিলমাত্র অপেক্ষা না করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এবারে সে মেয়েটার ঘরে ঢোকে। বলে, সাবধান, মা, তোমার বাবা ঘাটের মড়া কুড়িকুষ্ঠে ভরা একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে এসেছে। ভুলেও তার সঙ্গে কিছু করো না। শরীরে বিষ পুরে দিয়ে চলে যাবে।

আবু সামাত অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো, কিন্তু মেয়েটি ঘরে আসে না। চাকর-বাকররা এসে খানাপিনা সাজিয়ে দিয়ে গেল। একা একাই সে রাতের খানাপিনা সেরে নেয়। ঘুমাতে যাবার আগে নিত্যকার অভ্যাসমতো সে সুর করে কোরান পাঠ করতে থাকে।

মেয়েটি পাশের ঘর থেকে তার সুরেলা কণ্ঠ শুনে মুগ্ধ হয়। এমন মধুর গলার স্বর তো কোনও অসুস্থ মানুষের হতে পারে না। খোদা ভরসা, যা ঘটে ঘটুক, আমি তাকে স্বচক্ষে পরীক্ষা করে দেখবো। মনে হচ্ছে, শয়তান বুড়িটা বানিয়ে মিথ্যে কথা বলে গেছে।

ঘরের এক পাশে গান বাজনার যন্ত্রপাতি ছিল, একটা হিন্দুস্তানী তানপুরা তুলে নিয়ে সে গান ধরে। অপূর্ব কণ্ঠ। মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাবে সামাত, এতো কোনও কুষ্ঠরোগীর গলা দিয়ে বেরুতে পারে না। বুড়িটা কি তাকে ধোঁকা দিয়ে গেল?

আবু সামাত, মেয়েটির গান শেষ হলে, একটি আড়-খেমটা গাইতে শুরু করে। চোখে দেখতে না পেলেও, পরিস্কার সে বুঝতে পারলো, পর্দার ওপারে ওঘরে সে ঘুঙুর বাজিয়ে গানের তালে তালে নেচে চলেছে। এবার সে নিঃসন্দেহ হয়, যে-কুষ্ঠ রুগী সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারে না, সে আবার নাচতে পারে নাকি? ডাঁহা মিথ্যে কথা বলে গেছে শয়তান বুড়িটা।

গান থামলে, মেয়েটি নাচ থামিয়ে পর্দা ঠেলে সামাতের ঘরে ঢোকে। সামাত চমকে ওঠে। এক ঝলক বিজলী যেন হঠাৎ থেমে গেছে তার সামনে। তার কুসুম পেলব দেহলতা সামাতের চিত্তে চঞ্চলতা জাগায়। এত রূপ, এত লাবণ্য, এমন লাস্য সে এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলো। যেন এতক্ষণ ঘরখানা অন্ধকার কালো মেঘে আচ্ছন্ন ছিল, হঠাৎ মেঘ সরে গিয়ে চাঁদ বেরিয়ে আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে।

—কী গো, অমন হাঁ করে কী দেখছো, ঘরে চল, শোবে না।

ঘাড় বাঁকিয়ে ভুরু নাচিয়ে এমন ঢং-এ মেয়েটি তাকে ডাকে, সামাতের সারা শরীরে আগুন ধরে যায়। বলে, কোথায় যেতে হবে, চল।

মেয়েটি এমন ভাবে পাছা দুলিয়ে দুলিয়ে চলতে থাকে, দেখলে ধ্বজভঙ্গও যৌবন ফিরে পাবে। সামাতের মনে কোনও সংশয় ছিল না, তবু সহবাসের আগে তার দেহটা একবার পরীক্ষা করে দেখার ইচ্ছে হলো। কিন্তু মুখে বলে

কি করে সে কথা। মেয়েটি কিন্তু আঁচ করতে পারে, ও, বুঝেছি, সেই ডাইনী বুড়িটা তোমার ঘরেও ঢুকেছিল। আচ্ছা তোমার সন্দেহ নিরসন করে দিচ্ছি।

এক এক করে সে তার বেশবাস খুলে ফেললো। —এই দ্যাখো, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খুব ভালো করে দ্যাখো, সারা গায়ে গোটা কয়েক তিল ছাড়া কোথাও একটা ফুস্কুড়ী বা কাটা ছেঁড়ার কোনও দাগ ফাগ আছে কিনা।

সামাত দেখলো তার সর্বাঙ্গ মাখনের মত নরম। কোথাও কোনও অসামঞ্জস্য নাই। সুন্দর নিটোল মসৃন একটি কচি শালের গুঁড়ি।

সামাতের সুপ্ত পৌরুষ জেগে ওঠে। কিন্তু আনাড়ী তরুণ বুঝতে পারে না, কিসে কি হয়। সারা শরীরে অসহ্য এক যন্ত্রণা অনুভব করে। ভাবে মেয়েটি তো সেয়ানা, ও নিশ্চয়ই বাৎলে দেবে, শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে। কিন্তু কাছে এগোতেই মেয়েটি ছিটকে সরে যায়। চোখে মুখে তার আতঙ্ক।

—তোমার শরীরে যদি সত্যিই কুষ্ঠের বিষ থাকে। তাহলে আমি যে সারা জীবন পঙ্গু হয়ে থাকবো। আমাকে ধরার আগে তুমি বাপু কাপড়-চোপড় খুলে শরীরটা দেখাও। জানি আমি কুষ্ঠরুগীর চেহারা এমন চেকনাই লালটুস হয় না, তবু বলা তো যায় না।

আবু সামাত হাসে, সে তো খুব ভালো কথা, যাকে দেহ দেবে, তার দেহটা একবার চোখে দেখবে না—সে কি হয় ?

একেবারে নগ্ন হয়ে দাঁড়ালো তার সামনে। মেয়েটির চোখে অপার বিস্ময়। নিরন্তর নির্ঝর জল-প্রপাতের মধ্যে যেন একখণ্ড প্রস্তর শিলা। ছুটে গিয়ে স্বামীকে বাহুপাশে বেঁধে ফেলে সে। প্রায় এক রকম বুকে জড়িয়েই এনে ফেলে পালঙ্কে। তারপর প্রতি পলকে প্রলয় কাণ্ড ঘটতে থাকে। মেয়েটি বাঘিনীর মতো গোঙায়, তুমি না পুরুষ! কই, চালাও তোমার সিংহের থাবা। চিরে শেষ করে দাও আমাকে। প্রমাণ কর, তুমিও তোমার বাবার মতো আর এক সিংহ শিশুর জন্মদাতা।

একটি সুখের রাত্রির অবসান হয়। মেয়েটির বাহুপাশে আবদ্ধ সামাত-এর ঘুম ভাঙ্গে। রাত্রে সে জেনে নিয়েছে, মেয়েটির নাম জুবেদা। সামাত বলে, জুবেদা, আমার দুঃখ তোমাকে বোঝাতে পারবো না। আমি শর্তে আবদ্ধ। এখুনি তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। অথচ, মাত্র একটি রাতের কয়েক প্রহরের মধ্যে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, তুমি ছাড়া আমি বাঁচবো না।

জুবেদা আকুলভাবে তার হাত চেপে ধরে, সে কি কথা ? কেন চলে যাবে ? তা হয় না।

—তুমি কি জান না, কি শর্তে আমি সই করেছি। তোমার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু একটি রাতের জন্য। তোমার আগের স্বামী তোমাকে ফিরে পেতে চায়। আর সেই পথটা পরিস্কার করার জন্যে আমার সঙ্গে তোমার শাদী দেওয়া হয়েছে। এবার আমি তোমাকে তিন-তালাক দিয়ে গেলে সে আবার তোমাকে নিকা করে ঘরে নিতে পারবে। আমি যাতে বিশ্বাসঘাতকতা না করতে পারি সে জন্য তোমার আসল স্বামী আমাকে দিয়ে চুক্তি করিয়ে নিয়েছে। চুক্তি না মানলে আমার কাছ থেকে দশ হাজার দিনার

খেসারত আদায় করবে। দশ হাজার দিনার তো অনেক দূরের কথা, দশটা দিরহামও আমার জেবে নাই। সে ক্ষেত্রে, আমি যদি তোমাকে তালাক না দিই তোমার স্বামী আমার নামে মামলা দায়ের করবে। মামলায় আমি নির্ঘাৎ হারবো। তার পরিণাম কি জান? দশ হাজার দিনার আক্কেল সেলামী দিতে হবে। আর তা দিতে না পারলে, দিতে যে পারবো না তা তো জান, হাতে কাতকড়া পড়বে। ফাটক খাটতে হবে।

জুবেদা কি যেন একটুক্ষণ ভাবলো। তারপর সামাতের হাতে চুমু খেয়ে বললো, সামাত আমার সোনা, কালকে রাতের সুখ স্মৃতি সারা জীবনে আমি ভুলবো না। তোমার মতো পৌরুষ কটা পুরুষের থাকে? আমি তোমাকে ছাড়তে পারবো না। সারা জীবন ধরে তুমি আমার আকাশে ধ্রুব তারার মতো জ্বলবে। আমি কথা দিচ্ছি, একটা উপায় আমি বের করবোই। মুসকিলের আসান হবেই। তোমাকে ছাড়া এ যৌবন অন্য কারো হাতে তুলে দেবার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়, সোনা।

সামাত ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করে, কিন্তু কীভাবে তুমি আমাকে বাঁচাতে পারবে? আমি যে সই করে দিয়েছি।

জুবেদা বলে, ঘাবড়াও মাৎ, আমি তোমাকে ফিকির বাতলে দিচ্ছি। একটু বাদে আমার বাবা তোমাকে কাজীর কাছে নিয়ে যাবে। শাদী নামা বাতিল করে বয়ান তালাকের কাগজপত্রে সই সাবুদ করার জন্য তোমাকে যেতে হবে সেখানে। তুমি গিয়ে কাজীর কানে কানে বলবে, 'আমি আমার বিবিকে তালাক দিতে চাই না।' সে কথা শুনে সে অবাক হয়ে বলবে, 'কী বললে? পাঁচ হাজার সোনার মোহর এক হাজার দিনারের জিনিসপত্র এক হাজার দিনার দামের তেজী ঘোড়া—সব ছেড়ে দেবে সামান্য একটা মেয়েছেলের জন্য?' তখন তুমি বলবে, 'তার একগাছি চুলের দাম দশ হাজার দিনার।' কাজী তখন গম্ভীর হয়ে বলবে, বেশ, যা ভালো বোঝ, কর। আমার আপত্তির কি থাকতে পারে। কানুন তোমার পক্ষে আছে। শাদী করা বিবি আইনত তোমার সম্পত্তি। না ছাড়লে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। কিন্তু ফাঁসবে তুমি অন্য রাস্তায়। শর্ত করেছ, চুক্তি না মানলে দশ হাজার দিনার খেসারত দিতে হবে। তা দেবে, পয়সা যদি তোমাকে কামড়ায় দশ হাজার দিনার ছুঁড়ে দেবে তার আগের স্বামীর নাকের ডগায়। পয়সা দিয়ে দিলে তোমাকে আর সাজা দেবে কার সাধ্য। তবে হ্যাঁ, গুণে গুণে দশটি হাজার দিনার দিতে হবে। নইলে ফাটক—একেবারে সোজা শ্বশুর বাড়ি যেতে হবে।

জুবেদা বলতে থাকে, শোন, কাজী লোক ভালো শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান গরিমায় চমৎকার—শুধু একটাই তার দোষ—সুন্দর সুন্দর অল্প বয়েসী ছোকরা দেখলে আর ঠিক থাকতে পারে না।

—যাঃ বাবা, কাজীও দুমুখো নাকি?

সামাত আঁৎকে ওঠে। তাই দেখে জুবেদার কি হাসি। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে আর কি।

—তুমি ঠিক ধরেছ তো। কেন, আগের কোনও অভিজ্ঞতা আছে নাকি?

আবু সামাত বলে, খুব আছে। এর আগে এক দুমুখোর পাল্লায় পড়েছিলাম আমি। কোনও রকমে পালিয়ে বেঁচেছি। কিন্তু এখন ভাবছি এক দুমুখোর খপ্পর থেকে ছিটকে এসে আর এক দুমুখোর খপ্পরে পড়তে চলেছি। না না, সে আমি পারবো না, তুমি বরং অন্য ফিকির বাতলাও। আমি বুড়ো কাজিটার নোংরামী সহ্য করতে পারবো না।

জুবেদা বললো, আগেই অধৈর্য হয়ো না। দাঁড়াও, দেখ কি হয়? কাজী যখন তোমাকে বলবে, 'তাহলে খেসারতের দশ হাজার দিনার দিয়ে দাও,' তখন তুমি শুধু মুচকী হাসবে। ওর গা ঘেঁষে দাঁড়াবে। আব্দার করে বলবে, 'এখন আমি দিতে পারবো না, আমাকে কিছু সময় দিন।' দেখবে কাজ হবে। কাজী তোমাকে সময় দেবে। তারপর আল্লাহ একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবেন।

আবু সামাত বলে, এটা মন্দ বল নি।

এই সময় চাকর এসে বললো, মালকিন, বাইরে আপনার বাবা অপেক্ষা করছেন, এই সাহেবকে নিয়ে তিনি কোথায় বেরুবেন।

আবু সামাত চটপট নিজেকে তৈরি করে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

জুবেদার কথাই ঠিক। কাজী আবু সামাতের ব্যবহারে বিগলিত হয়ে দশ দিনের সময় দিয়ে বললো, এই দশ দিনের মধ্যে যদি টাকা জোগাড় করতে না পার, চিন্তা করো না, আমি দিয়ে দেব সে-টাকা।

আবু সামাত কৃতজ্ঞ চিত্তে কাজীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিবির কাছে ফিরে এল।

জুবেদা শুনে আনন্দে নেচে ওঠে। সামাতের হাতে একশোটা দিনার দিয়ে বলে, আজ রাতে জোর খানা-পিনার ব্যবস্থা কর। সারা রাত ধরে মৌজ করবো দুজনে।

আবু সামাত নিজে কেনাকাটা করে নিয়ে আসে। সরাবের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে নাচ-গান হাসি-মস্করার মধ্যে কাটাতে থাকে।

রাত তখন গভীর। হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে সামাত উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতে যায়।

খলিফা হারুন অল-রসিদ সেই রাতে পারসীক দরবেশের ছদ্মবেশে বাগদাদের পথ পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল উজির জাফর, দেহরক্ষী মাসরুর আর সভাকবি আবু নসাব। খলিফা জাফরকে বললেন, বুকের ভিতরটা কেমন ভার ভার মনে হচ্ছে, চলতো, জাফর, খোলা হাওয়ায় একটু ঘুরে আসি।

জাফর বললো, জো হুকুম জাঁহাপনা—

চারজনে চলতে চলতে এক সময় জুবেদা আর সামাতের গান-বাজনা শুনে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে পড়ে। —বাঃ তোফা মাইফেল চলছে তো!

দরবেশদের একজন জুবেদার দরজায় কড়া নাড়ে। দরজা খুলে আবু সামাত দেখলো, চারজন ফকির। সাদরে তাদের অভ্যর্থনা করে অন্দরে এল সে। পাশের ঘরটায় বসালো। সামাত খানাপিনা এনে সাজিয়ে দিল তাদের সামনে। তারা কিন্তু সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে বললো, খোদা মেহেরবান, আমরা একাহারী, খানাপিনার কোনও প্রয়োজন নাই। যদি গান শোনাও খুশি

হবো। বাইরে থেকে তোমাদের গানের কলি কানে ভেসে আসছিল। বড় সুন্দর সুরেলা গলা তোমাদের। মনে হয়, যেন কোনও নামজাদা গাইয়েরা গাইছিল।

সামাত বলে, না, আমরা কেউই পেশাদার গাইয়ে নই। মনের আনন্দে গাই, এই আর কি। আমার বিবি সত্যিই ভালো গায়।

এরপর কথায় কথায় আলাপ পরিচয় জমে ওঠে। সামাত যে এদেশের বাসিন্দা নয় তা ওরা আগেই বুঝেছিল। কি করে সে বাগদাদে এল, তারপর কি বিচিত্র তার অভিজ্ঞতা—সব আগাগোড়া খুলে বললো সামাত। সে-সব বিবরণের পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নাই।

দরবেশের প্রধান—অর্থাৎ খলিফা—আবু সামাতের কথা-বার্তায় আদব কায়দায় মুগ্ধ হয়ে পড়েন।

শোন বাবা, দশ হাজার দিনারের ভাবনায় মন খারাপ করো না। ব্যবস্থা একটা হবেই। আমি বাগদাদ শহরের সমস্ত দরবেশদের প্রধান। মোট আমরা চাল্লিশজন। তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করে তোমার দেনা আমরা শোধ করে দেব। যাক, ওসব টাকা পয়সার তুচ্ছ কথা, এখন তোমার বিবিকে একবার অনুরোধ জানাও, আমরা তার দু-একটা গান শুনতে এসেছি। তিনি যদি খুশি মনে শোনান, আমরা ধন্য হবো। কারো কাছে সঙ্গীত সুসম খাদ্য সমান, কেউবা সঙ্গীতকে দাওয়াই মনে করে, আবার কেউ ভাবে সঙ্গীত সময় কাটানোর উৎকৃষ্ট উপায়। যে যে-চোখে দেখে, যে যেভাবে ভাবে। কিন্তু আমাদের কাছে সঙ্গীতই সব। তা দিয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, ওষুধেরও কাজ দেয়, আর সময় কাটানো—তা তো হবেই।

জুবেদা দরবেশদের গান শুনিয়ে মাত করে দিতে পারলো। বাকী রাতটা কোন দিক দিয়ে কিভাবে কখন পালিয়ে গেল, কেউ টেরই পেল না। যখন তন্ময়তা কাটলো, তখন ভোর হতে চলেছে। সদল বলে প্রস্থান করার আগে খলিফা একশো স্বর্ণমুদ্রার একটি তোড়া তাকিয়ার নিচে রেখে গেলেন।

দুপুরবেলা সামাত বাজারে যাবার জন্য তৈরি হয়। খলিফা যে মোহরের তোড়াটা ফেলে গিয়েছিলেন তাই দিয়ে কিছু কেনাকাটা করবে—এই রকম ইচ্ছে। দরজা খুলতেই সে অবাক হয়। পঞ্চাশটা খচ্চর-এর পিঠে দামী দামী সামান পত্র। আর একটা খচ্চরে চেপে এসেছে আবু সিনিয়ার এক সুদর্শন বান্দা। ছেলেটি লাফিয়ে নেমে এসে সামাতের হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বলে, আমি কাইরো থেকে আসছি। আপনার বাবা আমাদের পাঠিয়েছেন। আপনার বিবির জন্য পঞ্চাশ হাজার দিনারের দান সামগ্রী পাঠিয়েছেন।

সামাত চিঠিখানা খুলে পড়তে থাকে।

'প্রাণ প্রতিম পুত্র আলা অল-দিন আবু সামাতের প্রতি তার পিতা সামস অলদিনের আশীর্বাদ পত্র :

বাবা, তোমার বিপদের কথা শুনলাম। ডাকাতের হাতে সর্বস্ব খুইয়ে আজ তুমি কিভাবে দিন কাটাচ্ছো জানি না। তোমার কষ্টের কথা ভেবে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

যাই হোক, এই সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার দিনার মূল্যের দান সামগ্রী

পাঠালাম। তোমার মা তার পুত্রবধূর জন্য নিজে হাতে তৈরি করা মূল্যবান পোশাক-আশাক এবং স্বর্ণালঙ্করাদি পাঠালেন। আশা করি এসব তার অপছন্দ হবে না।

আমরা শুনে আহত হলাম, তুমি নাকি অর্থাভাবে কোনও তালাক দেওয়া মেয়েকে শাদী করে আবার তার স্বামীর হাতে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছ। এ কাজ সম্ভ্রান্ত লোকে করে না। যাইহোক, শাদীর পর সে তোমার আইন সম্মত বিবি। তুমি না ছাড়লে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে এই অ-মানুষিক কাজ তোমার শোভা পায় না। তোমার যদি পছন্দ হয়, সে বিবিকে তুমি কিছুতেই তালাক দিও না। আমি সালিমের সঙ্গে যা পাঠালাম তার মূল্য পঞ্চাশ হাজারের অনেক বেশী। প্রয়োজন বোধ করলে, এর থেকে খেসারতের টাকা পরিশোধ করে দিয়ে শাদী করা বিবিকে সসম্মানে ঘরে আনবে।

আমি এবং তোমার মা কুশলে আছি। সত্বর ঘরে ফিরে আসবে। আল্লাহ তোমার সহায় থাকুন। ইতি—

তোমার আব্বাজান

আবু সামাতের আনন্দ আর ধরে না। ছুটে গিয়ে জুবেদাকে সব বলে, চিঠিখানা দেখায়, আর কী ভাবনা, এবার আমি তোমার আগের স্বামীর নাকের ডগায় ছুঁড়ে মারবো দশ হাজার দিনার। টাকার জন্যে তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে! ভারি তো দশ হাজার দিনার—তার আবার কথা। তোমার একগাছি চুলের দাম তার চেয়ে ঢের বেশি।

স্বামীর মুখে তোয়াজ-প্রশংসা শুনলে কোন্ মেয়ে না খুশিতে ডগমগ হয়। জুবেদা গলে গেল। স্বামীকে সোহাগ করে বলে, ওগো আমার গুল বাগিচার মালি, তোমায় আমি ছাড়বো না—ছাড়বো না। এমন করে ঢালতে পার পানি—আমার চৈত্র মাসের ঝরা পাতার মরা ডালে আবার নতুন করে গজায় কুঁড়ি।

এমন সময় জুবেদার বাবা এবং তার আগের স্বামী ঘরে ঢুকলো। বাবা বলে, বেটা সামাত, আমি তোমার কাছে একটা আর্জি নিয়ে এসেছি।

—বলুন।

—তুমি বাবা, আমার এই আগের জামাই-এর ওপর একটু করুণা কর। গরীব বেচারী, রাগের মাথায় বিবিকে বয়ান তালাক দিয়ে ফেলেছিল। তা সে আর সত্যি সত্যি তাকে মন থেকে মুছে ফেলতে চায়নি। জুবেদাকে তুমি ছেড়ে দাও বাবা, এই আমার ভিক্ষে। আল্লাহর কৃপায় তোমার অনেক আছে। আজ তোমার বাবা যা পাঠিয়েছে তা দিয়ে তুমি অনায়াসে বাঁদী বাজারের সেরা মেয়েকে কিনে আনতে পার। তা যদি পছন্দ না হয়, হাঁ করলেই আমির ওমরাহর সুন্দরী মেয়েকে বিবি করতে পারবে। কিন্তু আমার এই গরীব ছেলেটা জুবেদাকে ফিরে না পেলে আত্মঘাতী হবে। তুমি ওকে ফিরিয়ে দাও। সারা জীন্দগী সে তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে।

আবু সামাত বাধা দিয়ে বলে, আহা-হা ওকি কথা। কে কার গোলাম হয়ে থাকবে। ও কথা রাখুন, আল্লাহ আমাকে অনেক মূল্যবান সওদাপত্র পাঠিয়েছেন। এখন আমার আর কোনও অভাব নাই। তাই জুবেদার

স্বামীকে খেসারতের পরিমাণটা আরও অনেক বাড়িয়ে দিতে চাই। ঐ পঞ্চাশটা খচ্চর সমেত সামান পত্র সব আমি তাকে দিচ্ছি—সেই সঙ্গে ঐ বান্দা সালিমকেও দেব। আর যদি জুবেদা বলে, সে তার আগের স্বামীর সঙ্গেই ঘর করবে, আমার কোনও অমত নাই। এক কথায় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবো। জুবেদাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন সে কি বলে—সে কি চায়।

জুবেদার বাবা এবার মেয়ের মত চায়, মা, তুমি বল, কার সঙ্গে ঘর করতে চাও। তোমার জন্য তোমার আগের স্বামী খানা-পিনা বন্ধ করে পাগলের মতো হয়ে গেছে। আমি বলি কি মা, অমন রাগের মাথায় বেফাঁস কথা সবার মুখেই বেরোয়। তাই নিয়ে জিদ করে বসে থাকলে সংসার চলে না।

জুবেদা বলে, জিদের কথা নয় বাবা, লোকটা একেবারে অপদার্থ। একটা দিন সে তোমার মেয়ের মুখে হাসি ফোটাতে পারেনি। মেয়ে হয়ে এর বেশি আর কি বলবো তোমাকে। আর এই যে আমার নতুন স্বামী—কি তার যৌবন-পৌরুষ। আমার গুল বাগিচায় সে বাহার এনে দিয়েছে। জীবনে এত সুখ এত আনন্দ আছে—আগে বুঝিনি। আমার ঐ আগের স্বামী চলতে চলতে মাঝপথেই পা পিছলে পড়ে যেত—আর সে উঠতে পারতো না। না বাবা, আমার এই নতুন জীবনে আমি খুব খুশি হয়েছি। তুমি ওকে অন্য পথ দেখতে বল।

জুবেদার এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বামীটা গোঁ গোঁ করতে করতে ধুপ করে মাটিতে পড়ে গেল। আর উঠলো না।

আবু সামাত তার সুন্দর সহচরী জুবেদা বিবির সঙ্গে সুখে সচ্ছন্দে ঘর সংসার করতে লাগলো। প্রতিটি রাত্রি তারা খানা পিনায়, নাচে গানে মধুর করে তোলে। জীবনের সুধাপাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠে।

শাদীর পর নটা দিন কেটে গেছে। দশ দিনের দিন আবু সামাত তার বিবি জুবেদাকে বললো, দেখছো, কান্ডখানা। সেই দরবেশ প্রধান কি রকম ধাপ্পাটা দিয়ে গেল। তার আশায় চুপ করে বসে থাকলে তো আমাকে ফাটকের খানা খেতে হতো। আবার যদি বাছাধনের দেখা পাই, আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব।

সন্ধ্যাবেলা যথারীতি গান বাজনার আসর বসলো। একটুক্ষণ, পরে কড়া নাড়ার শব্দে সামাত উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। সেই দরবেশগুলো আবার এসেছে। আবু সামাত-এর মুখে বিদ্রুপের হাসি ফুটে ওঠে। —আসুন আসুন, মিথ্যের বাদশাহরা, ভিতরে আসুন। আহা, অমন করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ভিতরে আসুন? আল্লাহর কৃপায় আপনাদের খয়রাতি ছাড়াই আমার বিপদের সুরাহা হয়ে গেছে। যদিও আপনারা ডাঁহা মিথ্যুক এবং শঠ, তবু তো আমার মেহেমান, তাই বিনীত অনুরোধ ভিতরে আসুন।

দরবেশরা নীরবে ঘরের ভিতরে ঢুকে একপাশে বসে। আবু সামাত পর্দার ওপারে ওঘরে জুবেদাকে বলে, বিবিজান, সেই মেহেমানরা এসেছেন তোমার গান শুনতে। খুব ভালো করে গান শোনাও।

জুবেদা খুব রগরগে নাচএর সঙ্গে ততোধিক রগরগে গান গাইলো।

নাচগান থামলে প্রধান দরবেশ কি একটা কারণে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যেতেই সভাকবি আবু নসাব সামাতকে বলে, আচ্ছা সাহেব, কি করে তুমি ভাবলে, কাইরো থেকে তোমার বাবা পঞ্চাশটা খচ্চর আর ঐ সব দান-সামগ্রী তোমাকে পাঠিয়েছে? এখান থেকে কাইরো কত দিনের পথ? কম করে হলেও পঁয়তাল্লিশ দিনের আগে পেঁছান যায় না। কি? তাইতো?

আবু সামাত ঘাড় নেড়ে বলে, জী-হাঁ বিলকুল ঠিক।

কবি বলে, কাইরো থেকে বাগদাদ আসতেও নিশ্চয়ই ঐ রকম সময়ই দরকার?

—সে তো একশো বার।

—তবে? তবে এটা কি করে সম্ভব, বল? মাত্র দিন দশেক আগে তুমি ডাকাতের হাতে সর্বস্ব খুইয়েছ। এই সংবাদ এত অল্প সময়ের মধ্যে তার কাছে পেঁছল কি করে? খবর যেতে লাগবে দেড় মাস এবং সেখান থেকে কোনও কিছু আসতেও লাগবে দেড় মাস। তাই না?

—ইয়া আল্লাহ, আবু সামাত চিৎকার করে ওঠে, তাইতো। একথা তো আমার মাথায় ঢোকেনি—ঐ সব সামান পত্র আর বাবার চিঠিখানা দেখে আনন্দে আমি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম। তখন আর খতিয়ে দেখিনি, এত অল্প সময়ের মধ্যে কাইরো থেকে কি করে বাবা এসব পাঠাতে পারেন! আমার মনে হচ্ছে, আপনি সব জানেন। কে পাঠিয়েছে ঐ সব সামান পত্র, বলুন তো?

কবি বললো, আবু সামাত, তোমার রূপের মতো গুণটা যদি থাকতো তা হলে তোমার জুড়ি খুঁজে পাওয়া যেত না। তুমি খলিফার উজির হয়ে তার পাশে বসতে। এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাদের মধ্যে ইনি খলিফা হারুন অল রসিদের উজির জাফর অল বারমাকী, তার দেহ রক্ষী মাসরুর, আর এই অধম তাঁর সভাকবি আবু নসাব। স্বয়ং খলিফা একটু আগে বাইরে গেলেন।

আবু সামাত বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে।

—আচ্ছা কবি সাহেব, বলতে পারেন, আমার মধ্যে এমন কি বস্তু তিনি দেখেছিলেন যার জন্য তাঁর এই বদান্যতা?

কথাগুলো বলতে বলতে সামাতের গলা কেঁপে যায়। সারা শরীর ঘেমে ওঠে।

আবু নসাব স্মিত হেসে বলে, তোমার সুন্দর চেহারা আর আদব কায়দায় মুগ্ধ হয়েছিলেন খলিফা।

এই সময়ে খলিফা আবার ঘরে ঢুকলেন। আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে আবু সামাত বলে, ধর্মাবতার, আপনার অপার মহিমা। আমি দীনহীন অসহায় অবোধ, না জেনে অনেক কটুকথা বলেছি—আমার গুস্তাকী মাফ করুন, জাঁহাপনা। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে যে-সব বকশিস পাঠিয়েছেন তার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ঐরকম বিপদের মুহূর্তে আপনি আমাকে সাহায্য করে বাঁচিয়েছেন। ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারবো না।

খলিফা মুদু হাসলেন। আবু সামাতের চিবুক ধরে আদর করে

বললেন, কাল তুমি আমার প্রাসাদে আসবে।

এই বলে জাফর অল বারমাকী, মাসরুর আর আবু নসাবকে সঙ্গে নিয়ে খলিফা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। আবু নসাব সামাতের কানে কানে বলে গেল, ইয়াদ থাকে যেন, কাল অবশ্যই খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

পরদিন সকালে আবু সামাত খলিফা সন্দর্শনে যাবার উদ্যোগ আয়োজন করতে থাকে। খলিফা সেদিন সালিমের হাতে এক প্রস্থ মূল্যবান সাজপোশাক পাঠিয়েছিলেন আবু সামাতের জন্য। খুব পরিপাটি করে, সেই সাজপোশাক তাকে পরিয়ে দিল জুবেদা। খলিফার পাঠানো দান-সামগ্রীর মধ্য থেকে সবচেয়ে সুন্দর কাজ করা একটা উপহার সে বেছে বের করলো। ছোট একটা বাক্সে ভরে সলিমের হাতে দিয়ে বললো, চল এবার রওনা হওয়া যাক।

খলিফা তখন দরবারে সিংহাসনে বসেছিলেন। আবু সামাত যথাবিহিত কুর্নিশ জানিয়ে খলিফার পায়ের কাছে বাক্সটা রেখে বললো, এই সামান্য ভেট গ্রহণ করে আপনার এই অধম নফরকে ধন্য করুন, জাঁহাপনা।

তরুণের এই বিনয়াবনত বাক্য-ব্যবহারে খলিফা প্রসন্ন হয়ে বললেন, তোমার দেওয়া শুধু বাক্সটা পেলে তো আমার চলবে না, আবু সামাত। তোমাকেও আমি চাই। তুমি আমার প্রাসাদে এস, তোমাকে একটা ভালো পদে বহাল করবো আমি। এবং আজ থেকেই।

খলিফা তখন দরবারে ঘোষণা করলেন, আজ থেকে এই তরুণ আবু সামাতকে আমি সওদাগর সভার সভাপতি পদে বহাল করলাম। বাগদাদের পথে ঘাটে গঞ্জে বাজারে এই বার্তা সকলকে জানিয়ে যাও।

সুলতানের হুকুম মাফিক সারা শহরে তক্ষুণি ঢ্যাড়া পিটে সেই ঘোষণা জানিয়ে দেওয়া হলো। সেই দিন থেকে খলিফা একদিনও আবু সামাতকে কাছ ছাড়া করতেন না। সুতরাং আবু সামাত-এর মনের বাসনা মনেই শুকিয়ে যেতে থাকলো। সে ভেবেছিল, বাজারে একটা দোকান নেবে। সওদাগরি সামানপত্র সাজিয়ে বসবে। কিন্তু তা আর হলো না। খলিফা তাকে বণিক সভার সভাপতির পদে বহাল করলেন। কয়েক দিন পরে প্রাসাদের প্রধান সরাবজী মারা গেল। সুলতান এবার যথাযোগ্য মর্যাদায় আবু সামাতকে সেই পদে বরণ করলেন। পরদিন দরবার কক্ষে প্রবেশ করে এক সরকারী কর্মচারী জানালো, প্রাসাদের প্রধান সচিব আজ মারা গেছে। সুলতান সামাতকে বললেন, আজ থেকে তোমাকে আমার প্রাসাদ-এর পূর্ণ দায়িত্ব দিলাম। তুমি যা মাসোহারা পাচ্ছিলে, এখন থেকে তা দুগুণ হবে।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো সাতষট্টিতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয়:

আবু সামাত সারাদিন প্রাসাদের কাজকর্ম দেখাশুনা করে। এবং রাত্রিবেলায় বিবির কাছে চলে যায়। দুজনে মিলে মৌজ করে খানাপিনা করে। দরবারের গল্প শোনায়।

খলিফা একদিন বললেন, আজ নাচগানের মাইফেল বসানো হোক।

জলসাঘরে ঝাড়বাতি জ্বালানো হলো। ফুল আতর ধুপের গন্ধে মদির হলো সারা ঘর। পর্দার ওপারে খলিফার এক সুন্দরী বাঁদী রক্ষিতা এসে গান ধরলো। গানের মুর্ছনায় সকলেই তখন তন্ময়। খলিফা এক সময় সামাতের কানে কানে বললেন, তোমার চোখ দেখে মনে হচ্ছে বন্ধু, আমার বাঁদীর রূপে তুমি মজেছ!

—জাঁহাপনা মজলে বান্দাও মজবে, এই তো নিয়ম।

—উহুঁ, সে কথা বলে পাশ কাটালে হবে না। আমি আমার পিতৃ-পুরুষের নামে হলফ করে বলছি, আজ থেকে এই বাঁদী তোমার।

খোজাকে ডেকে বললো, 'দিল কা পেয়ারা'র যা কিছু ধনদৌলত আছে—সব এই সাহেবের বাড়ি পেঁছে দাও। আর তাকেও তার চল্লিশজন দাসী বাঁদীর সঙ্গে ওখানে রেখে এস।

কিন্তু আবু সামাত করুণভাবে মিনতি জানায়, অমন কাজটি করবেন না, জাঁহাপনা, একেবারে মরে যাবো। আমি তাকে স্পর্শও করতে পারবো না। সুলতানের ভোগের পাত্রী আমি ভোগ করবো, সে কথা মনে আনাও মহাপাপ।

হারুন অল রসিদ থামলেন, আমি বুঝেছি তোমার ভয় কোথায়। তারই নাকের ডগা দিয়ে আর একটা মেয়েকে ঘরে তুললে সে সহ্য করতে পারবে না। হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরবে, তাই না?

—না হুজুর সে-ভয় আমার নাই।

আবু সামাত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। খলিফা জাফরকে বললেন, জাফর বাঁদীবাজার থেকে হাজার দশেক দিনার দিয়ে একটা বহুৎ খুব সুরৎ বাঁদী কিনে নিয়ে এস। আমি সামাতের বাড়িতে পাঠাবো। তার কাজে খুশি হয়ে আমি তাকে ইনাম দিতে চাই।

জাফর আবু সামাতকে সঙ্গে নিয়ে বাঁদীবাজারে যায়। বলে, দেখে-শুনে পছন্দ কর। দামের জন্য ভাববে না।

কোতোয়াল আমির খালিদও সে-দিন বাঁদীবাজারে এসেছে। উদ্দেশ্য তার একমাত্র পুত্রের জন্য একটা বাঁদী কেনা। ছেলেটি সবে চৌদ্দয় পা দিয়েছে। দেখতে বড় কুৎসিৎ কদাকার। বাঁদরের মতো মুখাবয়ব, খুদে খুদে গোলাকৃতি দুটি চোখে জ্বলজ্বল করে মেয়েছেলের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকায়। ঘৃণায় সব মেয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয়। সুতরাং বাঁদী-বাজার থেকে মেয়ে কেনা ছাড়া আর কি উপায়? এই বামন সদৃশ বাঁদর-মুখো ছেলেটার নাম বড়ফট্টাই।

গত রাত্রে তার মা লক্ষ্য করেছে, ছেলের দেহে পুরুষত্ব এসেছে। তার বিছানার চাদরে দাগ দেখে সে বুঝেছে, ছেলের স্বপ্নদোষ হচ্ছে। তাই সে স্বামীকে বলেছে, ছেলে লায়েক হয়ে গেছে, আর দেরি নয়, এই বেলা তাকে একটা মেয়ে এন দাও। বিবির পরামর্শে, তাই, আমিরসাহেব ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে এসেছে।

দালালরা ফর্সা, কালো, শ্যামলা নানা রঙের নানাজাতের বাঁদী এনে দেখাতে থাকে। ছেলেকে নিয়ে আমির, আর আবু সামাতকে নিয়ে জাফর

সেই-সব আনকোরা মেয়েমানুষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। কিন্তু কোনটিই কারো পছন্দ হয় না। এমন সময় দালাল সর্দার একটি মেয়েকে এনে হাজির করলো। মেয়েটির রূপের তুলনা হয় না। যেন রমজানের চাঁদ। মেয়েটিকে দেখামাত্র বড়ফট্টাই কামাতুর চোখে জুলজুল করে তাকায়। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে থাকে। অর্থাৎ তার খুব পছন্দ। বাবাকে বলে, এই হচ্ছে আসলি মাল, এইটাই আমি নেব, বাবা।

এদিকে জাফর আবু সামাতকে বলে, দেখ, চলবে?

সামাত বলে, তোফা, খুব চলবে।

—আচ্ছা বাঁদীমেয়ে, জাফর জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কী?

মেয়েটি জবাব দেয়, আমার নাম যুঁই, মালিক।

জাফর দালালকে যুঁই-এর দাম জিজ্ঞেস করলো, কত নেবে?

দালাল বলে, পাঁচ হাজার দিনার, হুজুর।

তৎক্ষণাৎ বড়ফট্টাই দুম করে বলে, আমি ছয় হাজার দেব।

আবু সামাত সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমি আট দেব।

বড়ফট্টাই চিৎকার করে ওঠে, আমি আট হাজার এক দেব।

সামাত বলে, নয় হাজার এক।

জাফর বললো, পুরো দশ হাজারই রইলো।

দালাল হাঁকতে লাগলো, দশ হাজার দিনার—বাঁদী যুঁই দশ হাজারে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে—আর কেউ আছেন? তাড়াতাড়ি বলুন। মাত্র দশ হাজার,দশ হাজার—দশ হাজার। ডাক শেষ।

দশ হাজারে আবু সামাত যুঁই-কে কিনে নিল। দালাল তাকে সামাতের হাতে তুলে দেয়। বড়ফট্টাই মাটিতে পড়ে দাপাতে লাগলো। আমির তার ছেলের এই বেয়াদপি সহ্য করতে পারে না। ছেলেটা একেবারে অকালকুষ্মাণ্ড হয়েছে। শুধু বিবির বায়না ঠেলতে না পেরে সে সঙ্গে করে বাজারে নিয়ে এসেছে। না হলে এমন ছেলেকে সে ঘরের বাইরে নিয়ে আসতো না। ছিঃ ছিঃ কি কেলেঙ্কারী কাণ্ড!

জাফরকে অনেক সুক্রিয়া জানিয়ে আবু সামাত যুঁইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি চলে আসে। জুবেদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। জুবেদা স্বামীর পছন্দ করা বাঁদীকে অনাদর করতে পারে না। কাছে ডেকে বসায়। নাম ধাম জিজ্ঞেস করে।

জুবেদার ব্যবহারে সামাত মুগ্ধ হয়। বাঁদীকে সে তার দ্বিতীয় বিবির আসন দেবে। জুবেদা যুঁইকে সাজিয়ে গুজিয়ে সে রাতে সামাতের ঘরে পাঠায়। সামাতের সহবাসে সেই রাতেই যুঁই অন্তঃস্বত্ত্বা হলো।

বড়ফাট্টাই-এর বাবা ছেলেকে আর কিছুতেই বাগে আনতে পারে না। অবশেষে তাকে মিথ্যে স্তোক দিয়ে বাড়ি নিয়ে আসতে পারলো। ছেলে ঘরে এসে বিছানায় আছড়ে পড়ে।—ঐ বাঁদী না পেলে আমি আত্মঘাতী হবো।

মা হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো, ওগো আমার কী হবে গো, আমার ছেলে আর বাঁচবে না, গো।

এমন গলা ফাটিয়ে এমন কাণ্ড শুরু করলো, পাড়াপড়শীরা ছুটে

এল। অনেকেই ছেলের দুঃখে হাহুতাশ করলো, আহা দুধের বাছা, তার মুখের খাবার কেউ ঐভাবে কেড়ে নেয়?

যারা সমবেদনা জানাতে এসেছিল তাদের মধ্যে সিঁদেল চোর আহমদের বুড়ি মা মহা শয়তান। বললো, কিচ্ছু ভাবনা কর না বাছা, তোমার ছেলের মনোবাঞ্ছা আমি পূরণ করে দেব। আমার ছেলে আহমদ-একেবারে পাকা চোর। তার অসাধ্য কিচ্ছু নাই। মালিকের নাকের ডগা দিয়ে তার বাড়ির দরজা জানলা খুলে নিয়ে আসে সে। তাকে ধরবে, তেমন মরদ আরবে নাই। সে এমন যাদু জানে, ঘরের মালিক জেগে আছে, তার চোখের সামনে সিঁদ কেটে সে তার ঘরে ঢুকে সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে আসে—কিচ্ছু করতে পারে না।

বড়ফট্টাই-এর মা বুড়িকে আদর করে বসায়। বলে, যেমন করেই হোক, তোমার ছেলেকে দিয়ে বাঁদী যুঁইকে চুরি করিয়ে এনে দিতেই হবে। না হলে আমার ছেলে বাঁচবে না।

বুড়ি বলে, কিন্তু কি করে সে কাজ সে করবে বাছা। তাকে তো তোমার স্বামী হাতে পায়ে বেড়ি পরিয়ে কয়েদ করে রেখে দিয়েছে।

বড়ফট্টাই-এর মা জিজ্ঞেস করে, কেন?

—অতি তুচ্ছ কারণে মা, অতি তুচ্ছ কারণে। বাছা আমার সামান্য কটা দিনার জাল করেছিল—এই তার অপরাধ।

আমির-বিবি বলে, ঠিক আছে, ছেলের বাবা ঘরে আসুক, আজই আমি এর বিধি-ব্যবস্থা করছি।

সন্ধ্যা বেলায় কোতোয়াল ফিরে এলে, খানাপিনা শেষ হলে তার ঘরে এল আমির বিবি। পরণে বাহারী সাজপোশাক, প্রসাধন-প্রলেপে মুখখানা ডাগর মেয়ের মতো ঢলঢলে হয়েছে। চোখে সুর্মা কাজল পরেছে কচি মেয়েদের মতো করে। গায়ে ছিটিয়েছে দামী আতর। ভুরভুর করে গন্ধ বেরুচ্ছে। এই মোহিনী বেশে সামনে এসে দাঁড়াতেই খালিদের চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। বিবিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে পালঙ্কের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু ছলনাময়ী নারী নিজেকে শক্ত করে রাখে, না, আগে বল, আমি যা বলবো, শুনবে।

খালিদের রক্তে তখন নাচন শুরু হয়েছে। বলে, আল্লাহ কসম, যা চাইবে তাই দেব, যা বলবে তাই করবো, এবার চল।

আমির-বিবি স্বামীকে সোহাগ করতে করতে বলে, আহমদের মা মৃত্যু শয্যায়। ছেলের শোকে সে অন্ধ হয়ে গেছে। যেভাবেই হোক, তাকে খালাস করে দিতে হবে।

ততক্ষণে খালিদের দেহের ক্লেদ নির্গত হয়ে গেছে। আলস্য-অবসাদ জড়িত কণ্ঠে কোনরকমে সে বলতে পারলো; জবান যখন দিয়েছি নিশ্চয়ই তাকে খালাস করে দেব।

পরদিন সকালে আমির কয়েদখানায় এসে আহমদকে জিজ্ঞেস করে কী? আর করবে কখনও জালিয়াতী?

—জী না, আর কক্খনো করবো না, খোদা কসম। আমার অনেক আক্কেল সেলামী হয়েছে। এবারে একটু মানুষের মতো বাঁচতে চাই। আমি

তামাম দুনিয়াকে চিৎকার করে জানাতে চাই, অপরাধ করে সুখ শান্তি কিছুই পাওয়া যায় না।

কোতোয়াল তাকে সঙ্গে করে খলিফার সামনে নিয়ে যায়। সুলতান তো দেখে অবাক, এত নির্যাতনের পরেও লোকটা বেঁচে আছে? আমি তো ভেবেছি, প্যাঁদানীর চোটে কবে অক্কা পেয়ে গেছে।

আহমদ বেড়িসুদ্ধ হাতখানা মাথার উপরে তুলে বলে, খোদা মেহেরবান, আপনি ধর্মাবতার, কিন্তু শয়তানের কলিজা বড় কঠিন বস্তু।

খলিফা হো হো করে হেসে উঠলেন, বাঃ, তোফা কথা বলেছ তো, হে।

খালিদকে উদ্দেশ করে বললেন, ওকে কামারের কাছে নিয়ে যাও। কড়া বেড়ি সব খুলে দাও। লোকটাকে কাজে লাগাতে হবে। কাটা দিয়েই কাঁটা তুলবো। চোর ডাকাতদের এ যতটা জানে আর তো তেমন কারো পক্ষে জানা সম্ভব না। তাদের গতিবিধি ঘোঁৎঘাঁৎ আড্ডা—সবই এর নখ-দর্পণে। আজ থেকে একে আমি প্রধান কোতোয়ালের পদে বহাল করলাম।

আহমদ আভূমি আনত হয়ে খলিফাকে কুর্নিশ জানায়।

আজ তার আনন্দের সীমা নাই। শুধু কয়েদখানা থেকে ছাড়া পাওয়া নয়, একেবারে প্রধান কতোয়ালের চাকরী মিলে গেল। একেই বলে বরাত।

ইহুদী ইব্রাহিমের মদের দোকানে গিয়ে ঢকঢক করে কয়েক পাত্র গলায় ঢেলে দিল। আঃ, কী মজাদার সরাব। কতকাল সে মদ খেতে পায়নি। আজ আর কোনও কথা নয়, প্রাণ ভরে খাবে। যত পারে।

নেশায় টং হয়ে বাড়ি ফেরে। মা কেঁদে আকুল। এত মদ খেয়েছিস কেন, বাবা?

—খাবো না? কতদিন ফাটকে আটকে ছিলাম, এক ফোঁটা জিভেয় ঠেকাতে পারিনি।

বুড়ি বলে, কিন্তু আমার যে একটা কাজ করে দিতে হবে, বাবা।

—বল মা, কি করতে হবে। তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি।

তখন বুড়ি আবু সামাত, বাঁদী যুঁই আর ধড়ফট্টাই-এর সব বৃত্তান্ত খুলে বলে তাকে।

—এখন বড়ফট্টাই নাওয়া খাওয়া বন্ধ করেছে। যুঁইকে তার চাই-ই। তোর অসাধ্য কোনও কাজ নাই। তুই চেষ্টা করলে যুঁইকে তার কাছে এনে দিতে পারিস, বাবা।

আহমদ বলে, এ আর এমন শক্ত কী? তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

সে-দিন মাসের পয়লা। যথারীতি ফি মাসে এই তারিখে খলিফা তার প্রধান বেগমের ঘরে যান। তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন, খানাপিনা সারেন তারপর রাত্রিবাস করেন।

সন্ধ্যা হতেই খলিফা বেগমের মহলে আসেন। বেগমের শোবার ঘরের এ পাশে একটি ছোট বসবার ঘর। সেই ঘরের একটি মেজ-এর উপর খলিফা খুলে রাখলেন তার গলার রত্নহার, তার বাদশাহী মোহর এবং হীরা বসানো

একটা সোনার রোশনাই বাতি। এই হীরাটার দ্যুতি অন্ধকার-এ জ্বল জ্বল করে। ঘরের অন্ধকার কেটে যায়।

এ-সব আহমদের জানা। প্রাসাদের নফরচাকর সব ঘুমিয়ে পড়লে দড়ির মই বাধিয়ে তরতর করে প্রাচীরের উপরে উঠে যায় সে। তারপর টুক করে নিচে লাফিয়ে পড়ে। বেগমের বসার ঘর থেকে খলিফার খুলে রাখা জিনিসগুলো বগলদাবা করে আবার সে যেভাবে এসেছিল সেইভাবে সন্তর্পণে সটকে পড়ে।

আবু সামাতের বাড়ির দিকে ছুটে চলে আহমদ। নিঃশব্দে ফটকের তালা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে পড়ে। ঘরের পিছনের দিকের দেওয়ালের একখানা শ্বেতপাথরের থান তুলে ফেলে। সাবল দিয়ে খানিকটা গর্ত করে তার মধ্যে খলিফার ঐ রত্নহার আর মোহরখানা ভরে আবার যথারীতি পাথরের থানখানা এঁটে লাগিয়ে দিয়ে চুপিসারে কেটে পড়ে। তারপর ইবরাহিমের দোকানে এসে সারারাত ধরে তাড়ি খেতে থাকে।

সকালবেলা বেগমের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খলিফা হতবাক্ হয়ে যায়। তার ব্যবহারের জিনিসে কেউ হাত দিতে পারে—ভাবতে কষ্ট হয়। এত বড় দুঃসাহস কার হতে পারে!

সঙ্গে সঙ্গে সারা প্রাসাদ তোলপাড় হতে লাগলো। কী সর্বনাশ, প্রাসাদের হারেমে চোর ঢুকেছিল! খোজাদের তলব করা হলো। সবাই পাংশু বিবর্ণ মুখে বললো, কেউ কিছু বুঝতে পারেনি। খলিফা সিংহনাদ করে উঠলেন, আজ কারো নিস্তার নাই। সবাইকে আমি শেষ করে ফেলবো।

হন হন করে তিনি দরবারে এসে সিংহাসনে বসলেন। সারা মুখে চাপা ক্রোধ, চক্ষু রক্তবর্ণ। চারপাশে উজির আমির আমাত্যরা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। কারো মুখে কোনও ভাষা নাই। খলিফাও নির্বাক। সমগ্র দরবারে তখন কবরের নিরবতা।

হঠাৎ খলিফা হুঙ্কার ছাড়লেন, জাফর, রক্ত যে টগবগ করে ফুটছে!

জাফর শান্তভাবে বলে, আল্লাহ শয়তানকে শায়েস্তা করবেন।

এই সময়ে কোতোয়াল খালিদ আহমদকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলো। খলিফা বললেন, এই যে আমির খালিদ, এদিকে এস, আমার সামনে দাঁড়াও।

কোরবানীর খাসীর মতো খালিদ এগিয়ে যায়।

—তোমার শহর এলাকার হালচাল কী রকম চলছে?

—খুব ভালো জাঁহাপনা, চুরি ছিনতাই একদম নাই। আমি সব ঠাণ্ডা করে দিয়েছি।

—হুঁ, তাই নাকি। কিন্তু আমি তো গরম হয়ে গেছি, কোতোয়াল। আমাকে ঠাণ্ডা করবে কি দিয়ে?

—জাঁহাপনা—

—তুমি একটা মিথ্যেবাদী, উজবুক।

—জী হুজুর। কোথাও তো কিছু ঘটেনি।

—চোপরও।

উজির জাফর ফিসফিস করে খালিদের কানের কাছে বললো, কাল রাতে

বেগমের ঘর থেকে স্বয়ং ধর্মাবতারের জিনিসপত্র চুরি গেছে—সে খবর রাখ?

সুলতান বললেন, শোন খালিদ, যে জিনিসগুলো খোয়া গেছে তা আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং মূল্যবান। সারা সাম্রাজ্যের বিনিময়েও তার ক্ষতিপূরণ হতে পারে না। সুতরাং, যেভাবেই হোক, সেগুলো আমার ফেরৎ চাই-ই চাই। তা যদি না পার, তোমার গর্দান যাবে। আজকের দিন সময় দিলাম, তার মধ্যে তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে সেই চোরকে। নইলে কাল সকালে, এই প্রাসাদের ফটকের সামনে তোমার কাটা-মুণ্ডু ঝুলবে, বুঝলে?

বড়ফট্টাই-এর বাবা আমির খালিদের অবস্থা তখন কাহিল। এত বড় শহরে কোথায় সে-চোর গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে আছে, কি করে সে জানবে? নাঃ, আর কোনও বাঁচার পথ নাই। প্রাণটা গেল। হঠাৎ তার মাথায় ধাঁ করে একটা বুদ্ধি এল, হুজুর, আপনি তো কাল থেকে এই আহমদকে প্রধান কোতোয়ালে বহাল করেছেন। এখন তো সব দায়দায়িত্ব তার—আমি তার আজ্ঞাবহ মাত্র। যদি চুরির মাল না পাওয়া যায় তবে সাজা পেতে হলে তারই পাওয়া উচিত।

এবার আহমদ সামনে এগিয়ে আসে।—ধর্মাবতার, চোরকে খুঁজে বের করা শক্ত হবে না। হুজুরের কাছে প্রার্থনা, আপনি আমাকে শহরের যে কোন বাড়ি, ঘর দোকানপাঠ তল্লাসী করার ফরমান দিন। আমার অবাধ গতি থাকবে সর্বত্র। তা সে উজির জাফর অল বারমাকীর প্রাসাদই হোক, বা কাজী বা জাঁহাপনার একান্ত প্রিয়পাত্র আবু সামাতের বাড়িই হোক। আমার যেখানে প্রয়োজন আমি যাবো, যাকে খুশি জিজ্ঞাসাবাদ করবো, যে কোন জায়গা খানাতল্লাসী চালাবো।

খলিফা বললেন, অতি উত্তম কথা। আমি এক্ষুণি এইমর্মে ফরমান দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে আহমদ, গর্দান চাই-ই। তা সে তোমারই হোক, বা সেই চোরেরই হোক। তাকে ধরতে পারলে তোমারটা বাঁচবে তারটা যাবে। না পারলে তোমার—

আহমদ বিচলিত হলো না।—তাই হবে জাঁহাপনা। আমি আপনার বিচার মাথা পেতে নিলাম। এই আমি আমার বাপ ঠাকুরদা—চৌদ্দ পুরুষের নামে কসম খেয়ে বলছি—চোর আমি ধরবোই। তা সে যদি আমার নিজের ঔরসের ছেলেও চুরি করে থাকে—রেহাই পারে না সে। আপনার দরবারে হাজির করবো তাকে।

আহমদ সুলতানের ফরমান এবং কাজীর দুজন আর কোতোয়ালের দুজন সিপাইকে সঙ্গে নিল। প্রথমে সে গেল উজির জাফরের প্রাসাদে। সারা প্রাসাদ খানাতল্লাসী করলো। কিন্তু না, কিছুই পেল না। তারপর গেল কোতোয়াল আর কাজীর বাড়ি। সেখানেও কিছু মিললো না। সব শেষে এল সে আবু সামাতের বাড়ি। তখনও এত সব কাণ্ড কারখানার কিছুই খবর রাখে না আবু সামাত।

আবু সামাত বাইরের ঘরে বসেছিল। আহমদের এক হাতে সুলতানের ফরমান অন্য হাতে একখানা মস্ত সাবল। আবু সামাতকে সে তার আসার

কারণ বুঝিয়ে বললো।

—আপনি সুলতানের প্রিয়পাত্র, আপনাকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করার কারণ থাকতে পারে না। তবু কর্তব্য বড় কঠিন বস্তু, তল্লাসী আমাকে করতেই হবে। আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না।

সামাত হাসি মুখে বলে, না না, সে কি কথা? আপনি কর্তব্যের দাস। আমি মনে করবো কি? যেমন ভাবে খুশি সারা বাড়ি তল্লাসী করে দেখুন, আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই।

আহমদ বিড় বিড় করে বলে, শুধু নিয়ম রক্ষার জন্যে—তাছাড়া কোনও দরকার ছিল না।

তারপর ঘরের বাইরে আঙ্গিণায় এসে দাঁড়ায়। হাতের সাবলটা দিয়ে এখানে ওখানে ঠুকতে থাকে। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ চালাবার পর এক জায়গায় এসে আহমদ দাঁড়িয়ে পড়ে।

উঁহু, এই আওয়াজটা তো স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

আর একবার সে ঐ জায়গাটা সাবল দিয়ে ঠুকে। আওয়াজটা সত্যিই যেন কেমন কেমন। সামাত বলে, খুলে ফেলুন তো পাথরখানা।

আহমদ বলে, নিশ্চয়ই ভেতরটা ফাঁপা—

সাবলের ডগা দিয়ে চাঁড় দিতেই পাথরখানা খুলে যায়। ভেতরটায় একটা ছোট্ট গর্ত। গর্তের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে আহমদ টেনে বার করে খলিফার ব্যবহারের সেই জিনিসগুলো।

সামাতের মুখ সাদা হয়ে যায়। মাথা ঘুরতে থাকে। কোনও রকমে সে মাটির ওপরে বসে পড়ে।

একটা কাগজে উদ্ধার করা জিনিসগুলোর বিবরণ লিখে তখুনি সে কাজি এবং কোতোয়ালের কাছে পাঠায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই খলিফা কাজীকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে পড়েন। সিপাইরা চ্যাংদোলা করে সামাতকে কাঠগড়ায় নিয়ে গিয়ে হাজির করে।

খলিফা সাক্ষ্য প্রমাণে নিঃসন্দেহ হয়ে অবাক হয়ে ভাবতে থাকেন। শেষকালে সামাত—তার একান্ত প্রিয় পাত্র সামাতের এই কাণ্ড। কিছুতেই তিনি হিসাব মেলাতে পারেন না। এইভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক চুপচাপ বসে বসে ভাবতে থাকেন। তারপর এক সময় রায় দেন, একে নিয়ে যাও, ফাঁসীতে ঝোলাও।

হাবিলদার সারা শহরে ঢ্যাড়া পিটিয়ে জানিয়ে দেয়, আজ সন্ধ্যায় সামাতের ফাঁসী হবে।' তারপর সামাতের সব বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তার দুই বিবিকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে আসে। সোনাদানা টাকাকড়ি যা পাওয়া গেল—খাজাঞ্চীখানায় জমা করে দেয়। বাঁদী যুঁই আর বিবি জুবেদাকে নীলামের ডাকে তোলে। বাঁদী যুঁইকে বড়ফট্টাই-এর বাবা খালিদ কিনে নিয়ে চলে যায়। আর জুবেদাকে হাবিলদার নিয়ে যায় তার নিজের বাড়িতে।

এখানে বলে রাখা দরকার, এই সদাশয় হাবিলদারটি সামাতকে খুবই স্নেহ করতো। সামাতও তাকে বাবার মতো ভক্তি শ্রদ্ধা জানাতো। হাবিলদার সামাত-এর চরিত্র খুব ভালো ভাবেই জানে। তার পক্ষে এই

জঘন্য কাজ কিছুতেই করা সম্ভব না। নিশ্চয়ই এর পিছনে অন্য কোনও মতলব আছে। হাবিলদার বুঝতে পারে না—কি সে মতলব। যাই হোক, সুলতানের হুকুম সামাতকে ফাঁসী দিতে হবে। উপায় নাই। কিন্তু হাবিলদারের মন কিছুতেই সায় দেয় না। একটা নিরপরাধ ফুলের মতো নিষ্পাপ পবিত্র ছেলে প্রাণ হারাবে।

আর দেরি করা চলে না। আজ সন্ধ্যাতেই আবু সামাতের ফাঁসী দিতে হবে। হাজার হাজার লোক জড়ো হচ্ছে প্রাসাদের সামনে।

হাবিলদার কয়েদখানার সচিবের কাছে গিয়ে বললো, জনা চল্লিশেক ফাঁসীর কয়েদী আছে আপনার ফাটকে। আমি ওদের সবাইকে পরীক্ষা করে দেখবো।

ফাঁসীর আসামীদের এক এক করে দেখতে দেখতে একজনকে দেখে মনে হলো, এই লোকটার সঙ্গে সামাতের চেহারার অনেকটা মিল আছে। লোকটাকে সে বাইরে বের করে আনলো। যথা সময়ে সেই নকল সামাতের গলায় ফাঁসীর দড়ি পরানো হলো। লোকে হায় হায় করতে থাকলো। সেই উদ্বেলিত জনতার সমক্ষে সে-দিন সন্ধ্যায় নকল সামাতের ফাঁসী হয়ে গেল!

এর পর প্রায় মাঝ রাতে আসল সামাতকে ফাটক থেকে বের করে হাবিলদার তার বাড়িতে নিয়ে গেল। সামাতকে সে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বাবা, সত্যি কথা বলতো কেন এই কাজ করলে?

হাবিলদারের এই কথা শুনে সামাত আবার মূর্ছিত হয়ে পড়ে। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে। শেষে আপনিও আমাকে এই মিথ্যা সন্দেহে জড়াতে চাইছেন, বাবা। আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছি, আমি এর বিন্দু বিসর্গ জানি না। এ সবই এক জঘন্য চক্রান্ত।

হাবিলদার বলে, আমি জানি বেটা, তোমার মতো সাচ্চা মুসলমানের পক্ষে এধরনের অসৎ কাজ করা কিছুতেই সম্ভব না। যাই হোক, তুমি ভেব না, দোষী একদিন ধরা পড়বেই। এই মুহূর্তে তা প্রমাণ করা শক্ত। তোমার নিজের নিরাপত্তার জন্যে এখন আপাততঃ কিছুদিন এ শহর ছেড়ে অন্য কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে তোমাকে। কারণ চারদিকে শত্রুর চর ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার সন্ধান পেলে তোমার গর্দান যাবে, আমার গর্দান যাবে। আর দেরি নয়, আজই তোমাকে পালাতে হবে। লবন সমুদ্রের ওপারে আলেকজান্দ্রিয়া—সেখানে গিয়ে কিছুদিন থাকো। তারপর সময় হলে আমি তোমাকে নিয়ে আসবো। এখন তোমার বিবি জুবেদা আমার বাড়িতেই থাক। তার আদর যত্নের কোনও ত্রুটি হবে না।

আবু সামাত বলে, কিন্তু আমি তো পথঘাট কিছুই চিনি না।

—তার জন্যে কোনও ভাবনা করো না। আমি তোমার সঙ্গে যাবো। তোমাকে রেখে আমি ফিরে আসবো। আলেকজান্দ্রিয়ার শোভা বড় মনোহর। যে দিকে তাকাও, শুধু সবুজের মেলা। দেখে দু চোখ জুড়িয়ে যায়।

তাড়িঘড়ি তারা বেরিয়ে পড়লো। যাবার আগে জুবেদার সঙ্গে একবার দেখাও করে আসতে পারলো না সামাত। চুপিসারে নিঃশব্দ পায়ে পথ হেঁটে তারা বাগদাদের শহর সীমানা পার হয়ে যায়। চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সামাত। পায়ে হেঁটে আর কত দূর যাওয়া সম্ভব। উষর

মরুভূমির উত্তপ্ত বালী। ঝাঁ ঝাঁ করা রোদ। ক্রমশই গতি মন্থর হয়ে আসে।

এই সময়ে, হাবিলদার লক্ষ্য করলো, দুজন রক্তচোষা ইহুদী সুদখোর ঘোড়ায় চেপে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। লোক দুটো কাছে আসতে হাবিলদার হুকুম করলো, নামো, তোমাদের তল্লাসী করবো।

ঘোড়া থেকে নামতেই তরোয়ালের দুই কোপে দুজনের মাথা মাটিতে নামিয়ে দিলো সে। সামাত বললো, লোক দুটোকে মারলেন কেন, বাবা। ওরা তো কোনও দোষ করেনি।

হাবিলদার বলে, লোকগুলো সুদখোর শয়তান। ওদের ছেড়ে দিলে বাগদাদে পেঁছে টাকার লোভে আমাদের কথা খলিফাকে জানিয়ে দিত।

হাবিলদার তখন ইহুদী দুটোর টাকাকড়ি বের করে নিয়ে সামাতকে বললো, নাও, ঘোড়ায় চাপো। এতটা পথ হেঁটে হেঁটে যাওয়া তো সম্ভব না।

জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে বন্দরে এসে পেঁছয় তারা। একটা সরাইখানায় ঘোড়া দুটো রেখে তারা একটা নৌকার সন্ধানে বের হয়। বেশীক্ষণ খুঁজতে হলো না, একটু এগোতেই নজরে পড়লো, একখানা নৌকা ছাড়বো ছাড়বো করছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, নৌকাটা আলেকজান্দ্রিয়াতেই যাবে। আবু সামাতের হাতে সোনাদানা ইহুদী দুটোর দেহ তল্লাসী করে যা পাওয়া গিয়েছিল, তুলে দিয়ে হাবিলদার বলে, আলেকজান্দ্রিয়াতে গিয়ে তুমি আমার খবরের প্রত্যাশায় বসে থাকবে। সময়ের চাকা একদিন ঘুরবেই, তখন আমি নিজে এসে তোমাকে নিয়ে যাবো।

নৌকা ছাড়ার সময় হয়ে আসে। হাবিলদারের দু চোখ জলে ভরে ওঠে। হাত নেড়ে সে বিদায় জানায়।

বাগদাদে ফিরে এসে সে যা শুনেছিল তা এইরকম:

নকল সামাতকে ফাঁসী দেওয়ার পরদিন সকালে খলিফা অস্থিরভাবে পায়চারী করছিলেন। কাল সাররাত তিনি ঘুমাতে পারেননি। এখনও তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না, সামাত-এর দ্বারা এই কাজ হতে পারে। ছেলেটি বড় ভালো ছিল, তার স্বভাবচরিত্র আদব কায়দা পলকেই সবারই মন কেড়ে নেয়। জাফরকে তলব করতেই সে এসে হাজির হলো।

—উজির, কালকের ব্যাপারে আমি বড় ভেঙ্গে পড়েছি। দুনিয়ায় কাউকেই কি বিশ্বাস করতে পারা যাবে না। ছেলেটাকে বাইরে থেকে কত ভালো মনে হয়েছিল, কিন্তু ভেতরটা যে ঐরকম কদাকার তা কি করে বুঝবো!

জাফর বলে, ধর্মাবতার, রহস্যের কিনারা না পাওয়া পর্যন্ত সবই দুর্বোধ্য মনে হয়। কিছুতেই ভাবা যায় না কি করে অসম্ভব সম্ভব হলো। কিন্তু আসল কারণ যেদিন জানা যায় সেদিন সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। যাই হোক, আবু সামাত মিশরের এক সম্ভ্রান্ত সওদাগর বংশের ছেলে। তার চেহারা চরিত্র আদব কায়দার মধ্যে একটা খানদানী ছাপ আছে। এখনও আমার ধারণা, এর মধ্যে অন্য কোনও ব্যাপার নিহিত আছে।

খলিফা চুপচাপ বসে বসে ভাবতে থাকেন। সত্যিই কি তিনি কোনও নিরপরাধীকে ফাঁসী দিলেন? সে তো মহা অধর্ম, মহাপাপ।

—জাফর, আবু সামাতের লাশটা একবার দেখবো, চল। দুজনে ছদ্মবেশ ধারণ করে বধ্যভূমিতে এসে দাঁড়ালেন। তখনও কাফনে ঢাকা সামাতের লাশটা ফাঁসী কাঠেই ঝুলছিল। জাফর ঢাকাটা সরিয়ে দিতেই নকল সামাতের লাশটা দেখে চমকে ওঠেন খলিফা।

—এই সেই সামাত? কিন্তু সে তো আরও লম্বা চওড়া ছিল।

জাফর বলে, মরার পরে মানুষ সিটকে যেতে পারে। তাতে লম্বা মানুষকেও খাটো মনে হওয়া সম্ভব।

খলিফা বলেন, কিন্তু জাফর, তার গালে দুখানা তিল ছিল, এর গালে কোন তিলের বালাই নাই।

—জাঁহাপনা, এই অস্বাভাবিক মৃত্যুতে মুখের যে বিকৃতি ঘটে তাতে অনেক কিছুই পালটে যেতে পারে। সুতরাং ও-সব দিয়ে কিছু প্রমাণ হয় না।

খলিফা বললেন, তা ঠিক। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখ, এই ছেলেটার পায়ের পাতায় উল্কি কাটা আছে। আর ঐ উল্কিতে দুই শেখের নাম লেখা—এতো সিয়া সম্প্রদায়ের চিহ্ন। কিন্তু আমি ভালো করে জানি, আবু সামাত সুন্নি ছিল।

জাফর বলে, একমাত্র আল্লাহই এ রহস্যের কিনারা করতে পারেন।

দুজনে প্রাসাদে ফিরে আসেন। খলিফা হুকুম দিলেন, আবু সামাতের লাশটা কবর দিয়ে দাও।

এর পর থেকে আবু সামাতের সমস্ত স্মৃতি খলিফা হারুন অল রসিদের মন থেকে মুছে যেতে থাকে।

এবার আমরা আবু সামাতের দ্বিতীয় বিবি বাঁদী যুঁই-এর দিকে চোখ ফেরাচ্ছি:

আবু সামাতের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পর হাবিলদার তার দুই বিবিকে নীলামে তুলেছিল। প্রথম বিবি জুবেদাকে সে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। আর দ্বিতীয় বিবি বাঁদী যুঁইকে কিনে নেয় বড়ফট্টাই-এর বাবা কোতোয়াল খালিদ।

যুঁইকে বাড়ি নিয়ে এসে খালিদ ছেলে বড়ফট্টাই-এর ঘরে ঠেলে দেয়। বড়ফট্টাই-এর কামাতুর চোখ দুটো নেচে ওঠে। ছুটে এসে সে যুঁইকে জাপটে ধরতে যায়। কিন্তু যুঁই-এর গা রিরি করে ওঠে। এক ঝটকায় সে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বড়ফট্টাই এর দুম্বার মতো দেহটা। কপট ক্রোধে সে কোমর থেকে ছুরি বের করে ভয় দেখায়, ফের যদি আমার গায়ে হাত দিতে আসবে তো জবাই করে ফেলবো।

বড়ফট্টাই-এর মা ছুটে আসে, তোমার তো বড় সাহস বাঁদী! আমার ছেলেকে শাসাচ্ছো! দাঁড়াও, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি। বেয়াদপ বজ্জাৎ মেয়ে কোথাকার।

যুঁই রাগে গর্জে ওঠে, মুখ সামলে কথা বল, এমন বেআইনি কথা কে শুনেছে—এক স্বামীর ঘর করতে করতে আর একজনের সঙ্গে কোন্

মেয়ে সহবাস করে? তোমরা কি জাননা, আমি আবু সামাতের বিবি? তোমার ছেলের বামন হয়ে চাঁদ ধরার শখ কেন? সিংহীর গুহায় কুকুর ঢুকলে তার কী দশা হয়, জান না?

বড়ফট্টাই-এর মা আস্ফালন করতে থাকে, বড় বাড় বেড়েছ, না? কেমন করে তোমাকে শায়েস্তা করতে হয়, দেখ। খাটিয়ে তোমার গতর শেষ করে দেব।

যুঁই বলে, ঐ বাঁদরটাকে দেহ দান করার আগে আমি নিজেকে খতম করে দেব। আমার এই দেহ যৌবন ভালোবাসা সবই আমার স্বামীর জন্য। তা সে জিন্দাই থাক আর মারাই যাক।

বড়ফট্টাই-এর মা যুঁই-এর সাজপোষাক এবং অলংকারাদি জোর করে খুলে নিয়ে অতি সাধারণ ঝি চাকরাণীর পোশাক পরতে দেয়। বলে, রসুইখানায় যাও, ওখানেই তোমাকে থাকতে হবে। উনুন ধরাবে খানা বানাবে—এই তোমার কাজ।

যুঁই বলে, তোমার ঐ বাঁদর-মুখো কুঁজো বামন ছেলের সুরৎ দেখার চেয়ে এসব খাটুনি খাটাও ঢের ভালো।

এর পরে রান্না ঘরেই তার জায়গা হলো। বাড়ির অন্যান্য ঝি চাকররা এই ব্যাপারটা ভালো নজরে দেখতে পারলো না। যুঁই-এর মতো সুন্দরী বাঁদী রান্না ঘরের কালী ধোঁয়ার মধ্যে দিন কাটাবে! সবাই তাকে ভালোবেসে কাছে টেনে নিল। বলতে গেলে কোনও কাজই তাকে করতে দিত না। বললে, আহা, ঐ সোনার মতো হাতে কি কয়লার ছাই শোভা পায়। তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না মালকিন, আমরা সবাই মিলে হাতে হাতে তোমার কাজগুলো ভাগাভাগি করে সেরে দেব। তুমি চুপটি করে বসে থাকো।

আপনারা শুনে খুশি হবেন, বড়ফট্টাই সেই-যে বিছানা নিল আর উঠলো না।

আর হয়তো আপনাদের স্মরণে আছে, বাঁদী যুঁই-এর গর্ভে সামাতের সন্তান ছিল। কয়েক মাস পরে একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করলো সে। ছেলের বাবা সামাত আজ নাই, থাকলে সে-ই তার নামকরণ করতো। চোখের জল ফেলে যুঁই-ই ছেলের নাম রাখলো আসলান।

ঝি চাকরাণীদের চত্বরে আসলান শুধু মায়ের দুধ খেয়ে মানুষ হতে থাকে। বড়ফট্টাই-এর মা বা বাবা কেউই তার খোঁজখবর নেয় না। বাচ্চাটা কি খায় অথবা অনাহারে কাটায়, সে দিকে কারো ভ্রুক্ষেপ নাই।

ছেলেটি কিন্তু শুধুমাত্র মাতৃস্তন্য পান করেই সিংহ শাবকের মতো ডাগড়াই, তড়বড়ে হয়ে উঠতে থাকে। চেহারাখানা অবিকল সামাতের মতো, ধবধবে ফর্সা, ফুটফুটে সুন্দর। সবে হাঁটি হাঁটি পা পা করে একটু একটু হাঁটতে শিখেছে।

একদিন বাঁদী যুঁই কি একটা দরকারে রসুইখানার ওপরতলায় গিয়ে ছিল, এমন সময় আসলান পা পা করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে খালিদের বসার ঘরে চলে যায়। খালিদ তখন তসবী জপ করছিল, বাচ্চাটার দিকে নজর পড়তেই খালিদের দু চোখ জলে ভরে আসে। সামাতের শান্ত সৌম্য

চেহারাখানা ভেসে ওঠে। একেবারে খুদে সামাত। সেই চোখ মুখ নাক কান—সব-সব একেবারে সামাতের মতো।

—এস বেটা, এস।

আসলানকে সে দু হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নেয়। কোলের ওপরে বসিয়ে আদর করতে থাকে।—খোকন সোনা, চাঁদের কনা—

একটুক্ষণ পরে যুঁই নেমে এসে দেখে, আসলান নাই। প্রাণ উড়ে যায়। ডাইনী বড়ফট্টাই-এর মা-এর নজরে পড়লে তো আর রক্ষা নাই। নির্ঘাৎ সে বাছাকে বিষ খাইয়ে দেবে। এঘর-ওঘর ছুটাছুটি করে খুজতে থাকে সে। খালিদের বসার ঘরে গিয়ে ধড়ে প্রাণ ফিরে পায়। খালিদের কোলে বসে সে খুব ভাব জমিয়েছে। যুঁইকে দেখে খালিদ জিজ্ঞেস করে, তোমার ছেলে?

—জী হাঁ।

—এর বাবা কে, চাকরবাকরদের কেউ?

যুঁই আহত হয়। বলে, আপনি তো জানেন, আবু সামাত আমাকে শাদী করেছিল; তার সঙ্গে আমি কিছুকাল ঘর করেছিলাম। আপনি যখন আমাকে এখানে নিয়ে আসেন, আমি তখন কয়েক মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলাম—

খালিদ মাথা নাড়ে, ঠিক বটে, ঠিক। দেখতেও বেটা, একেবারে আবু সামাতের মতো হয়েছে।

যুঁই বলে, আজ থেকে আসলান আপনারই ছেলে। আপনি একে মানুষের মতো মানুষ করে তুলুন, এই আমার একমাত্র সাধ।

খালিদ-এর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ঠিক বলছো, মা, আমাকে দিয়ে দিলে? আমি ওকে লেখাপড়া শেখাবো, মস্ত বড় নামজাদা আমির বানাবো। আমি একে দত্তক নিলাম। শুধু তোমার কাছে আমার অনুরোধ, কারো কাছে এর আসল পরিচয় ফাঁস করে দিও না। লোকে জানবে, আসলান আমারই ঔরসের সন্তান।

যুঁই বলে, তাই হবে। ওর ভালর জন্য আমি আপনার সব কথাতেই রাজি।

খালিদ যুঁই-এর ছেলেকে নিজের শাদী করা বিবির গর্ভজাত সন্তানের মতো করে লালন-পালন করতে থাকে। খুব যত্ন করে তার লেখা-পড়া শেখানোর ব্যবস্থা হয়। নানা ভাষা বিশারদ এক মহাপণ্ডিত মৌলভীকে মাইনে করে রাখা হলো। নামজাদা হস্তলিপি বিশারদ হিসাবেও তার দেশ জোড়া নাম ছিল। যথা সময়ে, কোরান, কাব্য, অঙ্ক বিজ্ঞান দর্শনে এবং হস্তলিপিতে পারদর্শী হয়ে ওঠে আসলান। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলা, অস্ত্রবিদ্যা ঘোড়ায় চড়াতেও বেশ পটু হয়ে ওঠে। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ার হিসাবে আসলানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। খলিফা তাকে আমিরের উপাধিতে ভূষিত করেন।

একদিন নিয়তির বিধানে, ইহুদী ইব্রাহিমের সুঁড়িখানার সামনে আহমদ-এর সঙ্গে দেখা হয় আসলানের। আহমদের পীড়া-পীড়িতে আসলান দোকানে গিয়ে বসে। খুব মৌজ করে মদ্যপান চলতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আহমদ নেশায় মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। আসলান বলে, অনেক হয়েছে,

আজ আর খেয়ে কাজ নাই। চলুন বাড়ি ফেরা যাক।

দুজনে দোকানের বাইরে আসে। অন্ধকার রাত। আহমদ কামিজের জেব থেকে ছোট একটা সোনার চিরাগ বের করে। ঢাকনাটা খুলতেই হীরের আলোয় পথের অন্ধকার কেটে যায়। আসলানের অবাক লাগে। এমন আজব চিরাগ-বাতি সে কখনও দেখেনি। —দেখি দেখি, কেমন জিনিস! বাঃ চমৎকার তো! তেল না মোম না, অথচ জ্বলে? আমাকে দেবেন?

আহমদ বলে, তাই কি দেওয়া যায়। এতো আর সাধারণ চিজ নয়। এর পিছনে কত কান্ড-কারখানা ঘটে গেছে। একটা নিরীহ নিরপরাধ মানুষের জান খতম হয়ে গেছে এর জন্যে।

—কী রকম?

আসলান কিছুই বুঝতে পারে না? আহমদ তখন আবু সামাতের ফাঁসীর কাহিনী আদ্যোপান্ত খুলে বলে তাকে। আসলান বিষাদ বিষণ্ণ মুখে বাড়ি ফিরে আসে। ভাবে, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য মানুষ এত নীচ হয়! মা-এর কাছে সব খুলে বলে আসলান।

ছেলের কথা শুনে যুঁই অস্ফুট আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

এই সময় রজনী অতিক্রান্ত হতে চলেছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো উনসত্তরতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে:

যখন জ্ঞান ফিরে আসে, যুঁই ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলে, বাবা, এতদিনে আল্লাহ বুঝি মুখ তুলে চাইছেন। পাপ কখনও চাপা থাকে না। যা সত্যি তা একদিন না একদিন ফুটে ওঠেই। এত দিনের চাপা রহস্যের কিনারা পাওয়া গেছে। আমি আর কোনও কথা গোপন রাখবো না। বাবা, আমির খালিদ তোমার জন্মদাতা পিতা নন। তিনি তোমাকে আমার কাছ থেকে দত্তক নিয়ে প্রতিপালন করেছেন মাত্র। তোমার বাবা আমার স্বামী আবু সামাত। সুলতানের প্রাসাদের চুরির মিথ্যা দায়ে তার ফাঁসী হয়। আর দেরি নয়, এক্ষুনি তুমি তোমার বাবার বিশিষ্ট বন্ধু বৃদ্ধ হাবিলদারের সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বল তাকে। এবং খোদার নামে কসম খেয়ে তার সামনে হলফ করে এস, যেভাবেই হোক, তুমি তোমার বাবার হত্যাকারীর প্রতিশোধ নেবে।

আসলানের মুখে সব শুনে বৃদ্ধ হাবিলদার উল্লাসে ফেটে পড়ে। —খোদা হাফেজ, তিনিই সব রহস্যের পর্দা ছিঁড়ে আলোর সন্ধান করে দিয়েছেন। তাঁর ওপরই ভরসা রাখ, তিনিই শয়তানের সমুচিত শাস্তি বিধান করবেন।

বৃদ্ধের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। সেইদিনই পোলো খেলার আসরে এই নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনীত হলো। খলিফা তার দলবল নিয়ে পোলো খেলায় মেতেছেন। সুলতানের দল এবং প্রধান কতোয়ালের দলের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছে। আসলান খেলছে সুলতানের দলে।

খেলা বেশ জমে উঠেছে। বিপক্ষজনের একজন খেলোয়াড় সপাটে বল ঘুরিয়ে মারলো হারুন-অল-রসিদের দিকে। আর একটু হলেই খলিফার

একটা চোখ কানা হয়ে যেত। কিন্তু আসলান অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় বলটা রুখে দিতে পারলো। খলিফা বাহবা দিয়ে ওঠেন, সাবাস্‌! এরপর আসলান এমন জোরে একটা বল মারলো, সেই খেলোয়াড়টার পিঠের শিরদাঁড়ায় লেগে হাড়টা ভেঙ্গে গেল।

খলিফা চিৎকার করে ওঠেন, বাঃ চমৎকার মার মেরেছ ত, খালিদের ছেলে!

এইখানেই সেদিনের খেলার ইতি হয়। সবাই খলিফার সামনে এগিয়ে এল। খলিফা তখন আসলানের খেলার তারিফ করছেন।

—আমি খুব খুশি হয়েছি, তোমার খেলায়। কি ইনাম চাও, বল।

আসলান বলে, আমার বাবার হত্যাকারীর শাস্তি চাই, জাঁহাপনা!

—তোমার বাবা? তোমার বাবাতো সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে—আমির খালিদ।

—না হুজুর, উনি আমার বাবা নন। আমাকে দত্তক নিয়ে প্রতিপালন করেছেন। আমার বাবা আবু সামাত—যাকে আপনি মিথ্যা চুরির দায়ে ফাঁসী দিয়েছেন?

—সে কি! কী করে বুঝলে, সে চুরি করেনি?

—এখুনি আমি আসল চোর কে—প্রমাণ করে দিচ্ছি। ঐ যে আহমদ—ওর দেহ আপনি খানা-তল্লাসী করান। ওর কাছে আছে আপনার সেই আজব চিরাগ বাতি।

আসলানের এই কথায় খলিফা অবাক বিস্ময়ে আহমদের দিকে তাকান। আহমদ তখন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। খলিফা গর্জে ওঠেন, লোকটাকে তল্লাসী কর।

সঙ্গে সঙ্গে আহমদকে তল্লাসী করে তার কামিজের জেব থেকে খলিফার সেই সোনার চিরাগ বাতি পাওয়া গেল।

খলিফা হুঙ্কার ছাড়েন, এটা কোথায় পেলে?

—কিনেছি হুজুর।

—কিনেছো! এ জিনিস হাটে বাজারে কিনতে পাওয়া যায়? মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাওনি। এই—কে আছিস, চাবুক লাগা।

চাবুকের ঘায়ে জর্জরিত হয়ে যায় আহমদের সর্বাঙ্গ। দরদর করে রক্ত ঝরে পড়তে থাকে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে আহমদ। কিন্তু আসল কথা কবুল না করা পর্যন্ত চলতেই থাকে চাবুক।

অবশেষে সে স্বীকার করলো। হ্যাঁ, সে-ই বেগমের বসার ঘর থেকে খলিফার ব্যবহারের জিনিসগুলো চুরি করে সামাতের বাড়ির দেওয়ালে রত্নহার আর মোহরখানা পুরে রেখেছিল। আজব চিরাগ বাতির লোভ সে সামলাতে পারেনি। ওটা নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিল। তারই হঠকারিতায় সামাতের ফাঁসী হয়ে গেছে।

খলিফা আসলানের দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার তুমি তোমার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিজের হাতেই নাও, আসলান। তুমি নিজে হাতে লোকটাকে ফাঁসী দাও।

আসলান এবং হাবিলদার মিলে আহমদকে উপস্থিত সকলের সামনে

ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিয়ে দিল।

খলিফা আসলানকে সস্নেহে কাছে ডেকে বললেন, বল, আর কী করলে তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে?

আসলান বলে, জাঁহাপনা, আপনি আমার বাবাকে ফিরিয়ে এনে দিন, শুধু এইটুকু হলেই আমি খুশি হবো।

—কিন্তু, খলিফা হারুন অল-রসিদ অসহায়ের মতো কাঁদতে কাঁদতে বলেন, তাকে আমি কি করে ফেরৎ দেব, বাবা? তুমি তো শুনেছো, ভুল বিচার করে আমি তার ফাঁসী দিয়েছি।

আসলান বলে, যদি অভয় দেন তবে একটা কথা বলি।

—তুমি নির্ভয়ে বল, বাবা।

—আমার বাবা আবু সামাত এখনও বেঁচে আছেন।

—আবু সামাত বেঁচে আছে? তা কি করে সম্ভব? আমি যে তাকে ফাঁসী দিয়েছি, আসলান। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার কিছুটা সন্দেহ রয়ে গেছে। সামাতের ফাঁসীর পরদিন আমি আর জাফর তার লাশ পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। লাশটা দেখে কিন্তু সেদিন আমি নিঃসন্দেহ হতে পারিনি—সামাতের দেহের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য সেই লাশে আমি খুঁজে পাইনি। যাই হোক, এ বিষয়ে যদি কেউ কোন হদিশ দিতে পারে, আমার পিতৃ-পুরুষের নামে হলফ করে বলছি, তার মনোবাঞ্ছা আমি পূর্ণ করবো।

খলিফার কথা শুনে বৃদ্ধ হাবিলদার এগিয়ে এসে আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে বলে, ধর্মাবতার আপনি আমাকে অভয় দিন, আমি সব বলবো।

খলিফা বললেন, তোমার কোন ভয় নাই, বল।

—হুজুর, আবু সামাত জীবিত আছে। আপনার হুকুম সেদিন আমি তামিল করিনি, আমার গুস্তাফী মাফ করুন, জাঁহাপনা।

—তবে কাকে ফাঁসী দিয়েছিলে?

অন্য একজন ফাঁসীর আসামীকেই ফাঁসী দিয়েছিলাম, হুজুর।

—আর আবু সামাত?

—তাকে আমি রাতের অন্ধকারে বাগদাদ পার করে আলেকজান্দ্রিয়ার নৌকায় তুলে দিয়ে এসেছি। এখনও সে সেখানেই আছে। সেখানে সে একটা জাহাজী যন্ত্রপাতির দোকান করেছে।

হারুন অল-রসিদ আনন্দে, উল্লাসে ফেটে পড়লেন, খোদা মেহেরবান। এক্ষুণি আলেকজান্দ্রিয়াতে চলে যাও। যত তাড়াতাড়ি পার তাকে এখানে নিয়ে এস।

জাফরকে উদ্দেশ করে খলিফা আবার বললেন, হাবিলদারকে দশ হাজার মোহর সঙ্গে দিয়ে এখুনি আলেকজান্দ্রিয়া পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

আল্লাহর ইচ্ছায় আবার আমরা আবু সামাতের কাহিনী শুনবো।

নৌকায় চেপে আবু সামাত যখন আলেকজান্দ্রিয়ায় পেঁছিল, সেখানকার নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে তার দুচোখ জুড়িয়ে যায়। শহরের ভিতরে ঢুকে সে খবর পায়, সম্প্রতি এক দোকানের মালিক মারা গেছে। দেখাশুনার লোকের অভাবে দোকানটা বিক্রি হবে। দরদাম করে

আবু সামাত দোকানটা কিনে নেয়। জাহাজী যন্ত্রপাতির দোকান। ভালো লাভের ব্যবসা। নানা রকম, হাল, দাঁড়, পাল, দড়ি, কাছি, বস্তা, বাক্স, প্যাটরা —প্রভৃতিতে দোকানটি ভরা। বিদেশের বাজারে এখানকার এইসব সওদার ভীষণ চাহিদা। দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের ব্যবসায় সে বেশ মোটা অঙ্ক লাভ করেছে। পুঁজি বেড়ে আজ দশগুণ হয়ে গেছে।

আবু সামাতের নিঃসঙ্গ জীবন আর ভালো লাগে না। সে ঠিক করে. ব্যবসা-বাণিজ্য গুটিয়ে সে এখান থেকে চলে যাবে। আস্তে আস্তে গুদাম-জাত জিনিসপত্র বেচে দিতে থাকে। খদ্দের পেলে সে গোটা দোকানই বেচে দেবে।

এইভাবে দোকানটা ক্রমে ক্রমে খালি হয়ে আসে। একদিন সে সামান-পত্র ঝাড়াই বাছাই করতে করতে তাকের এক পাশে একটা হারের সঙ্গে একটা রঙিন পাথরের তক্তি দেখতে পায়। পাথরটা নিশ্চয়ই কোনও দৈব গ্রহরত্ন হবে। এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে থাকে। কিন্তু কিছুই অনুমান করতে পারে না।

এমন সময় দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো জাহাজের এক কাপ্তেন। পাথরের তক্তিটার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সে। আবু সামাত জিজ্ঞেস করে, কি দেখছো, সাহেব?

কাপ্তেন বলে, ঐ পাথরটা বিক্রি করবে?

—কেন—করবো না! দোকানের যা দেখছো, সব বিক্রি করে দেব—মায় দোকানটা পর্যন্ত। তা কত দাম দেবে?

কাপ্তেন বলে, আশী হাজার দিনার নাও।

ইয়া আল্লাহ, আবু সামাত অবাক হয়ে ভাবে, এত দাম দিতে চায় কেন সে? নিশ্চয়ই আরো অনেক বেশি দাম হবে। হেসে বলে, ভালো রসিকতা করতে জান তো, সাহেব। আমি তোমাকে এক লক্ষ দিনার দিচ্ছি, এনে দাও তো এই রকম একখানা পাথর!

ঠিক আছে, কাপ্তেন বলে, আরও দশ হাজার বেশি দেব।

সামাত রাজি হয়ে যায়। কাপ্তেন বলে, কিন্তু অত টাকা তো আমার সঙ্গে নাই। তোমাকে কষ্ট করে আমার জাহাজে যেতে হবে একবার। পাথরটা সঙ্গে নাও, এক হাতে দাম দেব এক হাতে পাথরটা নেব।

আবু সামাত বলে, খুব ভালো কথা, চল, তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

সামাতকে সঙ্গে নিয়ে কাপ্তেন জাহাজে এসে বলে, তুমি এখানে বসো, আমি আমার কামরা থেকে মোহরগুলো নিয়ে আসি।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে, সেই যে কাপ্তেন ভিতরে চলে গেল আর ফিরে এল না। হঠাৎ আবু সামাত কূলের দিকে তাকিয়ে দেখে, জাহাজটা তীর ছেড়ে মাঝ দরিয়ার দিকে চলেছে। আবু সামাতের আর বুঝতে বাকী রইল না, সে ঠগের পাল্লায় পড়েছে। এখন আর নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ নাই। কাপ্তেনের কব্জায় সে এখন বন্দী। যেদিকে তাকায়, জল আর জল। কোনও দিকে কোনও জাহাজ বা নৌকার চিহ্ন নাই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কাপ্তেনের আবির্ভাব হলো, কী আবু সামাত, কেমন মালুম হচ্ছে? তুমিই তো সেই আবু সামাত—তোমার বাবা কায়রোর

নামজাদা সওদাগর। এক সময়ে তুমি বাগদাদের খলিফার খুব প্রিয়পাত্র কর্মচারী ছিলে না? তোমাকে এখন জেনেভায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারপর দেখো, তোমার নসীবে কী লেখা আছে।

আবু সামাত মুখ বুজে বসে থাকে। কাপ্তেন অদ্ভুত এক হাসি হেসে অদৃশ্য হয়ে যায়।

জাহাজটা জেনেভা বন্দরে এসে নোঙর করে। দুজন প্রহরী সঙ্গে নিয়ে এক বুদ্ধা এসে উঠলো জাহাজে। বুদ্ধার ইশারায় আবু সামাত তাকে অনুসরণ করে এক মঠ সন্নিহিত গীর্জায় এসে পেঁছয়। এবার বুদ্ধা মুখ খোলে, এখন থেকে তুমি এই গীর্জায় আর মঠে নফরের কাজ করবে। কি কি কাজ তোমাকে করতে হবে, ভালো করে মন দিয়ে শোন: খুব সকালে ঘুম থেকে উঠবে। কুঠার নিয়ে জঙ্গলে যাবে—কাঠ কেটে আনবে। কাঠ কেটে ফিরে এসে এই গীর্জা আর মঠের চত্বর বারান্দা খুব ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে সাফ করবে। সতরঞ্চ, মাদুরগুলো সব ঝাড়বে। দুটো বাড়িই ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করবে। গম পিষে ময়দা করে রুটি বানাবে। চাকীতে ডাল ভেঙ্গে রাঁধবে। এইভাবে তিনশো সত্তরজন পাদরীর খাবার তৈরি করবে। প্রত্যেক পাদরীর ঘরে ঘরে সেই খাবার যথাসময়ে পেঁছে দিতে হবে। প্রতিদিন। এর কোনওরকম ব্যতিক্রম হলে তার পরিণাম খুব খারাপ হবে। তাদের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলেই সেই তিনশো সত্তরখানা থালা ঝকঝকে করে মেজে ধুয়ে রান্না ঘরে সাজিয়ে রাখবে। এর পর তোমার কাজ, বাগানে গাছের গোড়ায় জল দেওয়া। চারটে ফোয়ারার চৌবাচ্চার জল পালটানো। তারপর দেওয়ালের ধারে ধারে যে-সব জলের পিঁপেগুলো বসানো আছে, ওগুলো ভরতে হবে। এসব তোমাকে দুপুরের মধ্যেই শেষ করতে হবে। তারপর বিকেলের কাজ শোন: বিকালে তুমি গীর্জার বাইরে গিয়ে দাঁড়াবে। পথচারীদের প্রার্থনা শুনতে আসার জন্যে জোর জবরদস্তি করবে। তাতেও যদি তারা আসতে নারাজ হয়, তবে এখানে একটা পেল্লায় ভারি গদা আছে। সেই গদা দিয়ে তাদের পেটাবে। কারণ, আমরা চাই না, এই খ্রীস্টান শহরে কোনও বিধর্মী বাস করুক। এ শহরে যারা থাকবে, পাদরীদের আশীর্বাদ নিয়েই তাদের থাকতে হবে। সব শুনলে, আর এক মুহূর্ত দেরি না করে কাজে লেগে যাও। যা বললাম, ঠিক ঠিক মনে থাকে যেন।

আড়চোখে পিটপিট করে তাকাকে তাকাতে বুদ্ধা চলে গেল। আবু সামাত ভাবতে থাকে, হায় আল্লাহ, এ কি বেঘোরে পড়লাম। কি করে এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে, কিছুই বুঝতে পারছি না।

গীর্জার ভিতরে ঢুকে একটা কাঠের তক্তপোষের উপর বসে হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকে। সে। ঘণ্টাখানেক বাদে এক নারী কণ্ঠের আওয়াজে চমকে ওঠে। থামের আড়াল থেকে এক মধুর কণ্ঠের সঙ্গীত ভেসে আসছে। এমন সুরেলা কণ্ঠ সে শোনেনি কখনও। নিমেষের মধ্যে তার হৃদয়ের সকল সন্তাপ মুছে যায়।,

আবু সামাত উঠে দাঁড়ালো। মেয়েটিকে দেখতে হবে। একটু এগোতেই সে দেখতে পেল, বোরখা ঢাকা একটি মেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে কাঁপা কাঁপা গলায় সে বললো, আবু সামাত; আমি

তোমার প্রতীক্ষায় কতকাল ধরে বসে আছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অবশেষে তোমার দেখা পেলাম। এবার তুমি আমাকে গ্রহণ কর।

আবু সামাত অবাক বিস্ময়ে বলে, আল্লাহ, তুমিই একমাত্র সত্য, তুমি ছাড়া আর কিছু জানি না। একি! আমি স্বপ্ন দেখছি নাকি? আমি কি আমার আলেকজান্দ্রিয়ার সেই দোকানে শুয়ে ঘুমাচ্ছি?

মেয়েটি বলে, না না, তা কেন হবে? তুমি তো জেগেই আমার সঙ্গে কথা বলছো। আর এ শহরটার নাম জেনেভা। জাহাজের কাপ্তেনকে দিয়ে কৌশল করে আমিই এখানে আনিয়েছি তোমাকে। আমার বাবা এখানকার সম্রাট। আমার নাম রাজকুমারী হুসন মরিয়াম। ছোটবেলায় আমি যাদু বিদ্যা শিখেছিলাম। মন্ত্রবলে আমি তোমার অপূর্ব রূপ আর যৌবন প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সেই থেকে তোমায় ভালো বেসেছি। আমার সাধ ছিল তোমাকে স্বচক্ষে দেখবো। এই দ্যাখো, আমার গলায় সেই দৈব পাথরখানা। আমার হুকুমেই ঐ জাহাজের কাপ্তেন তোমার দোকানে এই হারটা লুকিয়ে রেখে এসেছিল। কি যে এর দৈব ক্ষমতা, হাতে হাতে তা বুঝেছ! যাই হোক, এতকালের সাধনার পর তোমাকে যখন কাছে পেলাম, এবার তুমি আমাকে বিয়ে কর। তারপর আমি তোমার সব ইচ্ছা পূরণ করবো—যা চাও।

—রাজকুমারী, তুমি কি আমাকে কথা দিতে পার—আমি আবার আলেকজান্দ্রিয়া ফিরে যাবার অনুমতি পাবো?

—কেন পাবে না? নিশ্চয়ই পাবে।

তক্ষুণি পাদরীকে ডাকা হলো। আবু সামাত আর মরিয়ামের বিয়ে দিয়ে দিল সে।

মরিয়াম বললো, বিয়ে তো হয়ে গেল, এবার তুমি কি আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরে যেতে চাও?

—খোদা হাফেজ, হ্যাঁ, এখনই আমি চলে যেতে চাই।

তখন মরিয়াম তার গলার সেই দৈব পাথরখানা সূর্যের দিকে তুলে ধরে। হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ঘষতে ঘষতে বিড় বিড় করে মন্ত্র আওড়ায়, 'সুলেমানের নাম স্মরণ করে বলছি, শোন রক্তমুখী মণি, আমি তোমাকে হুকুম করছি, এই মুহূর্তে আমার জন্যে একখানা উড়ন্ত শয্যা নিয়ে হাজির হও।'

মুখের কথা শেষ হতে না হতে তাদের সামনে একখানা উড়ন্ত-শয্যা নেমে এল। মোটা গদি আঁটা চারদিক ঘেরা। দুজনে উঠে বসলো। এবার মরিয়াম পাথরখানাকে ঘুরিয়ে আবার ঘষতে ঘষতে আওড়াতে থাকলো, রক্তমুখী মণি, এবার তুমি আমাদের নিয়ে সোজা আলেকজান্দ্রিয়া উড়ে চল।

তৎক্ষণাৎ উড়ন্ত-শয্যা তরতর করে শূন্যে উঠে যেতে থাকলো। উঠতে উঠতে মেঘের ওপরে গিয়ে তীর বেগে চললো। কয়েকটি মুহূর্তমাত্র, তারপর আবার সে শোঁ শোঁ করে নিচে নেমে এল। আবু সামাত তাজ্জব হয়ে দেখে, আলেকজান্দ্রিয়াতে পেঁছে গেছে তারা।

শয্যা ছেড়ে মাটিতে পা রাখলো দুজনে। আবু সামাত দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাগদাদের সেই বুদ্ধ হাবিলদার। সামাত কি স্বপ্ন

দেখছে। বিস্ময়ে রুদ্ধবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এক মুহূর্ত। তারপর হাবিলদারকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। হাবিলদার সামাতকে সান্ত্বনা দেয়, দুঃখের দিন শেষ হয়েছে বাবা। আসল চোর ধরা পড়েছে।

সামাতকে সব খুলে বললো সে।

—খলিফা তোমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাগদাদে নিয়ে যেতে বলেছে।

আবু সামাত বলে, আগে আমাকে কাইরো যেতে দিন, কতকাল মা বাবাকে দেখিনি। তাদের সঙ্গে নিয়ে খলিফার সঙ্গে দেখা করবো আমি।

হাবিলদারকে সঙ্গে নিয়ে ওরা তিনজন উড়ন্ত শয্যায় উঠে বসে। চোখের পলকে উড়ে চলে যায় কাইরোয়—সওদাগর সামস্ অল-দিনের বাড়ির দরজায়। কড়া নাড়তেই সওদাগর বিবি দরজা খুলে দাঁড়ায়, কে?

আবু সামাত আকুল হয়ে ছুটে যায়, আমি, মা, আমি তোমার ছেলে আবু সামাত।

বৃদ্ধ মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। সামস্ অল দিনও ছুটে বেরিয়ে আসে। এতকাল পরে ছেলেকে পেয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে সে।

কাইরোতে তারা তিনদিন বিশ্রাম নিল। তারপর সামাত মা বাবাকে সঙ্গে নিয়ে পাঁচজনে উঠে বসলো উড়ন্ত শয্যায়। এবার সোজা চলে এল বাগদাদে। সামাতকে পেয়ে খলিফা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। যেন মনে হলো, বহুকাল বিদেশে কাটানোর পর নিজেরই সন্তান ঘরে ফিরেছে। তিনি সামস্ অল দিন, আবু সামাত ও আসলানকে হুকুমতের উচ্চ পদে বহাল করলেন।

আবু সামাত ভেবে দেখল, তার এই ভাগ্য বিবর্তনের একমাত্র নায়ক মাহমুদ। অনেক অনুসন্ধানের পর তার খোঁজ পাওয়া গেল। প্রাসাদে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এল সামাত। এবং প্রধান কোতোয়ালের পদে বহাল করলো তাকে।

এর পর আবু সামাত তার পুত্র আসলান, তিন বিবি জুবেদা, যুঁই ও মরিয়মকে নিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুখেস্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়েছিল।

গল্প শেষ করে শাহরাজাদ চুপ করে বসে রইল। এতক্ষণ সুলতান শাহরিয়ার রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছিল। এবার সে উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, সত্যিই শাহরাজাদ তোমার এই আবু সামাতের কিস্সার তুলনা হয় না। দু মুখো মাহমুদ আর সামসামকে ভোলা যায় না।

শাহরাজাদ স্মিত হাসে। দুনিয়াজাদ বলে, দিদি, এবার কোন কাহিনী শোনাবে?

—শুনুন মহানুভব জাঁহাপনা, এবার আপনাকে সভাকবি আবু নসাব-এর দু-একটা মজার অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাবো। বড় উপাদেয়, মনোহারী।

দুনিয়াজাদ আব্দার ধরে, তা হলে শুরু কর, দিদি।

শাহরাজাদ বলে, জাঁহাপনা শুনতে চেয়েছেন, শোনাতে আমি বাধ্য,

বোন। কিন্তু আজ তো আর হবে না, রাত শেষ হয়ে আসছে। এখন ঘুমাও, কাল রাতে শুরু করা যাবে।

দুশো সত্তরতম রজনীতে নতুন কাহিনী :

শুরু করার আগে শাহরাজাদ সুলতান শারিয়ারের সঙ্গে সুরতরঙ্গ শেষ করে নেয়। দুনিয়াজাদ এতক্ষণ নিচে গালিচার উপরে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে কাপ মেরে শুয়েছিল। এবার সে পালঙ্কে দিদির পাশে এসে বসলো। শাহরাজাদ বলতে থাকে : একদিকে আবু নসাব খলিফা হারুন অল রসিদের সভাকবি হিসাবে খ্যাতিমান ছিল; আর এক দিকে আবার তার মতো কুখ্যাত অসচ্চরিত্রের মানুষ দুটি ছিল না।

দুনিয়াজাদ দিদিকে জড়িয়ে ধরে, কেন দিদি, কী সে করেছিল?

সুলতান শারিয়ারও বলে, কিস্সা শুরু করার আগেই দারুণ জমিয়ে দিলে, দেখছি। আবু নসাবের দু-একটা কীর্তির কিস্সা তা হলে শুনতেই হয়। মনে হচ্ছে, খুব মজাদার হবে। কিন্তু আজ রাতে আমার মনটা বড় উদাস হয়ে আছে, শাহরাজাদ। আজ কিছু জ্ঞানের কথা, কিছু উপদেশের বাণী শুনতে পেলে দিল্‌টা হালকা করতে পারতাম।

শাহরাজাদ বলে, আমিও হঠাৎ, আজ সারাটা দিন, এই ধরনের কথাই ভাবছিলাম জাঁহাপনা।

শারিয়ার বলে, তা হলে আর কাল বিলম্ব করে লাভ কী? শুরু কর।

শাহরাজাদ এক মুহূর্ত কি যেন ভাবে। তারপরে সে বলতে থাকে:

এক সময়ে বাগদাদ শহরে এক ধনী সওদাগর ছিল—বিষয়আশয় ধনদৌলত—কোনও কিছুরই অভাব ছিল না তার। কিন্তু এত সত্ত্বেও তার মনে কোনও সুখ ছিল না। তার সেই বিশাল বিত্ত বৈভব কে ভোগ করবে? তার কোন সন্তানাদি ছিল না। ভেবে ভেবে অকালে তার মাথার চুল সাদা হয়ে গেল। দেহে জরা-বার্ধক্য দেখা দিল। পুত্রার্থে অনেক ভার্যা সে কিনেছিল কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

কারণে অকারণে সে অনেক দানধ্যান করতো। অনেক পীর পয়গম্বরের আস্তানায় ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকতো। উপবাস থেকে দেহমন শুদ্ধ রাখতো। প্রহরে প্রহরে নামাজ পড়তো। এবং সর্বকনিষ্ঠা সুন্দরী বিবির সঙ্গে সহবাস করতো।

অবশেষে আল্লাহ মুখ তুলে চাইলেন। ছোট বিবি গর্ভবতী হলো। ন'মাস পরে সে একটি চাঁদের মতো ফুটফুটে সুন্দর ছেলে প্রসব করলো। খোদাতালার এই অপার করুণায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সে ভিক্ষুক, অনাথ, বিধবাদের সাতদিন ধরে পেট পুরে খাওয়ালো।

ছেলের নাম রাখা হলো আবু অল-হুসন। ধাই ও বহু সুন্দরী বাঁদীদের পরিচর্যায় শিশু বড় হতে থাকে। সময়কালে তার লেখা পড়ার ব্যবস্থা করলো সওদাগর। কোরান, কাব্য, অঙ্ক, হস্তলিপিতে সে পারদর্শী

হয়ে উঠতে থাকে। খেলাধুলা এবং অস্ত্রবিদ্যাতেও বেশ পটু হতে লাগলো —সব চেয়ে তার ঝোঁক ছিল ধনুর্বিদ্যায়। অব্যর্থ লক্ষ্য তার। নিশানার এক চুল এদিক ওদিক যায় না তার তীর।

শুধু লেখাপড়া বা খেলাধুলাতেই সে অন্য ছেলেদের চেয়ে সেরা হয়ে উঠেছিল তাই না, তার মতো চোখ ঝলসানো যাদুকরের মতো রূপই বা আর কার ছিল? একবার দেখলে সহসা চোখ ফেরানো যায় না।

আবু হুসন তার বাবার চোখের মণি, আঁধার ঘরের আলো। ছেলের দিকে বুক ভরা আনন্দ নিয়ে তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধ। আর ভাবে, তার তো যাবার সময় হয়ে এসেছে—এবার সব ফেলে রেখে চলে যেতে হবে। ছেলেকে কাছে ডেকে সে বলে, বাবা শোন, তাঁর ডাক পড়েছে, আমাকে যেতে হবে। কোনও কাজই আমি অসমাপ্ত রেখে যাচ্ছি না। তোমার জন্য প্রচুর ধন-দৌলত রইলো—সাত পুরুষ বসে খেলেও ফুরাবে না। যা রেখে গেলাম, ভালো করে ভোগ করবে। কিন্তু অমিতব্যয়ী হয়ো না। তাই বলে আত্মাকে কষ্ট দিয়ে সম্পত্তি সঞ্চয় করো না। যতটুকু প্রয়োজন, ব্যয় করতে দ্বিধা করো না। সব সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। মনে রাখবে, তার করুণাতেই বেঁচে আছো।

সওদাগর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো। যথাবিহিত মর্যাদা সহকারে তার শেষ কৃত্য সমাধা করলো আবু অল-হুসন।

শোকের দিনগুলো শেষ হয়ে গেল। বন্ধু-বান্ধবরা হুসনকে হামামে নিয়ে গিয়ে গোসল করিয়ে নতুন সাজপোশাকে সাজালো।

"সব শিশুই একদিন বৃদ্ধ হয়। তার মৃত্যুই তার অস্তিত্বের ইতি নয়। সব শিশুর অন্তরেই পিতা ঘুমিয়ে থাকে। মুছে ফেল অশ্রু। তোমার এই অফুরন্ত যৌবন আর অতুল বৈভব-এর সদ্ব্যবহার কর।"

বন্ধুদের সান্ত্বনা বাক্য উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে শোকের পালা শেষ হয়।

দিন যায়। সঙ্গী সাথীর সাহচর্যে দেহ প্রাণ-মন চপল চঞ্চল হয়ে ওঠে। সুতরাং আবু অল-হুসন একটু একটু করে বাবার উপদেশ বাণী ভুলে যেতে থাকে। বিলাসিতার বাহুল্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। 'ম' কারান্ত সবগুলো উপসর্গই প্রধান হয়ে ওঠে তার জীবনে। বাড়িতে নাচগানের আসর বসে নিত্য। নামকরা বাইজীরা আসে। দামী দামী মদ মাংসের মহোৎসব চলে। এইভাবে বসে বসে উড়ালে সুলতানের ভাণ্ডার শূন্য হতে কতদিন লাগে! হঠাৎ একদিন সে দেখলো, তার বিপুল বিত্ত বৈভবের আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নাই। থাকার মধ্যে আছে শুধু একটি কেনা বাঁদী।

এই হচ্ছে নসীবের নিয়তি। একটিমাত্র সুন্দরী বাঁদী ছাড়া সব তিনি কেড়ে নিলেন। এই বাঁদী তখনকার দিনের সেরা সুন্দরীদের সেরা ছিল। তার অসাধারণ রূপগুণের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল তামাম দুনিয়ায়। নাম হাফিজা। তন্বী শ্যামা শিখর দশনা। হরিণীর মতো কাজল কালো টানা টানা চোখ, টিকলো নাক, গুলাবের পাঁপড়ীর মতো গাল আর পাকা আঙুরের মতো অধর পুরুষের বুকে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এখন আবু অল-হুসনের এই সুন্দরী হাফিজাই একমাত্র এবং শেষ সম্পত্তি। আর সবই সে খুইয়ে ফেলেছে। চিন্তায় ভাবনায় তার মুখে খানা

ঝোচে না চোখে ঘুম আসে না।

হাফিজা দেখলো, এইভাবে অনাহারে অনিদ্রায় কাটাতে থাকলে হুসেন বাঁচবে না। যেভাবেই হোক, তার মনের কষ্ট লাঘব করতে হবে। মুখে হাসি ফোটাতে হবে।

ঘরে যে-টুকু গহনা-পত্র অবশিষ্ট ছিল, তাই পরে নিল হাফিজা। দামী সাজ-পোশাকে সেজেগুজে হুসেন-র কাছে এসে বললো, আমাকে দিয়ে তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে। আমার কথা শোন, খলিফা হারুন অল-রসিদের কাছে নিয়ে চল আমাকে। বলবে, মাত্র দশ হাজার দিনার-এর বিনিময়ে তুমি আমাকে বেচে দিতে চাও। যদি তিনি বলেন, দাম বড় বেশি হচ্ছে, তুমি বলবে 'ধর্মাবতার, এ বাঁদীর বাজার দাম আরও অনেক বেশি, বাঁদী বাজারে নীলামে তুললে কোন্ দেশের কোন্ বাদশা সওদাগরের ঘরে চলে যাবে সে—কিছুই জানতে পারবো না। কিন্তু আপনার কাছে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত হবো, সে কোনও দুঃখ কষ্ট পাবে না। আর তাছাড়া, রূপের জেল্লায় সবাই হয়তো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কিন্তু তার গুণের কদর আপনি ছাড়া আর কেউ-ই করতে পারবে না। যদি প্রমাণ চান, এখুনি কেমন সে গুণবতী পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারেন।' তবে একটা কথা, খলিফা যদি দর কষাকষি করে, তুমি কিছুতেই রাজি হবে না।

আবু অল হুসেন ভাবতে পারে না। হাফিজার মতো সর্ব গুণান্বিতা সেরা সুন্দরীকে হাত ছাড়া করার কথা কি করে সে ভাববে? সে তো শুধু পয়সা দিয়ে কেনা বাঁদীই নয়, সে যে তার দিল কা কলিজা! কিন্তু পেয়ারের চেয়ে প্রয়োজন অনেক বড়। তাই হাফিজার এই প্রস্তাব একেবারে নস্যাৎ করে দিতে পারে না। বলে, ঠিক আছে, চল।

যথারীতি কুর্নিশ জানিয়ে হুসেন খলিফার কাছে হাফিজার শেখানো বুলিগুলো আওড়ে যায়। খলিফা জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম কী, সুন্দরী?

—হাফিজা।

খলিফা বললেন, হাফিজা, তোমার তো অনেক গুণকীর্তন শুনলাম। তা কী কী বিষয়ে তোমার পাণ্ডিত্য—একটু-আধটু নমুনা দেবে?

—কেন নয়, জাঁহাপনা? একশোবার দেব। বলুন, আপনি কী জানতে চান? আমি কাব্য, ব্যাকরণ, সমাজবিজ্ঞান, সামরিক বিজ্ঞান, সঙ্গীত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি, অঙ্ক, আইন এবং কলাবিদ্যা আহরণ করেছি। পবিত্র ধর্মগ্রন্থের শাশ্বত সত্য আমি উপলব্ধি করেছি। তার প্রতিটি স্তবক, প্রতিটি ছত্র আমার মুখস্থ। আমি জানি কোরানের কোন্ অংশটুকু মক্কায় লেখা আর কোন্‌টুক মদিনায় বলেছিলেন। আমি মুসলমান ধর্মের সব ফরমানই জানি।

আমি কালোয়াতী গাইতে পারি। নাচতেও জানি। বীণা সেতার স্বরোজ পাখোয়াজ বাজাতে পারি।

হারুন অল রসিদ মেয়েটির অসাধারণ বাকপটুতায় মুগ্ধ হয়ে আবু অল হুসেনকে বললেন, আমি আমার দেশের সমস্ত গুণীজ্ঞানীদের ডেকে পাঠাচ্ছি। তারাই পরীক্ষা করে দেখবে তোমার এই বাঁদীর বিদ্যাবুদ্ধি। তাদের বিচারে এ যদি উৎরে যায়, তাহলে মাত্র দশ হাজারই নয় অনেক অনেক

বেশি ইনাম তুমি পাবে। আর যদি সে না পারে, তবে তোমার জিনিস তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, আমার কোনও কাজে লাগবে না।

খলিফা তখনকার সবচেয়ে সেরা পণ্ডিত ইবরাহিম ইবন শিয়ারকে ডেকে পাঠালেন। বলতে গেলে, তিনি বিদ্যার সাগর। এছাড়া দেশের সেরা কবিদেরও ডাকা হলো। ডাকা হলো ব্যাকরণবিদ, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ, আইনবিদ এবং আরও বহু প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের।

প্রাসাদের বিরাট সভাকক্ষে সকলে এসে সমবেত হলো। কেউই জানে না, কী কারণে খলিফা তাদের তলব করেছেন। সভাকক্ষের ঠিক মাঝখানে খলিফার স্বর্ণাসন। তার চারপাশ ঘিরে বৃত্তাকারে বসলো সকলে। হাফিজা নগণ্য এক নারী—বোরখা ঢাকা দিয়ে সভাকক্ষের এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলো।

হঠাৎ কলগুঞ্জন থেমে গিয়ে নিরালা নির্জন অন্ধকারের নিশব্দ নিস্তব্ধতা নেমে এল সেই বিশাল সভাকক্ষে। হাফিজা এগিয়ে এসে আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানালো খলিফাকে।

—ধর্মাবতার বাঁদী হাজির, হুকুম করুন, আমি তামিল করার জন্য প্রস্তুত। এখানে উপস্থিত সকলেই প্রাজ্ঞব্যক্তি, আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনও বিষয়ে যে কোনও প্রশ্ন আপনারা করতে পারেন, আমি সাধ্য মতো জবাব দেবার কোসিস করবো।

হারুন অল রসিদ চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, এখানে আপনারা সবাই গুণীজন হাজির আছেন। যার যা ইচ্ছা, এই মেয়েকে প্রশ্ন করতে পারেন। আজ তার বিদ্যাবুদ্ধির পরীক্ষা হবে।

সকলে মাটিতে মাথা নুইয়ে সুলতানের প্রতি শ্রদ্ধা জানালো।

হাফিজা উঠে দাঁড়িয়ে সমবেত পণ্ডিতদের সামনে বলতে থাকে, আপনাদের মধ্যে কোরান বিশেষজ্ঞ কি কেউ আছেন? মেহেরবানী করে সাড়া দিন।

সকলের চোখ একজনের দিকে ঘুরে গেল। এক হেকিম উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি—আমি সেই লোক।

হাফিজা স্মিত হেসে বললো, তাহলে আপনিই আমাকে প্রথমে প্রশ্ন করুন, মালিক।

সুতরাং কোরান বিশারদ সেই হেকিম তখন প্রশ্ন করেন, শোন মেয়ে, তুমি তো কোরানের সব পাঠই শেষ করেছ। আচ্ছা বল দেখি, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত? কতগুলি শব্দ কতগুলি অক্ষর এবং কতগুলি আদেশ আছে কোরানে? আচ্ছা আগে বল, কে তোমার মালিক কে তোমার পয়গম্বর, কে তোমার ইমাম? বল, কোন্‌টা তোমার নির্দিষ্ট দিক। এবং তোমার জীবনের নীতি কী? কী তোমার নির্দেশিত পথ? এবং কারা তোমার ভ্রাতা?

সে বললো, আল্লাহ আমার মালিক। মহম্মদ আমার পয়গম্বর। কোরানই আমার কানুন। সুতরাং তিনিই আমার ইমাম। মক্কাতে অবস্থিত আবরাহামের নির্মিত আল্লাহর কাবাহ্‌ আমার দিক। আমার পয়গম্বরের নির্দেশই আমার জীবনের নীতি। সুন্নী সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যই আমার পথ-

নির্দেশ। আর আমার ধর্মে বিশ্বাসী যারা সকলেই আমার ভাই।

হাফিজার জবাবে খলিফা মুগ্ধ হলেন। এবার সেই হেকিম আবার প্রশ্ন রাখলেন, আচ্ছা বল, কী করে বুঝতে পার আল্লাহ আছেন?

—যুক্তি দিয়েই বুঝতে পারি?

—কী সেই যুক্তি?

—যুক্তি দুই প্রকারের। প্রথম যুক্তি পাই অন্তর থেকে। দ্বিতীয় যুক্তি অর্জন করতে হয়। প্রথম যুক্তি যা অন্তর থেকে পাই তা আল্লাহ নিজেই তার অনুগতদের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেন। আর অর্জিত যুক্তি শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা লাভ করতে হয়।

—চমৎকার। কিন্তু এবার বল, এই যুক্তির অবস্থান কোথায়?

—হৃদয়ে। অবশ্য উৎসাহ আসে মস্তিষ্ক থেকে।

—আমাদের ধর্মের অবশ্য করণীয় কর্তব্য কি কি?

—অবশ্য করণীয় কর্তব্য পাঁচটি। ধর্ম বিশ্বাস—আল্লা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন ঈশ্বর নাই, এবং মহম্মদ আল্লাহর পয়গম্বর। প্রার্থনা। দান। রোজা—রমজান মাসব্যাপী উপবাস। যখন সম্ভব মক্কায় তীর্থ যাত্রা।

—ধর্মের প্রতি প্রশংসণীয় আচরণ কি কি?

—ছয় প্রকার। প্রার্থনা-নামাজ। দান। উপবাস। তীর্থযাত্রা। রিপু দমন, নিষিদ্ধ দ্রব্যবর্জন এবং ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা।

—নামাজের উদ্দেশ্য কি?

—আল্লাহর পায়ে আমার ধর্মের অর্ঘ নিবেদন করা, তার মহিমার গুণকীর্তন করা। এবং আমার আত্মার শান্তি বিধান করা।

—বাঃ বা, চমৎকার—চমৎকার। নামাজের জন্য অপরিহার্য প্রস্তুতির প্রয়োজন নাই?

—নিশ্চয়ই আছে। রুজু দ্বারা সমস্ত দেহ পবিত্র করা দরকার। পরিষ্কার শুদ্ধ বস্তু পরিধান বিধেয়। নামাজের জন্য পরিষ্কার স্থান নির্বাচন করা দরকার। পবিত্র এবং একাগ্র হওয়ার জন্য নাভি থেকে উরুপ্রদেশ পর্যন্ত সুরক্ষা করা প্রয়োজন। পবিত্র কাবার দিকে—অর্থাৎ মক্কার দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে হবে।

—নামাজের আবশ্যকতা কী?

—ধর্ম বিশ্বাসের ভিত সুরক্ষিত করে।

—নামাজে কি লাভ হয়?

—নিখাদ নামাজে পার্থিব কোন লাভ নাই। মানুষ এবং আল্লাহর মধ্যে এক অপার্থিব যোগসূত্র রচনা করে। এর দ্বারা দশটি অলৌকিক ফললাভ হয়: হৃদয় উদ্ভাসিত করে। মুখমণ্ডলে প্রশান্তি আনে। সহানুভূতি জাগ্রত করে। শয়তানকে তাড়িত করে। হৃদয় দয়ার্দ্র হয়। অশুভ অন্তর্হিত হয়। অসুস্থতা প্রতিরোধ করে। শত্রু থেকে রক্ষা করে। টলায়মান চেতনাকে দুর্গ-সুরক্ষিত করে। এবং আত্মা আল্লাহর নিকটবর্তী হয়।

—নামাজের চাবি-কাঠি কী?

—যথাযথ রুজুই নামাজের প্রকৃষ্ট উপায়। এবং রুজু করার আগে মন করুণাঘন ও সহানুভূতিসম্পন্ন করে তোলা দরকার।

—রুজুর বর্ণিত ব্যবহার কিরূপ?

—গোঁড়া ইমাম মহম্মদ ইবন ইদ্রিস অল সফির নির্দেশ ছয় প্রকারের: সৃষ্টিকর্তার পায়ে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য একনিষ্ঠ ইচ্ছা দরকার—এতে আত্মা পবিত্র হয়। প্রথমে মুখমণ্ডল প্রক্ষালন, হাত থেকে কনুই অবধি ধোয়া, মাথার একাংশ ঘর্ষণ করা, পায়ের নখ থেকে গোড়ালী পর্যন্ত ধোয়া, এবং সব কাজই গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে করা।

যখন রুজু শেষ হয়ে যাবে তখন এই সূত্রটি আওড়াতে হবে: আল্লাহ, আমাকে শুদ্ধ, অনুতপ্ত এবং বিশ্বস্ত বলে গ্রহণ কর। আমি জানি আর কেউ নাই, তুমিই একমাত্র আল্লাহ। তুমি আমার আশ্রয়, আমার গুনাহর জন্য তোমার কাছে আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী। আমেন। এই সূত্রটি আমাদের পয়গম্বর আওড়াতে সুপারিশ করেছেন। বলেছেন, এই প্রার্থনা যে করে তার জন্য আমি বেহেস্তের আটটি দরজা উন্মুক্ত করে রাখি। তার খুশি মতো যে কোনও ফটক দিয়ে সে প্রবেশ করতে পারে।

—যথার্থ প্রশংসা পাওয়ার মতো জবাবই বটে। কিন্তু এ কথা কি বলতে পার, যখন একজন মানুষ রুজু করে তখন শয়তান অথবা জীনরা কি করে?

—মানুষ যখন রুজু করতে থাকে তখন জীনরা ডান পাশে এসে দাঁড়ায়। আর শয়তানরা দাঁড়ায় বাঁ পাশে। কিন্তু যখনই আল্লাহর নামে নামাজ প্রস্তুতি সূত্র উচ্চারিত হতে থাকে শয়তান সটকে পড়ে, কিন্তু জীন আরও কাছে সরে আসে। চারদিক থেকে চারটি আলোর মণ্ডপ মাথার উপরে তুলে ধরে। আল্লাহর জয়গান করে এবং মানুষের পাপের ক্ষমার জন্য মধ্যস্থতা করে। যদি সে আল্লাহ নাম উচ্চারণ করতে ভুলে যায় অথবা রুজু করার সময় বাদ পড়ে যায়। শয়তান ফিরে এসে তার উপর চড়াও হয় প্রাণপণে আত্মাকে নিপীড়িত করতে থাকে। সন্দেহর ইঙ্গিত করে। চেতনা প্রশমিত করার আগ্রহ দেখায়।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ চুপ করে বসে থাকে।

দুশো তিয়াত্তরতম রজনীতে আবার সে শুরু করে:

হাফিজা বলতে থাকে, রুজুর সময় প্রত্যেকের উচিত সারা দেহ পানিতে প্রক্ষালন করা। দৃশ্য অথবা অদৃশ্য সমস্ত চুল জলে ভেজানো দরকার। এবং তার যৌন অঙ্গপ্রত্যঙ্গও। সারা শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভালোভাবে ঘষামাজা করা দরকার। এই সব শেষ না হওয়া পর্যন্ত পা ধোয়া উচিত নয়।

—খুব চমৎকার জবাব। আচ্ছা বলতে পার, তায়ামাম প্রথায় কীভাবে রুজু করা হয়?

—তায়ামাম শুদ্ধ বাণী দিয়ে করা হয়। সাতটি উপলক্ষ্যে পয়গম্বর এই বাণী দিয়ে রুজুর বিধান দিয়েছেন। সাতটি উপলক্ষ্য এইরূপ: পানির অভাব, পানি নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা, পানীয় পানির প্রয়োজনে, পানি বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকলে, পানি

ব্যবহারে মারাত্মক ব্যাধির আশঙ্কায়, হাড় ভেঙ্গে যাওয়ার পরে এবং এমন ক্ষত যা স্পর্শ করা নিষেধ। আরও চারটি প্রয়োজনীয় শর্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছে। একান্ত বিশ্বস্ত হওয়া দরকার। বালি অথবা ধুলো হাতে নিয়ে গায়ে মুখে না মেখে মাথার অনুরূপ নকল ভঙ্গী করতে হবে। দুটি রীতি সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। এইভাবে রুজু করার সময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ করবে এবং শরীরের বাঁ পাশের আগে ডান পাশের রুজু শেষ করতে হবে।

—অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। আচ্ছা এবারে রোজা সম্বন্ধে বল।

—রমজান মাসে সূর্যাস্তের আগে আহার, পান, ও মৈথুন থেকে বিরত থাকতে হয়। নতুন চাঁদ যতদিন না দেখা যাবে ততদিন ধরে এই উপবাস পালন করা বিধেয়। আরও ভালো হয় যদি এই রোজার সময় কোরান ছাড়া অন্য কিছু পাঠ এবং অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাকা যায়।

—আপাত দৃষ্টিতে কতকগুলো ব্যাপারে মনে হতে পারে রোজা কলুষিত হয়, কিন্তু শাস্ত্রে বলেছে না তা হয় না—সেগুলো কী?

—চুলে মাথার সুগন্ধী তেল, মলম, কাজল সুর্মা ব্যবহার; রাস্তার নোংরা ধুলোবালী লাগা, থুথু গিলে ফেলা, দিনে অথবা রাত্রে বীর্যপাত; অমুসলমান নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত, রক্তপাত, সহবাস—এর কোনটার দ্বারাই রোজা দূষিত হয় না।

—আত্মিক পলায়ন কাকে বলে?

—শুধুমাত্র উদবাসন, নারী সংসর্গ পরিহার এবং মৌন থাকার জন্য দীর্ঘকাল মসজিদে অবস্থানকে সুন্নীরা আত্মিক পলায়ন বলে। কিন্তু এটা ধর্মসম্মত নয়।

—আচ্ছা এবার তীর্থযাত্রা বিষয়ে বল।

—প্রত্যেক মুসলমানের জীবদ্দশায় অন্তত একবার মক্কায় তীর্থ করতে যাওয়া কর্তব্য। এ ব্যাপারে কতকগুলো শর্ত মেনে চলা কর্তব্য: দরবেশের পোশাক ধারণ করা, নারীদের সঙ্গে কোন ব্যবসায়িক বিষয় পরিহার করা, মস্তক মুণ্ডন করা, নখ কাটা, মস্তক এবং মুখমণ্ডল আবৃত রাখা। সুন্নীরা অবশ্য আরও কতকগুলো বিধি পালন করে।

—এবার পবিত্র যুদ্ধ সম্পর্কে বল।

—বিধর্মী দ্বারা ইসলাম বিপন্ন হলে জেহাদ ঘোষণা করা হয়। এই যুদ্ধ কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য—আক্রমনাত্মক নয়। তখন সাচ্চা মুসলমান অস্ত্রসজ্জিত হয়ে নির্ভয়ে সামনে কদম বাড়াবে—কখনও পলায়ন করবে না।

প্রশ্নকর্তা মনে মনে স্বীকার করলেন, হাফিজার অজানা কিছুই নাই। তবু তাকে বেকায়দায় কী করে ফেলা যায় তার কায়দা ভাঁজতে লাগলেন।

—আচ্ছা বল, রুজু করার ভাষাগত অর্থ কী?

—অন্তরের এবং বাইরের সব মলিনতা প্রক্ষালন করা।

—রোজা শব্দের অর্থ?

—বিরত থাকা।

—দানের অর্থ?

—নিজেকে সমৃদ্ধ করা।

—তীর্থযাত্রী দলে সামিল হওয়া মানে?

—চরম লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যাওয়া।

—যুদ্ধ কাকে বলে?

—নিজেকে রক্ষার জন্য প্রতিরোধ করা।

এবার প্রশ্নকর্তা, প্রশংসায় সোচ্চার হয়ে ওঠেন, ধর্মাবতার এই বাঁদীর অগাধ পাণ্ডিত্য আমাকে হতবাক করে দিচ্ছে।

হাফিজা মৃদু হাসলো, এবার আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।

—বলতে পারেন, ইসলামের বুনিয়াদ কী?

কিছুক্ষণ ভাবলেন তিনি। তারপর বললেন, চারটি বুনিয়াদের ওপর ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে। ধর্ম বিশ্বাস—যা জ্ঞানগর্ভ যুক্তি দ্বারা প্রতিভাত হয়। সাধুতা। কর্তব্য বোধ, ন্যায়পরায়ণতা ও বিচক্ষণতা। এবং সমস্ত অঙ্গীকার পালন।

হাফিজা বলে, আর একটা প্রশ্ন করতে অনুমতি দিন। যদি আপনি এ প্রশ্নের জবাব না দিতে পারেন, তবে, আপনার ঐ শিরোপা খুলে আমাকে দিয়ে দিতে হবে।

—আমি রাজি। কী তোমার প্রশ্ন, বল?

হাফিজার প্রশ্ন, ইসলামের কয়টি শাখা?

অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন সেই কোরান বিশারদ। কিন্তু জবাব দিতে পারলেন না। সুতরাং খলিফা বললেন, হাফিজা তুমি যদি পার, তুমিই আমাদের শুনিয়ে দাও। শিরোপা তোমার পাওনা হলো।

হাফিজা মাথা নত করে খলিফাকে শ্রদ্ধা জানায়।

—ইসলামের কুড়িটি শাখা : শাস্ত্রের কঠোর শিক্ষা, পয়গম্বরের মুখ নিসৃত বাণী নির্দেশ এবং রীতিনীতি পদ্ধতির স্বীকৃতি, অন্যায় অবিচার এড়ানো, মঞ্জুরীকৃত খাদ্য গ্রহণ, কখনও না নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ, শয়তানের শাস্তি বিধান, দুষ্কৃত কর্মের জন্য অনুতাপ, ধর্মজ্ঞান আহরণ, শত্রুর সঙ্গে সহৃদয়তা, বিনয় নম্রতা, আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ, নতুন প্রথা প্রবর্তন ও পরিবর্তন থেকে বিরত থাকা, বাধা বিপত্তিতে সাহস প্রদর্শন এবং পরীক্ষার সময় শক্তি সঞ্চয়, ক্ষমতাবানকে ক্ষমা প্রদর্শন, বিপদে ধৈর্য ধারণ, আল্লাকে উপলব্ধী করা, পয়গম্বরকে জানা, দুষ্টের পরামর্শ প্রতিরোধ করা, ষড়রিপু দমন, পবিত্র আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ।

খলিফা কোরান বিশারদকে বললেন, আপনি পরাজিত, আপনার শিরোপা হাফিজাকে দিয়ে দিন।

তৎক্ষণাৎ তিনি তার শিরোপা হাফিজার সামনে রেখে অবনত মস্তকে সভাকক্ষ ছেড়ে বাইরে চলে গেলেন।

এর পর আর এক বিশারদ উঠে দাঁড়ালেন।

—আমি তোমাকে সামান্য একটা প্রশ্ন করবো। আচ্ছা বল তো, আহার্য গ্রহণের সময় কী কী নিয়ম অনুসরণ করা বিধেয়?

—খেতে বসার আগে হাতমুখ প্রক্ষালন করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা

জানানো অবশ্য কর্তব্য। খানার সময় বাঁদিকে কুঁজো হয়ে বসতে হয়। এবং শুধুমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট, তর্জনী ও মধ্যমার সাহায্যে খাদ্যবস্তু তুলে মুখে পুরতে হয়। খুব ছোট ছোট গ্রাস মুখে নেওয়া উচিৎ। প্রতিটি গ্রাস ভালোভাবে চর্বন করা প্রয়োজন। খাওয়ার সময় অন্য কারো দিকে দৃকপাত করতে নাই বা কে কি ভাবছে এই ভেবে সঙ্কুচিত হতে নাই। এর ফলে ক্ষুধা নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে।

—আচ্ছা বল, খানিকটা কী, অর্ধেকটা কী এবং তুচ্ছাতি তুচ্ছই বা কাকে বলে?

—ধর্মাত্মাই 'খানিকটা', ভণ্ড 'অর্ধেকটা' আর বিধর্মীই 'তুচ্ছাতি-তুচ্ছ'।

—চমৎকার। আচ্ছা বলতে পার বিশ্বাসের সন্ধান কোথায় পাওয়া যায়?

বিশ্বাস চার জায়গায় থাকে : হৃদয়ে, মস্তকে, জিহ্বায় এবং ধর্মানুসারীদের মধ্যে।

—হৃদয় কয় প্রকারের?

—অনেক। তার মধ্যে সাচ্চা মুসলমানের হৃদয় পূতপবিত্র হয়, কিন্তু বিধর্মীর অন্তর ঠিক তার বিপরীত...

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দুশো ছিয়াত্তরতম রাত্রিতে আবার সে শুরু করল :

—কারো কারো অন্তর বিষয় আশয়ে মজে থাকে। আবার বা কারো হৃদয় অপার্থিব আনন্দে মশগুল। কেউবা কামনায় দগ্ধ হয়, ঘৃণা ও লোলুপতা কারো অন্তরে বাসা বাঁধে। কেউ বা অলস হৃদয়, কারো হৃদয় ভালোবাসার আগুনে জ্বলে পুড়ে যায়, কারো অন্তর অহঙ্কারে ভরা, আমাদের পয়গম্বরের উন্মুক্ত হৃদয় আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত। এই হৃদয়ই কাম্য।

হাফিজার জবাব শুনে প্রশ্নকর্তা বিস্ময়ে হতবাক।

—তোমার তুল্য জ্ঞান আমি প্রত্যক্ষ করিনি।

হাফিজা হাসে, আমার কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে। খলিফার দিকে চেয়ে বলে, ধর্মাবতার, আমি এঁকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। যদি তিনি জবাব দিতে না পারেন ওঁর শিরোপা আমাকে খুলে দিতে হবে।

খলিফা হাসলেন, ঠিক আছে, তাই হবে।

—বলতে পারেন, সবচেয়ে আগে কোন্ কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। হয়তো অনেক জরুরী কাজ সামনে আছে—তার থেকে আরও জরুরী কাজ কি মনে হতে পারে?

এ প্রশ্নের জবাব জোগালো না তার মুখে। হাফিজা শিরোপা পেয়ে গেল। তারপর নিজেই সে উত্তর দিল :

ধর্মীয় সব কর্তব্য পালন করার আগে রুজু কর্তব্য সমাধা করতে হবে। ধর্মীয় কর্তব্য সমাধা করতে গেলে প্রথমে দেহ মনের শুদ্ধ

প্রয়োজন।

হাফিজা সমবেত সভাসদদের দিকে দৃষ্টিপাত করলো। সকলেই মুগ্ধ বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সবারই মুখে একই কথা: এ যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত।

এবার আর এক মহা দিগ্‌গজ উঠে দাঁড়ালেন।

—তুমি তো কোরান সম্বন্ধে সবই জান। আমাদের কিছু নমুনা শোনাও, দেখি।

—কোরানে একশো চোদ্দটি অধ্যায় আছে। তার মধ্যে সত্তরটি মক্কায় এবং বাকী চুয়াল্লিশটি মদিনায় রচিত হয়েছিল। এগুলো আবার ছয়শো একুশটা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এদের নাম দশক। ছয় হাজার দুশো ছত্রিশটি স্তবক আছে এতে। সব শুদ্ধ শব্দ সংখ্যা উনআশী হাজার চারশো উনচল্লিশ। তিনলক্ষ তেইশ হাজার ছয়শো সত্তরটি অক্ষরমালায় এই শব্দ সমষ্টি গঠিত।

পঁচিশজন পয়গম্বরের নাম: আদম, নোয়াহ, ইসমাইল, আইজাক, জ্যাকব, জোসেফ, ইলিসা, জোনাহ্‌, লড, সালিহ্‌, হুদ, সুয়াইব, ডেভিড, সোলোমন, ধুল-কাফ্ল, ইদ্রিস, ইলিয়াস, ইয়াহিয়া, জ্যাকারিয়াস্‌, জোব, মোসেস, আরুন, জেসাস এবং মহম্মদ।

—ঠিক বলেছ। এবারে বল, আমাদের পয়গম্বর কিভাবে বিধর্মীর বিচার করেছেন।

—তিনি বলেছেন, ইহুদীরা বলে খ্রীস্টানরা ভুল, আর খ্রীস্টানরা বলে ইহুদীরা ঠিক নয়। বলতে গেলে ওরা দুজনই ঠিক কথা বলে।

এই সময়ে রজনী অতিক্রান্ত হতে থাকে। শাহরাজাদ চুপ করে বসে রইলো।

দুশো আটাত্তর রজনীতে আবার সে বলতে থাকে:

প্রশ্নকর্তা এবারে উল্লসিত কণ্ঠে বলেন, ধর্মাবতার এই অসামান্য মহিলার পাণ্ডিত্যের তুলনা নাই।

হাফিজা বললো, আমি এবারে একটা প্রশ্ন করবো। বলুন তো কোরানের কোন স্তবকে কাফ অক্ষরটি তেইশবার আছে। মিম ষোলবার এর আর একটা অক্ষর চল্লিশবার আছে?

এ প্রশ্নের তিনি উত্তর দিতে পারলেন না। হাফিজা তখন তাঁর শিরোপা দাবি করে বললো, আমি বলে দিচ্ছি।

খলিফা উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, সারা দেশের মধ্যে হাফিজা শ্রেষ্ঠ গুণী। তার সমকক্ষ আর কেউ নাই।

হাফিজাকে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ইনাম দিলেন খলিফা। দশটি থলেয় ভরে এই মোহরগুলো আবু অল হুসনর হাতে তুলে দেওয়া হলো।

খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, হাফিজা তুমি কি আমার হারেমে যেতে চাও? সেখানে তোমাকে বাদশাহী মর্যাদায় রাখতে পারি আমি। অথবা তুমি এই যুবকের সঙ্গেও যেতে পার।

হাফিজা আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানায়। খোদা মেহেরবান,

তিনি আপনার মঙ্গল করুন, আপনার বাঁদী এই যুবকের সঙ্গে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে যেতে চায়।

এ কথায় খলিফা অসন্তুষ্ট হলেন না। বরং খুশি হয়ে বললেন, আমি তোমাকে আরও পাঁচশো দিনার উপহার দিচ্ছি। তোমাদের ভালোবাসার কাছে আমার প্রাসাদের এই ভোগবিলাস যে তুচ্ছ, তা জেনে আমি মুগ্ধ হলাম, হাফিজা। আমি তোমার ভালোবাসা আবু অল হুসনকে আজ থেকে আমার দরবারের এক উচ্চ পদে বহাল করলাম।

এর পর ওরা দুজনে সভাগৃহ ছেড়ে চলে গেল। হাফিজা নিল সেই শিরোপাগুলো আর আবু অল হুসন নিয়ে চললো সেই মোহরের থলেগুলো।

সভাকক্ষের সমবেত সকলে বিপুল হর্ষধ্বনী দিয়ে ওঠে, আব্বাসের বংশধরের এই মহানুভবতার তুলনা সারা বিশ্বে কোথাও খুঁজে পাবে না কেউ।

শাহরাজাদ বললো, তারপর খলিফার হুকুমে হাফিজার এই গুণকীর্তন লিপিবন্ধ করে রাখা হলো।

শাহরাজাদ থামলো। শাহারিয়ার বাহবা দিয়ে বলে, তোফা? কিন্তু এবার তো তোমাকে আবু নসাবের কাহিনী শোনাতে হবে শাহরাজাদ?

—বেশ তো শোনাচ্ছি।

এতক্ষণ দুনিয়াজাদ আধা-ঘুমে ঢুলছিল। এই সব তত্ত্ব-কথা তার ভালো লাগবে কি করে? আবু নসাবের নাম কানে ঢুকতেই সে সোজা হয়ে বসলো।

একদিন রাতে খলিফা হারুন অল রসিদের চোখে আর কিছুতেই ঘুম আসে না। অবশেষে তিনি একাই প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে তিনি তার বাগানে এসে উপস্থিত হন। দেখতে পেলেন, বাগান-সন্নিহিত তার হাবেলীতে আলো জ্বলছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যান তিনি। দরজা খোলা। পর্দা ঝুলছে। বাইরে খোঁজাটা নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। অতি সন্তর্পণে খোজাটাকে ডিঙিয়ে খলিফা ঘরের ভিতরে ঢুকলেন।

এক পাশে একটি পর্দাঘেরা পালঙ্ক। পালঙ্কের দুই দিকে দুটি ঝুলন্ত ঝাড়বাতি। মাথার দিকে ছোট্ট একটা মেজ। তারপর একটা সোনার তৈরি সরাবের ঝারি। ঝারির মুখ একটি সোনার পেয়ালায় ঢাকা।

হারুন অল রসিদ অবাক হয়ে দেখতে থাকেন। তার হাবেলীর ঘরে এই সব কাণ্ডকারখানা চলছে—তিনি ভাবতেও পারেন না। পালঙ্কের পর্দা তুলতে খলিফা আরও অবাক হলেন। এ কি? অসামান্য রূপলাবণ্যবতী এক ডানাকাটা পরি—অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

হারুন অল রসিদ সরাব ঢাললেন। আস্তে আস্তে পেয়ালাটা শেষও করলেন। মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে থাকলেন, কী করে কোথা থেকে এল এই সুন্দরী? মেয়েটির কপালে হাত রাখেন খলিফা।

চোখ মেলে তাকালো সে। এক মুহূর্ত। খলিফাকে চিনতে পেরেই ধড়মড় করে উঠে বসে সে। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে কাঁপতে লাগলো। খলিফা হাসলেন, ভয় কী? ঠিক হয়ে বস।

মেয়েটি তবু নিজেকে সহজ করতে পারে না। কোন রকমে বেশবাস সংবৃত করে সরে গিয়ে এক কোণায় বসে।

খলিফা বললেন, পাশে তানপুরা দেখছি, তুমি গাইতে জান?

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে জানায়—হ্যাঁ, জানে।

খলিফা বললেন, যদিও জানি না, তুমি কে, কেনই বা এখানে এসেছ, তবু, থাক সে-সব পরিচয়, আজ সারা রাত তোমার গান শুনে কাটাবো, শোনাবে?

মেয়েটি তানপুরা হাতে তুলে নেয়। তারে টঙ্কার দিয়ে সুর তোলে। কণ্ঠ গুনগুনিয়ে ওঠে। অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠ। খলিফা তন্ময় হয়ে শোনেন। এক এক করে একুশটা রাগরাগিণী গাইলো সে।

এক অনাবিল আনন্দে খলিফার মনপ্রাণ ভরে গেছে। এবার বুকে সাহস নিয়ে মেয়েটি বলে, ধর্মাবতার আজ আমি ভাগ্যদোষে এই নির্জন-পুরীতে নির্বাসিত হয়ে আছি।

খলিফা অবাক হয়ে বলেন, কেন? কী ব্যাপার?

—আপনার পুত্র, অল আমিন কয়েকদিন আগে আমাকে বাঁদীবাজার থেকে দশ হাজার দিনার দিয়ে কিনে এনেছেন। আমাকে শোনানো হয়েছিল, ধর্মাবতারকে ভেট দেবার জন্যই নাকি তিনি আমাকে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু আমার নসীব মন্দ, খাস বেগম জুবেদা এই ব্যাপারটা সুনজরে দেখলেন না। তিনি একটা নিগ্রো খোজাকে সঙ্গে দিয়ে আমাকে এই নির্জনপুরীতে পাঠিয়ে দিলেন। খোজাকে তিনি হুকুম করেছেন, এখানে যেন আমাকে বন্দী করে রাখা হয়।

মেয়েটির কথা শুনে খলিফা ক্রোধান্বিত হন।—এ ভারি অন্যায়। যাই হোক, তুমি দুঃখ করো না সুন্দরী, আমি তোমার জন্য আলাদা একটা প্রাসাদের বন্দোবস্ত করে দেব। সেখানে তুমি দাসী-বাঁদী নিয়ে স্বাধীনভাবে থাকতে পারবে। আমি তোমার মোটা মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

গানের আওয়াজে খোজাটার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। কোরবানীর খাসীর মতো সে দাঁড়িয়েছিল দরজার পাশে। খলিফা বললেন, যা, খুব চটপট কবি সাহেব আবু নসাবকে তল্লাস করে ডেকে নিয়ে আয়।

আপনারা শুনে রাখুন, খলিফার মাথায় যখনই কোন দুষ্টু বুদ্ধি আসে, তিনি আবু নসাবের খোঁজ করেন।

খোজা আবু নসাবের বাড়ি ছুটে যায়। কিন্তু ঐ গভীর রাতে—তখনও সে বাড়ি ফেরেনি। বাগদাদের সমস্ত গাঁজা-ভাঙের আড্ডায় হানা দিতে দিতে সবুজ দরজার কাছে এক তাড়িখানায় তাকে পেল সে।

খোজা বলে, জাঁহাপনা আপনাকে তলব করেছেন। এখুনি যেতে হবে। চলুন।

মদে চুর আবু নসাব কোনরকমে বলতে পারে, সে কি করে হবে বাবা, একটা ছেলের কাছে আমার এই দেহটা যে বন্ধক দিয়ে দিয়েছি, খোজা

সাহেব। ও না ছাড়লে যাই কী করে?

খোজা ঠিক বুঝতে পারে না। সোনা-দানা সওদাপত্র বাঁধা দেওয়া যায়, কিন্তু নিজের দেহটাও বন্ধক দেওয়া চলে নাকি?

—ব্যাপারটা তো বুঝতে পারলাম না, কবি সাহেব?

কবি হো হো করে হাসতে লাগলো, পারলে না, একটুও বুঝতে পারলে না, খোজা বাবা? ছেলেটা খুবই কচি, এখনও গোঁফ দাড়ি গজায়নি, লম্বা ছিপছিপে। একেবারে লালটুস্। আমি তাকে বলেছিলাম এক হাজার দিরহাম দেব। কিন্তু আগে খেয়াল হয়নি—আমার কাছে টাকা পয়সা কিছু ছিল না। তাই, টাকা না পেলে সে তো আমাকে ছাড়বে না?

—ইয়া আল্লাহ, খোজা অসহায়ের মতো আর্তনাদ করে ওঠে, কোথায় সে ছেলে?

এই সময়ে ছেলেটি এসে দরজার সামনে দাঁড়ালো। আবু নসাব উল্লাসে ফেটে পড়ে, ঐ তো এসেছে, সোনারচাঁদ।

সোনার চাঁদই বটে। অপূর্ব সুন্দর তার চেহারা। আর অপূর্ব সাজে সেজেছে সে। ছেলেটির মুখে মিষ্টি হাসি। কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো সে।

খোজা হাভেলীতে ফিরে এসে খলিফাকে জানাল; আবু নসাব, একটা তাড়িখানায় নেশা করে চুর হয়ে পড়ে আছে। সেখান থেকে আসার তার উপায় নাই। একটি বাচ্চা ছেলেকে টাকা দেবে বলেছিল, কিন্তু দিতে পারে নি। তাই সে নিজেকেই বাঁধা দিয়েছে তার কাছে।

খলিফা মজাও পেলেন, ক্রুদ্ধও হলেন। খোজার হাতে এক হাজার দিরহাম দিয়ে বললেন, ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে আয়। যা, ছুটে যাবি, আর দৌড়ে আসবি।

খোজা দ্রুত পায়ে তাড়িখানায় গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে।

আবু নসাবকে দেখে খলিফা হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন, তোমার লজ্জা করে না, বেহেড মাতাল হয়ে তাড়িখানায় পড়ে থাকতে?

আবু নসাব কিন্তু খলিফার এই ক্রোধে বিচলিত হয় না। দাঁত বের করে হাসে।—বাঃ, মেয়েটা তো বেড়ে জোগাড় করেছেন, জাঁহাপনা।

আবু নসাব মেয়েটির গা ঘেঁষে বসে পড়ে। মেয়েটি খলিফাকে এক পেয়ালা মদ ঢেলে দিল। খলিফা গম্ভীর মুখে নসাবকে বলে, নাও, চুমুক দাও।

আবু নসাব দ্বিধা না করে মদের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে সাবাড় করে দেয়। মদের ক্রিয়া করবেই, আবু নসাব টাল সামলাতে না পেরে টলতে টলতে পড়ে যায়। খলিফা তলোয়ার বের করে বাগিয়ে ধরেন—ভাবখানা, এক কোপে নসাবের মুণ্ডুটা নামিয়ে দেবেন। আবু নসাব ভয়ে ছিটকে সরে যায়। কিন্তু খলিফাও ঘাবড়াবার পাত্র নন, নসাবকে তাড়া করতে করতে ঘরময় এদিক ওদিক ছুটাছুটি করেন। কিন্তু নসাব, মাতাল হলে কি হল, তালে ঠিক ছিল, খলিফার তলোয়ার বাঁচিয়ে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত লুকোচুরি খেলতে থাকে। শেষে খলিফা ক্লান্ত হয়ে বলে, ঢের হয়েছে, এবার এস, আর এক পাত্র চড়িয়ে নাও, নেশা তো সব পানি

হয়ে গেছে।

আবু নসাব খলিফাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না। সে টুক করে মেয়েটির পিছনে এসে লুকিয়ে পড়ে। খলিফা তলোয়ারখানা রেখে মুচকি হেসে বলেন, এবার থেকে তোমাকে আমি একটা নতুন চাকরীতে বহাল করবো, নসাব। তুমি হবে বাগদাদের মেয়েমানুষের দালাল-দের সর্দার।

আবু নসাব ঠোঁট কাটা। ভয় ডর কিছু নাই। বলে, জাঁহাপনা দালালীটা আজ থেকেই পাবো তো?

—কেন?

—বাঃ, এমন খুব সুরৎ মেয়েমানুষ নিয়ে রাত কাটাবেন। দালালী দেবেন না?

খলিফা রাগে থর থর করে কাঁপতে থাকেন। খোজাকে হুকুম করেন, এই—মাসরুরকে ডেকে নিয়ে আয়। আজ আমি এর গর্দান নেব।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চুপ করে বসে থাকে।

দু'শো নব্বইতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে :

মাসরুর এসে কুর্নিশ জানালো। খলিফা বললেন, এই বেয়াদপকে উলঙ্গ কর। গাধার জীনের রেকাবীর সঙ্গে রসি দিয়ে বেঁধে ওকে শহর ঘুরিয়ে নিয়ে এস। তারপর সকালবেলা শহরের সিংহ দরজায় সকলের সামনে এর গর্দান নেবে।

মাসরুর সারা রাত ধরে সুলতানের হুকুম তামিল করে নসাবকে শহরের সদর ফটকে নিয়ে আসে। শহরবাসীরা দলে দলে এসে জড়ো হতে থাকে। আহা বেচারা! লোকটা বড় রসিক ছিল। সুলতানের কোপে পড়ে আজ প্রাণ হারাতে হবে।

উজির জাফর অল বারমাকী প্রাসাদে যাওয়ার পথে জনতার ভিড় দেখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার? কী হয়েছে, এত জমায়েত কেন?

কে যেন বললো, সভাকবি আবু নসাবের গর্দান নেওয়া হবে।

জাফর ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখে, সত্যিই তাই। জাফর জিজ্ঞেস করে আবু নসাব, কী ব্যাপার? কী করেছ? এ দশা কেন?

আবু নসাব বলে, আল্লাহ সাক্ষী, কোনও দোষ করিনি আমি। এমন কি কবিতা শুনিয়ে খলিফাকে এইসা মাতিয়ে দিয়েছি যে খুশি হয়ে তিনি আমাকে তার গায়ের বাদশাহী সাজপোশাক ইনাম দিয়েছেন।

খলিফা কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। নসাবের কথা শুনে হো হো করে হাসতে লাগলেন। নসাবকে তিনি শুধু ক্ষমাই করলেন না, সত্যিই নিজের অঙ্গের পোশাক খুলে পুরস্কার দিলেন।

শাহরাজাদ গল্প থামাতে দুনিয়াজাদ হেসে গড়িয়ে পড়লো।—কী মজার গল্প, দিদি। আর একটা আবু নসাবের গল্প বল না।

সুলতান শারিয়ার বাধা দিয়ে বলে ওঠে, না না, ঐ সব ফচ্‌কে গল্প আর না। এবার তুমি রোমাঞ্চকর কিছু একটা শোনাও।

শাহরাজাদ বললো, ঠিক আছে এবার সিন্দবাদ-এর সমুদ্রযাত্রার কাহিনী শোনাচ্ছি।

খলিফা হারুন অল রসিদের সময়ে বাগদাদে সিন্দবাদ নামে দরিদ্র কুলি বাস করতো। অন্যের মোট বয়ে কোনক্রমে তার দিন যেতো।

একদিন সে দারুণ গ্রীষ্মের খরতাপে দগ্ধ হয়ে পেল্লাই ভারি মোট মাথায় করে নিয়ে চলছিল। ঘামে সারা শরীর নেয়ে যাচ্ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে এক বিরাট সওদাগরের বাড়ির ফটকের সামনে এসে থামল। পা আর চলতে চায় না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কাছেই একটা রোয়াকের ওপর মোটটা নামিয়ে সে বসে পড়লো।

মনে হয় একটু আগেই ফটকের সামনেটায় কেউ গোলাপ জল ঢেলে দিয়ে গেছে। মৃদুমন্দ হাওয়ায় গোলাপ জলের মনমাতানো সুবাস বড় মধুর লাগে। সিন্দবাদের সকল ক্লান্তি কেটে যায়। প্রাণ ভরে সে গোলাপের গন্ধ আঘ্রাণ করতে থাকে।

কান পাতলে শোনা যায়, সওদাগরের বাড়ির অন্দর থেকে অপূর্ব মিষ্টি গানের কলি ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে তানপুরার সুমধুর তান। সিন্দবাদ ফটকের ফাঁকে মাথাটা ঝুকিয়ে দৃষ্টিপাত করে। একটা বিরাট বাগিচা। ঝকঝকে তকতকে। কত বিচিত্র নানা বর্ণের বাহারী সব ফুল। দুচোখ জুড়িয়ে যায়। এমন সাজানো গোছানো বাগান সে বড় একটা দেখেনি। সাধারণ লোকের কথা দূরে থাক, অনেক সুলতান বাদশাহের বাগিচাও এমন সুন্দর হয় না।

এতক্ষণে সে বুঝতে পারলো, গুলাবের সুবাস কোথা থেকে আসছে। মৃদুমন্দ সমীরণে চারদিক সুগন্ধে মদির হয়ে গেছে। সিন্দবাদ এই প্রথম অনুভব করতে পারে, জীবনে কত গান আছে, কত ফুল আছে, কত রূপ আছে কত গন্ধ আছে। কিন্তু সে-সব তার জন্য নয়। এই গান এই ফুল, এই গন্ধ তাদের মতো দরিদ্রের জন্য নয়। ধনীর দুলাল হয়ে জন্মালে তবেই এই সব ভোগ করার অধিকার থাকে। সিন্দবাদ ভাবতে থাকে, প্রতিদিন প্রতি নিয়ত আমি ধনীর মোট বয়ে বেড়াই। কত সোনা দানা হীরে জহরৎ বয়ে নিয়ে যাই বিত্তবানের বাড়ি কিন্তু, হায় আমার নসীব, কয়েকটা দিরহাম ছাড়া, সে-সব আমি চোখেও দেখতে পাই না। সেইসব ধনরত্ন বিলাসের সামগ্রী যারা ভোগ করে তারা তো ভিন্ন গোত্রের মানুষ। বিলাস ব্যসন তাদের জন্মগত অধিকার। আমি মোট বয়ে চলি।

এই তো, আজও, যে মোটের অত্যধিক ভারে আমি ঘর্মাক্ত ক্লান্ত এবং নুব্জ্য হয়ে এখনে বসে পড়তে বাধ্য হয়েছিলাম, জানি, এর মধ্যে যে আনন্দ বিলাসের উপকরণ আছে, তাতে বহুজন বিত্তের বিবিধ বিনোদন হতে পারবে।

মনের দুঃখে গান ধরে। সে-গানে হৃদয়ের সকল ব্যথা বঞ্চনা গলে গলে ঝরতে থাকে। অনেকক্ষণ জিরিয়ে শরীর এবং মন বেশ জুড়িয়ে গেছে।

মোটটা মাথায় তুলে আবার সে যাত্রা করতে উদ্যত হয়েছে—এমন সময় ফটকটা খুলে গেল। একটি ছোট্ট বান্দা বেরিয়ে এল। মুখে বেশ মিষ্টি হাসি। কোন রকম ভূমিকা না করে সিন্দবাদের একটা হাত ধরে সে টানে, আমার মালিক তোমাকে ডাকছে, চল।

সিন্দবাদ অবাক হয়, ভয়ও পায়। না যাওয়ার ছুতো খুঁজতে থাকে। যাহোক একটা কিছু বলে ছেলেটাকে বোঝাতে হবে তো। কিন্তু ভেবে পায় না, কি বলবে। ছেলেটা আবার হাত ধরে টানে, চল না, আমার মালিক তোমার সঙ্গে কথা বলবে।

ছেলেটি একেবারে নাছোড় বান্দা। সিন্দবাদ বলে, কিন্তু আমার এই মোট? এটা কোথায় রেখে যাবো?

ছেলেটি বলে, সে তুমি কিছু ভেবো না। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ফটকে পাহারা আছে না? পাহারাওলার কাছে রেখে, চল। ভয় নাই, কেউ কিচ্ছু নেবে না।

পাহারাওলার কাছে মোটটা গচ্ছিত রেখে সিন্দবাদ খুদে বান্দাটার পিছনে পিছনে চলে।

সুরম্য ইমারৎ। ঝকঝকে তকতকে সাজানো গোছানো। ছেলেটি তাকে এক বিশাল কক্ষে নিয়ে গেল। খানদানী ঘরের অতিথি অভ্যাগত সমবেত হয়েছে। ঘরময় হরেক রকম নাম-না-জানা ফুলের সৌকি সমারোহ—প্রাণমন ভরে যায়। আর আতর গোলাপজলের মিষ্টি গন্ধে মাতাল করে হৃদয়। বিরাট লম্বা মেজ-এ চিকনের কাজ করা দুগ্ধ ফেননিভ চাদর বিছানো। তার ওপর থরে থরে সাজানো খানাপিনা—পেস্তার বরফী, গাজরের শাহী হালওয়া, দুষ্প্রাপ্য ফল, ইত্যাদি। অসংখ্য রুপোর রেকাবীতে ভরা ঝলসানো দুম্বার মাংস, মুরগীর দোপিঁয়াজী, বটি কাবাব, টিকিয়া ইত্যাদি। আর একধারে সরাবদানীতে ভরা দামী আঙ্গুরের মদ। একদল বান্দারা সেজেগুজে অপেক্ষমান। আর এক দিকে সুন্দরী বাঁদীরা নানারকম বাদ্য-যন্ত্র হাতে নিয়ে বসে আছে।

সিন্দবাদ মুগ্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এযে একেবারে বেহেস্ত। এখানে যারা সমবেত তারা নাকি এই দুনিয়ার কোন নরনারী, না—বেহেস্তের জীন পরী? উপস্থিত সকলে তাকে স্বাগত জানায়। সিন্দবাদ এক পাশে গিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে।

সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ একজন তাকে কাছে ডাকে। আদর করে পাশে বসায়।

বান্দাদের একজনকে খানা দিতে বলে। সিন্দবাদের সামনে রেকাবী ভর্তি খাবার সাজিয়ে দেওয়া হয়। বৃদ্ধ বলে, হাত-মুখ ধুয়ে আগে খানা সেরে নাও, তারপর তোমার সঙ্গে কথা হবে।

সিন্দবাদ সুবোধ বালকের মতো খানাপিনা সারে। বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হয়ে বলে, একটু আয়েস করে বস। আচ্ছা বেটা, তোমার নাম কী? কী কর তুমি?

—আমার নাম সিন্দবাদ কুলি। আমি ভারি ভারি মোট বয়ে রুটির পয়সা রোজগার করি।

বৃদ্ধ হাসলেন। শিশুর মতো সরল হাসি। বললেন, আরে, কী আশ্চর্য, তোমার নাম আর আমার নাম যে এক। তুমি সিন্দবাদ কুলি, আর আমার নাম সিন্দবাদ নাবিক...আমি তোমাকে ডেকেছি তোমার সুন্দর মিষ্টি গান শুনে। আমার ইচ্ছা, এখানে তুমি আমাদের দু-একখানা গান শোনাও।

সিন্দবাদ কেমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। —আল্লাহর দোহাই, আমার ঐ দুঃখের গান শুনে আমাকে দোষারোপ করবেন না।

সিন্দবাদ নাবিক বললো, কেন, দোষারোপ করবো কেন? আর তোমারও কুণ্ঠিত হওয়ার কোনও করণ নাই। গলা ছেড়ে প্রাণ খুলে গাইবে। তাতে কার কী মনে করার থাকতে পারে। এখানে তোমার লজ্জা সঙ্কোচ করার কিচ্ছু দরকার নাই। তুমি আমার ছোট ভাই-এর মতো। ঐ যে গানগুলো গাইছিলে না? সেইগুলোই আবার শোনাও।

সিন্দবাদ আবার গাইলো গানগুলো। সিন্দবাদ নাবিক তো মহাখুশি।

আমার ভাগ্যও বড় বিচিত্র। তোমাকে বলবো সেই কাহিনী। তাহলে বুঝতে পারবে, কী নিদারুণ উত্থান পতন আর অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আজ আমি এই অতুল ঐশ্বর্যের মালিক হয়েছি। কী অমানুষিক কঠোর পরিশ্রম ধৈর্য তিতিক্ষার ফলশ্রুতি এই বিত্ত তা আমার কাহিনী না শুনলে উপলব্ধি করতে পারবে না। কত বিপর্যয় কত দুর্ভাগ্য আর কত দুঃসাহসিকতা জড়িয়ে আছে এই সাফল্যের পিছনে তা কল্পনা করতে পারবে না। আমি পরপর সাতবার অসাধারণ সমুদ্রযাত্রা করেছি—তার যে-কোন একটা কাহিনী শুনলে মানুষ হতবাক হয়ে যাবে। তোমাকে আমি সবগুলোই শোনাব।

বৃদ্ধ সিন্দবাদ নাবিক বলতে শুরু করে:

এখানে, আমার মহামান্য মেহেমানরা,—যাঁরা উপস্থিত আছেন, এবং আমার এই নতুন মিতা—সবাই শুনুন। আমার বাবা ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত সওদাগর। গরীবদের প্রতি তার দরদ ছিল অসীম। দু হাতে তাদের জন্য খরচ করতেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর পর আমি যথেষ্টই পেলাম। টাকা-পয়সা, জমি-জমা—প্রচুর রেখে গিয়েছিলেন তিনি। আমি তখন নাবালক। সুতরাং অছি হিসাবে আমার এক আত্মীয় আমার বিষয় আশয় দেখাশুনা করতো।

যখন আমি সাবালক হলাম, আমার বিষয় সম্পত্তি আমি নিজের হাতে ফিরে পেলাম। হঠাৎ কাঁচা বয়সে প্রচুর পয়সা হাতে পেয়ে আমার ভোগ বিলাসের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। ইয়ার বন্ধুদের সংখ্যাও দিনদিনই বাড়তে লাগলো। প্রতিদিন দামী দামী মদ আর মাংসের মহোৎসব চলতে থাকলো। মূল্যবান সাজপোশাক পরে ফূর্তি মেরে আর কাব্য করে দিন কাটাই। এইভাবে অনেক দিনই চললো। তারপর হঠাৎ একদিন দেখলাম, বিষয়-সম্পত্তি বলতে আর তেমন কিছুই অবশিষ্ট নাই আমার। যা আছে, বলতে গেলে, নগণ্য। আমি ভয়ে শিউরে উঠলাম। জীবনে বাকী দিনগুলো কি

নিদারুণ কষ্টেই আমার কাটবে। পয়গম্বর সুলেমান ইবন দাউদ-এর একটা বাণী মনে পড়লো। —আমার বাবা প্রায়ই এই কথাগুলো আওড়াতেন : 'জন্মের মুহূর্তের চেয়ে মৃত্যুর মুহূর্ত অনেক ভালো। জীয়ন্ত কুকুর মৃত সিংহের চেয়ে সেরা। দারিদ্র্যের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।'

সুতরাং আর. কাল বিলম্ব না করে আমার যা কিছু কিঞ্চিৎ বিষয়-সম্পত্তি তখনও অবশিষ্ট ছিল কোনদিকে দৃকপাত না করে প্রায় জলের দরেই বেচে দিলাম। সর্বসাকুল্যে মাত্র তিন হাজার দিরহাম পেলাম।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দুশো বিরানব্বই রজনীতে আবার সে বলতে থাকে :

বৃদ্ধ সিন্দবাদ নাবিক তার কাহিনী বলছে :

এই মাত্র তিন হাজার দিরহাম সম্বল করে আমি বিদেশ যাত্রা করবো মনস্থ করলাম।

বাজারে গিয়ে নানা ধরনের বাহারী জিনিসপত্র সওদা করে একটা গাঁটরী বাঁধলাম। নিজেই মাথায় করে বন্দরে নিয়ে গেলাম। ঐ সময়ই একখানা জাহাজ ছাড়ছিল—আর কোনও কিছু না ভেবে জাহাজে চেপে বসলাম। দেখলাম, আরও অনেক সওদাগর চলেছে সেই জাহাজে। আমাদের জাহাজ বাগদাদের বন্দর ছেড়ে বসরাহর দিকে এগিয়ে চললো।

বসরাহ ছেড়ে আবার জাহাজ চলতে থাকে। দিনের পর দিন সমুদ্র যাত্রা করে চলেছি আমরা। এক এক করে অনেক দ্বীপ আসে। তাদের পিছনে ফেলে আমরা আবার এগিয়ে চলি। ক্লান্তিহীন বিরামহীন আমাদের এই সমুদ্র যাত্রা। কবে শেষ হবে কে জানে। প্রতি বন্দরেই জাহাজের ভিড়ে। আমরা সওদা ফিরি করে ফিরি। কিছু কিছু বিক্রিও হয়।

কয়েক সপ্তাহ ধরে একটানা সমুদ্র যাত্রার পর একদিন এক দ্বীপের নিশানা দেখতে পেলাম। গাছপালায় ভর্তি, শস্য শ্যামল প্রান্তর—শুধু সবুজের মেলা। কি মনোহর দৃশ্যাবলী—বেহেস্তের উদ্যানের শোভার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কাপ্তেন এই দ্বীপে জাহাজ নোঙর করলো। যাত্রীরা সকলে নেমে পড়লো।

আমরা সব সওদাগরই এক সঙ্গে নামলাম। খানা পাকাবার সাজ-সরঞ্জাম এবং ডাল আটা ঘি সঙ্গে নিলাম। একটা গাছের তলায় উনুন জ্বালানো হলো। কেউ তরকারি কাটে, কেউ বাঁটনা বাঁটে, কেউ বা কাপড় পরিষ্কার করতে লেগে গেল। কেউ বা এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে। কেউ বা গাছতলায় পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমায়। আমার কিন্তু নাওয়া খাওয়ার দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। আমি শুধু প্রকৃতির মনোহর শোভা দেখে আকুল। চোখ আর ফেরাতে পারি না। কি অপূর্ব বনরাজিনীলা।

সবাই আমরা যখন শত কর্মে রত, এমন সময় হঠাৎ সারা দ্বীপটা ভীষণ আন্দোলিত হয়ে কেঁপে উঠলো। কে কোথায় যে কীভাবে ছিটকে পড়লো বুঝতে পারলাম না। শুধু শুনতে পেলাম, কাপ্তেনের চিৎকার—যে যেখানে আছ, জাহাজে ফিরে এস। এটা কোনও দ্বীপ নয়। বিরাট একটা

তিমি মাছের পিঠ। বহু যুগ ধরে সে এই সমুদ্রের মাঝখানে ঘুমাচ্ছে। তাই কালক্রমে তার পিঠে পলি জমেছে। আর এই পলি মাটিতে গজিয়েছে লতা-গুল্ম বৃক্ষ। তোমরা আগুন জ্বালিয়ে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছ। আগুনের উত্তাপে যন্ত্রণা পেয়েছে, তাই মোচড় দিয়ে উঠেছে সে। এবার সে চলতে শুরু করেছে। তোমরা আর দেরি করো না—শিগ্গির জাহাজে পালিয়ে এস। এখুনি হয়তো ডুব দিয়ে সমুদ্রের নিচে তলিয়ে যাবে।

কাপ্তেনের চিৎকারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে হাঁড়িকুড়ি বাসন, খানাপিনা জামা-কাপড় সব ফেলে রেখে জাহাজের দিকে ছুটে এল সবাই। কাপ্তেন ততক্ষণে নোঙর তোলার হুকুম দিয়ে দিয়েছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জাহাজ ছেড়ে দেওয়া হলো। ঐ সময়ের মধ্যে যারা পারলো, হুড়পাড় করে জাহাজের পাটাতনে উঠে পড়লো, আর যারা দেরি করলো, তারা আর সে সুযোগ পেল না। তিমিটা ততক্ষণে আড়মোড়া ভেঙ্গে বার তিনেক প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে সমুদ্রের গভীরে তলিয়ে গেল।

যে সব হতভাগ্যরা সময়মতো জাহাজে উঠতে পারলো না আমি তাদের একজন। কিন্তু আল্লা আমাকে সমুদ্রের গহন গহ্বরে তলিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করলেন। ভাসমান এক খণ্ড ফাঁপা কাঠের গুঁড়ি সামনে দেখে আঁকড়ে ধরলাম। এই কাঠের পাটে কিছুক্ষণ আগে আমার সহযাত্রীরা তাদের কাপড়-চোপড় আছাড় দিয়ে কাচছিল। বহুকায়ক্লেশে, অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করার পর, গুঁড়িটার উপরে উঠে বসতে পারলাম। ভারসাম্য যাতে বজায় থাকে সেইভাবে গুঁড়ির মাঝখানে নিজের দেহটাকে ঠিক করে বসিয়ে দুই পা জলে ডুবিয়ে দাঁড় কাটতে থাকলাম। এইভাবে কিছুদূর হয়তো অতিক্রম করা গেল কিন্তু হঠাৎ একটা উত্তাল ঢেউ এসে আবার আমাকে কোথায় যে ভাসিয়ে নিয়ে গেল কিছুই হদিস পেলাম না।

এদিকে, তখনও বেশ দেখতে পাচ্ছি, আমাদের জাহাজে পাল তোলা হচ্ছে। আমি চিৎকার করতে থাকলাম। কিন্তু আমার কণ্ঠস্বর অতদূর অবধি পেঁছল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই পালে হাওয়া লাগলো। নিমেষে আমার নজর থেকে জাহাজখানা অদৃশ্য হয়ে গেল। এদিকে রাত্রির কালো ছায়া নেমে আসে। ঐ নিঃসীম নির্জন নীল সমুদ্রের অন্ধকার কারাগারে আমি তখন এক প্রাণদণ্ডের আসামী। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। তিনিই একমাত্র ভরসা ভেবে সেই কাঠের পাটাতনে পা গুটিয়ে চুপ-চাপ বসে বসে রাত্রি আর মৃত্যুর প্রহর গুণতে থাকলাম। কিন্তু না, মরিনি। অন্ধকার কেটে গেল, সকাল হলো, সূর্যদয়ের পূর্বাভাষে সমুদ্র সন্নিহিত নীলাকাশ রক্তবর্ণ ধারণ করলো। আমি তাঁর উদ্দেশে প্রণতি জানালাম।

আবার শুরু হলো আমার পদ-সঞ্চালন। পায়ের দাঁড়ে জল কেটে পাড়ি জমাবার সে-এক দুরন্ত ছেলেমানুষী প্রয়াস। ঘটি ঘটি জল তুলে সমুদ্র শোষণ করা—আর কি। যাইহোক, আমার আকুল আকুতি বুঝি তিনি বুঝেছিলেন। তাই, বেলা বাড়তেই বায়ুবেগও বাড়তে থাকলো। হাওয়ার ঠেলায় আর ঢেউ-এর ধাক্কায় তরতর করে তীরের দিকে ভেসে চললাম আমি।

অবশেষে তীর পাওয়া গেল। কিন্তু না, তীর না, সে এক সমুদ্র-দ্বীপের দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত-পাদদেশ। পাহাড় পর্বত সঙ্কুল এই দ্বীপটির কাছে

এসে আমি হতাশ হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকলাম। সমুদ্রের তলদেশ থেকে খাড়াই উঠে গেছে একটি পাহাড়। সারা পাহাড়ময় লতাগুল্ম বৃক্ষ। সবুজের সমারোহ। কিন্তু উপরে উঠবার উপায় নাই। এমন একটা স্থানও দেখতে পেলাম না যেখানে পা রেখে কিছু একটা আঁকড়ে ধরে ওপরে ওঠা যায়। এদিক ওদিক দেখছি। কিন্তু কোনও কায়দা করতে পারছি না। হঠাৎ নজরে পড়লো, একটা পাহাড়ী বটের ডাল থেকে ঝুরি ঝুলে পড়েছে সমুদ্রের জলে। পা দিয়ে দাঁড় কাটতে কাটতে গুঁড়িটাকে নিয়ে গেলাম সেখানে। লতানে ঝুরিটা আঁকড়ে ধরে প্রাণপণ চেষ্টায় উঠে এলাম গাছের ডালে।

এইভাবে অনেক কষ্টে এক সময় পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এলাম আমি। এবার মনে কিছুটা বল ফিরে পেলাম। নিজের সারা শরীরটার দিকে ভালো করে লক্ষ্য করার ফুরসৎ হলো। পা দুটো সামুদ্রিক মাছের কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। দুর্গম পাহাড়ের ঘষায় বুকে পিঠের ছাল-চামড়া ছড়ে গেছে। এসব নজর করার আগে অবধি কোন জ্বালা যন্ত্রণা ব্যথা আমি অনুভব করতে পারছিলাম না। এবার কাতর হয়ে পড়লাম। সারা শরীর টনটন করতে লাগলো। একটা জায়গায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম। তারপর আমার আর কিছু স্মরণ নাই। কতক্ষণ ঐভাবে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিলাম জানি না, যখন চোখ খুললাম, দেখি আবার সকাল হয়েছে। সূর্যের ঝলমলে রোদ এসে পড়েছে আমার মুখে। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। পা দুটো ব্যথায় অসাড় হয়ে গেছে। আবার মাটিতে পড়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ পরে বুকে হেঁটে, হামাগুড়ি দিতে দিতে সামনের সমতল ভূমির দিকে এগোতে লাগলাম। এইভাবে এক সময় সেই ঝর্ণা আকুল শ্যামল সমতটে নেমে আসতে পারলাম। চারদিক ফুলে ফলে ভরা।

এখানে আমি গাছের ফল আর ঝর্ণার জল খেয়ে অনেকদিন কাটালাম। ধীরে ধীরে দেহের ক্ষত শুকিয়ে এল, বল ফিরে আসতে লাগলো। কিন্তু মাটিতে পা ফেলে তখনও হাঁটতে পারি না। দুখানা কাঠের ডাণ্ডায় ভর দিয়ে কোনও রকমে চলাফেরা করি।

একদিন এইভাবে সমুদ্র সৈকতে—এসে বসেছিলাম। হঠাৎ কী যেন একটা অদ্ভুত বস্তু দেখলাম। ঠিক বর্ণনা করতে পারবো না, মনে হলো, কোনও জংলী জানোয়ার অথবা সামুদ্রিক দানব। অদম্য কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলাম। ভয়েও বুক দুরু দুরু করছে। কি জানি, যদি কোনও বিপদ হয়। যাইহোক, কাছে যেতেই বুঝতে পারলাম। না, তেমন কোনও হিংস্র কোনও কিছু নয়। আমাদের দেশের শান্ত নিরীহ মাদী ঘোড়া জাতীয় একটি প্রাণী। সমুদ্রের ধারে একটা গাছের গুঁড়িতে বাঁধা। লোভ হলো, জানোয়ারটার পিঠে চেপে বেড়ানো যেতে পারে। একেবারে ওর সামনে এস দাঁড়ালাম। হঠাৎ একটি মানুষের চিৎকারে আমি হতচকিত হয়ে পড়ি। একটি লোক ছুটতে ছুটতে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। রাগে সে ফুঁসছে। হুঙ্কার ছেড়ে বললো, কে তুমি? কোত্থেকে এসেছ, এ জায়গায় আসার সাহসই বা তোমার হলো কী করে?

আমি ভীত চকিত হয়ে বললাম, মালিক, আমার অপরাধ নেবেন না,

আমি বিদেশী। জাহাজে করে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছিলাম। কিন্তু পথের মধ্যে বিপর্যয় ঘটে। আমার সঙ্গে আরও অনেকে সমুদ্রের জলে ভেসে যাই। তারা কে কোথায় গেছে, বেঁচে আছে কি নাই জানি না। আমি, আল্লাহর মেহেরবানীতে, একটা কাঠের গুঁড়ি ধরে প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছি। নিজের ইচ্ছায় নয়, ঢেউ-এর তালে তালে আমি ভেসে এসেছি এই দ্বীপে।

লোকটি আমার একখানা হাত ধরে বললো, এসো, আমার সঙ্গে এস।

আমি তার পিছনে পিছনে চলতে থাকি। সে আমাকে পাহাড়ের নিচে একটা গুহায় নিয়ে আসে। ভিতরে ঢুকে চোখ জুড়িয়ে গেল। বিরাট প্রশস্ত একটি ঘর। আমাকে আদর করে বসালো। খানাপিনা দিল খেতে। খেলাম। কতকাল এই সব খানা খাইনি। বড় ভালো লাগলো। প্রাণ ভরে চেটেপুটে খেলাম সব। খুশিতে ভরে উঠলো মন। লোকটি তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আমার নামধাম পরিচয়। আমি সব বললাম তাকে। কেন আমার এই সমুদ্রযাত্রা সে কাহিনীও শোনালাম।

লোকটি মুগ্ধ বিস্ময়ে সব শুনলো। এবার আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা মালিক, আপনিই বা এই নির্জন দ্বীপে কেন? কি করেই বা এই পর্বতগুহায় বাসা বাঁধলেন। আর আপনার ঐ মাদী ঘোড়াটা—ওকেই বা পেলেন কোথায়? সমুদ্রের ধারে ওকে বেঁধেই বা রেখেছেন কেন? কী ব্যাপার কিছুই অনুমান করতে পারছি না।

এমন সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দু'শো তিরানব্বইতম রজনীতে আবার সে শুরু করে:

লোকটি বলে। এই দ্বীপে আমার মতো আরও অনেকেই আছে। আমি একা নই। সুলতান মিরজানের আজ্ঞাবহ দাস আমরা। দ্বীপের চার পাশে পাহারারত আছি। প্রতি মাসে প্রথম চাঁদ দেখা দিলে আমরা সবাই সমুদ্রের ধারে একটা করে মাদী ঘোড়া বেঁধে রেখে গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকি। মাদী ঘোড়ার গায়ের গন্ধ পেয়ে সমুদ্র থেকে সিন্ধুঘোটক উঠে এসে উপগত হয়। তারপর তাকে সঙ্গে করে ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে সে কিন্তু আমাদের ঘোড়াগুলো সেয়ানা। কিছুতেই তার সঙ্গে যেতে চায় না। চিঁহিহি করে ওঠে। সেই শব্দে আমরা বুঝতে পারি, কাজ খতম হয়ে গেছে। তখন ছুটে গিয়ে সিন্ধুঘোটকটাকে তাড়িয়ে দিয়ে মাদী ঘোড়াটাকে নিয়ে আসি। এরপর কিছুদিন বাদে সে বাচ্চা প্রসব করে। এই বাচ্চা কালে তাগড়াই জাঁদরেল ঘোড়া হয়। বিদেশের বাজারে সেইসব ঘোড়ার চড়া দাম পাওয়া যায়। আমাদের সুলতানের এই করেই এত ধনদৌলত।

আজ সিন্ধুঘোটকের ওঠার দিন। তুমি অপেক্ষা কর, কাজ শেষ হয়ে গেলে, তোমাকে নিয়ে আমাদের সুলতানের কাছে যাবো। আমাদের দেশটাও ঘুরিয়ে দেখাবো। আল্লাহর দয়াতেই আমার সঙ্গে তোমার আজ দেখা হয়ে গেল। তা না হলে হাজার চেষ্টা করেও এই দ্বীপের গন্ডী ছেড়ে তোমার নিজের দেশে ফিরে যেতে পারতে না।

কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল আমার মন। আমরা বসে কথা বলছি, এমন সময়

হঠাৎ সিন্ধুঘোটক জল থেকে উঠে এসে মাদী ঘোড়ার ওপর চড়াও হওয়ার আওয়াজ শোনা গেল। আমরা গুহা থেকে বেরিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে মাদী ঘোড়াটার পাল-খাওয়া দেখতে লাগলাম। কাজকর্ম শেষ হয়ে গেলে, সিন্ধুঘোটকটা ঘোড়াটাকে তার সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য দাঁড়াপীড়ি করতে লাগলো। কিন্তু সে যেতে নারাজ।

এই সময় আমার বন্ধুটি তারস্বরে চিৎকার করতে থাকলো, হেই, কে আছ, ছুটে এস। হেই, কে আছ, ছুটে এস।

পলকের মধ্যে লাঠি-সোটা বর্শা তীর ধনুক নিয়ে তার অনেক সঙ্গী সাথী জড়ো হয়ে গেল। তাদের আক্রমণে সিন্ধুঘোটকটা শঙ্কিত হয়ে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে গেল।

এবার সকলে হৈ-হৈ করতে করতে মাদী ঘোড়াটাকে সঙ্গে করে গুহার সামনে হাজির হয়। আমার বন্ধুটি আমার সঙ্গে তার সঙ্গী সাথীদের আলাপ পরিচয় করিয়ে দেয়। আমাকে পেয়ে তারা তো মহাখুশি। নানা রকম ফল-মূল খানাপিনা দিয়ে তারা আমাকে আদর-আপ্যায়ন করলো। একটা ভালো দেখে ঘোড়া এনে দিল আমাকে। বললো, ওঠ দোস্ত, ঘোড়ায় চাপো, তোমাকে আমাদের সুলতানের কাছে নিয়ে যাবো। তুমি আমাদের মেহেমান।

ঘোড়ায় চেপে ওদের সঙ্গে সুলতানের প্রাসাদে গেলাম। সুলতান মিরজান আমাকে দারুণ আদর অভ্যর্থনা করে তাঁর পাশে বসালেন। আমার সমুদ্রযাত্রার কারণ এবং ভাগ্য বিড়ম্বনার সবিস্তার বিবরণ আগাগোড়া খুলে বললাম তাকে। তিনি মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনলেন সব। বললেন, বেটা, উপরে আল্লাহ আছেন, নিয়তির লিখন কেউ এড়াতে পারে না। তোমার নসীবে যা লেখা আছে তা ঘটবেই। তিনি তোমার ইন্তেকালও তোমার কপালে লিখে রেখেছেন, তার আগে তোমার মৃত্যু কিছুতেই হতে পারে না। তোমার যা দুর্ভোগ, দুঃখ, কষ্ট, সুখ, আনন্দ সবই লিপিবদ্ধ করা আছে—তার কোনওটাই এড়াতে পারবে না। আল্লাহর উপর ভরসা রাখ, তিনিই সব বিপদ উদ্ধার করে দেবেন।

সুলতান শুধু আমাকে উপদেশই দিলেন না, তার উজির আমিরদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমাকে বন্দরের প্রধান পরিদর্শকের পদে বহাল করলেন।

আমার এই চাকরীর কাজ তেমন কিছু কঠিন নয়। ক্বচিৎ কখনও জাহাজ আসে বা ছাড়ে। সুতরাং কাজের তেমন চাপও ছিল না। সাধারণত সুলতানের দরবারেই আমার বেশিরভাগ সময় কাটে। মাঝে মধ্যে বন্দরে গিয়ে এক পাক ঘুরে আসি।

প্রায় সব সময় সুলতানের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকার ফলে তিনি প্রায় প্রতি বিষয়েই আমার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। আমার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায়, তিনি কেন, দরবারের সকলেই খুব প্রশংসা করতেন। প্রজারাও উপকৃত হতে লাগলো। দুহাত তুলে তারা সুলতানের গুণগান করতে থাকলো। ফলে এমন অবস্থা দাঁড়ালো, আমার কথা ছাড়া সুলতান আর কোনও কাজই করেন না।

আমার কিন্তু কিছুতেই মন বসে না। সুলতানের এত আদর যত্ন ভালোবাসা—তবু মন ভরে না। শুধু এক চিন্তা—কবে দেশে ফিরে যাবো।

হা পিত্যেশ করে বন্দরে বসে থাকি। দূরে-বহুদূরে সমুদ্রের শূন্যতায় শুধু খুঁজে মরি জাহাজের মাস্তুল। যদি কোন নাবিক, এই পথে পাড়ি দেয় তাকে শুধাবো, তুমি কি জান বন্ধু, কোন পথে যেতে হয় বাগদাদ—আমার জন্মভূমি?

প্রতীক্ষায় বসে থাকতে থাকতে একদিন হয়তো একখানা জাহাজ এসে ভিড়ে। আমি ছুটে যাই। কাপ্তেনকে জিজ্ঞেস করি, সাহেব, আপনি বলতে পারেন, বাগদাদ এখান থেকে কতদিনের পথ। কোন্ দিকে যেতে হবে?

কাপ্তেন অজ্ঞতার কথা শোনায়। শুনেছি বটে বাগদাদ বলে একটা শহর আছে। জাহাজও ভিড়তে পারে তার বন্দরে। কিন্তু আমি কখনও যাইনি, বলতেও পারবো না, কোন্ পথে যাওয়া যায়—কতদিন লাগে।

আমি হতাশা নিয়ে প্রাসাদে ফিরে আসি। জাহাজের নাবিকই যদি বলতে না পারে তবে কে আমাকে সন্ধান দেবে?

সুতরাং আরও অনেককাল আমাকে সেই সুলতান মিরজানের দ্বীপেই কাটাতে হয়। এই প্রবাস কালে কতকগুলো অদ্ভুত বিস্ময়কর বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। তার দু-একটা এখানে আমি শোনাবো:

একদিন সুলতান মিরজান, আমি তখন তার দরবারে বসেছিলাম, কয়েকজন হিন্দুস্তানীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কোথা থেকে আসছেন? কোথায় আপনাদের দেশ?

ওরা জানালো, হিন্দুস্তান থেকে তারা আসছে। হিন্দুস্তানেই তাদের বাসভূমি।

—সেখানকার অধিবাসীরা কোন্ ধর্মের লোক?

—হিন্দু। আমরা, হিন্দুরা, বহু বর্ণে বিভক্ত। তার মধ্যে ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ। ক্ষত্রিয়েরা উচ্চ বংশ কুলোদ্ভব, সাহসী, বীর, যোদ্ধা। কখনও অন্যায় করে না—অন্যায় প্রশ্রয় দেয় না। শত্রুর দমন এবং শিষ্টের পালনই তাদের ধর্ম। আর যাঁরা ব্রাহ্মণ তারা পূত পবিত্র। পূজা উপাসনা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, রচনা তাদের জীবনের ব্রত। কখনও তারা মদ্যপান করে না। আচার বিনয় বিদ্যা তাদের সহজাত ধর্ম। কাব্য সাহিত্য দর্শন শিল্প, সঙ্গীত চর্চা করে তারা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে। এই ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ ছাড়া আরও বাহাত্তর রকমের নিম্নবর্ণের মানুষ সেখানে বাস করে। এদের জীবন যাত্রার প্রণালী অবশ্য একেবারে ভিন্ন ধরনের।

ওদের এইসব অদ্ভুত কথা শুনে আমি তো তাজ্জব বনে গেলাম। একই দেশে একই ধর্মে এত ভাগ? আমি কখনও হিন্দুস্তানে যাইনি। কিন্তু তার পাশের দেশ আমাদের সুলতানের সলতানিয়ৎ কাবুলে একবার গিয়েছিলাম।

একদিন আমি সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ দেখি, একখানা বিরাট জাহাজ আসছে বন্দরের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে জাহাজখানা এসে নঙর করলো। মালপত্র কি কি আছে দেখার জন্য আমি জাহাজে উঠে গেলাম।

কাপ্তেন আমাকে এক এক করে সমস্ত সওদাপত্র বের করে দেখালো। আমি সব পরীক্ষা করে দেখতে থাকলাম। কাপ্তেনকে জিজ্ঞেস করলাম, আর কিছু নাই?

কাপ্তেন বলে, আছে। কিন্তু সে-সব সামান পত্রের মালিক জাহাজে নাই। তাই, পরের জিনিস, ওগুলো বিক্রি করতে পারিবো না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন, তারা কোথায় গেছে?

কাপ্তেন বললো, পথের মধ্যে তারা জলে ডুবে গেছে। আল্লাহ জানেন, তাদের কে বেঁচে আছে অথবা কেউই বেঁচে নাই। যাইহোক, আমাদের দেশ বাগদাদে ফিরে গিয়ে তাদের ওয়ারিশের কাছে ফেরৎ দিয়ে দেব।

আমার সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যায়। বুকের মধ্যে কাঁপতে থাকে। প্রশ্ন করি, তাদের কী কী নাম?

কাপ্তেন বলে, একজনের নাম সিন্দবাদ—

কাপ্তেন আর কি বললো আমি আর শুনতে পেলাম না। মাথাটা কেমন বোঁ করে ঘুরে গেল। কিন্তু একটুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে ভালো করে কাপ্তেনের দিকে লক্ষ্য করলাম। হ্যাঁ, আমাদের জাহাজের সেই কাপ্তেনই বটে। আমি প্রায় চিৎকার করেই বললাম, আমি—আমিই সেই সিন্দবাদ। তিমি মাছের পিঠের উপর নেমেছিলাম আমরা। তারপর সে আড়মোড়া ভেঙ্গে গা ঝাড়া দিতেই কে কোথায় ছিটকে পড়েছিলাম। প্রায় সবাই জাহাজে উঠতে পেরেছিল। কিন্তু আমি পারিনি। তিমিটা জলের তলায় তলিয়ে গেল। আমি একটা কাঠের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে কোনওক্রমে প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছি।

তারপর কিভাবে কত কষ্ট করে এই দ্বীপে এসে পেঁৗচেছি—সবই সবিস্তারে বললাম তাকে।

—এখন আমি এখানকার সুলতান মিরজানের খুব পেয়ারের লোক। আমাকে তিনি জাহাজ পরিদর্শকের কাজে বহাল করেছেন।

এই সময় রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

দু'শো চুরানব্বইতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে:

আমার কথা শুনে কাপ্তেন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নাই। তিনিই একমাত্র সত্যি। কিন্তু সাহেব, তোমার মতো এতবড় মিথ্যেবাদী তো আমি জীবনে দেখিনি। নিজের চোখে আমি দেখেছি, যারা জাহাজে সময়মতো উঠে আসতে পারেনি। তারা সবাই সমুদ্রের নিচে তলিয়ে গেছে। আর তুমি কিনা বোঝাতে চাইছ, তুমি বেঁচে গেছ! গাজাখুরি গপ্প মারবার আর জায়গা পেলে না?

আমি মুহূর্তের জন্য মুষড়ে পড়লাম। —কিন্তু—কিন্তু আমি যে সেই সিন্দবাদ তার প্রমাণ দিতে পারি আপনাকে।

—কী প্রমাণ দেবে?

আমি বললাম, জাহাজে আমার যারা সহযাত্রী ছিল তারা তো আছেন। তাদের সবাইকে এখানে ডাকুন। তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে, আমি কে।

কাপ্তেন সওদাগরদের সকলকে বাইরে আসতে বলতেই তার সহ-যাত্রীরা বাইরে এসে আমাকে দেখা মাত্র জড়িয়ে ধরে হৈ-হৈ কাণ্ড বাধিয়ে তুললো। তাদের চোখে মুখে আনন্দ আর ধরে না।

কাপ্তেনকে আর কিছু বোঝাতে হলো না। সে নিজেই বুঝলো আমিই সেই সিন্দবাদ।

আমার সহযাত্রীরা বলে, আমরা তো ভেবেছিলাম তুমি কোথায় তলিয়ে গেছ। সামুদ্রিক জন্তু-জানোয়ারের ফলার হয়েছ। তা কি করে বাঁচলে ভাই?

আমি তখন আবার আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী বললাম তাদের। তারা আসমানের দিকে দু-হাত তুলে খোদাতালার উদ্দেশে প্রণাম জানালো। এর থেকেই বোঝা যায়, দুনিয়াতে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনও কিছু নাই। তা না হলে যে অবিশ্বাস্য কাহিনী শোনালে, তাকি কখনও সম্ভব হয়? এতো তোমার দ্বিতীয় জন্ম হয়েছে!

কাপ্তেন আমার যাবতীয় সওদাপত্র আমাকে বের করে দিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম, যা যা ছিল সবই যথাযথ ঠিক আছে।

বাজারে নিয়ে গিয়ে বেশিরভাগ সওদাই বেশ চড়া দামেই বেচলাম। সবচেয়ে বাহারী কয়েকটা জিনিস উপহার দিলাম সুলতান মিরজানকে।

আমাদের জাহাজ বন্দরে নোঙর করেছে শুনে সুলতান মিরজান আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন।—যাক এতদিনে আল্লাহ মুখ তুলে চাইলেন।

নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর উপহার উপঢৌকনে আমাকে ভরে দিলেন তিনি। এত জিনিস নিয়ে আমি কী করবো। আমার সহযাত্রীদের কাছে ভালো দামে বেচে দিলাম খানিকটা।

সুলতান মিরজান যে আমাকে কতখানি ভালোবেসে ফেলেছিলেন তা বুঝলাম যেদিন আমি তার কাছে বিদায় নিতে গেলাম।

আমাদের জাহাজ ছাড়বে। এবং এই জাহাজেই আমি স্বদেশে ফিরে যাবো। সবই সুলতান জানতেন, তবু বিদায় বেলায় তাঁর চোখ ছলছল করে উঠেছিল, কথা বলতে গলা ভারি হয়ে এসেছিল।

আমিও বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। —যাচ্ছি। অনেক সুখ স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, জাঁহাপনা। জীবনে হয়তো আর দেখা হবে না। কিন্তু আমার স্মৃতির আকাশে চিরকাল ধ্রুব তারার মতো জ্বলবেন আপনি।

সুলতান মিরজান আমার মাথায় হাত রাখলেন, বেটা, মায়া মহব্বৎ বহুৎ খারাপ চিজ। দিল-কলিজা ঝাঁঝরা করে দেয়।

তারপর নিজের দেহ থেকে খুলে খুলে মহামূল্যবান সব সাজ-পোশাক, রত্নহার আমার হাতে তুলে দিলেন।

—এই সব যখন দেখবে, আমাকে মনে পড়বে তোমার।

সে-গুলো আমি প্রাণে ধরে বিক্রি করে দিতে পারিনি। ঐ যে দেখ, এই ঘরেই সেগুলো সব সাজানো আছে। এখনও ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে যাই, ঐ সাজ-পোশাক, ঐ রত্নহার পরে তিনি যেন সেই সিংহাসনেই বসে আছেন। কিন্তু শুধু স্মৃতিটুকুই পড়ে আছে, ভার মুক্ত সে তো আজ নাই।

যথা সময়ে হাওয়া সাধ দিল। পাল তুলে হাল খুলে আমরা জাহাজ ছেড়ে দিলাম।

একটানা অনেক দিন অনেক রাত্রি অতিবাহিত করার পর একদিন আমরা বসরাহয় এসে পেঁছিলাম। এবার মন নেচে উঠলো, বাগদাদ আর বেশি দূরে নয়। বাঁধাছাদার তোড়জোড় পড়ে গেল। দু-এক. দিনের মধ্যেই আমাদের জাহাজ বাগদাদের বন্দরে এসে ভিড়লো।

অনেক টাকা পয়সা মূল্যবান উপহার উপঢৌকন সঙ্গে নিয়ে আমি বাড়ি এলাম। আত্মীয় পরিজনরা, অনেকদিন পরে আমাকে পেয়ে, খুশিতে ডগমগ হলো। দেখলাম, তারাও সবাই বহাল তবিয়তে রয়েছে।

এরপর খুশিতে ভরে উঠলো আমার সংসার। দাসদাসী-বাঁদী সওদা-সামান-পত্র কিনে এনে বাড়ি ভরে ফেললাম। আবার সেই, আমার বাবার আমলে যেমনটি ছিল, আগের মতো ধনদৌলত-এ সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো আমার ঘর।

আবার সব হারানো বন্ধুদের ফিরে পেলাম। আমার দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে তারাও একদিন বিদায় নিয়েছিল। মধুর সন্ধান পেয়ে আবার তারা গুন গুন করে জড়ো হতে থাকলো। খানাপিনা হাসি গানে মেতে উঠলাম আমি।

এই হলো আমার প্রথম সমুদ্র যাত্রার কাহিনী। এরপরে দ্বিতীয় অভিযানের বিচিত্র কাহিনী শোনাবো তোমাদের। তার আগে এস, আমরা খানাপিনা সেরে নিই। সিন্দবাদ কুলিকেও বললো, তুমিও আমাদের সঙ্গে খাবে কিন্তু।

খানাপিনা শেষ হলে সিন্দবাদ নাবিক একশোটা স্বর্ণমুদ্রা সিন্দবাদ কুলির হাতে দিয়ে বললো, এটা রাখো। কাল সকালে আবার আসবে, আমার কাহিনী শোনাবো, কেমন?

সিন্দবাদ কুলি কুণ্ঠিতভাবে বলে, তা আসবো। কিন্তু এই মোহরগুলো কি জন্যে?

—তোমার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে আমি দিচ্ছি, নাও।

—আপনার ইনাম আমি মাথা পেতে নিলাম। ঠিক আছে, কাল সকালে আবার আসবো।

সেদিনের রাত্রিটা সুখ-স্বপ্নে কাটলো তার।

. রাত্রির অন্ধকার কাটছে, শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

দু'শো পচাঁনব্বইতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয়ঃ

সকালে উঠে সিন্দবাদ কুলি সিন্দবাদ নাবিকের প্রাসাদে চলে আসে। তাকে দেখে বৃদ্ধ তো মহাখুশি।—এসো, এসো, মিতা। তোমার জন্যেই বসে আছি। আরে, অত লজ্জা সঙ্কোচের কি আছে, এসো; আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে বসো দিকিনি। মনে কর না কেন, এ তোমার নিজের ঘর।

সিন্দবাদ কুলি বৃদ্ধের হাত জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে।

বৃদ্ধ বলে, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।

কিছুক্ষণের মধ্যে অন্যান্য অভ্যাগতরাও এসে পড়লো। মেজ-এ থরে থরে সাজানো ছিল সকালবেলার নাস্তা। বাঁদীরা গানবাজনা শুরু করে। সুমধুর সঙ্গীতের সুরে অবগাহন করতে করতে নাস্তাপর্ব সমাধা হয়।

তারপর এক সময় গানবাজনা থেমে যায়। কারো মুখে কোন শব্দ

নাই। সকলেই প্রতীক্ষা করছে, এবার বৃদ্ধ সিন্দবাদ তার কাহিনী শুরু করবে।

অসাধারণ আনন্দ উল্লাসে দিন কাটছিল। একঘেয়ে আনন্দও আমার বেশিদিন ভালো লাগে না। ইচ্ছে হলো, আবার অজানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। বাজারে গেলাম। অনেক অর্থব্যয় করে বহু মূল্যবান জিনিসপত্র সওদা করে গাঁটরি বাঁধলাম। আমি জানতাম কোন্ কোন্ জিনিস বিদেশের বাজারে চাহিদা বেশি। সেই সব জিনিসপত্রেই বোঝাই করলাম আমার বাক্স প্যাটরা প্রভৃতি।

সন্ধান পেলাম, সুন্দর একখানা আনকোরা জাহাজ বিক্রী আছে। শুধু দেখতেই বাহারী নয়, তার সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতী, কলকব্জা ইত্যাদি আমার খুব পছন্দ হলো। জাহাজের নওজোয়ান কাপ্তেনটিও দারুণ চৌকস। এই বয়সে সে তামাম দুনিয়ার সব দেশে জাহাজ ভিড়িয়েছে। দাম কিছু বেশিই নিল, তা নিক, জাহাজখানা আমার বেশ মনের মতো হলো।

আমার চেনাজানা পেয়ারের সওদাগর বন্ধুদের খবর দিলাম। তারা যদি বাণিজ্যে যেতে ইচ্ছা করে আমার জাহাজে যেতে পারে। পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের প্রায় সকলেই তল্পিতল্পা নিয়ে জাহাজে উঠে বসলো।

দিনক্ষণ দেখে একদিন জাহাজ ছেড়ে দিলাম। ভেসে চললাম অজানার সন্ধানে। এদেশ থেকে ওদেশ, দ্বীপ থেকে দীপান্তরে সওদার সন্ধানে ঘুরে বেড়াই। কত নতুন নতুন শহর বন্দর দেখতে থাকি। সেই সব দেশের হাটে বাজারে গঞ্জে বিক্রি করি বাগদাদের বাহারী জিনিসপত্র। বিদেশীরা হুমড়ী খেয়ে পড়ে। এমন জিনিস তারা কখনও চোখে দেখেনি। বেশ চড়া দামে বিক্রী হতে থাকে মাল।

এইভাবে একদিন সমুদ্র মধ্যে এক সুন্দর দ্বীপে এসে নোঙর করলাম। যেদিকে তাকাই সবুজের সমারোহ। বিশাল বিশাল গাছপালা। আমরা সবাই নামলাম। খানাপিনা পাকাবার ব্যবস্থা করা হলো।

আমি চারদিক ঘুরে ঘুরে প্রকৃতির শোভা দেখতে থাকি। এক জায়গায় এসে গাছের পাকা ফল পাড়লাম। পাশেই কুলকুল রবে ঝর্ণা বয়ে চলেছে। গাছের সুমিষ্ট ফল ঝরণার জল খেয়ে প্রাণ ভরে গেল। মৃদুমন্দ হাওয়া বইছিল। আবেশে দু চোখ জুড়িয়ে আসে।

কতক্ষণ ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম জানি না, কিন্তু দ্রুতপায়ে জাহাজের দিকে এসে দেখি জাহাজখানা নাই। মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়লাম। ওরা আমাকে ফেলে রেখেই জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। এই নিরালা নির্জন প্রান্তরে আমি একা-কপর্দক শূন্য। আমার যা কিছু সবই ছিল ঐ জাহাজে।

কিছুই বুঝতে পারলাম না, কেন ওরা আমাকে এই নির্জন দ্বীপে ফেলে রেখে চলে গেল? কী তাদের মৎলব?

যতই ভাবি, কোনও কূলকিনারা পাই না। বুক ফেটে কান্না এল,

হায় খোদা, একি কঠিন পরীক্ষায় ফেললে? এই কি আমার নিয়তি? প্রথম যাত্রায় তোমার দয়ায় কোনওরকমে প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছিলাম। কিন্তু এবার? এবার কি করে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবো? বার বার কি বিপদে বাঁচা যায়?

আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকি। কখনও বা নিজের কপালটা মাটিতে ঠুকি, এ কি করলে আল্লাহ। এমন শাস্তি কেন আমায় দিলে? কী পাপ আমি করেছি? হায়, আমার আবার কেন এই সমুদ্রযাত্রার দুর্মতি হলো। বেশ তো মহা সুখে ছিলাম বাগদাদে। কেন আমাকে সুখে থাকতে ভূতে কিলালো? খাওয়াপরা, ধনদৌলত কোনও কিছুরই তো অভাব ছিল না আমার। তবে কেন সেধে এই বাঁশ ঘাড়ে নিতে গেলাম! প্রথমবারের সমুদ্রযাত্রায় যা পেয়েছিলাম—সাতপুরুষ দিব্যি আরামে বসে খেতে পারতাম। কেন আবার আমার লোভ হলো—কেন—কেন?

মাথা ঠুকতে ঠুকতে আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে পড়লাম।

অবশেষে আমি বুঝলাম, এইভাবে নিজেকে ধ্বংস করে কোনও ফয়দা নাই। হাহুতাশ করে মাথা ঠুকলে এ বিপদের সুরাহা হবে না। সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। ঠাণ্ডা মাথায় উপায় খুঁজতে হবে। তারপর উপরে আল্লাহ আছেন, তিনি যদি দয়া করেন, উদ্ধার পেয়ে যাবো। আর না হলে মরতে হবে। উপায় কী?

উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম খানিকক্ষণ। তারপর একটা বিরাট গাছের ডালে উঠে বসলাম। কি জানি, কোথায় ওৎ পেতে আছে কোন্ জন্তুজানোয়ার। গাছের অত্যুচ্চ শিখরে উঠে এদিক ওদিক যে দিকে তাকাই কোনও জনবসতি দেখি না। চারদিকে শুধু দিগন্ত বিস্তৃত গহন গভীর বন-জঙ্গল, ধু ধু করা মাঠ, প্রান্তর, সমুদ্র, পাহাড় আর পাখী। দেখতে দেখতে হঠাৎ একদিকে বহু দূরে কি যেন উজ্জ্বল সাদা ধরনের একটা বস্তু নজরে পড়লো। কিন্তু কিছুই আন্দাজ করতে পারলাম না।

গাছ থেকে নেমে পড়লাম। কিন্তু একা একা এগিয়ে যেতে গা ছমছম করতে লাগলো। যাই হোক, এদিক ওদিক খুব ভালোভাবে দেখে শুনে অতি সন্তর্পণে সেই অদ্ভুত সাদা বস্তুটার উদ্দেশে এগোতে থাকলাম। পায়ে পায়ে এক সময় পৌঁছেও গেলাম তার কাছে। বিশাল বিরাট পেল্লাই একটা গম্বুজ। সাদা পাথরের তৈরি। চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকলাম। কিন্তু না, কোথাও একটা দরজা নাই। অথবা ভেতরে ঢোকার কোনও সিঁড়ি বা পথ—কিছুই দেখতে পেলাম না। অনেক রকম কায়দা কসরৎ করে গম্বুজটার মাথার ওপরে ওঠার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বৃথাই আমার কোসিস। এমন তেলতেলে মসৃণ তার গা—যে কোনও রকমেই আঁকড়ে ধরে ওপরে ওঠা সম্ভব না। পা-এর সামনে পা রেখে সারা গম্বুজটা প্রদক্ষিণ করে মেপে দেখলাম—একশো পঞ্চাশ পদক্ষেপ।

গম্বুজের ভিতরে ঢোকার বা ওপরে ওঠার ফিকির খুঁজতে খুঁজতে কখন যে সূর্য পাটে বসেছে বুঝতে পারিনি। ধীরে ধীরে যখন চারদিক অন্ধকার হয়ে এল তখন আমার চৈতন্য হলো। তাই তো—এখন কি করি।

প্রথমে মনে হয়েছিল, একখণ্ড বিশাল কালো মেঘ সারা আকাশ ছেয়ে

ফেলেছে। কিন্তু তাই বা হবে কি করে? এই দারুণ গ্রীষ্মে এমন বর্ষার মেঘ আসবে কোথা থেকে? পরে বুঝতে পারলাম, মেঘ নয়, একটি বিশাল পাখী ডানা মেলে নিচের দিকে নেমে আসছে।

অনেক গল্প কাহিনীতে পড়েছিলাম, একরকমের পাখী আছে তারা দেখতে ছোটখাটো একটা পাহাড়ের মতো। এদের নাম রকপাখী। এবার আমি আন্দাজ করতে পারলাম, যাকে আমি এতক্ষণ একটা গম্বুজ বলে মনে করেছিলাম আসলে তা ঐ রক পাখীরই ডিম।

একটু দূরে সরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। পাখীটা নেমে এসে তার বিশাল বিস্তৃত ডানা দুখানা মেলে সেই গম্বুজটার ওপরে বসলো। এবার আমি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হলাম—গম্বুজ সদৃশ ডিমটা তারই।

মাথায় একটা মৎলব এল। মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে অতি সন্তর্পণে ডিমটার পাশে চলে এলাম। পাখীটা তখন পাখা দুখানা দিয়ে ডিমটাকে আচ্ছাদিত করে তা দিচ্ছে। ডিমের দুপাশে তার দুখানা পা ঝুলে পড়েছে। মাথার পাগড়ীটা খুলে আলগোছে পাখীর একটা পায়ে ফাঁস পরিয়ে দিলাম। ভাবলাম, যখন সে আবার আকাশে উড়বে, ফাঁসটা পায়ে আটকে যাবে, আর পাগড়ীর অপরপ্রান্ত আঁকড়ে ধরে ঝুলতে ঝুলতে আমিও তার সঙ্গে উড়ে চলবো। শুনেছি, এই রক পাখিরা নাকি আস্ত একটা হাতীকেও ঠোঁটে ধরে তুলে নিয়ে যায়।

এই সময়ে রাত ফুরিয়ে আসতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

একশো ছিয়ানব্বইতম রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে আবার সে শুরু করে:

সারাটা রাত ডিমটার পাশে আমি উপুড় হয়ে শুয়ে রইলাম। আমার হাতের কব্জীতে বাঁধা পাগড়ীর অন্য এক প্রান্ত। চোখে তন্দ্রা নাই। কখন রক আকাশে উড়বে তারই অধীর প্রতীক্ষায় রাতের প্রহর গুণতে থাকি। মনে মনে আশার জাল বুনি, হয়তো রক আমাকে এই নির্জন কারাদ্বীপ থেকে উদ্ধার করে কোনও এক জনবসতি এলাকায় নিয়ে যাবে। তারপর ঘরে ফেরার পথ আমি নিশ্চয়ই খুঁজে পাবো।

এই সব আকাশকুসুম ভাবতে ভাবতে এক সময় ভোর হয়ে আসে। ডানা ঝাপটে রক আকাশে উড়লো। আমি প্রাণপণে পাগড়ীর প্রান্ত আঁকড়ে ধরে থাকি। পাখীটা শোঁ শোঁ করে খাড়াই উপরে উঠে যায়—একেবারে মহাশূন্যে, প্রায় বেহেস্তের কাছাকাছি। মনে হতে থাকে, এর ওপরে বুঝি আর যাওয়ার কোনও পথ নাই। হঠাৎ বুঝতে পারলাম, পাখীটা তীরবেগে নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে। সারা দেহের রক্ত শির শির করে মাথার দিকে ধাবিত হতে লাগলো। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তার পরই অনুভব করলাম আমার শরীরের ওজন একেবারে হাল্কা হয়ে গেছে। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি, এক পর্বতমালার ওপরে এসে সে বসেছে।

ক্ষিপ্র হাতে কব্জীর বাধন খুলে পাগড়ীটা ফেলে দিই। কি জানি, আবার যদি এখুনি সে আকাশে উঠে যায়।

আমার অনুমানই ঠিক। আর এক পলক দেরি করলেই আবার সে

আমাকে নিয়ে আকাশে উড়ে যেত। ভাগ্যিস পাগড়ীর ফাঁসটা আমি পাখীটার পা থেকে খুলে ফেলতে পেরেছিলাম।

কিন্তু না পারলেই বোধহয় ভালো হতো। পাখীটা উড়তে উড়তে সমুদ্রের ওপারে কোন অজানা দেশে অদৃশ্য হয়ে গেল। দেখে শিউরে উঠলাম, পর্বতচূড়া থেকে ডানা ঝাপটে ওঠার সময় সে বিশাল এক পাহাড়ী ময়াল সাপ ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে গেল। মনে হয় পাহাড়ের মাথায় ঐ সাপটাকে দেখেই সে নেমে এসেছিল।

আমার প্রাণ ভয়ে উড়ে গেল। ঐ ভয়ালভয়ঙ্কর সাপটা এই পর্বত কন্দরেই কোথাও নিশ্চয়ই ছিল। আর একটা যখন দেখলাম, তখন বিশ্বাস কি, আরও হাজারটা থাকতে পারে।

এদিক ওদিক ভালো করে তাকালাম। না, কোথাও কোনও গাছপালা, ঝর্ণা, নদী কিছুই নাই। সেই দ্বীপটা তবু অনেক ভালো ছিল—জনমানব না থাক, ফলমূল জল প্রচুর ছিল। না খেয়ে অন্তত মারা যেতাম না। কিন্তু এ যে একেবারে নির্জলা নিষ্ফলা ধূধূর মরুপর্বত। এখানে শুধু বিষধর সাপের আড্ডা। একবার তাদের নিশ্বাসের আওতায় পড়লে আর রক্ষা নাই। প্রচণ্ড আকর্ষণে টেনে নিয়ে মুখের গহ্বরে পুরে ফেলবে। যত বড় বীরপুরুষই হোক, পালাতে পারবে না।

মৃত্যু অনিবার্য ভেবেই সেই পর্বত শীর্ষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকুল হয়ে ভাবছি। খিদে পেলে কি খাবো। তৃষ্ণার জল দেবে কে? উফ্ ভাবতেও মাথা ঘুরে যায়। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। এ একেবারে কড়াই থেকে চুল্লিতে এসে পড়েছি।

ধীরে ধীরে নিচে নামতে থাকি। একটু নামলেই একটা উপত্যকা। পর্বতসঙ্কুল হলেও মোটামুটি সমতল। নামতে নামতে, কি আশ্চর্য, যেদিকে তাকাই শুধু দেখি হীরের স্তূপ। চোখ ঝলসে যায়। দূর থেকে এতক্ষণ যেগুলোকে পাথরের টুকরো বলে ভ্রম হচ্ছিল আসলে তা সবই ছোট বড় হীরে। কোথাও কোথাও এই হীরের স্তূপ প্রায় মানুষ সমান উঁচু হয়ে উঠেছে।

আমি অবাক হয়ে সেই হীরের স্তূপ দেখছি এমন সময় নজরে পড়লো কিছুটা দূরে অসংখ্য সাপ কিলবিল করছে। ভয়ে শরীরের রক্ত হিম হয়ে আসে। দেখলাম সাপগুলো ধীরে ধীরে তাদের গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। এই সাপগুলো রকপাখীর ভয়ে দিনেরবেলায় আদৌ বাইরে বেরোয় না। রাতেরবেলা, যখন রক-এর উপদ্রব থাকে না, ওরা গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে আহারের সন্ধান করে। এক-একটা সাপ এত বড় যে একটা হাতী পর্যন্ত অনায়াসে গিলে ফেলতে পারে।

প্রতি পদক্ষেপের আগে খুব ভালোভাবে জায়গাটা দেখে নিই। কি জানি, হয়তো সাপের গর্তেই পা রাখবো। মনে মনে নিজের নসীবের কথা ভাবি। সুখে থাকতে ভূতে কিলালো। তা না হলে অমন বেহেস্তের বাগদাদ ছেড়ে এই দোজকের দক্ষিণ দুয়ারে আসবো কেন?

সারাটা দিন আমি একটু নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করে কাটালাম। কিন্তু একটিমাত্র গুহা ছাড়া কোনও কিছুই চোখে পড়লো না। প্রাণে

আমার সাপের ভয়। কিংদেতেন্টা মাথায় উঠেছে। সারাটা দিনের মধ্যে সে-সব কথা একবার মনেও এল না।

ক্রমে সন্ধ্যার কালো ছায়া নেমে আসতে থাকে। আমি আর বাইরে থাকা নিরাপদ মনে না করে সেই ছোট গুহাটার ভিতরে কোনওরকমে শরীরটাকে গলিয়ে দিলাম। একটা পাথরের চাঁই দিয়ে চাপা দিয়ে দিলাম গুহাটার মুখ। ভাবলাম, কোনওরকমে রাতটুকু তো কাবার করা যাক। তারপর কাল সকালে যা ভাগ্যে থাকে হবে।

গুহার ভিতরে একটা কোণ বেছে নিয়ে শুতে যাবো হঠাৎ সামনের পাথরের চাইটা কেমন নড়েচড়ে উঠলো। সর্বনাশ! দিনেরবেলায় যাকে একখণ্ড কালো পাথরের চাঁই ভেবেছিলাম আসলে সেটা একটা সাপ—কুণ্ডলী পাকিয়ে ডিমে তা দিচ্ছে। আমার অবস্থা তখন যে কি; বুঝতেই পারছেন। সারা শরীর অবশ হয়ে গেল। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো। তারপর আর কিছু মনে নাই।

সকালবেলায় জ্ঞান ফিরে পেলাম। অতি সন্তর্পণে গুহার মুখ থেকে পাথরখানা সরিয়ে দেহটাকে টেনে বাইরে বের করে আসতে পারলাম। গত-কাল সারা দিনরাত্রি উপবাসে কেটেছে। তার উপর স্নায়ুর ওপর ঐ ভয়ঙ্কর চাপ—আমার শরীরের সব শক্তি যেন কে কেড়ে নিয়ে গেছে।

উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নাই। তবু কোনওরকমে দেহটাকে তুলে ধরলাম। ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি না। মাতালের মতো টলতে থাকি। হঠাৎ থপ করে কি একটা শব্দ হলো। তাকিয়ে দেখি আমার সামনে এসে পড়েছে প্রকাণ্ড মাংসের একটা খণ্ড। অবাক হলাম। কাছে গিয়ে দেখি একটা ভেড়ার চার ভাগের এক ভাগ ছালচামড়া ছাড়ানো মাংস-পিণ্ড।

মনে হলো, গল্প শুনেছিলাম, জহুরীরা এই হীরক পাহাড় থেকে হীরে সংগ্রহ করার জন্য ভেড়ার মাংসপিণ্ড ছুঁড়ে দেয়। কাঁচা মাংসের গায়ে হীরের কিছু টুকরো গেঁথে যায়। তারপর রক অথবা বাজপাখীরা এসে মাংসের খণ্ডটাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে নিজের বাসায় গিয়ে বসে। সেই সময় পাখীগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে তারা হীরের টুকরোগুলো বেছে নিয়ে যায়।

মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বড় বড় অনেকগুলো হীরে কুড়িয়ে আনলাম কুর্তা কামিজ ইজার পাতলুন সব খুলে হীরের টুকরোগুলো বোঝাই করে কোমরে ঝুলিয়ে নিলাম। তারপর পাগড়ীটা খুলে মাংসর পিণ্ডটাকে ফাঁস দিয়ে এমনভাবে বাঁধলাম, যাতে মাংসর বেশির ভাগ অংশই অনাবৃত থাকে। তারপর পাগড়ীর অপর প্রান্ত আমার হাতে বেঁধে একটা পাথরের চাঁই-এর আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম। একটুক্ষণ পরে শোঁ শোঁ করে নেমে এল একটা রকপাখী। ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল মাংস পিণ্ডটা। আর সেই সঙ্গে আমাকেও। ঝুলতে ঝুলতে আমিও রকপাখীর সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চললাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাখীটা তার আস্তানায় নামলো। আমি কব্জীর বাঁধন খুলে একটু দূরে সরে পড়লাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক বৃদ্ধ জহুরী এগিয়ে এল সেখানে। আমাকে

দেখে সে অবাক হয়েছে। মানুষের মুখ দেখে আমার তো আর আনন্দ ধরে না। আমি খুশিতে লাফাতে লাফাতে তার দিকে এগিয়ে যাই। সে কিন্তু খুশি হতে পারলো না। রুক্ষ স্বরে কৈফিয়ৎ চাইল, কে তুমি? এখানে কী করতে এসেছ, চোর কোথাকার। আমার হীরে চুরি করার মৎলব করেছ? কিন্তু জেনে রাখ, সেটি হবে না। এ আমাদের বংশজাত অধিকার। আমাদের রুটিতে হাত দিতে এলে কিছুতেই বরদাস্ত করবো না।

আমি হাসতে হাসতেই বলি, আপনি অত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন কেন, শেখসাহেব। আমি আপনার বাড়া ভাতে ছাই দিতে আসিনি। আপনার ধারণা বিলকুল ভুল। আমি চোরও না, ডাকাতও না—নেহাতই একজন সাদাসিধে সৎ সওদাগর। ভাগ্যের ফেরে আজ আমার এই দশা।

কামিজের জেব থেকে কয়েকখানা হীরে বের করে তার হাতে দিয়ে বললাম, এই নিন। হবে তো?

বৃদ্ধের চোখ ছানাবড়ার মতো গোল গোল হয়ে ওঠে, ইয়া আল্লাহ, এত বড় বড় হীরে তো জিন্দগীভর কখনও দেখিনি। আমাদের মাংসের পিণ্ডে তো ছোট ছোট হীরের কুচি আটকে আসে। এ হীরে তুমি কোথায় পেলে, বেটা?

—কোথায় পেলাম, পরে বলছি। আগে বলুন, আপনি খুশি হয়েছেন কিনা। না, আরও কয়েকটা দেব।

জহুরী বলে না না, বাবা, আর কী করবো। এর একখানার দামেই সাতপুরুষ বসে বসে খাওয়া যায়। আমার তো তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। তা ছাড়া বংশে বাতি দেবার কেউ নাই। এই পয়সাই কে খাবে। ওসব তোমার নিজের কাছে রাখ।

আমি বললাম, আমাকে একটা থলেটলে দিতে পারেন?

তখনও আমি উলঙ্গ। আমার পাতলুনের দোনলায় ভরা হীরের টুকরো। বৃদ্ধ বললো, আলাবৎ, এই নাও থলে। কটা নেবে?

সমস্ত হীরেগুলো একটা বড় থলেতে বোঝাই করে আবার আমি কামিজ পাতলুন পরে সভ্য হলাম।

. জহুরী জিজ্ঞেস করলো, ঐ দুর্গম হীরক পাহাড়ে কী করে তুমি গিয়েছিলে, বেটা। ওখানে আজ অবধি কোনও মানুষ গিয়ে ফিরে আসতে পারেনি।

আমি আমার সমুদ্রযাত্রা থেকে শুরু করে আগাগোড়া সব কাহিনী তাকে খুলে বললাম।

বৃদ্ধ আমাকে বাহবা দিয়ে বললো, তোমার সাহস বটে। যাই হোক, আল্লাহর দোয়ায় প্রাণে বেঁচে গেছ।

আমি তখন দারুণ ক্ষুধার্ত। বললাম, কাল সারাদিন রাতে পেটে দানাপানি পড়েনি। কিছু খেতে দিতে পারেন।

বৃদ্ধ বললো, ও, তাই তো, আমি একেবারে খেয়াল করিনি, বাবা। চল, আমাদের তাঁবুতে চল। কাছেই।

ওদের তাঁবুতে এসে পেট ভরে খানাপিনা খেলাম। এতক্ষণে দেহে বল ফিরে এল। সারাটা দিন ওদের তাঁবুতে ঘুমালাম। সন্ধ্যায় খেয়েদেয়ে

আবার শুয়ে পড়লাম।

সকালবেলা যখন ঘুম থেকে উঠলাম দেহ, মন বেশ ঝরঝরে হয়ে গেছে। ওরা আমাকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে এল। সেখান থেকে জাহাজে উঠে চলে এলাম কর্পূর দ্বীপে। এই দ্বীপে একটা প্রকাণ্ড বড় বৃক্ষ আছে। তার ডালপালার মধ্যে শখানেক মানুষ নির্বিবাদে লুকিয়ে থাকতে পারে। এই বৃক্ষের দুধের মতো সাদা রস থেকে তৈরি হয় কর্পূর।

এই দ্বীপটায় আমি অবশ্য কতকগুলো মারাত্মক রকমের হিংস্র জানোয়ার দেখে এসেছি। এই জানোয়ারটার নাম কারকাডন—অনেকটা আমাদের দেশের গণ্ডারের মতো দেখতে। এর নাকের ডগায় আছে প্রায় ছয় হাত লম্বা একটা শিং। এদের গায়ে ভীষণ জোর। বড় বড় হাতীর সঙ্গে যুঝতে পারে এরা। সিং দিয়ে গুতিয়ে গুতিয়ে হাতীকে মেরে না ফেলা পর্যন্ত এরা ক্ষান্ত হয় না। কিন্তু হাতীটা মরে পড়ে গেলে এরা আর তার ধারে কাছে যায় না। রক পাখিরা তাকে তাকে থাকে। হাতীর বিশাল বপুটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই উড়ে এসে ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে মহাশূন্যে উড়ে যায়।

এই দ্বীপে এসে আমি আমার একখানা হীরে বিক্রি করে সোনা কিনলাম। এখান থেকে দেশে ফেরার জন্য জাহাজ ভাড়া করতে হবে। জাহাজ-এর ভাড়া মেটাবার জন্য সোনা দরকার।

এ বন্দর থেকে সে বন্দর, আবার সেখান থেকে অন্য এক বন্দর—এইভাবে একদিন আমি বসরায় এসে পৌঁছলাম। আমার মন খুশিতে নেচে উঠলো। দেশ আর বেশি দূর নয়। দু-এক দিনের মধ্যেই আমি আমার জন্মভূমি চিরসুন্দর সুখের নীড় বাগদাদে ফিরে এলাম।

আমাকে পেয়ে আপনজনরা খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলো। আমিও বহুদিন বাদে তাদের সঙ্গ ফিরে পেয়ে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠলাম। সোনা-দানা হীরে—যা এনেছিল্যম সবারই হাতে কিছু কিছু দিলাম। অনেকদিন পর আবার হাসি গানে ভরে উঠলো আমার ঘর।

এর পর থেকে নানা ভোগবিলাসের মধ্যেই দিন কাটতে লাগলো দামী দামী মদ আর মাংস সপরিবারে নিত্য খাই। বাহারী সাজপোশাক পরি। গান বাজনা হৈহল্লার মধ্যে আমার মহা আনন্দে দিন কাটতে থাকে। প্রতিদিন আমার ইয়ার বন্ধুরা আমার কাছে গল্প শুনতে আসে। বহু বিচিত্র আমার জীবনের অভিজ্ঞতা। দিনের পর দিন বলেও শেষ করা যায় না।

এই হলো আমার দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রার কাহিনী। কিন্তু আগামীকাল, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তোমাদের আমি তৃতীয় সমুদ্রযাত্রার বিচিত্র কাহিনী শোনাবো। যে দুটো কাহিনী তোমরা শুনলে সে কাহিনী তার চেয়ে আরও অনেক বেশি রোমাঞ্চকর।

রাত্রি অবসান হতে চলেছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

দু'শো আটানব্বইতম রজনীতে আবার সে শুরু করে:

সিন্দবাদ নাবিক গল্প থামিয়ে চুপ করে। টেবিলে খানাপিনা সাজানো

ছিল। বান্দারা উপস্থিত অভ্যাগতদের সকলকে খানাপিনা দিল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে বৃদ্ধ সিন্দবাদ কুলি সিন্দবাদকে একশোটা সোনার মোহর দিয়ে বলে, এটা রাখো। আমি খুশি হয়ে দিলাম।

কুলি সিন্দবাদ কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করে তার দান। মহা আনন্দে বাসায় ফিরে আসে। পরদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে রুজু নামাজাদি সেরে আবার সে বৃদ্ধ সিন্দবাদের প্রাসাদের দিকে রওনা হয়।

সিন্দবাদ নাবিক তারই প্রতীক্ষায় বসেছিল। আদর করে কাছে বসায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক এক করে আবার সব অতিথি অভ্যাগতরা এসে হাজির হয়। যথারীতি টেবিলে সাজানো ছিল সকালবেলার নাস্তা। খানা-পিনা শেষ হলে সিন্দবাদ কাহিনী শুরু করে:

বন্ধুগণ, আল্লা যে সর্বশক্তিমান সে তো আমরা সবাই জানি। কিন্তু তার অসাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি বিচক্ষণতাও মানুষের চাইতে অনেক অনেক বেশী। তা না হলে যে বিপদে পড়ে একদিন আমার প্রাণসংশয় ঘটেছিল, এইরকম বিত্ত বৈভবের মধ্যে মহা আনন্দে দিন কাটাতে কাটাতে, আবার সেই প্রাণঘাতী বিপদের মধ্যে পা বাড়াবো কেন? যথা সময়ে তিনি আমার মন থেকে সেই সব আতঙ্ক ভয় মুছে নিয়েছিলেন। তাই আবার আমার সমুদ্রযাত্রার বাসনা হলো। বাগদাদে বসে বসে একঘেয়ে আনন্দের জীবন আর আমার ভালো লাগলো না। কোনও বৈচিত্র্য নাই। কুড়ের মতো ঘরে বসে বসে বিলাস ব্যসনের মধ্যে দিন কাটাবো আমার রক্তের ধারা সেরকম নয়। তাই আবার একদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি।

এবার আমি আর ভারি ভারি মোটা সওদা সঙ্গে নিলাম না। বিদেশের বাজারে আরবের মূল্যবান আতর নির্যাসের কদর খুব বেশি। এছাড়া বাগদাদের সূক্ষ্ম শিল্পকর্মও অন্য দেশে চড়া দামে বিক্রি হয়। পয়সার তো আমার অভাব নাই তখন, অনেক অর্থ ব্যয়ে এই সব বিলাসের সামগ্রী সংগ্রহ করে বসরাহয় এসে পৌঁছলাম। এখান থেকে দুনিয়ার প্রায় সব জায়গারই জাহাজ ছাড়ে। বসরাহয় গিয়ে একদল সাচ্চা মুসলমান, সদাশয় সওদাগরের সঙ্গে আমার দোস্তি হয়ে গেল। তারাও বাণিজ্যে যাবে। ভালো সঙ্গীদল পেয়ে আমিও ভিড়ে গেলাম তাদের দলে।

দিনক্ষণ দেখে, আল্লাহর নাম নিয়ে একদিন জাহাজে চেপে বসলাম আমরা।

পালে হাওয়া লাগলো। জাহাজ চলতে থাকলো।

এক এক করে অনেক বন্দর আসে। শহরে শহরে আমরা সওদা ফিরি করি। আমি যে-ধরনের মূল্যবান বিলাস সামগ্রী সঙ্গে নিয়েছি সে-ধরণেও সওদা বড় একটা কেউই সঙ্গে নিতে পারে না। তাই যেখানেই দেখাই সবাই লুফে নিতে থাকে। প্রতিটি সওদায় মোটা লাভ হতে থাকে আমার। খুশিতে মন নেচে ওঠে।

এইভাবে চলতে চলতে একদিন আমরা মুসলমান সুলতানদের

সলতানিয়ৎ এলাকা ছাড়িয়ে মাঝ-সমুদ্র ধরে পাড়ি জমিয়েছি। হঠাৎ কাপ্তেন চিৎকার করে ওঠে। সর্বনাশ!

আমরা ছুটে গেলাম তার কাছে।—কী? কী হয়েছে?

সে কোনও কথার জবাব দেয় না। ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে, আর কপাল চাপড়ায়।

আমরা অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করি, কী হয়েছে, বলবে তো?

কাপ্তেন তখন পাগলের প্রায়। মাথার চুল, আর জামাকাপড় ছিঁড়ছে। চোখে মুখে তার সে-এক অবর্ণনীয় নিদারুণ আতঙ্ক। কোনওরকমে সে বলতে পারে, পালের হাওয়া ঘুরে গেছে। আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি। এখন যে পথে জাহাজ চলেছে, সে পথে চলতে থাকলে আমরা বাঁদর দ্বীপে পেঁছিব। সেখানে একবার গেলে আর কেউ ফিরে আসতে পারে না।

আমরা চিৎকার করে উঠি, যেভাবেই হোক, জাহাজের গতি ফেরাও।

কাপ্তেন বললো, অসম্ভব। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজ বাঁদর দ্বীপে পেঁছে যাবে। এখন চেষ্টা করে কোনও লাভ নাই। জোর করে ঘোরাতে গেলে জাহাজ ভেঙ্গে খানখান হয়ে যাবে।

আমরা উদ্ভ্রান্তের মতো জাহাজের ডেকে ছুটাছুটি করতে লাগলাম। সামনে মৃত্যু অবধারিত জেনে কে আর চুপচাপ বসে থাকতে পারে?

কিছুক্ষণের মধ্যে জাহাজ বাঁদর দ্বীপের কাছাকাছি এসে পড়লো। জাহাজটা ঘিরে ধরলো বাঁদরের পঙ্গপাল। সংখ্যায় কত—তার হিসাব বলতে পারবো না। দশ বিশ—এমন কি পঞ্চাশ হাজারও হতে পারে। এক বিশাল সেনাবাহিনী বলা যায়।

আমরা জাহাজের মধ্যে ভয়ে গুটিসুটি মেরে বসে আছি। নিচে নামবো—সাধ্য কী? ওরা কিন্তু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সহজাত অসভ্যতায় 'স্বাগত' জানাতে থাকে। মুখের ভাষা দুর্বোধ্য, কিন্তু ভাবখানা এই—নিচে নেমে এস বাছাধনরা, আমরা তোমাদের বুক চিরে রক্ত পান কববো।

ওদের আক্রমণ করার দুঃসাহস আমাদের নাই। অথবা ওদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার শক্তিও আমরা ধরি না। এই অবস্থায় আশু কর্তব্য কী, কিছুই ঠিক করতে পারছি না। এমন সময় হুড়পাড় করে তারা আমাদের জাহাজের ডেকে উঠে এল। আমরা অনড় অচল হয়ে বসে রইলাম। ওরা আমাদের সওদাপত্র তছনছ করতে লাগলো। ওদের বীভৎস চেহারা দেখে আর বিকট চিৎকার শুনে হৃৎপিণ্ড শুকিয়ে যায়। বিচিত্র ধরনের অঙ্গভঙ্গী আর অদ্ভুত ধরনের মুখ ব্যাদন করে তারা যে কত কি বলতে লাগলো তার একবর্ণও বুঝলাম না। আমাদের সামনেই তারা মাস্তুলের মাথায় উঠে পালের কাছি খুলে দিল। তারপর হাল আর দাঁড় অধিকার করে জাহাজটাকে সমুদ্রসৈকতে নিয়ে গিয়ে ভেড়ালো।

এক এক করে আমাদের সবাইকে টানতে টানতে তীরে নামালো ওরা। আমরা তখন কোরবানীর খাসী। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও রুখে দাড়াবার দুঃসাহস নাই।

আমাদের সকলকে নামিয়ে দিল, কিন্তু ওরা কেউই জাহাজ থেকে নামলো না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমাদের যথাসর্বস্ব সওদাপত্র ঠাসা

জাহাজখানা নিয়ে ওরা মাঝদরিয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমার মতো অনেকেই বুক ভাঙ্গা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। কিন্তু কান্নাকাটি করেই বা লাভ কী? বিদেশে বিপর্যয় ঘটতেই পারে। তার জন্য আগে থেকে যেমন সতর্ক হওয়াও সম্ভব না, তেমনি বিপদ এসে গেলে ভেঙ্গে পড়াও সঙ্গত না। অবস্থা ও সময়ের সঙ্গে মানিয়ে চলাই বিচক্ষণতা।

যাই হোক, আমাদের সর্বস্ব চলে গেছে। এখন বাঁচার পথ বের করতে হবে। আমরা সকলে সেই সমুদ্রসৈকতে বালির উপরে বসে এক সভা করলাম। ঠিক হলো আগে আমরা দ্বীপের অভ্যন্তরে ঢুকে কিছু খানা-পিনার সন্ধান করবো। প্রথমে ফলমূল এবং জলের সন্ধান করে তারপর অন্য ফিকির খুঁজতে হবে।

সমুদ্রতীর থেকে খানিকটা ভিতরে ঢুকতেই নানারকম পাকা মিষ্টি ফল আর ঝর্ণার জলের খোঁজ পাওয়া গেল। ধড়ে প্রাণ এল। যাই হোক, অনাহারে শুকিয়ে মরতে হবে না।

এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে পাকা মিষ্টি ফলের সন্ধান করতে করতে আমরা আরও অনেকটা ভিতরে ঢুকে পড়েছি। হঠাৎ নজরে পড়লো, গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, অদূরে এক প্রাসাদোপম অট্টালিকা। আপাত-ভাবে মনে হয় জনমানব শূন্য।

খানাপিনা শেষ করে আমরা ঐ ইমারতের দিকে এগিয়ে গেলাম। প্রকাণ্ড উঁচু, প্রস্থে ও দৈর্ঘে সমান—চতুষ্কোণাকৃতি পেল্লাই এক প্রাসাদ। চারদিক পাথরের প্রাচীরে ঘেরা। দুই দুটো সিংহ দরজা পেরিয়ে তবে প্রাসাদের চত্বরে প্রবেশ করা যায়।

শুধু সিংহ দ্বারই হাট হয়ে পড়ে আছে। সিংহ সদৃশ প্রহরী আজ আর নাই সেখানে। আমরা ভিতরে ঢুকে গেলাম। বিরাট প্রশস্ত প্রাঙ্গণ-সদৃশ এক কক্ষ। সারা ঘরময় থরে থরে সাজানো রান্নাবান্নার সাজ-সরঞ্জাম। বড় বড় কড়াই ডেকচি হাতা বেড়ি প্রভৃতি। ঘরের মেজেয় স্তূপীকৃত হাড়। কতকগুলো একেবারে শুকনো সাদা। আবার কতকগুলো এখনও মাংসের ঝোলঝাল লেগে রয়েছে। একটা পচাদুর্গন্ধ নাকে এল। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো। পলকের মধ্যেই আমরা সংজ্ঞা হারিয়ে মেজেয় লুটিয়ে পড়লাম।

সূর্য সবে পাটে বসেছে; এমন সময় বাজ পড়ার মতো হুঙ্কারে আমাদের তন্দ্রাভাব কেটে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসতেই দেখলাম বিশাল দৈত্যের মতো একটা কালো কুৎসিত কদাকার একটা মানুষ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছে। লম্বায় সে তাল গাছের সমান, হতকুৎসিৎ বাঁদরের চেয়েও দেখতে বীভৎস। তার চোখ দুটো গোলাকৃতি আগুনের ভাঁটা। গাঁইতির কাটার মতো তার দাঁত আর মুখের গহ্বর ঠিক একটা ইঁদারার মতো। নিচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে বুক অবধি। কুলোর মতে কান দুখানা কাঁধ ঢেকে ফেলেছে। হাতের নখগুলো ইয়া বড় বড়, আর থাবা—ঠিক সিংহের মতো।

দেখা মাত্র আমরা ভয়ে শিউরে উঠেছিলাম। পরে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসে রইলাম। দেওয়ালের পাশে একটা বেঞ্চির উপরে সে

বসলো। এক এক করে আমাদের সকলের ওপর চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল। তারপর উঠে এসে সিংহের মতো থাবা দিয়ে আমার ঘাড়টা চেপে ধরলো। তারপর ছোট্ট একটা ইঁদুর ছানার মতো আমার দেহটাকে শূন্যে তুলে এদিক ওদিক ঘোরাতে থাকলো। তারপর কি খেয়াল হলো, আমাকে মেজের ওপর ছুড়ে দিয়ে আর একজনের ঘাড়ে থাবা বসালো। হয়তো আমার কৃশকায় দেহটা তার পছন্দসই হলো না। কিন্তু আমাকে ছেড়ে যাকে ধরলো তাকেও দু-একবার দুলিয়ে ছুড়ে দিল। এইভাবে এক এক করে সে সকলের দেহের ওজন পরীক্ষা করে দেখতে থাকলো। সব শেষে সে এল কাপ্তেনের কাছে।

কাপ্তেনের শরীরটা বেশ মোটাসোটা তাগড়াই। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। তাকে দেখে দৈত্যটার মুখে হাসি আর ধরে না। অর্থাৎ খুব পছন্দ হয়েছে তার।

এক হাত দিয়ে ওর কোমরটা আর এক হাত দিয়ে ঘাড়টা ধরে একটা মোচড় দিয়ে মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেললো সে। তারপর একটা বিরাট কড়াই-এর মধ্যে ফেলে উনুনে আগুন জেলে দিল। কিছুক্ষণ পরে কাপ্তেনের দেহের আধ সেদ্ধ মাংসপিণ্ডটা তুলে গোগ্রাসে খেতে থাকলো সে। খুব তৃপ্তি করে খেয়ে মোটা মোটা হাড়গুলো মেজের ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়া মাত্র সে বেঞ্চিটার ওপরে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে মোষের মতো নাক ডাকাতে লাগলো। এইভাবে পরদিন সকাল অবধি সে ঘুমিয়ে কাটালো। ঘুম ভাঙ্গামাত্র কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে যে পথে নেমে এসেছিল সেই সিঁড়ি দিয়েই আবার ওপরে উঠে চলে গেল। আমাদের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। বেঁচে আছি কি নাই, সে বোধশক্তিও নাই কারো।

যখন বুঝলাম সে সত্যিই চলে গেছে, আমরা হাঁউমাউ করে কেঁদে ফেললাম।—এর চেয়ে গহিন সমুদ্রে ডুবে মরাও ঢের ভালো ছিল, আল্লাহ। অথবা বাঁদরগুলো যদি আমাদের কলিজা ছিঁড়ে রক্ত পান করতো সেও বরং সহ্য হতো, কিন্তু কড়াই-এর ফুটন্ত তেলে ফেলে ভাজা হওয়া—উফ্ঃ!

কিন্তু ভেবে আর লাভ কী? নসীবে যা লেখা আছে তা হবেই। আল্লাহই একমাত্র ভরসা। তিনি না বাঁচালে কেউ বাঁচাতে পারবে না এখন।

প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা। সারাদিন দ্বীপের এদিক ওদিক ঘুরলাম। লুকিয়ে থাকার মতো কোনও একটা গুহা বা ডেরা যদি কোথাও পাওয়া যায়। কিন্তু আতি পাতি করে খুঁজেও কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। সারা দ্বীপটায় আর কোনও বাড়িঘর নাই। না আছে কোনও পাহাড় পর্বত, না আছে কোনও গভীর জঙ্গল। সবত্রই ফাঁকা ফাঁকা গাছপালা বা উন্মুক্ত প্রান্তর।

সন্ধ্যা নেমে এল। আমরা নিরুপায় হয়ে আবার সেই রাক্ষস পুরীতেই ফিরে এলাম। এছাড়া উপায়ই বা কী? রাক্ষসটার একটা গুণ—সে আমাদের একজনকে ছাড়া দুজনকে এক সঙ্গে খাবে না। কিন্তু এই অরক্ষিত গাছতলায় রাত কাটানর কী ভরসা। হয়তো এক রাতেই সদলে সকলে প্রাণ খোয়াবো

আমরা। তার চাইতে যার নসীবে যা আছে, তাই হবে। রাক্ষস পুরীতেই যাওয়া যাক। যার বরাত খারাপ আজ রাতে তার প্রাণ যাবে—

আমাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই দৈত্যটা হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে নেমে এল। আবার সে গত রাতের মতো এক এক করে সকলের দেহ পরীক্ষা করে দেখতে থাকলো। কোনটা ওজনে বেশি ভারি। শেষ পর্যন্ত একজনকে বেছে নিয়ে একই কায়দায় আধাসিদ্ধ করে খেয়ে আবার বেঞ্চে শুয়ে পড়ে মোষের মতো নাক ডাকাতে লাগলো। যথারীতি পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আবার সে উপরে উঠে গেল।

আমরা ঠিক করলাম, না, এই নারকীয় বীভৎস ব্যাপার আর সহ্য করা যায় না। এর চেয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করা ঢের ভালো। মরীয়া হয়ে উঠেছি সকলে, আজ যা হয় একটা এসপার-ওসপার করতেই যে হবে। আমাদের একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললো, শুনুন ভাইসব, নিজেরা নিহত হওয়া অথবা আত্মহত্যা করার চেয়ে এই শয়তানটাকে হত্যা করার ফিকির খোঁজা কি ভালো না? মরতে তো হবেই, তা বলে এইভাবে মরা? আসুন আমরা আমাদের শত্রুকে নিধন করি। তার জন্যে যদি মৃত্যু আসে আসুক—সে অনেক গৌরবেব হবে। কিন্তু এতো কাপুরুষের মতো নিজের গলাটা হাড়ি-কাঠে বাড়িয়ে দেওয়া—

এরপর আমি উঠে আমার বক্তব্য পেশ করলাম। —শুনুন শেখ সাহেবরা, দৈত্যটাকে যদি মারতে পারি তো খুব ভালো, কিন্তু না যদি পারি সে ক্ষেত্রেও তো একটা উপায় ভাবতে হবে। আমি বলি কি—আমরা একটা কাঠের ভেলা বানাই। আমি দেখেছি সমুদ্রের ধারে অনেক কাঠের গুঁড়ি পালা দেওয়া আছে। ভেলাটায় চড়ে আমরা ভাসতে ভাসতে চলি। তারপর আল্লাহ যদি মুখ তুলে চান, নিশ্চয়ই কোনও জাহাজের নাবিক আমাদের তুলে নেবে। নতুবা হয়তো কোনও নতুন দ্বীপে গিয়ে ভিড়বো। আর যদি পথের মধ্যে ডুবেই মরি, সে-ও তো এর চেয়ে অনেক ভালো হবে। এই অবধারিত অপ-মৃত্যুর জন্য প্রতিটি মুহূর্ত অপেক্ষা করার চেয়ে অনেক ভালো হবে। অনেক গৌরবের হবে।

সকলে আমার কথায় সায় দিল। —বহুৎ আচ্ছা, চমৎকার!

রাত্রির অন্ধকার কাটতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশোতম রজনী:

বৃদ্ধ সিন্দবাদ তার কাহিনী বলছে:

আমরা সকলে সমুদ্র-সৈকতে গিয়ে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে একটা ভেলা বানালাম। নানারকম কাঁচা পাকা ফলমূলে বোঝাই করলাম। বেশ কিছুদিনের খাবার সঙ্গে থাকা দরকার। না জানি কতদিনে নতুন দ্বীপের বা কোনও জাহাজের সন্ধান পাওয়া যাবে। এরপর আমরা আবার দৈত্যপুরীতে ফিরে আসি। যথা সময়ে রাক্ষসটা হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে নামে। তারপর এক এক করে বাছাই করে একজনকে কড়াই-এ চাপায়। আমাদের এই

বীভৎসতা অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। তবু চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলাম।

একটু পরে রাক্ষসটার খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আমরা দুখানা ইয়া মোটা মোটা লোহার সিক এনে উনুনের মধ্যে রাখলাম। গনগনে আগুনে টকটকে লাল হয়ে উঠলো সিক দুটো। তারপর দুজনে দুখানা তুলে এনে এক সঙ্গে ঢুকিয়ে দিলাম দৈত্যটার দুই চোখে। যন্ত্রণায় আকাশ-ফাটা আর্তনাদ করে ওঠে সে। কিন্তু ততক্ষণে আমাদের কাজ হাঁসিল হয়ে গেছে। বিকটভাবে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সে আমাদের দিকে তেড়ে আসে। কিন্তু এলে কি হবে, চোখ তো গেছে, আন্দাজে কি করে ধরবে আমাদের? আমরা ওর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা করতে করতে পাশ কাটিয়ে যেতে থাকি। নিরুপায় হয়ে দৈত্যটা তখন গোঙাতে গোঙাতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যায়।

এবার আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে সমুদ্রের ধারে এসে ভেলায় উঠে পড়লাম।

ভাবলাম পথের কাঁটা দূর হয়েছে। কিন্তু না, ভেলাটা তখনও তীর ছেড়ে খুব বেশিদূর যায়নি, দেখলাম, একটা কালো কদাকার মেয়েছেলে দৈত্যটার হাত ধরে ছুটতে ছুটতে তীরের দিকে আসছে। মেয়েটা একখণ্ড পাথরের চাঁই এনে দিল ওর হাতে। আর প্রচণ্ড বেগে সে ছুঁড়ে মারলো আমাদের ভেলা বরাবর। চোখে দেখতে না পেলে কি হবে, নিশানা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। আর একটু হলেই ভেলার মাঝখানে পড়তো চাঁইটা। নেহাৎ বরাতের জোর, এক দিকের কানায় লেগে কাত হয়ে গেল খানিকটা। আমাদের দুটি লোক প্রাণ হারালো। তবুও, অল্পের ওপর দিয়ে ফাঁড়া কেটে গেল। এর পরেও অবশ্য আরও কয়েকটা পাথরের চাঁই সে ছুঁড়েছিল, কিন্তু ততক্ষণে আমাদের ভেলা তার নাগালের বাইরে চলে গেছে।

আল্লাহর দোয়ায় হাওয়া অনুকূল হলো। একটানা দুদিন-দুরাত্রি চলার পর আমরা একটা নতুন দ্বীপে এসে ভিড়লাম। নতুন জায়গা, কিছুই জানি না; সুতরাং খানাপিনা সেরে আমরা একটা বড় গাছের ডালে উঠে সে-রাতটা কাটালাম।

সকাল বেলা, অন্ধকার কেটে যেতেই, নজরে পড়লো, বিরাট বিরাট সাপ সেই গাছের অন্য ডালে লেজ-জড়িয়ে ঝুলছে। ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেল। তাদের চোখগুলো যেন জ্বলন্ত ভাঁটা। লোলিহান জিহ্বা বের করে আমাদের দিকে জ্বল জ্বল করে তাকাচ্ছে। হঠাৎ একজনের আর্ত চিৎকারে তাকিয়ে দেখি, আমাদের একজনকে প্যাঁচে জড়িয়ে ফেলছে একটা সাপ। তারপর বিকট বিশাল হা করে তার গোটা দেহটা নিমেষের মধ্যে গিলে ফেললো সে।

হায় আল্লাহ, একি হলো, দৈত্যের খপ্পর থেকে যদি বা রেহাই পাওয়া গেল কিন্তু এখন এই ভয়াল সাপের হাত থেকে বাঁচবো কি করে? আল্লাহ ছাড়া আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে। জ্ঞান চৈতন্য প্রায় নাই বললেই চলে। কোনও রকমে গাছের ডাল থেকে নামতে পারলাম আমরা। একটা ঝর্ণার ধারে এসে মুখ হাত ধুয়ে কিছু ফলমূল খেয়ে নিলাম। তারপর শুরু হলো

আমাদের অন্বেষণ যাত্রা। কোথায় একটা নির্ভরযোগ্য আস্তানা পাওয়া যাবে তারই অনুসন্ধান করতে লগলাম। অবশেষে অনেক দূরে একটা গাছ নির্বাচন করা হলো। তন্ন তন্ন করে খুঁজে পেতে দেখলাম। না, কোথাও কোনও সাপ-খোপ কিছু নাই। তাছাড়া গাছটা অনেক উঁচু। সে-রাতটা আমরা সেই গাছের ডালেই অনেকটা নিশ্চিন্তে কাটাতে পারবো। মনে আশা হলো এতদিন পরে বোধহয় এই প্রথম আমাদের নির্ভয় রাত্রিবাস হবে। কিন্তু হায় কপাল, রাত, যত গভীর হতে থাকে চারদিকে ভয়াল সাপের নিশ্বাসের শব্দ শুনে কেঁপে উঠি। দিনের বেলায় তারা গাছে থাকে না। কিন্তু রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয়।

আমার নিচের ডালের সঙ্গী চিৎকার করে উঠে। বুঝলাম, যদিও অন্ধকারে চোখে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, সাপের মুখে চলে গেছে সে।

তখন, সেই অন্ধকারে, গাছ থেকে নেমে পালাই তার সাধ্য কি? মরি বাঁচি এই গাছের ডাল আঁকড়েই রাতটা কাটাতে হবে। প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে শুধু আল্লাহর নাম জপ করতে থাকলাম।

সকাল হলো। দেখলাম সাপটা খেয়ে-দেয়ে কেটে পড়েছে। আমি গাছ থেকে নেমে পড়ি। তখন আমার মাথায় শুধু একমাত্র চিন্তা এই সাপ-পুরী থেকে পালাতে হবে। আবার সমুদ্রেই পাড়ি জমাবো। তাতে যদি ডুবেও মরি, কোন দুঃখ নাই।

সমুদ্রের দিকে চললাম। কিছুদূর যেতেই আমার বিবেক বাধা দিতে লাগলো। সামান্য সাপ-খোপের ভয়ে যদি পালাতে হয় তবে দেশের সুখ-বিলাস ছেড়ে পরবাসের দুর্ভোগ পোয়াতে বেরুবার কি দরকার ছিল? ভাবলাম, না, পলায়ন নয়, সাপের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলতে হবে। সেই উপায় খুঁজে বের করতেই হবে।

সুতরাং আবার আমি ফিরে এলাম। কতকগুলো টুকরো টুকরো কাঠ যোগাড় করলাম। দুপায়ে বাঁধলাম দুখানা। কোমর থেকে গলা অবধি বুক পিঠ ঢোকে বাঁধলাম কয়েকখানা কাঠে। দুহাতে বাঁধলাম দুখানা। এইভাবে অনেকগুলো কাঠের টুকরো দিয়ে সারা শরীরটা মুড়ে ফেললাম। এবার যদি সাপ আমাকে আক্রমণও করে, গিলে ফেলতে পারবে না।

আমার এই কায়দায় সে রাতটা আমি সাপের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছিলাম নিজেকে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ময়াল সাপ এসে আমাকে গ্রাস করার চেষ্টা করলো। কিন্তু দুস্তর কাঠের বাধা—সে কিছুতেই মুখে পুরতে পারলো না। কিছুতেই কায়দা করতে না পেরে শেষে সাপটা আমাকে জড়িয়ে ফেললো। কিন্তু তাতেও আমার কিছু অসুবিধে হলো না। তার প্যাঁচের বাঁধন কাঠের গায়েই আটকে থাকলো। আমার দেহে কোনও আঘাত করতে পারলো না।

এইভাবে সাপটা সারাটা রাত আমার সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত হয়ে ভোরবেলা কেটে পড়লো।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

যখন আমি নিশ্চিতভাবে বুঝলাম, সাপটা চলে গেছে, কাঠের টুকরো-গুলো এক এক করে খুলে ফেললাম সব। সারাটা রাত এই কাঠের বন্ধনে কাটিয়ে শরীরটা অবশ অসাড় হয়ে গেছে। ঝর্ণার পাশে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে কিছু ফলাহার করে উন্মুক্ত সূর্যালোকে ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

এইভাবে অনেকক্ষণ আয়েস করার পর, ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে চলতে থাকি। হঠাৎ একটা মাস্তুল চোখে পড়লো। ছুটে আরো কাছে যেতেই পরিষ্কার দেখতে পেলাম, একখানা জাহাজ চলে যাচ্ছে। আমি দু হাত নেড়ে তারস্বরে চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু মনে হলো না, কেউ শুনতে পেলনা। তখন আমার মাথার পাগড়ী খুলে জোরে জোরে দোলাতে থাকলাম। এবার কাজ হলো। বুঝলাম, ওরা আমার পাগড়ী নাড়া দেখতে পেয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কাপ্তেন জাহাজের গতি ঘুরিয়ে দ্বীপে এসে ভিড়লো। আমাকে ওরা তুলে নিল জাহাজে।

ওরা আমাকে নতুন সাজ পোশাক দিল, খানাপিনা দিল। আমি আবার নতুন জীবন ফিরে পেলাম। জাহাজের কাপ্তেন, খালাসীদের বললাম আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী। তারা শুনতে শুনতে আমার দুঃসাহসিকতার তারিফ করলো। বললো, আল্লাহ তোমার সহায় আছেন, তাই এই বিপদেও প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছ।

এর পর আমরা বেশ সুখেই দিন কাটাতে থাকলাম। জাহাজ চলতে চলতে একদিন সালাহিতা দ্বীপে এসে নোঙর করলো। সওদাগররা নেমে শহরের দিকে চললো—কেনাবেচা করতে।

জাহাজের কাপ্তেন আমাকে ডেকে বললো, দেখো, তুমি তো ভাগ্যের বিপর্যয়ে আজ নিঃসম্বল। গরীব। এক কাজ কর, আমার এই জাহাজে বাগদাদের এক সওদাগরের কিছু সওদাপত্র আছে। পথের মাঝখানে তাকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তুমি সেই জিনিসপত্রগুলো এখানকার শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করার চেষ্টা করো। যা লাভ হবে, সবই তোমার। আমাকে শুধু আসল দামটা ফেরৎ দিও। দেশে ফিরে তার আপনজনদের হাতে টাকাটা ফেরৎ দিয়ে দেব।

আমি কাপ্তেনের এই বদান্যতায় খুশি হয়ে বললাম, আপনি আমার জন্যে এতটা করছেন, এ ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না।

কাপ্তেন বলে, তার দরকার নাই। যাও, আমি খালাসীদের বলে দিচ্ছি। তোমাকে গাঁটরিগুলো বের করে দেবে।

কাপ্তেনের হুকুমে খালাসীরা গাঁটরীগুলো বাইরে আনলো। আমি দেখে অবাক হলাম—গাঁটরীগুলোর ওপরে আমার নাম 'সিন্দবাদ নাবিক' লেখা রয়েছে।

আনন্দে আমি লাফিয়ে উঠলাম। এসব তো আমারই জিনিস। গতবারের সমুদ্রযাত্রার সময় এক দ্বীপে নেমে যথা সময়ে জাহাজে ফিরতে পারিনি আমি। জাহাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

কাপ্তেন সব শুনে আমাকে ভালো করে লক্ষ্য করলো, তাই তো, তুমিই

তো সেই সওদাগর বটে। তা হলে তো ভালোই হলো। তোমার জিনিস তুমি ফিরে পেলে। আর আমিও একটা দায় থেকে রেহাই পেলাম। যাও, এবার শহরে গিয়ে বেসাতি করে এস।

সেই সব জিনিসপত্র বেশ চড়া দামে বিক্রি করে অনেক নাফা করলাম আমি।

এর পর আমরা দেশে ফিরে আসি। এই হচ্ছে আমার তৃতীয় সমুদ্র-যাত্রা। এর পর তোমাদের শোনাবো আমার চতুর্থ যাত্রার কাহিনী।

বৃদ্ধ সিন্দবাদ একপোটা সোনার মোহর কুলি সিন্দবাদের হাতে গুঁজে দিয়ে বললো, কাল সকালে ঠিক সময়ে আসবে কিন্তু।

❋ ❋ ❋ ❋

পরদিন যথা সময়ে কুলি সিন্দবাদ এবং অন্যান্য শ্রোতারা এসে হাজির হয়। নাস্তাপানি শেষ করার পর বৃদ্ধ তার কাহিনী বলতে শুরু করে :

যদিও দারুণ ভোগ বিলাসের মধ্যে আমার দিন কাটছিল, কিন্তু রক্তে আছে আমার ঘর-ছাড়ার নেশা। তাই বাগদাদের বৈচিত্র্যহীন বিলাসের জীবন-যাত্রা আমার ধাতে সইলো না। কিছুদিন যেতে না যেতেই বিদেশ যাত্রার ভূত আমার ঘাড়ে চেপে বসলো।

এবারও আমি অনেক বাছাই করা দামী দামী বাহারী সামগ্রী সওদা করলাম। যে-সব জিনিস সাধারণত বিদেশের বাজারে মেলে না, সেই জাতের জিনিসপত্র।

দিনক্ষণ দেখে একদিন বসরাহর বন্দর থেকে এক বিরাট জাহাজে চেপে বসলাম আমরা কয়েকজন সওদাগর।

দিনের পর দিন জাহাজ চলেছে। একদিন কাপ্তেন এসে বললো, এখুনি ঝড় উঠবে। আর এক পাও এগানো যাবে না। জাহাজ এই মাঝ সমুদ্রেই নোঙর করতে হবে।

ঝড়ের কথা শুনে বুক শুকিয়ে গেল। না জানি এবার কি বিপদ ঘটে। যদি উত্তাল ঢেউর দাপট সহ্য করতে না পেরে জাহাজটা উল্টে যায়—

মুহূর্তের মধ্যে প্রচণ্ড ঢেউ-এর ধাক্কায় আমাদের জাহাজটা খানখান হয়ে গেল। সেই প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে কে কোথায় তলিয়ে গেল তার কোনও হদিশ করতে পারলাম না।

আল্লাহর অপার মেহেরবানী, আমি একখানা কাঠের পাটাতন আঁকড়ে ধরতে পেরেছিলাম। সেই পাটাতনখানা আশ্রয় করে ভাসতে ভাসতে এক সমুদ্র-সৈকতে এসে উঠলাম।

তখন আমার প্রায় মৃত-কল্প দশা। হিমের মতো ঠাণ্ডা জলে সারা শরীর সিঁটকে গেছে। সারা রাত সৈকতের বালির উপরে অসাড় অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলাম। সকালবেলায় উঠে দেখি আমার পাশে আরও কয়েকজন সহযাত্রী শুয়ে আছে। আল্লাহর কৃপায় তারাও প্রাণে রক্ষা পেয়ে গেছে।

সমুদ্রতীর ছেড়ে আমরা গ্রামের পথে পা বাড়ালাম। কিছু দূর যেতেই

একটা বাগানের মধ্যে একখানা সাদা রঙের বাড়ি দেখতে গেলাম। বাড়িটার কাছে আসতেই একদল উলঙ্গ কালো মানুষ বেরিয়ে এসে আমাদের ঘিরে ধরলো। তাদের মুখে কোনও কথা নাই। শুধু ইশারায় পথ দেখিয়ে বাড়িটার ভিতরে নিয়ে এল। প্রকাণ্ড প্রশস্ত একখানা ঘর। তার মাঝখানে সিংহাসনে আসীন এক সম্রাট।

সম্রাট আমাদের বসতে হুকুম করলেন। একটু পরে বড় বড় বারকোষে বোঝাই করে খানা এল। খানা বলতে এক ধরনের অদ্ভূত মাংস। এ ধরনের মাংস আমি জীবনে কখনও দেখিনি। চেহারা দেখেই আমার ক্ষিদে তেষ্টা উবে গেল। কিন্তু আমার সঙ্গীরা ক্ষিদের জ্বালায় সেই মাংসই গোগ্রাসে খেতে লাগলো। জাহাজ ডোবার পর থেকে খাওয়া দাওয়া হয়নি, ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করে জ্বলছিল, তাই আর কোনও দিকে দৃকপাত না করে গোটা বারকোষটাই সাবাড় করে দিল তারা। আমি বসে বসে দেখলাম। আমার গা গুলিয়ে যাচ্ছিল ওদের ওই রাক্ষসের মতো গেলা দেখে।

খেয়েদেয়ে ওরা ঢেকুর তুলতে লাগলো। ভূরি ভোজের খানা। আমি কিন্তু নিরম্ব উপবাসীই রয়ে গেলাম। মরে গেলেও ঐ আজব খানা আমার মুখে উঠবে না।

খানাপিনা ব্যাপারে আমার এই খুঁতখুঁতে বাই সে-যাত্রায় আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। কেমন করে, সেই কথাই বলছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি বেশ বুঝতে পারলাম, এই উলঙ্গ হাবসী লোকগুলো নরখাদক। আর ঐ সম্রাট—সেও। তবে ওদের হাতে কোনও মানুষ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ওরা খায় না। প্রথমে তাকে কিছুদিন খাইয়ে-দাইয়ে বেশ মোটাসোটা নাদুস নুদুস করে তোলে। দেহে চর্বি না গজালে নাকি মাংসের স্বাদ হয় না। তাই তারা খুব ভালো করে পেটপুরে খেতে দেয়। আদর যত্ন করে। খাটুনি-মেহনত একেবারেই করায় না। মোট কথা বড় তোয়াজে রাখে।

যে-সব মানুষ ধরা পড়ে তাদের মধ্যে মোটা-সোটা তাগড়াইগুলো থাকে সম্রাটের জন্য। বাকীগুলো খায় উলঙ্গ হাবসীরা। হাবসীরা মানুষের কাঁচা মাংস খেতেই ভালবাসে। কিন্তু হাবসী সম্রাটের বিলাসিতা অনেক। সে কখনও না পুড়িয়ে খাবে না। তার খানা পাকাবার কায়দাই আলাদা। বিরাট মানুষ সমান চুল্লীতে কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। দাউ দাউ করা আগুনে কাঠগুলো পুড়ে যখন গনগনে আগুনের অঙ্গার হতে থাকে, সেই সময়, জ্যান্ত একটা মানুষের সর্বাঙ্গে তেল-মসলা-ঝালের গোলা মালিশ করা হয়। মানুষটা যখন লঙ্কার ঝালে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে থাকে তখন হাবসীরা বুঝতে পারে, মসলায় সে জারিত হয়ে গেছে। এর পর তারা তাকে চুল্লীর নিচে নামিয়ে দেয়। আধপোড়া মতো যখন হয়ে আসে তখন তারা সিকে গেঁথে আংরা মানুষটাকে উপরে উঠিয়ে নিয়ে আসে। এর পর টুকরো টুকরো করে কেটে সম্রাটের সামনে ভোগ নিবেদন করে। আমি ওদের মুখেই শুনেছি, এই নরমাংসের কাবাব-এর স্বাদই নাকি আলাদা। একবার যে খেয়েছে তার মুখে মোরগ-মসাল্লামও নাকি পানসে লাগবে।

এই সব জানার পর থেকে আমি ক্ষিদে ভুলে গেলাম। শুধু পানি

খেয়ে প্রাণ ধারণ করতে লাগলাম। উলঙ্গ হাবসীরা আমাদের সকলকে রাখালের হেপাজতে দিয়ে বললো, খুব সাবধানে চোখে চোখে রাখবি। একটাও যেন খোয়া না যায়। আর খুব ভালো করে চরাবি। দু-চার দিনের মধ্যেই যেন মোটাসোটা নাদুস-নুদুস হয়ে ওঠে সবাই। সম্রাটের ভোগে লাগবে। মনে থাকে যেন।

রাখাল আমাদের বনে জঙ্গলে মাঠে নিয়ে যায়। গাছের ফল পেড়ে এনে দেয়। ফসলের শুটি, রসালো আখ খাইয়ে পেট ডাঁই করে দেয় আমার সঙ্গীদের। আমি কিন্তু কিছু স্পর্শ করি না। ফলে, দিনে দিনে কৃশ হতে কৃশতর হতে থাকি। শেষে এমন হলো ; গায়ে বল পাই না, শরীরের হাড়গোড় সব বেরিয়ে গেল। রাখালটা ভাবে, এই লোকটা একটা আপদ। এক ফোঁটা মাংস লাগছে না গায়ে। উল্টে শুকিয়ে চেলা কাঠ হয়ে যাচ্ছে। সম্রাট কেন, তার সাগরেদরাও খেতে চাইবে না বেটাকে।

রাখালটা আর আমার দিকে তেমন নজর রাখে না। সে শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে আমার বন্ধুদের ওপর। ওরা নির্বিবাদে খেয়েদেয়ে শুয়ে বসে ঘুমিয়ে দিনকে দিন ঢাউস হতে থাকলো। হাবসীরা আর রাখালও ওদের তদারকেই ব্যস্ত হয়ে থাকে। আমি যেন ওদের কাছে এক অবাঞ্ছিত অতিথি। নেহাত ফেলে দেওয়া যায় না তাই রেখেছে—ভাবখানা এই।

তাদের এই ভাবেরই সুযোগ নিলাম আমি। একদিন রাখাল আমাদের চরাতে নিয়ে বেরিয়েছে। আমি কিছু দূর গিয়েই ধপাস করে পড়ে গেলাম। রাখাল জিজ্ঞেস করলো, কী? কী হলো?

আমি বললাম, না, কিচ্ছু না, মাথাটা কেমন ঘুরে গেল?

—ব্যামো? আরে ছো! শকুনে খাবে।

অর্থাৎ অসুস্থ মানুষের মাংস অভক্ষ্য। ওগুলো শেয়াল শকুনকে খেতে দেয় তারা। আমাকে পথের ওপর ফেলে রেখে আমাদের বন্ধুদের তাড়িয়ে নিয়ে রাখালটা এগিয়ে যেতে যেতে বলে, মাথাটা ঠিক হয়ে গেলে পিছনে পিছনে আয়। না হলে, ফেরার সময় নিয়ে যাবো, এখানেই শুয়ে থাক।

এই—মউকা! রাখালটা চোখের আড়াল হতেই আমি বাঁকা পথ ধরলাম। ঝোপ জঙ্গল ভেঙ্গে সবার অলক্ষে সমুদ্রের দিকে এগোতে থাকি।

কিন্তু কোথায় সমুদ্রতীর? সারা দিন সারা রাত চলার পরও কোনও সমুদ্রের কিনারা পাওয়া গেল না। পরদিনও এইভাবে দুর্গম পথ অতিক্রম করে চলতে থাকি। শেষে আটদিনের দিন এক নতুন দেশে এসে হাজির হই। সেখানকার অধিবাসীরা দেখলাম, আমাদের মতোই সভ্য জগতের মানুষ। তাদের গায়ের রঙ শুভ্র; কাপড়চোপড় পরে।

একদল মানুষের সঙ্গে দেখা হলো। ওরা তখন লঙ্কার ক্ষেত থেকে লঙ্কা তুলে বস্তাবন্দী করছিল। আমাকে পরদেশী দেখে তারা কাছে এসে ভিড় করে দাঁড়ালো। ওদের মুখের ভাষা আমারই মাতৃভাষা। কতকাল পরে অন্যের মুখে নিজের দেশের ভাষা শুনে কি যে ভালো লাগলো—

ওরা জিজ্ঞেস করে, কে বাছা তুমি? এমন কেন তোমার দশা?

আমি জবাব দিই, আমি বিদেশী মুসাফীর। সমুদ্রে জাহাজ ডুবি

হয়ে এই হাল হয়েছে। নরখাদকদের হাতে পড়েছিলাম। কোনওরকমে পালিয়ে এসেছি। আমার সঙ্গীরা এখনও তাদের খপ্পরেই পড়ে রয়েছে।

আমার কাহিনী শুনে ওরা বিস্ময়াহত হয়। বলে, আহা, তোমার বুঝি অনেক কাল নাওয়া খাওয়া হয়নি?

আমি বলি, খাইনি, তাই বেঁচে গেছি। খাওয়া দাওয়ার লোভ সামলাতে না পারলে আর বাঁচতে হতো না।

ওরা আমাকে ওদের ঘরে নিয়ে গেল। ভালো করে গোসল করলাম। এই প্রথম পেট পুরে খানা খেলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর ওরা আমাকে একখানা জাহাজে করে দরিয়ার ওপারে একটা দ্বীপের শহরে নিয়ে গেল। সেখানে থাকে ওদের সুলতান। শহরটা ভারি সুন্দর। অনেক দোকানপাট, অনেক লোকের বাস। সুলতানের দরবারে যাওয়ার পথে শহরটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে দেখালো ওরা। আমাদের বাগদাদের মতোই নানারকম বাহারী জিনিসপত্র পাওয়া যায় সেখানকার বাজারে। পথঘাট-গুলোও বেশ চওড়া। তাগড়াই ঘোড়া, উট, গাধা, খচ্চর সবই দেখতে পেলাম। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে অবাক লাগলো, জীন লাগাম ছাড়াই ঘোড়ার পিঠে চেপে চলেছে সেখানকার সওয়ারীরা।

সুলতানের দরবারে আমাকে হাজির করা হলো। যথা বিহিত কুর্নিশ জানিয়ে তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার দেশ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, জাঁহাপনা। কিন্তু একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না, জীনলাগাম না লাগিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে কেন এখানকার মানুষ? জীন লাগাম শুধু আরামদায়কই না, দেখতেও বড় বাহারী।

সুলতান অবাক হয়।—জীন লাগাম? সে কেমনতর বস্তু? আমার বাপ চৌদ্দপুরুষ তো তেমন কোনও জিনিসের নামও শোনেনি।

আমি বললাম, আপনি যদি হুকুম করেন, আমি আপনাকে বানিয়ে দেখাতে পারি। তারপর বুঝতে পারবেন, কত সুন্দর, সুখের, শখের আর দরকারী এই জীন লাগাম।

সুলতান বললো, বেশ তো করে দেখাও। যদি খুশি করতে পারো—তোমাকেও খুশি করে দেব আমি।

আমি বললাম, আমাকে একজন চৌকস ছুতোর দিতে হবে।

সুলতানের নির্দেশে শহরের সেরা সূত্রধর এল আমার কাছে। আমি তাকে নক্সা এঁকে বোঝালাম, কী বস্তু আমি বানাতে চাই। লোকটা কাঠের কাজে ওস্তাদ। যেমনটি আমি চাই—নিখুঁতভাবে সেই রকম একখানা কাঠের জীন বানিয়ে দিল। এবার আমি ধুনুরীকে দিয়ে জীনের মাপের একখানা বাহারী গদী তৈরি করালাম। সোনার জরিতে কাজ করা নানা বর্ণের এই গদী কাঠের জীনের ওপর বসিয়ে এঁটে দিলাম। এর পর এক দক্ষ কামারের সহায়তায় বানালাম একজোড়া লাগাম আর রেকাবী।

সব যখন আমার পছন্দ মতো যথাযথভাবে তৈরি হয়ে গেল, সুলতানের ঘোড়াশাল থেকে বাছাই করে একটা তাগড়াই ঘোড়া নিয়ে এলাম আমি। সেই নতুন জীন লাগাম তার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে এলাম সুলতানের সামনে। সুলতান ক'দিন ধরে রোজই আমার কাজের খোঁজ-খবর নিচ্ছিল। নতুন

এই বস্তুটি দেখার আগ্রহে সে অধীর হয়েছিল।

ঘোড়ার যে এমন মনোহর সাজ হতে পারে সুলতান ভাবতে পারেনি। খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলো সে। আর তর সইলো না, তখুনি সে লাফিয়ে উঠে বসলো ঘোড়ার পিঠে।

—বাঃ, বহুৎ বড়িয়া চিজ তো? হুঁ—খুব আরাম—

সুলতান খুব খুশি হয়ে আমাকে প্রচুর পরিমাণে ইনাম দিল। উজির আমাকে বললো, বাঃ চমৎকার জিনিস তো। আমাকেও একটা বানিয়ে দাও।

তাকেও তৈরি করে দিলাম একটা। সে-ও আমাকে অনেক পয়সাকড়ি উপহার দিল। এরপর দরবারের আমির ওমরাহ, সেনাপতি একে একে সবাই ফরমাশ করতে থাকলো—সবাইকেই বানিয়ে দিলাম লাগাম জীন। বিনিময়ে পেলাম প্রচুর অর্থ। এইভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে, সেই শহরের আমি এক সেরা ধনী এবং মান্যগণ্য মানুষ হয়ে উঠলাম।

সুলতান আমাকে বহুৎ খাতির যত্ন করতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যে আমি তার পহেলা পেয়ারের মানুষ হয়ে গেলাম।

একদিন, দরবারে আমি তার পাশে বসে আছি, সুলতান আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললো, সিন্দবাদ। তুমি কি জান, আমি তোমাকে কত ভালোবাসি! তুমি তো আমার প্রাসাদের পরিবারেরই একজন হয়ে গেছ। তোমাকে ছাড়া আমার এক দণ্ড চলে না, তোমার পরামর্শ ছাড়া কোনও একটা কাজ করতে পারি না। সুতরাং আমার এই মায়াবন্ধন ছিঁড়ে ফেলে যে দেশে পালাবে সে আমি হতে দেব না। এই কারণে আমি তোমাকে কঠিন বাধনে বাঁধতে চাই।

আমি বললাম, আদেশ করুন, জাঁহাপনা। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য। আজ আমার যে এই ধনদৌলত ইজ্জত—সবই তো আপনার মেহেরবানীতে। সুতরাং আপনি যা হুকুম করবেন আমি মাথা পেতে নেব।

—তাহলে, সুলতান বলে, তুমি আমার কথা মতো আমার প্রাসাদের একটি পরমা সুন্দরী মেয়েকে শাদী করে এখানে পাকাপাকি ভাবে সংসার পাতো। মেয়েটি রূপে গুণে অসাধারণ। সারা দেশে তার জুড়ি খুঁজে পাবে না। আমার বিশ্বাস, সে তোমাকে সুখ শান্তি দুইই দিতে পারবে। আমি ভেবেছি, সে-ই পারবে তোমাকে এখানে ধরে রাখতে।

আমি লজ্জাবনত হয়ে বসে থাকি। ভেবে পাই না, কি এর জবাব দেব—কিভাবেই বা দেব।

সুলতান, আমাকে নীরব থাকতে দেখে, প্রশ্ন করলো, কী, চুপ করে রইলে কেন? জবাব দাও?

আমি কোনও রকমে কুণ্ঠিত ভাবে বলতে পারি, আমি আর কী বলবো জাঁহাপনা, সবই আপনার হাতে। আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আমি আপনার দাসানুদাস।

সুলতানের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে কাজীকে খবর দেওয়া হলো। তক্ষুণি সাক্ষীসাবুদ নিয়ে হাজির হলো কাজীসাহেব। এক ঘন্টার মধ্যে শাদীনামা তৈরি হয়ে গেল। শাহবংশের এক পরমা সুন্দরী

শিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে সাদী হয়ে গেল আমার।

আমার সদ্য শাদী করা বিবি শুধু সুন্দরী আর শিক্ষিতাই নয়—সে তার মৃত পিতার অতুল ঐশ্বর্যের একমাত্র ওয়ারিশ। প্রাসাদোপম ইমারৎ, বিশাল ভূসম্পত্তি, বহু মূল্যবান ধনরত্ন এবং প্রচুর নগদ অর্থের সে মালিক। এছাড়া সুলতানও উপহার উপঢৌকন দিল অঢেল। আমাকে দিল সে একখানা প্রাসাদ এবং আরও দিলেন বিশ্বস্ত লোকজন, দাসদাসী নফর বান্দা। এদের কেউই বাজার থেকে সদ্য কেনা নয়। বহুকাল সুলতান-প্রাসাদে একান্ত বশংবদ হয়ে কাজ করে এসেছে।

শাদীর পরে আমার জীবনের মোড় ঘুরে গেল। এত আনন্দ, এত প্রাণঢালা ভালোবাসার স্বাদ এর আগে কখনও পাইনি। আমার যৌবনে বসন্তের রং ধরলো। নানা বাহারে, নানা ছন্দে বিকশিত হয়ে উঠলাম আমি।

এইভাবে অনেক দিন কেটে গেল। যদিও সুলতানের কাছে আমি অঙ্গীকারাবদ্ধ, তবু অন্তরে, অতি সঙ্গোপনে, লালন করে চলেছি, একদিন না একদিন আমার বিবিকে সঙ্গে করে আমি আবার বাসভূমি বাগদাদে ফিরে আসবো।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। মানুষ নিয়তিকে এড়াতে পারে না। এবং তার ভবিতব্য কি তাও সে জানতে পারে না। নিয়তির হাতে সে খেলার পুতুল মাত্র।

একদিন আমার এক প্রতিবেশী বন্ধুর বিবি মারা গেল। তার তার-স্বরে কান্না শুনে আমি ছুটে গেলাম। নানাভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার কোনও সান্ত্বনাই তার মড়াকান্না থামাতে পারলো না। আমি যতই তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করি, ততই সে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে।

আমি বোঝাতে চাই, দেখ, বিবি কারো চিরকাল বেঁচে থাকে না। তাই নিয়ে এত কান্নাকাটি করে কি করবে? এই তো তোমার জোয়ান বয়স, আবার শাদী করবে, আবার তোমার সংসার ভরে উঠবে। কেন এত দুঃখ করছ। আমি তোমাকে সুন্দরী মেয়ে দেখে শাদী দিয়ে দেব।

আমার বন্ধু আরও উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলো, এসব তুমি কী বলছো, দোস্ত। আর একঘন্টা বাদে যাকে সহমরণে মরতে হবে তার আবার নতুন করে শাদী করার কথা ওঠে কি করে?

আমি কিছুই বুঝতে পারি না তার কথা।—তার মানে? একঘন্টা বাদে মরতে হবে কেন?

আমাকে অবাক হতে দেখে বন্ধুবর বললো, সেকি! তুমি জান না আমাদের দেশের আইনকানুন। এদেশে স্বামী বা বিবি যে-ই আগে মরুক, তার সহমরণেই মরতে হবে অন্যজনকে। তা সে যদি স্বয়ং সুলতানও হন, কোনও রেহাই নাই।

আমি আঁৎকে উঠি। সর্বনাশ! এমন জানলে, কে শাদী করতো। এখন আমার বিবি যদি মারা যায় তবে আমাকে মরতে হবে? একি কথা? কিন্তু আমি তো পরদেশী। এ দেশের আইনকানুন আমার ঘাড়ে চাপবে

কেন? বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা বলতে পার, দোস্ত তোমাদের দেশের এই বদখদ আইন আমার বেলাতেও খাটবে কিনা?

—আলবৎ খাটবে। এদেশে যে বাস করবে তা সে এদেশীই হোক, আর বিদেশীই হোক সকলের বেলাতেই সমানভাবে খাটবে।

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম কান্নার আসল কারণটা কী? বিবি মারা যাওয়ার জন্য তার বিশেষ শোকতাপ নাই, নিজেকে মরতে হবে সেই আতঙ্কেই সে সারা।

যাই হোক বিপদের দিনের বন্ধুর পাশে এসে দাঁড়ানো দরকার। তার এই অন্তিমযাত্রায় দু ফোঁটা চোখের জল ফেলাও তো আমার কর্তব্য।

পাড়াপড়শীরা অনেকেই এল। যথা নিয়মে মৃতদেহকে বয়ে নিয়ে চললো কিছু লোক। তার পিছনে আমার বন্ধু কাঁদতে কাঁদতে চলে। আমরা চলি তার পিছনে। আমাদের চোখেও জল। সমবেদনার অশ্রু।

শহর ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে পাহাড়ের পাদদেশে ওদের সমাধিক্ষেত্র। সমাধিক্ষেত্র বলা বোধ হয় ঠিক হলো না। একটা প্রকাণ্ড বড় ইঁদারা। তার নিচে নামিয়ে দেওয়া হয় শবদেহটা। তারপর যাকে সহ-মরণে পাঠানো হবে তার পিঠে সাতখানা রুটী, এক কলসী জল আর হাতে দড়ি বেঁধে সেই ইঁদারার নিচে নামানো হয়। তলায় মাটি স্পর্শ করার পর উপর থেকে বলা হয়, এবার হাতের বাঁধন খুলে দড়ি ছেড়ে দাও। দড়ির বাঁধন সে খুলে দেয়। তখন দড়িটা তুলে, ইঁদারার মুখে একটা পাথর চাপা দিয়ে তারা ঘরে ফিরে যায়। ব্যাচারী সাতটা রুটি খেয়ে যতদিন বাঁচতে পারে ততদিন বেঁচে থাকে। তারপর অনাহারে, আতঙ্কে একদিন সে মরে যায়।

আমার বন্ধুর এই ভয়াবহ প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা দেখে আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। মনে হলো, এখুনি বুঝি আমি মূর্ছা যাবো। কিন্তু না, নিজেকে কোনওরকমে সামলে নিয়ে ছুটে গেলাম সুলতানের কাছে। কোনও-রকম ভূমিকা না করে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলাম, আমার বিবি যদি আগে মারা যায়, আমাকে কী তার সঙ্গে সহমরণে যেতে হবে?

সুলতান বললো, নিশ্চয়ই। কিন্তু কেন, তোমার বিবি কি—

আমি বাধা দিয়ে বলি, না সে সব কিছু ঘটেনি। তবে ঘটতে তো পারে। সে ক্ষেত্রে আমাকে কেন মরতে হবে? আমি তো পরদেশী। আর তা ছাড়া ছেলে মেয়ে বিবি সবই তো আছে। আপনার দেশের আইনকানুন আমাকে মানতে হবে কেন?

—আলবৎ মানতে হবে। এদেশে বাস করলে, এদেশের মেয়েকে শাদী করলে এদেশের কানুন মানতেই হবে। সে তুমি যে-দেশের মানুষই হও।

আমার অবস্থা তখন উন্মাদের মতো। প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ি ফিরে এলাম। আসার পথে কেবল আতঙ্ক হচ্ছিল, যদি বাড়ি পেঁাছে দেখি, বিবি মরে গেছে! তখন? তখন কী হবে? শহরের প্রতিটি মানুষ আমাকে ভালোবাসে। আমার শোকে সান্ত্বনা দিতে আসবে তারা। আমার বিরাট প্রাসাদ-এ তিল ধরনের ঠাঁই থাকবে না। লোকেলোকারণ্য হয়ে যাবে। এর পর শবযাত্রায় সঙ্গী হতে আসবেন, সুলতান, উজির আমির সেনাপতি —সবাই। এদের চোখে ধুলো দিয়ে পালানো যাবে না। বে-ঘোরে প্রাণ

হারাতে হবে।

কিন্তু না, ওসব কিছুই হয়নি। বিবি আমার বহাল তবিয়তেই আছেন। ধড়ে প্রাণ এল।

কথায় আছে—খোদার মা'র দুনিয়ার বা'র। নসীব খারাপ, কিছু দিন যেতে না যেতে আমার বিবিজান অসুখে পড়লো। শরীর থাকলেই অসুখ-বিসুখ হয়। তাই নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কী আছে? এই বলে মনকে প্রবোধ দিই। কিন্তু ঘর পোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডর হয়। আমার দশাও তাই। শুধুই মনে শঙ্কা জাগে, যদি অসুখ না সারে। যদি আর শয্যা ছেড়ে না ওঠে সে?

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। সত্যি সে আর সে-শয্যা ছেড়ে উঠলো না। খোদা তাকে কোলে তুলে নিলেন। আমার অবস্থা নিশ্চয়ই আঁচ করতে পারছো তোমরা। কোরবানীর খাসীর মতো গলা বাড়িয়ে দিতে হবে ভেবে আমি শিউরে উঠলাম। পালাবো সে পথ নাই। আমার অগণিত শুভানুধ্যায়ীরা পিলপিল করে ধেয়ে এসে আমার প্রাসাদ ভরে ফেললো। সুলতানের প্রাসাদে খবর গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তার দলবল নিয়ে সান্ত্বনা জানাতে এল আমাকে।

সুলতান সাশ্রু নয়নে বললো, বিধাতার বিধান মেনে নিতেই হবে, বাবা। এই সংসারের মায়া মহব্বৎ, সব কাটিয়ে তোমাকে আজ তার দোসর হতে হবে। আমাদের শাস্ত্রের এই বিধান। এবং এর চেয়ে বেশি পুণ্য আর কিছুতে হয়না। হাসি মুখে তোমার বিবির অনুগামী হও, বেটা। মন পার্থিব কামনা বাসনা মুক্ত কর। দেখবে, তখন এই পার্থিব জগতে থাকতে আর মন চাইবে না।

সুলতানের এই বাক্যালা আমার তখন অসহ্য মনে হচ্ছিল। এই লোকটার জন্যেই আজ আমার এই দশা। দেশে বিবি বাচ্চা থাকতে এখানে একটা মেয়েকে গছিয়ে দিল সে। আর এত বড় হাড়ে-হারামজাদা, সব কথা খোলসা করে বলেনি আমায়! এইরকম বর্বর আইনকানুন আছে এদেশে সে-কথা আগে জানলে কে সেধে হাঁড়ি-কাঠে মাথা গলাতো?

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতাম। বিবি-বাচ্চা নিয়ে সুখে সংসার করতাম। শুধু এই সুলতান বেটাই আমাকে আটকে রেখে দিল। বলে কিনা, 'তোমায় আমি ছাড়বো না। তোমাকে আমি পেয়ার করি। আমাকে ছেড়ে চলে গেলে প্রাণে বাঁচবো না—তুমি এখানে শাদী করে সংসার পাতো।' তখন কি বুঝেছিলাম, লোকটা আমাকে এখানকার মাটিতে জ্যান্ত কবর দেওয়ার ফন্দী আটছে!

আমি আর্তনাদ করে উঠলাম।—আমাকে আপনারা ছেড়ে দিন। আমি দেশে ফিরে যাবো। সেখানে আমার বিবি বালবাচ্চা আছে। আমি পরদেশী। এভাবে আমাকে মেরে ফেলা আপনাদের অন্যায়।

কিন্তু আমার কথায় কর্ণপাত করলো না কেউ। আমার বিবিকে শাদীর সাজে সাজানো হলো। দামী দামী রত্নালঙ্কারে মুড়ে দেওয়া হলো তার সারা শরীর। তারপর একখানা সাদা কাপড়ের আচ্ছাদনে ঢেকে শব-দেহটা কাঁধে তুলে নিল কয়েকজন।

শব-মিছিলের পুরো ভাগে আমার মৃত বিবি, তার পিছনে আমি, আমার পিছনে সুলতান, তারপর উজির আমির এবং অগণিত শুভানুধ্যায়ীরা। ধীর পদক্ষেপে আমরা এগিয়ে চলি সমাধি ক্ষেত্রের দিকে। সমুদ্র সন্নিহিত পর্বত পাদদেশে।

সেই ইঁদারার কাছে এসে দাঁড়ালাম আমরা। শবদেহ নিচে নামানো হলো। আচার অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর আমার বিবির মৃত দেহটা ইঁদারার নিচে নামিয়ে দেওয়া হলো। এবার আমার পালা। একটা কলসীতে জল ভরে সঙ্গে সাতখানা রুটি আমার পিঠে বেঁধে দিল ওরা। আমি এবার ডুকরে কেঁদে উঠলাম।—দোহাই আপনাদের, আমাকে ছেড়ে দিন।

কিন্তু কেউ শুনলো না সে কথা। আমার হাতে পরিয়ে দিল দড়ির ফাঁস। তারপর কয়েকজনে মিলে জোর-জবরদস্তি করে নামিয়ে দিল ইঁদারার নিচে।

উপর থেকে চিৎকার শোনা গেল, ফাঁসটা খুলে দড়িটা ছেড়ে দাও—

কিন্তু আমি ওদের কথা শুনলাম না। ঠিক করলাম দড়ি আমি ছাড়বো না। বারবার ওরা আমাকে হুকুম করতে থাকলো, দেরি করো না, দড়িটা ছেড়ে দাও। আমরা ফিরে যেতে পারছি না।

তবু আমি ওদের কথা শুনলাম না। শেষে দড়ির আশা ছেড়ে, ইঁদারার মুখে পাথর চাপা দিয়ে ওরা চলে গেল।

আমি সেই প্রায়ান্ধকার ইঁদারার তলদেশে বসে আকুল হয়ে কাঁদতে থাকলাম। কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে শেষে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। সারাটা দিন সারাটা রাত অসাড় ঘুমে কেটে গেল। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গলো। প্রচণ্ড ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে। একখানা রুটি আর একটু জল খেলাম।

চারদিকে ভালো করে চেয়ে দেখলাম, অসংখ্য নরকঙ্কাল। কতকগুলো মৃতদেহে পচন ধরেছে। আর কতকগুলো এখনও আনকোরা। পচা দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু উপায়ই বা কী?

ভেবে ভেবে আতঙ্কিত হতে থাকলাম, এই রুটি ক'খানা ফুরিয়ে গেলে, একদিন অনাহারে শুকিয়ে মরে যেতে হবে এখানে। এই-ই আমার নিয়তি।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো চারতম রজনী সমাগত:

শাহরাজাদ আবার বলতে শুরু করে:

আমি আমার নসীবের কথা ভাবছি। কেন এই পরবাসে শাদী করার শখ হয়েছিল আমার? দেশের ছেলে দেশে ফিরে গিয়ে বিবি বালবাচ্চাদের নিয়ে সুখে সংসার করতে পারতাম। কিন্তু কেন আমার এই দুর্মতি হলো? এখন এইভাবে অপমৃত্যু বরণ করতে হলো? এর চেয়ে সেই হীরক পাহাড়ে সাপের গহ্বরে প্রাণ হারালে ক্ষতি কি ছিল? কিংবা সেই নরখাদকরা যদি আমাকে কাবাব করেই খেত—তাতেই বা কি হতো। সেও

মৃত্যু, এও মৃত্যু। সবচেয়ে ভালো হতো, যখন জাহাজখানা খানখান হয়ে গেল, সেই সময় সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যাওয়া। সে মৃত্যু অনেক গৌরবের হতো।

আমি নিজের চুল নিজে ছিঁড়তে থাকি। ইঁদারার দেওয়ালে কপাল ঠুকি। অসহায়ের মতো আর্তনাদ করি। কিন্তু কে শুনবে আমার সেই আকুল আবেদন।

এইভাবে সাতটা দিন কেটে গেল। রুটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। খিদেয় পেট জ্বলতে থাকে। তবু প্রাণে ধরে শেষ রুটি টুকু নিঃশেষ করে দিতে পারি না। তবুও এখনও ঐ একখণ্ড রুটির দিকে তাকিয়ে ভাবতে পারছি আরও দু-একটা দিন হয়তো বাঁচতে পারবো। মউৎ শিয়রে এলে বাঁচার সাধ বড় বেশি করে জাগে।

খিদের বড় জ্বালা। খাবো না খাবো না করেও রুটির শেষ খণ্ড-টুকু খেয়ে ফেললাম। এরপর আরও দুটি দিন কেটে গেল। আর বুঝি বাঁচা গেল না, জঠরের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম, মৃত্যু আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। চোখ বন্ধ করে আল্লাহর নাম জপ করতে থাকি।

হঠাৎ এক ঝলক আলো এসে উদ্ভাসিত হয়ে গেল আমার আশপাশ। উপরে তাকিয়ে দেখলাম, পাথরখানা সরে গেছে। একটি নতুন শব-দেহ নিচে নেমে আসছে। মৃতদেহটি একজন বৃদ্ধের। এর পরেই দড়ি বেয়ে নেমে এল তার বিবি। পিঠে বাঁধা সাতখানা রুটি আর এক কলসী জল।

আমি উঠে গিয়ে নিয়ে এলাম কঙ্কালের একখানা পা। সেই হাড়ের ডাণ্ডা বসিয়ে দিলাম বুড়িটার মাথায়। একটা বাড়ি মারতেই সে লুটিয়ে পড়ে গেল, আর একটা বাড়ি দিতেই সব শেষ।

এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড করতে হলো ঐ মাত্র সাতখানা রুটির জন্য। যেন তেন প্রকারে আমাকে প্রাণ ধারণ করতে হবে—তখন আমার একমাত্র চিন্তা। কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায়, কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম সে জ্ঞান বুদ্ধি তখন আমার লুপ্ত হয়ে গেছে।

সেই ক'খানা রুটি আর এক কলসী জলে আরও কয়েকদিন চললো। এর পর আবার একদিন কূপের মুখ উম্মুক্ত হলো। নেমে এল একটি বিবির মৃতদেহ আর তার জীয়ন্ত স্বামী। মানুষের কাছে তার নিজের জীবন সবচেয়ে প্রিয়। তাই তাকেও হত্যা করে সেই সাতখানা রুটি আর জল সংগ্রহ করলাম।

এইভাবে অনেক দিন বেঁচে থাকলাম আমি। এক একটা করে মৃত দেহ আসে; আর তার সঙ্গীকে হত্যা করি আমি।

একদিন আমি আমার জায়গায় শুয়ে ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা অদ্ভূত শব্দে ধড়মড় করে উঠে হাড়ের ডাণ্ডাটা হাতে বাগিয়ে ধরলাম। শব্দটা অনুসরণ করে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে থাকি। বেশ বুঝতে পারি, বড়সড় গোছের কোনও একটা প্রাণী ছুটে চলে গেল। আমিও তার ছায়া অনুধাবন করে ছুটে চলি। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই নজরে আসে না। তবু চলতে থাকি। ব্যাপারটা কী—দেখতে হবে। এইভাবে অনেকক্ষণ

চলার পর হঠাৎ একটি আলোর রশ্মি এসে পড়লো আমার মুখে। সেই আলোর নিশানা ধরে আমি এগিয়ে চলি। ক্রমশ সামনেটা পরিষ্কার হয়ে আসে। আরও এগিয়ে যাই। আলোর বন্যায় চোখ আমার ঝলসে গেল। তখনও আমি কিন্তু ভাবতে পারছি না, এই আমার মুক্তির পথ। বরং মনে হলো, এ বুঝি আর একটা মৃত্যু কূপ। কিন্তু একটু পরেই আমার ভ্রম কাটলো। সেই দিবালোকে পরিষ্কার দেখলাম, একটি মাংসভুক জানোয়ার দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম।

হিংস্র জানোয়াররা মড়ার লোভে পাহাড়ের নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে এই মৃত্যুকূপের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে। রাতেরবেলায় তারা চুপিসারে এসে লাশ টেনে নিয়ে চলে যায়।

জানোয়ারটাকে অনুসরণ করে আমি এগিয়ে যাই। এবার আমি উন্মুক্ত আকাশের নিচে এসে দাঁড়াই। সামনে সমুদ্র। পিছনে খাড়াই পাহাড়। প্রাণ ভরে মুক্ত হাওয়ায় নিশ্বাস নিই। দু-হাত তুলে তাঁকে প্রণতি জানাই।

ঋজু পাহাড়টা ওপারের শহরটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে যাওয়ার বা ওদিক থেকে এদিকে আসার কোনও উপায়ই নাই। একমাত্র সমুদ্র পাড়ি দেওয়া ছাড়া পালাবার কোনও পথ দেখতে পেলাম না।

খিদের জ্বালায় আবার আমি ফিরে গেলাম সেই মৃত্যু-কূপএ। সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। আবার আসে নতুন শব। আবার সেই নরহত্যা —সেই রুটি জল সংগ্রহ। এইভাবে বেশ কিছুকাল কাটালো।

সমুদ্রের ধারে এসে দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকি। যদি কোনও জাহাজের মাস্তুল দেখতে পাই। হঠাৎ আমার মাথায় বুদ্ধি খেলে যায়। মৃত্যুকূপ-এ এসে হীরে জহরৎ অলঙ্কারাদি সংগ্রহ করতে থাকি। কতকাল ধরে কত হাজার হাজার মানুষের সমাধি হচ্ছে এখানে। তার অর্ধেক নারী। তারা সবাই রত্নাভরণে সজ্জিতা হয়ে আসে। সেই সব অলঙ্কার ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে আছে।

এক এক করে কুড়িয়ে এক জায়গায় পালা দিই। বিরাট স্তূপের মতো হয়ে ওঠে। শবাচ্ছাদনের মোটা কাপড়ে বোঝাই করে পুটলি বাঁধতে থাকি। তারপর পুটলীগুলো কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাই সমুদ্রের পাড়ে।

দীর্ঘদিন প্রতীক্ষার পর একখানা জাহাজ দেখতে পাই। মাথার পাগড়ী খুলে এদিক ওদিক দোলাতে থাকি। কাপ্তেনের যাতে এদিকে নজর পড়ে সে জন্য এধার ওধার ছুটাছুটি করি। নসীব সাধ দিল। কাপ্তেন সদয় হয়ে একখানা ছোট ডিঙি পাঠিয়ে দিল আমার কাছে। পুটলীগুলো সঙ্গে নিয়ে নৌকায় চেপে বসলাম আমি। একটুক্ষণের মধ্যেই জাহাজে উঠে এলাম।

কাপ্তেন জিজ্ঞেস করলো, কে তুমি? এই হিংস্র জন্তুজানোয়ারের রাজ্যে এলেই বা কী করে। ঐ পাহাড়ের চূড়া ডিঙিয়ে এদিকে তো কোনও মানুষ আসতে পারেনি কখনও। আমি এই সমুদ্রে সারাটা জিন্দগী ঘুরে বেড়াচ্ছি। আজ পর্যন্ত ওখানে কোনও মানুষের ছায়া তো আমার চোখে পড়েনি! তুমি কী করে এলে ওখানে?

আমি বললাম, তা হলে শুনুন আমার কাহিনীঃ আজ আমি এক

মুসাফীর। কিন্তু একদিন আমি ভাগ্য অন্বেষণে বাণিজ্য করতে বেরিয়েছিলাম। সমুদ্রের মধ্যে ঘূর্ণী ঝড়ের মুখে আমাদের জাহাজ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আমি জাহাজের একখানা পাটাতনের কাঠ ধরে কোনও রকমে এইকূলে এসে উঠি।

আমি কিন্তু প্রথমটুকু ঠিকই বললাম, কিন্তু শেষের সব ঘটনাই বেমালুম চেপে গেলাম। বললাম, আমার সামানপত্র সবই খোয়া গেছে। শুধু কোনরকমে আঁকড়ে ধরে ছিলাম আমার এই মূল্যবান হীরে জহরৎগুলো।

একখানা খুব দামী জড়োয়ার গহনা বের করে কাপ্তেনের হাতে দিয়ে বললাম, এটা আপনি রাখুন, যে উপকার আমার করলেন, সে ঋণ এই সামান্য হীরে জহরতে শোধ করা যায় না।

কাপ্তেন কিন্তু গ্রহণ করলেন না।—সে হয় না। তোমার কাছ থেকে একটা কানাকড়ি আমি নিতে পারবো না, বাবা। তুমি বিপদে পড়েছ, আমি নাবিক, তোমাকে উদ্ধার করে যথা স্থানে পেঁছে দেওয়াই আমার কর্তব্য। এজন্য একটুও কুণ্ঠিত হয়ো না তুমি। এই দুস্তর সমুদ্র পথে চলতে চলতে কত মানুষকে আমি উদ্ধার করি। তাদের খানাপিনা সাজ-পোশাক এমন কি ঘরে ফেরার মতো সামান্য কিছু রাহা খরচও সাধ্য মতো দিই। কিন্তু ঐ আমার এক কথা, কারো কাছ থেকে একটা কপর্দকও আমি নিই না। তাই তোমার কাছ থেকেও কিছু নিতে পারবো না। ওটা তুমি রেখে দাও। শোন বাবা, এই দুনিয়াটা পান্থশালা, এখানে খোদাতালার নির্দেশে দুদিনের জন্য এসেছি আমরা। কাজ ফুরালেই চলে যাব। চলার পথে দুদিনের চেনাজানা, দেখাশোনা—সেই স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকে, যদি কখনও কারও এতটুকু উপকারে আসতে পারি।

কাপ্তেনের দীর্ঘ জীবন কামনা করে অনেক সুক্রিয়া জানালাম আমি। জাহাজ আবার চলতে থাকলো। অনেক শহর বন্দর দ্বীপ পার হয়ে চলতে থাকলাম।

জাহাজের খোলা পাটাতনে বসে সমুদ্রের ঘন নীল জলরাশির দিকে চেয়ে চেয়ে স্মৃতি রোমন্থন করি। মাঝে মাঝে শিউরে উঠি। আবার কখনও সন্দেহাকুল হয়ে ভাবি, যা মনে করতে পারি, সবই কি সত্যি সত্যি ঘটেছিল? কোনও মানুষের জীবনে কী এই সব ঘটনা ঘটতে পারে? আমার মৃত বিবির সঙ্গে সেই মৃত্যু-কূপের দিনগুলো? উফ্, ভাবা যায় না। এসব কথা বললে, কেউ বিশ্বাস করবে না। বলবে, হাসিসের মাত্রাটা বুঝি বেশি হয়ে গেছে।

আল্লাহ দোয়ায় একদিন বসরাহর বন্দরে এসে জাহাজ ভিড়লো। খুশিতে নেচে উঠলো মন। এতদিনে ভরসা হলো, দেশে ফিরতে পারবো। বসরাহয় কয়েকটা দিন অবস্থান করার পর আমরা বাগদাদে এসে পেঁছিলাম।

আমাকে দেখে আপনজনদের আনন্দ আর ধরে না। তারা আশঙ্কা করেছিল, আমার সলিল সমাধি ঘটেছে। আমার যে কী আনন্দ সে তোমাদের বোঝাতে পারবো না।

সাতদিন ধরে দীনভিখারী অনাথ আতুরদের ভুরি ভোজন করালাম।

ফকির দরবেশদের দানধ্যান করলাম অনেক।

কিন্তু এও তেমন কিছু নয়, বৃদ্ধ সিন্দবাদ নাবিক বলতে থাকে, আগামীকাল তোমাদের যে কাহিনী শোনাবো তার কোনও তুলনা হয় না। সবই আল্লাহর ইচ্ছা—

সেদিনও সে কুলি সিন্দবাদকে একশোটা সোনার মোহর দিয়ে বলে, কালসকালে ঠিক সময়ে চলে আসবে, কেমন? আচ্ছা, এবার সবাই এস খানাপিনা সেরে নেওয়া যাক।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে সে দিনের মতো সকলে যে যার ঘরে চলে গেল।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো ছয়তম রজনী:

কুলি সিন্দবাদ বাড়ি ফিরে আসে। সারা রাত তার চোখে ঘুম আসে না। বৃদ্ধ সিন্দবাদের সেই বিচিত্র কাহিনীর সব জীয়ন্ত ছবি চোখের সামনে ফুটে উঠতে থাকে। পরদিন সকালে সে যখন আবার বৃদ্ধের বাড়িতে চলে আসে তখনও সে ভাবছে—কী করে সেই মৃত্যুকূপের মধ্যে এই মানুষটা একদিন অতগুলো বীভৎস দিন কাটাতে পেরেছিল। আর কী করেই বা সে মৃত্যু গহ্বর থেকে নিজেকে উদ্ধার করেছিল।

নাস্তাপানি সেরে আবার বৃদ্ধ সিন্দবাদ তার জীবন কাহিনী বলতে শুরু করলো:

আমার চতুর্থ অভিযানের পর বেশ কিছুকাল আমি ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে ফুর্তি করে দিন কাটাতে থাকলাম। কালক্রমে সবই ফিকে হয়ে আসে। সেই নিদারুণ দুঃখকষ্ট আর অনুভব করতে পারি না। শুধু মনে থাকে বিশাল ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির ছবিগুলো। অন্তর থেকে তাগিদ আসে—বাণিজ্যে যাও, সিন্দবাদ বেরিয়ে পড়, ঘরের কোণে বন্দী হয়ে থাকা তোমার ধর্ম নয়। তোমার রক্তে নাচছে ঘরছাড়ার দুরন্ত বাসনা।

বাগদাদের বাজার থেকে দামী দামী দুষ্প্রাপ্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করলাম। একখানা আনকোরা নতুন জাহাজ কিনে বোঝাই করলাম সব। অভিজ্ঞ একজন কাপ্তেনকে মোটা মাইনেয় বহাল করলাম। এবার আমি সঙ্গে নিলাম চাকর নফর বান্দা। এরা আমাকে দেখাশুনা করবে, জাহাজের কাজ কাম করবে। যারা জাহাজে ওঠার আগে ভাড়া চুকিয়ে দেয় সেইরকম কিছু বাছাই করা সওদাগর নিলাম।

দিনক্ষণ দেখে, আল্লাহ নাম করে বসরাহর বন্দর থেকে যাত্রা করলাম আমরা। চলার পথে অনেক শহর বন্দর আসে। আমরা যথারীতি সওদা ফিরি করি। আমাদের দেশের জিনিস তাদের কাছে বিক্রি করি। তাদের দেশের দুষ্প্রাপ্য জিনিস কিনে নিই। অন্য দেশে চড়া দামে বিক্রি হবে—

এই আশায়।

চলতে চলতে একদিন এক দ্বীপের নিশানা দেখতে পেলাম। মনে হলো, জন-বসতি নাই। শুধু বন জঙ্গল আর ধু ধু করা প্রান্তর। আরো কাছে আসতে মাস্তুলের উপরে উঠে দেখলাম দুই গোলাকৃতি গম্বুজের মতো সাদা দুটি অদ্ভুত বস্তু। বুঝতে কষ্ট হল না—এ হচ্ছে রক পাখীর ডিম। এমন বিচিত্র বস্তু দেখার সৌভাগ্য ক'জনের হয়? সঙ্গী সাথীরা বললো, আমরা গল্প শুনেছি, আপনার মুখে, এবার যখন সুযোগ এসে গেল; জাহাজটা একবার ভেড়ান, দেখে আসি।

দ্বীপের কিনারে ভিড়িয়ে জাহাজটা নোঙর করা হলো। আমি ছাড়া সকলেই মহাউল্লাসে নেমে গেল। আমি বললাম, আমার তো দেখা জিনিস। আমি আর যাবো না, জাহাজেই থাকছি। আপনারা দেখে আসুন। আর তা ছাড়া জাহাজখানা একেবারে অরক্ষিত রেখে সবাই মিলে দল বেঁধে নেমে যাওয়াও ঠিক না।

একটু বাদে সঙ্গীরা ফিরে এসে যা বর্ণনা দিল, শুনে ভয়ে আমার হৃৎপিণ্ড কাঁপতে লাগলো। ডিম দুটো ওরা সবাই মিলে ঠেলে এক চুল নড়াতে পারেনি। শেষে বিরাট দুখানা পাথরের চাঁই ছুড়ে মেরেছিল। পাথরের আঘাতে ডিম দুটো ভেঙ্গে একপ্রকার গোলা পদার্থ নির্গত হতে থাকে। শেষে বেরিয়ে আসে রক পাখীর দুটো কচি বাচ্চা।

আমি বললাম, কী সর্বনাশ করেছেন, আপানারা। এখুনি ওদের মা-বাবা আমাদের খতম করে ফেলবে। রক পাখীরা সাধারণত মানুষের কোনও ক্ষতি করে না। কিন্তু একবার যদি তারা বুঝতে পারে, তাদের অনিষ্ট করার জন্য চেষ্টা করছে কেউ—তার আর রক্ষা নাই। আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। এখুনি নোঙর ওঠাও। জাহাজ ছাড়ো।

তাড়াহুড়া করে নোঙর তুলে আমরা জাহাজ মাঝদরিয়ায় নিয়ে এলাম। মনে হল এ যাত্রা বুঝি বিপদ কেটে গেল; কিন্তু না। সবে তখন আমরা খানা-পিনা পাকাতে আরম্ভ করেছি এমন সময় দূর আকাশে দুখণ্ড কালো মেঘ দেখলাম। ভয় হলো; হয়তো তুফান উঠবে। কিন্তু না, সে আমাদের ভুল। মেঘ নয়, দুটি রক পাখী শোঁ শোঁ করে নিচের দিকে নেমে আসছে। তাদের পায়ে ধরা দুখানা বিশালাকৃতির পাথরের চাঁই। তার যে কোনও একখানা আমাদের জাহাজের চাইতেও বড়।

আমাদের তো হাত পা ঠাণ্ডা হওয়ার জোগাড়। একটা পাখি একখানা পাথর তাক করে ছেড়ে দিল। আমাদের কাপ্তেন ছিল চৌকস। ক্ষিপ্র হাতে সে হাল ঘুরিয়ে নিমেষে জাহাজখানা বেশ খানিকটা সরিয়ে নিয়ে যেতে পারলো। যে জায়গায় জাহাজখানা ছিল সেখানে থাকলে পুরো পাথরের চাঁইটা এসে পড়তো জাহাজের ঠিক মাঝখানে। যাই হোক, প্রথম ফাঁড়াটা কাটলো। পাথরটা পড়লো একটু দূরে জলের উপর। বিরাট একটা পুকুরের মতো গর্ত হয়ে গেল সমুদ্রের জল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য মাত্র। তারপর চারপাশ থেকে উত্তাল জলরাশি এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই গর্তের ওপর। প্রচণ্ড ঢেউ-এর সৃষ্টি হলো। আমাদের জাহাজ দুলতে থাকলো।

আমরা তখন আতঙ্কিত হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। আর একটি রক-এর পায়ে আর এক খণ্ড পাথর আছে। সে তাক করছে—জাহাজের ওপরে ফেলবে। আমাদের কাপ্তেনের শ্যেন চক্ষু তার পায়ের দিকে নিবদ্ধ। পা দুটো আলগা করতেই তীর বেগে নেমে আসতে থাকে পাথরখানা। কাপ্তেন হালে মোচড় দিতে থাকে। জাহাজখানা প্রায় ঘুরিয়ে ফেলেছিল সে। কিন্তু একটুর জন্য সর্বনাশ ঘটে গেল। জাহাজের এক দিকের গলুই-এর উপর প্রচণ্ডভাবে আঘাতকরে জলে পড়ে গেল পাথরখানা। আর সঙ্গে সঙ্গে জাহাজখানার সামনের খানিকটা অংশ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। বাকী আমরা যারা পাথর চাপা পড়লাম না, তাদেরও বাঁচার কোনও নিশ্চয়তা রইলো না। কারণ মুহূর্তের মধ্যেই জাহাজখানার সলিলসমাধি ঘটে গেল। কে কোথায় গেল বলতে পারবো না, আমি একখণ্ড ভাঙ্গা জাহাজের কাঠ ধরে ভাসতে লাগলাম। অনেক কসরৎ করে কাঠের তক্তাটার উপরে উঠে বসে দুই পা দিয়ে দাঁড় কাটতে কাটতে চলতে থাকলাম।

এইভাবে চলতে চলতে এক সময় হাওয়া উঠলো। ঢেউ-এর তালে তালে এগিয়ে চলি। অবশেষে এক সময় এক দ্বীপের কিনারে এসে ভিড়লাম। শরীরে শক্তি বলে আমার কিছু নাই। কোনওরকমে কূলে নেমে বালির বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। এইভাবে ঘণ্টাখানেক মড়ার মতো অসাড় হয়ে পড়ে থাকার পর উঠে দাঁড়িয়ে দ্বীপটার ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

একটু এগোতেই মনোরম এক উদ্যানে এসে পড়ি। গাছে গাছে সোনার বর্ণের পাকা পাকা ফল, নানারকম রঙের বাহারী সব ফুল, সুন্দর সুন্দর পাখি, রূপোর মতো ঝকঝকে ঝর্ণার আর মখমলের মতো ঘাসের গালিচা। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। গাছের ফল আর ঝর্ণার জল খেয়ে তৃপ্ত হলাম।

এমন সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো সাততম রজনীতে আবার সে শুরু করে:

সন্ধ্যার কালো ছায়া নেমে না আসা পর্যন্ত আমি সেই বাগিচার তৃণ-শয্যায় শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম করলাম। এতক্ষণ বেশ ভালোই কাটছিল। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে সেই অচেনা অজানা দ্বীপে নিজেকে বড় অসহায় মনে হলো। ভয়ে গা ছমছম করতে লাগলো। যদিও আমার চারপাশে নানা সৌন্দর্যের সমারোহ, তবু আমি ক্রমশ ভীত শঙ্কিত হতে থাকলাম। সুতরাং ঘুম এল না চোখে। সারাটা রাত একরকম জেগে জেগেই কেটে গেল। ভোরের দিকে একটু তন্দ্রাভাব হয়েছিল। তার মধ্যে দেখলাম বিশ্রী সব দুঃস্বপ্ন।

সকাল হতে অনেকটা সুস্থির হতে পারি। ঠিক করলাম, আজ আমি দ্বীপটা ঘুরে ঘুরে দেখবো।

কিছু দূর যেতেই একটা ছোট্ট জলপ্রপাত চোখে পড়লো। তার এক পাশে একটা সাঁকো। সেই সাঁকোর এক প্রান্তে প্রায় উলঙ্গ একটি বৃদ্ধ মানুষ বসে ছিল। গাছের পাতার আচ্ছাদনে কোনরকমে সে লজ্জা নিবারণ

করেছে। আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগলো। ভাবলাম, আমারই মতো কোনও হতভাগ্য, হয়তো জাহাজ ডুবি হয়ে সর্বস্ব খুইয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, শেখ সাহেব, আপনার এই দশা কেন? কী হয়েছিল?

কিন্তু সে কোনও জবাব দিল না। হাতের আর চোখের ইশারা করে কি যেন বোঝাতে চাইলো। বেশ কিছুক্ষণ পরে আমি ওর মনের কথা বুঝতে পারলাম। ও বোঝাতে চাইছে, আমার চলার শক্তি নাই। তুমি আমাকে কাঁধে করে ঐ বাগানে ঝর্ণার ধারে নিয়ে যেতে পার? আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে।

আমি বোঝালাম, এ আর বেশি কথা কী। এস, তোমাকে পেঁছে দিচ্ছি।

বুড়ো অক্ষম মানুষের উপকার করলে পরকালের কাজ হয়। বৃদ্ধকে আমি কাঁধের ওপর বসিয়ে নিলাম। দু হাত দিয়ে সে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে বসে রইলো। সেই বাগিচার ঝর্ণার পাশে এসে ওকে নামাতে চেষ্টা করি, কিন্তু লোকটা আমাকে শক্ত করে চেপে ধরে থাকলো। হাত দিয়ে আমার গলাটা এমনভাবে পেচিয়ে ধরলো; মনে হলো, এখুনি আমি শ্বাস-রুদ্ধ হয়ে মরে যাবো। প্রাণপণে তার হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু না, তার হাতের লোহার মতো পেশী একচুল সরানো গেল না। তবে কি, লোকটা আমাকে শ্বাস রোধ করে মেরে ফেলে দেবে? মৃত্যুর আতঙ্কে আমি শিউরে উঠলাম। তারপর আর মনে নাই। কখন আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেছি, বলতে পারবো না। যখন জ্ঞান ফিরলো, দেখি, লোকটা তখনও আমার ঘাড়ের উপর বসে আছে। শুধু তফাৎ এই, আমাকে অচৈতন্য দেখে হাতটা একটু আলগা করেছিল সে। কিন্তু যেই আমার সাড়া পেল আবার সে বজ্রবেড়িতে চেপে ধরলো আমার গলা। আমি ছাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করি। কোনওরকমে নিজেকে মুক্ত করেছি মাত্র, এমন সময় সে প্রচণ্ড এক লাথি মারলো আমার পেটে। আমি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠি। সে আমাকে উঠে দাঁড়াতে ইশারা করলো। ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আবার সে লাফিয়ে উঠলো আমার ঘাড়ে। পা দুখানা ঝুলিয়ে দিল আমার বুকের ওপর। হাত দিয়ে এঁটে ধরলো আমার গলা। তারপর ইশারা করলো—ফলের গাছের তলায় নিয়ে যেতে। আমি নিরুপায়। সে বৃদ্ধ হলে হবে কি, তার গায়ে অসুরের বল। তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আমার নাই।

আমার কাঁধে চেপে সে গাছের নিচে এসে ফল ছিড়ে খেল। আমাকে ইশারা করে ঝর্ণার কাছে নিয়ে গেল। ঝর্ণার জল খেয়ে আবার সে আমাকে অন্য দিকে নিয়ে চললো। এইভাবে সারাদিন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে নাস্তানাবুদ করতে থাকলো। আমি তার হাতের খেলার পুতুল হয়ে, তার ইচ্ছা পূরণ করতে লাগলাম। রাত্রিবেলায় সে আমাকে চেপে ধরে শুয়ে রইলো। কিছুতেই নিষ্কৃতি পেলাম না।

এইভাবে দিনের পর দিন সেই জানোয়ারটা আমার ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালাতে থাকে। আমি ভেবে পাই না, কি ভাবে এই বাঁদরটার হাত থেকে রক্ষা পাবো।

একদিন ওকে কাঁধে নিয়ে চলতে চলতে এক দ্রাক্ষা কুঞ্জে ঢুকে পড়লাম। থোকা থোকা পাকা আঙুরের অরণ্য। আমার মাথায় একটা ফন্দী এল। পাশেই দেখলাম, একটা লাউ গাছ। একটা পাকা লাউ-এর বশ ছিঁড়ে এনে তার ভেতর থেকে কুরে কুরে বিচি আর শাঁসগুলো বের করে ফেলে দিলাম। তারপর আঙুর ছিঁড়ে এনে ভরলাম সেই লাউ-এর খোলে। মুখটা ভালো করে বন্ধ করে একটা গর্ত খুঁড়ে পুঁতে রাখলাম। কয়েক দিন পরে আঙুর-গুলো পচে পচে গাজলা কাটতে থাকে। আমি লাউ-এর খোলটা তুলে এনে খুলে দেখলাম, বেশ টলটলে মদ তৈরি হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে কয়েক চুমুক খেয়ে নিলাম। খুব বেশী খেলাম না। একটু পরেই মদের ক্রিয়া শুরু হলো। ধীরে ধীরে শরীরটা আমার হাল্কা তুলোর মতো মনে হতে লাগলো। ঘাড়ের ওপর অত বড় যে বোঝা—তখন আর তেমন ভার বলেই মনে হলোনা। স্ফূর্তিতে নেচে উঠলো আমার মন। আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে লাগলাম।

আমার এই অস্বাভাবিক অবস্থা এবং অসাধারণ বল দেখে সে ঘাবড়ে গেল। কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র। তারপর আমাকে একটা গোত্তা মেরে ইশারা করলো—ঐ লাউ-এর খোলের জিনিসটা খাবে সে। তার ধারণা হয়েছিল, ঐ পদার্থটা খেয়েই আমার শরীরের তাগদ অনেক বেড়ে গেছে। এইভাবে আমি শক্তিধর হতে থাকলে সে হয়তো আমাকে আর কাবু করে রাখতে পারবে না। তাই, সে-ও আরও শক্তি সঞ্চয় করতে চায়।

আমি হাসলাম। লাউ-এর মদটা ওর হাতে দিলাম। প্রথমে অল্প একটু চেখে দেখলো। বেশ মিষ্টি মিষ্টি টকটক ঝাঁঝালো বস্তু। ঢকঢক করে সবটা সে উজাড় করে গলায় ঢেলে দিল। অতখানি কড়া মদ পেটে পড়ার পর দারুণ ক্রিয়া শুরু হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নেশায় বুঁদ হয়ে গেল। হাত পায়ের বাঁধন আলগা হয়ে পড়লো। এই সুযোগে প্রচণ্ড এক ঝাঁকানী দিয়ে আমি তাকে মাটিতে ফেলে দিলাম। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আমার মাথায় তখন প্রতিশোধের খুন চেপে উঠেছে। একখানা পাথরের চাঁই তুলে এনে ওর মাথায় ছুঁড়ে মারলাম। লোকটা গোঁঙাতে লাগলো। এবার আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে পাথরখানা দিয়ে বাড়ি মারতে তার মাথার খুপরীটা খুলে ফেললাম।

এইভাবে সেদিন সেই শয়তানের হাত থেকে রেহাই পেলাম।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো আটতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে:

বুড়োটাকে হত্যা করার পর আমার দেহের বল আর মনের স্ফূর্তি দশ গুণ বেড়ে গেল। আমি মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে সমুদ্র সৈকতের দিকে এগিয়ে গেলাম। তখন সবে মাত্র একখানা জাহাজ কিনারায় ভিড়ে নোঙর করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজের কাপ্তেন এবং অন্যান্য যাত্রীরা নেমে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা এই দ্বীপে নামলেন কেন? এখানে তো কোনও জন-বসতি নাই।

কাপ্তেন বললো, জানি। কিন্তু এখানে একটা ঝর্ণা আছে। তার জল বড় মিষ্টি। আমরা জল আর ফল সংগ্রহ করতে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি? তুমি এখানে কি করে এলে?

আমি আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী সবটুকুই সংক্ষেপে বললাম।

কাপ্তেন চোখ কপালে তুলে বললো, সর্বনাশ! তুমি ঐ শয়তান বুড়োটার খপ্পরে পড়েছিলে? যে-সব নাবিক একবার তার পাল্লায় পড়েছে—জান নিয়ে আর ফিরতে পারেনি। শয়তানটার দাবনাতে এত জোর—দুই পায়ের চাপেই মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। তোমার এই জোয়ান বয়স, আর তাগড়াই স্বাস্থ্য—তাই তুমি সামলাতে পেরেছ। তা না হলে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া শক্ত ছিল। ঐ বুড়ো শয়তানটা 'সমুদ্রের আতঙ্ক' নামে কুখ্যাত ছিল। যাক, তাকে মেরে ফেলে তুমি অনেক মানুষের প্রাণ বাঁচালে।

কাপ্তেন আমাকে তার জাহাজে নিয়ে গেল। আমার পরনের পোশাক আশাক প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সে আমাকে নতুন সাজপোশাক দিল পরতে।

জাহাজ ছেড়ে দিল। অনেক দিন চলার পর এক সুন্দর বন্দরে ভিড়লো আমাদের জাহাজ। স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞেস করে জানলাম, জায়গাটার নাম বাঁদর-শহর। তার কারণ, হাজার হাজার অদ্ভুত জাতের বাঁদর বাস করে এই শহর বন্দরের গাছে গাছে।

একজন সওদাগরকে সঙ্গে নিয়ে আমি তীরে নামলাম। ইচ্ছা ছিল, শহরের কোথাও যদি একটা কাজ-কাম জোগাড় করতে পারি। বন্দর পিছনে রেখে আমরা শহরের পথে এগিয়ে যেতে থাকি। আমার সঙ্গী সওদাগরটি বড় সদাশয় মানুষ। আমাকে একটা কাপড়ের থলে দিয়ে বললো, পাথরের নুড়িতে ভরে নাও থলেটা। শহরের সদর ফটকে চলো, সেখানে দেখবে, তোমার মত আরও অনেকে থলে ভর্তি পাথরের নুড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। এক এক করে আরও অনেকে এসে দাঁড়াবে সেখানে। সবারই হাতে থলে ভর্তি পাথরের নুড়ি। তারপর ওরা যেখানে যাবে, ওদের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও যাবে। ওরা যা করবে তুমিও তাই করবে। দেখবে তোমার অনেক লাভ হবে।

সওদাগরের কথা মতো থলেটা বোঝাই করলাম পাথরের নুড়িতে। কাঁধে করে নিয়ে চললাম শহরের সদর ফটকের সামনে। সওদাগরের কথাই ঠিক, কিছু লোক দাঁড়িয়েছিল সেখানে। সকলেরই কাঁধে আমার মতো একটা করে নুড়ি বোঝাই থলে। কিছুক্ষণের মধ্যে আরও অনেকে এসে জড়ো হলো। তাদের কাঁধে একটা থলে। আমরা সকলে সংঘবদ্ধ হয়ে পাহাড়ের দিকে এগোতে থাকলাম। এক জায়গায় এসে দেখি, অসংখ্য লম্বা লম্বা গাছ। এগুলোকে এরা নারকেল গাছ বলে। গাছের মাথায় বেশ বড় বড় কাঁদি কাঁদি এক জাতের ফল। এর ওপরের খোসাটা বেজায় শক্ত। কিন্তু ভিতরে মিষ্টি জল আর ধবধবে সাদা সন্দেশের মতো শাঁস। এদেশের

লোকের খুব প্রিয় খাদ্য। একে এরা নারকেল বলে। এই নারকেল গাছের মাথায় বাঁদরের বাসা।

আমরা সবাই মিলে পাথরের নুড়ি ছুড়ে ছুড়ে বাঁদর খেপাতে লাগলাম। বাঁদরগুলো পাথরের আঘাত পেয়ে রাগে ফুঁসতে থাকে। নারকেল ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমাদের মারে। কিন্তু আমরা তাদের তাক বুঝে পাশ কাটাই। নারকেলগুলো এক এক করে থলেয় ভরে নিই। এইভাবে থলেটা বোঝাই হয়ে গেলে সে দিনের মতো ফিরে আসি। শহরের বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করি। বেশ ভালো দামেই বিক্রি হয়। এ এমন সওদা—সবটাই লাভের।

এইভাবে প্রতিদিন সকালে আমরা দল বেঁধে বাঁদর খেপাতে যাই। ফিরে আসি নারকেল বোঝাই বস্তা নিয়ে। বাজারে বিক্রি করে পয়সা রোজগার করি।

কয়েক দিনে বেশ কিছু জমে গেল। এবার আমরা মুক্তো-সমুদ্রে যাত্রা করবো। হিসেব করে দেখলাম, আমার জাহাজের ভাড়া জোগাড় হয়ে গেছে। এর পরে যেসব নারকেল সংগ্রহ করে আনলাম সেগুলো আর এই শহরে বিক্রি না করে জাহাজে এনে তুললাম। আমাদের যাত্রা পথে যে সব বন্দর পড়বে সেখানে আরও ভালো দামে এগুলো বিক্রি হবে।

হলোও তাই। এইভাবে হাতে কিছু পয়সা জমিয়ে ফেললাম। এর পর আমরা মুক্তো সমুদ্রে এসে মুক্তো সন্ধান করতে থাকি। কোনও কোনও ঝিনুকের খোলে মুক্তো পাওয়া যায়। কিন্তু সকলের ভাগ্যে মুক্তো মেলে না। আমার নসীব সাথ দিল। যতগুলো ঝিনুক খুলি তার বেশিরভাগেই মুক্তো পাই।

হাতে অনেক টাকা এসে গেল। বাড়ির জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। আমি আর সেখানে অপেক্ষা করলাম না। একখানা নৌকা ভাড়া করে বসরাহয় এসে পৌঁছলাম। সেখান থেকে বাগদাদ নিজের দেশে এসে নামলাম।

এর পর আত্মীয় পরিজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে থাকলাম।

এই হলো আমার পঞ্চম সমুদ্র যাত্রার কাহিনী।

বৃদ্ধ সিন্দবাদ ক্ষণকালের জন্য থামলো। তারপর কুলি সিন্দবাদের হাতে একশোটা মোহর গুঁজে দিয়ে সবাইকে বললো, এস, এবার আমরা খানা পিনা সেরে নিই। কাল আবার তোমাদের শোনাবো আমার আর এক অভিযানের কাহিনী।

পরদিন সকালে আবার সবাই এসে হাজির হলো। নাস্তাপানি শেষ হলে বৃদ্ধ সিন্দবাদ বলতে শুরু করে:

একদিন আমার বৈঠকখানায় বসে বন্ধুদের সঙ্গে খোশগল্পে মসগুল হয়ে আছি এমন সময় দেখলাম, আমার বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে চলেছে কয়েকজন পরদেশী সওদাগর। সাদর অভ্যর্থনা করে তাদের ডেকে বসালাম

আমার ঘরে। কথাবার্তায় বুঝলাম, বিদেশে বাণিজ্য করতে বেরিয়েছে তারা। আমার রক্ত চনমন করে ওঠে। বললাম, আমিও যাবো, আমাকে নেবেন আপনাদের জাহাজে?

ওরা বললো, এতো ভারি আনন্দের কথা। আসুন আমাদের জাহাজে। এখানে আমরা আরও দুদিন থাকবো।

আমি আর দেরি না করে বাজারে গিয়ে নানারকম সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র সওদা করে আনলাম। বাঁধাছাঁদা শেষ করে জাহাজে চেপে বসলাম। জাহাজ চললো বসরাহর দিকে।

বসরাহয় এসে আমরা আরও একটা বড় জাহাজে গিয়ে উঠি। দিনক্ষণ দেখে জাহাজ ছাড়া হলো। আমরা নিরুদ্দেশের সায়রে গা ভাসালাম।

রাত্রি শেষ হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো নয়তম রাতে আবার সে বলতে শুরু করে:

আমরা এ বন্দর থেকে সে বন্দরে নোঙর করি। নতুন নতুন দেশ দেখি সওদাপত্র ফিরি করি।

এইভাবে কত অজানা দেশ দেখা হয়। একদিন রাতে আমরা তখন শুয়ে পড়েছি, হঠাৎ কাপ্তেনের চিৎকার শুনে ধড়মড় করে উঠে পড়লাম সবাই।

কাপ্তেন বললো, তোমরা সবাই শোন, আমরা এক অজানা সমুদ্রে এসে পড়েছি। এ পথ আমার অচেনা। কি হবে কিছুই বলতে পারছি না। এখন আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তিনি যদি বাঁচান, তবেই বাঁচবো।

কাপ্তেন আর দাঁড়ালো না। সোজা মাস্তুলের উপরে উঠে গেল। পালের কাছি খুলে দেওয়া হলো। একটুক্ষণের মধ্যেই প্রবল ঝড় উঠলো। সেই তুফানের দাপটে জাহাজখানা উথাল পাতাল করতে করতে সামনের এক পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে গেল। অগাধ জলে কে কোথায় তলিয়ে গেল, কিছুই হদিশ করতে পারলাম না। আমি সেই পাহাড়ের এবড়ো খেবড়ো পাথর আঁকড়ে ধরে কোনওরকমে আত্মরক্ষা করতে পারলাম।

পাহাড়টাই খাড়াই উঠে গেছে। ওপরে ওঠার আশা দুরাশা। তবে লক্ষ্য করলাম, পাহাড়টা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে একটা দ্বীপ। পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে অতি কষ্টে এগিয়ে চললাম সেই দ্বীপের দিকে।

দ্বীপের সৈকতে অসংখ্য জাহাজের ভাঙ্গা টুকরো আর নানারকম সওদাগরী সামানপত্রে ভর্তি। কত জাহাজ যে পথ হারিয়ে এই পাহাড়ের ধাক্কায় চুরমার হয়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নাই। সেই সব জাহাজের ধ্বংসাবশেষ আর তার মালপত্র ঢেউ-এ ঢেউ-এ এসে জড়ো হয় এই বেলাভূমিতে।

ভাঙ্গা গলুই, কাঠের পাটাতন, মাস্তুল, পালের কাছি কাপড়ের গাঁট, বাক্স প্যাটরা তোরঙ্গ-এর স্তূপ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে দ্বীপের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। একটু এগোতেই চোখে পড়লো, একটি ছোট্ট কলস্বনা নদী। ঐ পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। দ্বীপের এদিক ওদিক এঁকেবেঁকে আবার

ঐ পাহাড়ের পাদদেশের এক গুহার মধ্যে হারিয়ে গেছে।

কিন্তু এর আসল চেহারা অন্য। এই ছোট্ট নদীটার দুই তীর নানা বর্ণের উপলখণ্ডে সমাকীর্ণ। লক্ষ কোটি ছোট ছোট পাথরের নুড়ি। সবই মূল্যবান পাথর। বেশীরভাগই চুণী। মাঝে মাঝে সূর্যের রশ্মি ঠিকরে চোখে হানছে হীরের দ্যুতি। এর মধ্যে সোনা আর রূপোর টুকরোর কি ছড়াছড়ি। তাছাড়া আরও কত অমূল্য গ্রহরত্ন যে এর মধ্যে মিশে রয়েছে তার হদিশ একমাত্র পাকা জহুরীই করতে পারবে। আমার সাধ্য নাই। সারা নদীর উপকূলে এই যে বহু বিচিত্র রঙের মেলা—এর উপর সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে স্বপ্ন লোকের হুরী পরীর দেশের সে-এক রঙিন ছবি মনে করিয়ে দেয়। চীন আর ভারতের কুমারিকা অঞ্চলে যে উৎকৃষ্ট মানের ঘৃত-কুমারী পাওয়া যায় সেই জাতের ঘৃতকুমারী গাছ গজে উঠেছে এই ঝর্ণা-নদীর জলে।

পাহাড় থেকে আরও একটা ঝর্ণা নেমে এসেছে। না, জলের নয়। গলিত আলকাতরার মতো এক প্রকার তরল পদার্থ পাহাড় থেকে নির্গত হয়ে অবিরামভাবে বয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। সমুদ্র থেকে লোভী মাছেরা উঠে এসে এই তরল পদার্থ খেয়ে পেট ডাই করে। তারপর এক সময় সব উগলিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই বমি জলের ওপরে রঙিন শক্ত মোমের মতো ভাসতে থাকে। এবং সেই ভাসমান মোমের সুগন্ধে সারা সৈকত মদির হয়ে ওঠে।

এই যে অমূল্য সম্পদসম্ভার, সবই মূল্যহীন হয়ে পড়ে আছে এখানে। সম্পদ তখনই মূল্যবান হয় যখন তা মানুষের অধিকারে আসে। কিন্তু এই জনমানব বর্জিত দ্বীপে বাইরের কোনও মানুষ সশরীরে এসে পেঁছিতে পারে না। যারা পথ ভুলে এসে পড়ে, পাহাড়ের দুর্বার আকর্ষণে জাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে, তাদের সলিল সমাধি ঘটে। তাই, আজ পর্যন্ত এই অতুল ঐশ্বর্য মানুষের অদেখাই রয়ে গেছে।

সারা দ্বীপে এত ঐশ্বর্যের সমারোহ, কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তির কোনও আহার্য নাই। তন্নতন্ন করে খুঁজেও খাবার মতো কোনও বস্তুর সন্ধান পেলাম না। খিদের জ্বালায় আমি হন্যে হয়ে ঘুরি। কিন্তু না, কোথাও কিছু নাই। ভাবলাম, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না।

এইভাবে আরও কয়েকটা দিন কাটে। আমি আর চলতে ফিরতে পারি না। বালির ওপরে অসাড় হয়ে পড়ে থাকি। বুঝতে পারি ধীরে ধীরে আমার সকল শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে। অনাহার অনশনের যে কি জ্বালা—সে কথা আর বোঝাবো কি করে। তখন আর উপায় নাই, শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর মুহূর্তের অপেক্ষায় আছি। হাত দিয়ে বালি সরিয়ে সরিয়ে নিজের কবর নিজেই খুঁড়তে থাকি।

মোটামুটি গর্তটা খোঁড়া হয়ে গেলে তার নিচে দেহটাকে সঁপে দিই। মনে আশা, আমার মৃত্যুর পর সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়া বালী উড়িয়ে এসে ঢেকে দেবে আমার দেহখানা।

নিজের উপর রাগ হয়। এর আগে পাঁচ পাঁচ বার কত বিপদ বিপর্যয়ে দিন কেটেছে তাতেও আমার শিক্ষা হলো না। আবার পথে বেরুলাম।

আমার মতো মানুষের এই সাজাই সমুচিত। কি দরকার ছিল এই সেধে বাঁশ ঘাড়ে নেবার। বাগদাদে যে সম্পত্তি আমি রেখে এসেছি তিন পুরুষ ধরে মোচ্ছব করে খেলেও ফুরাবে না। তবে? তবে কেন এই দুর্মতি হলো আমার?

হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, আচ্ছা, এই যে ছোট্ট নদী—এর উৎপত্তি স্থান ঐ পাহাড়—সে জায়গা আমি দেখে এসেছি। কিন্তু এর শেষ কোথায়, তাতো দেখতে পেলাম না? শুধু এইটুকু দেখতে পাচ্ছি। নদীটা এঁকে বেঁকে আবার ঐ পাহাড়েরই গুহার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু গুহার ভিতর দিয়ে কোথায় কত দূর সে চলে গেছে, কোথায় গিয়ে কার সঙ্গে মিশেছে তা তো জানা হলো না?

আমি ভাবলাম, নদীটা নিশ্চয়ই এই পাহাড়ের তলাতেই শেষ হয়ে যায়নি। হয়তো অন্য কোথাও অন্য কোনও দেশে চলে গেছে। ঠিক করলাম, শেষ দেখতে হবে। মৃত্যু তো শিয়রে এসেই গেছে, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি। যদি বেরুবার কোনও পথ পাই, ভালো, আর যদি ঐ নদীর জলেই সমাধি ঘটে ঘটুক। এমনিও মরতে হবে—না হয় জলেই ভেসে যাবো।

ভাঙ্গা জাহাজের পাটাতনের কাঠ জুড়ে জুড়ে একখানা ভেলা বানালাম। কয়েকটা বস্তা, সমুদ্রের ধারে এই সব জিনিসের ছড়াছড়ি, সংগ্রহ করে নদীর ধার থেকে হীরে চুনি পান্না মুক্তোয় বোঝাই করে নিলাম। তারপর আল্লাহর নাম নিয়ে বস্তাগুলো ভেলায় চাপিয়ে নিজেও চেপে বসলাম। খরস্রোতা আমার ভেলা নিয়ে ঢুকে গেল গুহার গহ্বরে। নিরন্ধ্র নিঃসীম অন্ধকার। তবে বেশ বুঝতে পারলাম, আমার ভেলাখানা তরতর করে এগিয়ে চলেছে। শুধু ভাবছি, এইবার হয়তো তমসার শেষ হবে। এই পাহাড়ে সুড়ঙ্গ নদী আলোয় এসে পড়বে। কিন্তু না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে থাকলো, অন্ধকার আর নদী কেউই শেষ হয় না। ভেলার ওপরে শুয়ে উপবাসী আমি এক মৃতকল্প মানুষ। কোনই চৈতন্য নাই। কি ভাবে কোথা দিয়ে কোথায় চলেছি কিছুই বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ আমার তন্দ্রাভাব কেটে গেল। চেয়ে দেখি আমি এক সবুজ ঘাসের শয্যায় শুয়ে আছি। আমার ভেলাটা বাঁধা আছে অদূরে নদীর কিনারে। আর আমার চারপাশে এসে জড়ো হয়েছে শতাধিক উৎসুক মুখ। সাজপোশাক চেহারা চরিত্র দেখে বুঝলাম, এরা হিন্দুস্তানের বাসিন্দা।

ওরা আমাকে কি যেন জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু ভাষার দুস্তর বাধা, ওদের কথা একবর্ণ বুঝলাম না আমি। বললাম, কে তোমরা? এই দেশেরই বা কী নাম?

ওরাও বুঝলো না আমার ভাষা। কিন্তু আমিও চেষ্টা করতে থাকলাম—কী করে মনের ভাব ব্যক্ত করা যায়, কী করে ওদের বক্তব্য বুঝতে পারা যায়—তারই কসরৎ চলতে থাকলো।

আমি পেট দেখিয়ে মুখে হাত রেখে বোঝালাম, অন্য কথা পরে হবে, আগে আমাকে কিছু খেতে দাও। আমি কতকাল কিছু খাইনি।

দেখলাম, ওদের মুখ ব্যথায় টনটন করে উঠলো। কয়েকজন ছুটে গেল খাবার আনতে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অনেক খাবার দাবার এসে

গেল। আমি খুব তৃপ্ত করে খেলাম।

এমন সময় দেখলাম, আমার এক জাতভাই সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরাই ডেকে নিয়ে এসেছে তাকে। আমাকে সে পরিষ্কার আরবী ভাষায় জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কী? দেশ কোথায় তোমার? কেনই বা এসেছ এখানে?

আমি আমার দুঃখের কাহিনী বিবৃত করলাম। আমার নাম ধাম সব বললাম তাকে। সে আমার কথাগুলো হিন্দুস্তানী ভাষায় তর্জমা করে বুঝিয়ে দিল ওদের। দোভাষীর মুখে এই সব তাজ্জব কাহিনী শুনে তো তাদের চোখ কপালে ওঠার দাখিল।

—এমন দুঃসাহসিক কাণ্ড কি কেউ করতে পারে?

—আমি বললাম, এই আমার ধাত, একবার নয়, এর আগে আরও পাঁচ পাঁচবার ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে প্রাণ সংশয় ঘটেছিল। প্রতিবারই আল্লাহর অপার করুণায় উদ্ধার পেয়ে গেছি। এবারও বাচার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় বেঁচেই গেলাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ জায়গাটার নাম কী?

দোভাষী বললো, সারন দ্বীপ। এখানকার সম্রাটের কাছে তোমাকে নিয়ে যাবো, চলো। তোমাকে দেখলে তিনি খুব খুশি হবেন।

আমি বললাম বেশ, চলো।

ওরা আমাকে শোভাযাত্রা করে সম্রাটের কাছে নিয়ে এল। তিনি আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে কাছে বসালেন। আমি আমার এই দুঃসাহসিক সমুদ্র অভিযানের সমস্ত কাহিনী তাঁকে খুলে বললাম।

সারন দ্বীপ সম্রাট বললেন, ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করেছেন। না হলে, এইরকম বিপদে পড়ে কেউ বাঁচতে পারে না।

আমার বস্তা খুলে কিছু রত্নপাথর ভেট দিলাম তাকে।

এই সব দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান পাথর দেখে সম্রাট তো মহাখুশি। সাগ্রহে নিলেন আমার উপহার। তিনিও আমাকে দিলেন অনেক মূল্যবান উপহার উপঢৌকন।

তার কাছ থেকেই জানলাম, এই বিশাল সারন দ্বীপ চব্বিশটি প্রদেশে বিভক্ত। এর উত্তরে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শিখর। লোকে বলে, আমাদের আদি পিতা আদম এই পর্বতশৃঙ্গে কিছুকাল বসবাস করেছিল। এই পর্বতমালায় নানা মূল্যবান গ্রহরত্ন পাওয়া যায়। সম্রাট তার কয়েকটা আমাকে উপহার দিলেন। যদিও আকারে সেগুলো বেশ বড়ই। তবুও আমার গুলোর মতো অত সুন্দর না। এই দ্বীপের আর একটা বস্তু লক্ষ্য করার মতো—চারদিকে অসংখ্য নারকেল গাছ।

একদিন সম্রাট আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, সিন্দবাদ, তোমার স্বদেশ বাগদাদের শাসন ব্যবস্থাদি কেমন? এবং সুলতান হারুন অল রসিদ-ই বা কতটা জনপ্রিয় শাসক?

আমি বললাম, আমাদের সুলতানের মতো ধর্মাত্মা আমি দেখিনি। তাঁর হুকুমতে অন্যায় অবিচার বলে কিছু নাই। লোকে সুলতানকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। সুলতানও প্রজাদের কল্যাণের জন্য দিবস-রজনী চিন্তা

করেন।

সারন দ্বীপ সম্রাট মুগ্ধ হয়ে বললেন, সত্যিই আদর্শ বাদশাহ। আমার প্রীতির নিদর্শন হিসাবে তাকে কিছু উপহার পাঠাতে চাই। তুমি তাঁর কাছে পেঁাছে দেবে, আমার হয়ে?

—বাঃ, কেন দেব না? আর তাছাড়া আপনি যে আমার সঙ্গে কত সুন্দর ব্যবহার করছেন তাও তাকে বলবো বৈকি! আমার তো মনে হয়, এর ফলে, দুই দেশের মধ্যে সখ্যভাব গড়ে উঠবে।

সম্রাট রাজন্যদের নির্দেশ দিলেন, সুলতান হারুন অল রসিদের উপহার সামগ্রী সাজাতে।

একটা বড় ঘট নানাজাতের মূল্যবান রত্নপাথরে ভর্তি করা হলো। একটা প্রকাণ্ড গালিচা দিলেন তিনি। সাপের চামড়া দিয়ে তৈরি। আগা-গোড়া গালিচাটার গায়ে মোহরের মতো গোল গোল চক্র। শ দুই কর্পূরের ডেলা। আট হাত লম্বা আর সেই পরিমাণ চওড়া হাতীর দাঁত। এবং এর সঙ্গে দিলেন সারন দ্বীপের এক উর্বশী কন্যা।

এই সঙ্গে তিনি একখানা পত্র দিলেন খলিফা হারুন অল রসিদকে।

"মহামান্য খলিফা; আমার এই দীন উপহারটুকু আপনি গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন। আপনার কীর্তিকাহিনী শুনে আমি মুগ্ধ। আমি আপনার মতো আদর্শ সম্রাট হয়ে রাজ্য শাসন করতে পারলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো। আপনি আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। আপনার বন্ধুত্ব পেলে আমি ধন্য হবো।"

সম্রাট আমাকে বললেন, সিন্দবাদ, তুমি আমার আদরের অতিথি। যদি এ দেশ তোমার ভালো লাগে, এখানেই থাকো। আমি খলিফার কাছে অন্য দূত পাঠাচ্ছি। সে তোমার আপনজনদেরও খবর দিয়ে আসতে পারবে—তুমি ভালো আছ।

আমি বললাম, আপনার সহৃদয়তা আমি কোনওদিনই ভুলতে পারবো না, সম্রাট। না, আমি দেশেই ফিরে যেতে চাই। আপনার দেশ আমার খুবই ভালো লেগেছে। কিন্তু নিজের আত্মীয়স্বজনদের দেখার জন্য মন আমার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দু-এক দিনের মধ্যেই একখানা নৌকা বসরাহর দিকে ছাড়বে। আমি ঠিক করেছি, এই নৌকাতেই রওনা হয়ে যাবো।

সম্রাট বললেন, বেশ, তাই যাও। কিন্তু তোমার জন্য আমার দরজা সব সময়ই খোলা রইলো, সিন্দবাদ। যখন তোমার ইচ্ছে হবে, চলে আসবে।

কাপ্তেনকে ডেকে তার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে সম্রাট বললেন, এ হচ্ছে সিন্দবাদ, দুর্বার দুরন্ত। কতবার যে মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে এসেছে তার ইয়ত্তা নাই। তুমি যাওয়ার পথে এর মুখে শুনবে সেই সব বিচিত্র কাহিনী। শোন, কাপ্তেন, সিন্দবাদ আমার বিশেষ অতিথি। তাকে খুব যত্ন করে পেঁাছে দেবে তার দেশে। তোমার যা ভাড়া, আমি দেব।

সম্রাটের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি নিরাপদে বসরাহয় এসে পেঁাছলাম। সেখান থেকে আমার স্বদেশ-বাগদাদ।

জাহাজ থেকে নেমে প্রথমে আমি গেলাম সুলতান হারুন অল রসিদের প্রাসাদে। যথাবিহিত কুর্নিশ জানিয়ে সম্রাটের চিঠিখানা আর তার উপহার সামগ্রী দিলাম তাঁকে। আমার সমুদ্র যাত্রার কাহিনীও বললাম।

খলিফা মনোযোগ সহকারে চিঠিখানা পড়লেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন সব উপহারের জিনিসপত্র। বললেন, বাঃ, বেশসুন্দর তো!

আমি সম্রাটের গুণগান করে বললাম, সত্যিই, তাঁর মতো ধর্মপ্রাণ প্রজাবৎসল, ন্যায়পরায়ণ সম্রাট আমি দেখিনি, জাঁহাপনা। তাঁর দেশে অধর্ম, অন্যায়, অবিচার বলে কিছু নাই। সম্রাট নিজেই তাঁর দেশের প্রধান বিচারক। প্রতিটি প্রজার কল্যাণের জন্য সর্বদা তিনি চিন্তিত।

খলিফা বললেন, আমারও তাই মনে হচ্ছে, সিন্দবাদ। তুমি যে তাঁর শুভেচ্ছা বয়ে নিয়ে এসেছ আমার কাছে, এজন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

খলিফা আমাকে মূল্যবান সাজপোশাক উপহার দিলেন।

এই হচ্ছে আমার ষষ্ঠ অভিযানের কাহিনী। এর পর কাল তোমাদের শোনাবো আমার শেষ সমুদ্রযাত্রার আর এক অভিজ্ঞতা।

বৃদ্ধ সিন্দবাদ নাবিক, এরপর, সকলের সঙ্গে বসে খানাপিনা করলো। কুলি সিন্দবাদকে একশোটা সোনার মোহর উপহার দিয়ে বললো, কাল সকালে আবার আসবে। আমার কাহিনী শোনাবো।

পরদিন সকালে কুলি সিন্দবাদ রুজু নামাজ সেরে যথা সময়ে বৃদ্ধ সিন্দবাদের বাড়ি এসে হাজির হয়।

এক এক করে অন্য সব অভ্যাগতরা এসে পড়লে বৃদ্ধ সবাইকে নিয়ে খানাপিনা করে। অনেক রসালাপ হয়। তারপর কাহিনী বলতে শুরু করে সিন্দবাদ নাবিক:

❋❋ ❋❋ ❋❋ ❋❋

আমার ছয় ছয় বার অভিযানের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর সমুদ্র অভিযানের সঙ্কল্প একেবারে মন থেকে মুছে ফেলে দিলাম। একবার দুবার নয়, এই ন্যাড়া পর পর অনেকবার বেলতলায় গেছে, আর নয়। যে-সব মরণ ফাঁদ থেকে আমি উদ্ধার পেয়ে বেঁচে এসেছি সে-সব কথা স্মরণ করলে শিউরে উঠতে হয়। সুতরাং এই বয়সে আর সেই সব বিপদের মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাই না। তাছাড়া বয়সও বেড়েছে, এখন আর এত ধকল শরীরে সইবে না। আর কেনই বা যাবো? আমার তো অর্থের প্রয়োজন নাই। আমি এখন, আল্লাহর কৃপায়, বাগদাদের সেরা ধনী। সাতপুরুষ বসে খেলেও ফুরাবে না। শুধু কি অর্থ, সারা শহরে আজ আমার কত নাম যশ খ্যাতি! স্বয়ং খলিফা আমাকে সাদরে ডেকে পাঠান। আমার অভিযানের কাহিনী শুনে তিনি চমৎকৃত হন।

কিন্তু মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছাই বড় কথা নয়। একদিন খলিফা হারুণ অল রসিদের দরবারে বসে আমার দুঃসাহসিক অভিযানের বিচিত্র কাহিনী শোনালাম তাকে। তারপর খলিফা আমাকে একটি প্রস্তাব দিলেন।

—সিন্দবাদ, আমি অনেক দিন ধরেই ভাবছি, সারন দ্বীপ সম্রাটের

কাছে আমার শুভেচ্ছা আর উপহার পাঠাবো। কিন্তু জুতসই কোনও দূত পাচ্ছি না। তুমিই একমাত্র যোগ্য লোক, আমার ইচ্ছে, তুমি আমার দূত হয়ে তাঁর কাছে যাও। তোমাকে আবার পেয়ে তিনি খুব খুশিও হবেন, আমারও কাজ হবে।

বুঝলাম, খলিফার ইচ্ছাই আদেশ। আমি বিনয়াবনত হয়ে বললাম, আপনার হুকুম শিরোধার্য, জাঁহাপনা। কবে যেতে হবে, বলুন।

দু-এক দিনের মধ্যেই তিনি সব গোছগাছ করে দিলেন। তোমরা বিশ্বাস কর, ঘর ছেড়ে বেরুবার এক বিন্দু ইচ্ছে ছিল না আমার, শুধু খলিফাকে তুষ্ট করার জন্যই পথে বেরুতে হলো।

তিনি আমাকে দশ হাজার দিনার রাহা খরচ দিলেন। সারন্ দ্বীপ সম্রাটকে এক শুভেচ্ছাপত্র লিখলেন। সেই চিঠির সঙ্গে তাঁর স্বনির্বাচিত উপহার উপঢৌকনাদি বেঁধে ছেঁদে দিলেন আমার হাতে। তার মধ্যে ছিল : একটি চমৎকার রক্তাভ মখমল শয্যা। কি যে দাম হতে পারে, আমি কল্পনা করতে পারলাম না। অর্থ আমার প্রচুর আছে, কিন্তু অমন বিলাস-শয্যা আমি জীবনে চোখে দেখিনি। এই ধরনের আরও দুখানা দুরঙের শয্যা তিনি সঙ্গে দিলেন। কুফার তৈরি একশো প্রস্ত বাহারী সাজ-পোশাক। আলেকজান্দ্রিয়ার তৈরি লোভণীয় রেশমী কাপড়। বাগদাদের বিখ্যাত কারু শিল্পীদের তৈরি কিছু সূক্ষ্ম সূচীকর্ম করা সাজপোশাক। কারুকার্যকরা সোনার তৈরি অতি প্রাচীন এবং দুষ্প্রাপ্য ফুলদানী। সেই ফুলদানীর গায়ে বিখ্যাত শিল্পীর হাতে খোদাই করা ছিল একটি ছবি—এক শিকারী এক সিংহকে তীরবিদ্ধ করতে উদ্যত। এ ছাড়া একজোড়া সেরা আরবী ঘোড়া এবং হাজারো রকমের অন্যান্য জিনিসপত্র।

রাত্রি শেষ হয়ে আসতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো বারোতম রজনীতে আবার সে শুরু করে :

খলিফার এই সব লটবহর নিয়ে একদিন, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, রওনা হয়ে পড়লাম।

একটানা দুই মাস সমুদ্র যাত্রার পর একদিন নিরাপদে এসে পেঁছিলাম সারনদ্বীপে। সম্রাটের হাতে তুলে দিলাম খলিফার সেই চিঠি আর উপহার। অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে আবার কাছে পেয়ে সম্রাট দারুণ খুশি হলেন। খলিফার দূত হয়ে এসেছি আমি। সুতরাং রাজসিক আদর অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটি রাখলেন না তিনি। আমাকে তিনি যথেষ্ট ভালোবাসেন, সুতরাং আদর যত্নের কোনও অভাব হওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু এই অভ্যর্থনা, এই সম্মান খলিফা হারুন অল রসিদের জন্য। আমাকে সম্মান দেখানো মানেই সুলতানকে সম্মান জানানো।

সম্রাট বললেন, সিন্দবাদ এতদিন বাদে তোমাকে আবার কাছে পেয়েছি, এবার বেশ কিছুদিন থেকে যাও।

আমি বললাম, কিন্তু সম্রাট আমি তো এবার সুলতানের আজ্ঞাবহ দাস হয়ে এসেছি। এখানে, আমার ইচ্ছামতো, থেকে যাবো—সে তো হয়

না। তাঁকে যথাসময়ে আমার কাজের কৈফিয়ত দিতে হবে। আপনি মাফ করবেন, এবার আমাকে ছেড়ে দিন, পরে যদি কখনও আসতে পারি, আপনার ইচ্ছা আমি অপূর্ণ রাখবো না।

কয়েক দিন পরে সম্রাটের কাছে বিদায় নিয়ে আমার জাহাজে চেপে বসলাম। আর কোনও দিকে নয়, সোজা যাবো বসরাহ। সেখান থেকে বাগদাদ।

পালের হাওয়াও আমাদের অনুকূলে হলো। খুব সুন্দর আরামের সমুদ্রযাত্রা করছি আমরা। সমুদ্রের জলে ভেসে এত নির্বিঘ্ন নির্ঝঞ্ঝাট যাত্রা আমার নসীবে আগে কখনও জোটেনি।

এইভাবে সপ্তাহখানেক চলার পরে আমরা সিন দ্বীপে এসে নোঙর করলাম। এখানে সওদাগররা কেনা বেচা করার জন্য নামে। দ্বীপটা মোটামুটি জন-বসতি-বহুল। লোকের আর্থিক অবস্থাও মন্দ না। তাই, চলার পথে সওদাগরদের চোখ এড়ায় না এই বন্দরটা।

সিন ছাড়িয়ে সবে সমুদ্রের মাঝ বরাবর এসে পথের নিশানা ঠিক করা হচ্ছে, এমন সময় কাপ্তেন এসে আতঙ্কিত ভাবে বললো, ঠিক বুঝতে পারছি না, কোথায় এসে পড়লাম। যাইহোক, আমি মাস্তুলের উপরে যাচ্ছি, দেখি, নিশানা বুঝতে পারি কি না।

কাপ্তেন ক্ষিপ্র হাতে গায়ের কুর্তা খুলে ফেলে দিয়ে মাস্তুলের মাথায় উঠে যায়। আমরা অজ্ঞ অসহায় কতকগুলো সওদাগর। আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে রইলাম। ভয়ে বুক ঢিব ঢিব করছে। কাপ্তেন কি বার্তা শোনাবে, কে জানে!

জানা গেল, বার্তা শুভ নয়। আমরা এসে পড়েছি এক মরণ ফাঁদ দ্বীপের মুখোমুখি। এখানে এলে কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারে না। অন্তত নাবিকরা তাই বলে। এতকাল ধরে যারা পথ ভুলে, অথবা নসীবের দোষে এই সমুদ্রে এসে পড়েছে তাদের সকলেরই ইন্তেকাল হয়ে গেছে এখানে।

কাপ্তেন নেমে এসে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, আর কেন, এবার তাঁর নাম-জপ কর। আর কোনও আশা নাই। একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণী ঝড় তেড়ে আসছে এই দিকে। আমাদের মতো শখানেক জাহাজ তার একটা পাকে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। খুব কাছেই একটা দ্বীপ আছে—চেষ্টা করলে এই তুফানের তাণ্ডব এড়িয়ে আমরা সেই দ্বীপে গিয়ে নোঙর করতে পারি। কিন্তু তাতেও কোনও ফয়দা হবে না। সিংহের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে হায়নার মুখে পড়া হবে।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কেন—কেন?

কাপ্তেন বললো, ঐ দ্বীপের কিনারে বাস করে অসংখ্য ময়াল সাপ। তারা আকারে এক-একটা ছোটোখাটো পাহাড়ের মতো। আমাদের এই জাহাজখানা আস্ত একবারে পেটে পুরে ফেলতে তাদের একটুও মেহনত করতে হবে না।

আমরা আঁৎকে উঠলাম, ওরে—বাবা! দরকার নাই—তার চেয়ে ঝড় তুফানে মরবো, সে-ও ভালো।

কাপ্তেন তার তোরঙ্গ থেকে একটা ছোট্ট বাক্স বের করলো। বাক্সের তালা খুললে তার মধ্যে থেকে একখণ্ড ন্যাকড়া আর কিছু সাদা গুঁড়ো মতো একটা বস্তু বের করলো। খানিকটা জল দিয়ে ঐ অত্যাশ্চর্য গুঁড়ো বস্তুটি ভিজিয়ে আটা মাখার মতো ডেলা করে নাকের ফুটোয় পুরে দিল। এরপর সে একখানা ছোট্ট কিতাব বের করে বললো—আমার যাদুমন্ত্রের বই।

আমরা বললাম, এ দিয়ে কি হবে?

—তোমরা জান না, ঐ যে ঝড় আসছে দেখছো, ও হচ্ছে পয়গম্বর সুলেমানের সৈন্যবাহিনী। আর ঐ যে দ্বীপ দেখছো, ঐ দ্বীপে আছে সুলেমানের সমাধি। আজ পর্যন্ত কেউ ঐ সমাধিক্ষেত্র দেখতে পায়নি। এখানে এলেই, প্রথমে তেড়ে আসতে থাকে ঐ তুফান। তাকে পাশ কাটিয়ে যদি দ্বীপের তীরে পেঁাছেও যাও, তবু রক্ষা নাই। ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ আর বিকটাকৃতির দানব আস্ত গিলে ফেলবে।

এরপর কাপ্তেন আর একটি কথা বললো না। নিবিষ্ট মনে বই-এর কয়েকটা পাতা উল্টে উল্টে বিড় বিড় করে কি সব পড়তে থাকলো।

—নাঃ, হলো না।

—কী হলো না?

আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করি, কি হলো না কাপ্তেন?

—সে বললো, না, এ দুর্যোগ কাটবার কোনও সম্ভবনা নাই। বরং আরও বাড়বে। সুতরাং আমার ওপর ভরসা না রেখে নিজের নিজের পথ দ্যাখো, ভাইসব। আল্লাহ মেহেরবান—

তখনও ঝড় এসে পেঁাছয়নি, কিন্তু বৃষ্টির বন্যায় জাহাজের পাটাতন ভেসে যেতে থাকে। আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করি—কাপড়ের গাঁটগুলো বাঁচানো যায় কিনা। কাপ্তেন বললে, ওসব থাক, আপনি বাঁচলে বাপের নাম, আগে নিজের বাঁচার পথ দেখ। জানে বাঁচতে পারলে অনেক কাপড়ের গাঁট চোখে দেখতে পাবে। এখুনি ঘূর্ণী ঝড় এসে আছড়ে পড়বে। যদি পারো, সাবধান হও। আমি চললাম, বিদায় বন্ধু, বিদায়। বেঁচে যদি থাকি, আবার হয়তো কোনদিন দেখা হতে পারবে—

কাপ্তেনের করুণ চোখের সেই ভয়ার্ত দৃষ্টি আমি আজও ভুলতে পারিনি। জানিনা সেই দিনই তার সলিল সমাধি হয়েছে কিনা। জানিনা, বেঁচে থাকলেও, জীবনে আর কোনও দিন তার সঙ্গে দেখা হবে কিনা।

একটু বাদেই প্রচণ্ড একটা ঝড়ের ধাক্কা এসে লাগলো আমাদের জাহাজে। প্রথম ধাক্কাটা সামলাতে পারলেও পরের দাপট আর সহ্য করতে পারলাম না। এলো পাথাড়ী ঝড়ের তাণ্ডব চলতে থাকলো। বিশাল বিশাল ঢেউ এসে আমাদের গোটা জাহাজটা গ্রাস করে ফেলে। কখনও বা মনে হয়, জলের একটা পাহাড় এসে পড়লো। আবার দেখি, না, জলটা সরে গেল। কিন্তু এভাবে বেশিক্ষণ কাটলো না। একটা ঘূর্ণী এসে আমাদের জাহাজখানাকে প্রায় একশো হাত ওপরে তুলে আছাড় মারলো। তারপর কে কোথায় আমরা ছিটকে পড়লাম, তলিয়ে গেলাম, হারিয়ে গেলাম তার কোনই হদিশ করতে পারলাম না। তখন সবাই নিজের চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত। কে কোথায় বাঁচলো কি মরলো, সে-কথা মনে আসবে কি করে?

আমি জাহাজের একখানা ভাঙ্গা পাটাতন আঁকড়ে ধরতে পারলাম। এই তক্তাখানায় ভর করে ভেসে চললাম। কোথায় এবং কতদূরে জানি না, এক সময় দেখলাম, ঐকটা দ্বীপের কিনারে এসে ভিড়েছি। দ্বীপটা শান্ত শ্যামল, ফলে ফুলে ভরা। ছোট্ট একটা স্রোতস্বিনী নদী দ্বীপের মাঝ দিয়ে বহমান।

আগের অভিযানের সেই রত্নগর্ভা খরস্রোতার কথা মনে পড়ে গেল। সেবার সেই নদীর দৌলতেই আমার প্রাণ রক্ষা হয়েছিল। ঠিক করলাম, এই নদীর জলেই ভেলা ভাসিয়ে চলবো—যা থাকে কপালে। যদি বাঁচি ভালো, না বাঁচলেও দুঃখ থাকবে না। এছাড়া উপায়ই বা কি!

গাছের সুমিষ্ট ফল আর নদীর জল খেয়ে নিজেকে একটু চাঙ্গা করে নিলাম। কাঠের পাটাতনখানা টেনে এনে ফেললাম নদীর জলে। তার উপর চেপে বসে ভেসে চলতে থাকলাম স্রোতের টানে। ভেলা ছাড়ার আগে যতটা পারলাম ফলমূল বোঝাই করে নিলাম। আর নিলাম কতকগুলো সুগন্ধী গাছের ডাল। নাম জানি না, কিন্তু সেই কাঠের সুবাস আঘ্রাণ করে বেশ বুঝতে পারলাম, নিশ্চয়ই কোনও দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান বস্তু।

গাছের ডাল গুলো ভেলার ওপরে না চাপিয়ে শক্ত লতা দিয়ে ভেলার পাশে বেঁধে দিলাম। এর ফলে ভেলার ওপরে ভার পড়লো না, অথচ ভেলাটাও আকারে অনেক বড় হয়ে গেল।

ভেলার ওপরে চেপে একটা গাছের ডাল দিয়ে ঠেলা দিতেই নদীর মাঝখানে চলে যায়। তারপর প্রবল স্রোতের টানে দুর্বার গতিতে ছুটে চলে। আমি আর তাল সামলাতে পারি না। মাথাটা বাঁই বাঁই করে ঘুরতে থাকে। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারা গেল না। ভেলার ওপরে পাক খেয়ে পড়ে গেলাম। আমার দেহের ওপরে গাদা হয়ে গড়িয়ে পড়লো ফলের ডাঁই। আমি চাপা পড়ে গেলাম।

যখন আমার জ্ঞান ফিরলো, দেখি, ভেলাটা তখনও তীর বেগে ছুটে চলেছে। প্রাণপণে উঠে বসবার চেষ্টা করি। কিন্তু কে যেন আমার হাত-পা বেঁধে রেখেছে, কিছুতেই উঠতে পারলাম না। ভয়ে আঁৎকে উঠলাম, এই দুর্বার গতি রোধ করার সাধ্য তো কারো হবে না। তাহলে, তাহলে কি এই আমার অনন্ত যাত্রা? চোখ বন্ধ করে আল্লাহর নাম জপ করতে থাকলাম।

হঠাৎ কানে এলো, কিছু লোকের চিৎকার। তাকিয়ে দেখলাম, একদল ধীবর জাল ফেলেছিল, সেই জালে আটকে গেছে আমার ভেলা। লোকগুলো ছুটে এসে আমাকে তীরে তুললো। তখন আমার অর্ধমৃত অবস্থা। জালের জট থেকে ভেলটাকেও ছাড়িয়ে ওপরে তোলা হলো।

শীতে আমি তখন ঠক-ঠক করে কাঁপছি। ওরা আমাকে গরম কাপড় চোপড় দিয়ে ঢেকে দিল।

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো তেরতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয়:

একজন বৃদ্ধ আমার সারা শরীরে তেল মালিশ করে আমাকে খানিকটা চাঙ্গা করে তোলে। এবার আমি উঠে বসতে পারি। কিন্তু তখনও কথা

বলতে পারছি না। আমাকে ওরা ধরাধরি করে একটা হামামে নিয়ে গেল। গরম জলে গোসল করার পর মোটামুটি একটু সুস্থ হলাম।

বৃদ্ধ তার নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল আমাকে। পাড়া-পড়শীরা ভিড় করে এল। চমৎকার সব খানাপিনা এনে দিল। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল সে। চোখে আমার তন্দ্রা আসছিল। শোয়া মাত্র ঘুমে ডুবে গেলাম।

এইভাবে তিন দিন তিন রাত্রি দারুণ তোয়াজের মধ্যে কাটালাম আমি। ওরা আমাকে একটা কথাও জিজ্ঞেস করলো না।

চার দিনের দিন সকালবেলা বৃদ্ধ এসে আমার পাশে বসলো।
—আল্লাহর দোয়ায় এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলে, বাবা। আমরা তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। সবই তাঁর ইচ্ছে—

একটু থেমে বৃদ্ধ আমাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা বাবা, কে তুমি? কোত্থেকেই বা আসছিলে?

আমি বললাম, আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন, আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করবেন। আমার নাম সিন্দবাদ নাবিক। অনেক সমুদ্র যাত্রার ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে আমার জীবনে।

এরপর আমার সমুদ্র-অভিযান অভিজ্ঞতার বিচিত্র কাহিনী বললাম তাকে।

বৃদ্ধ মন্ত্র মুগ্ধের মতো শুনলো সব। তারপর বললো, বেটা আর দেরি না করে এবার তোমার মূল্যবান সামানপত্র সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়ে যাও। কারণ এ জিনিস শুধু সুন্দরই না—একেবারে দুষ্প্রাপ্য। অন্য লোকের লোভ হতে পারে।

আমি অবাক হই। —আপনি কিসের কথা বলছেন? কি এমন অমূল্য বস্তু আমার সঙ্গে আছে?

—তুমি যে গাছের ডালগুলো সঙ্গে এনেছো সেগুলো মূল্যবান চন্দন কাঠ। যদি বেচতে চাও; আমার সঙ্গে বাজারে চল। আমি তোমাকে ন্যায্য দাম পাইয়ে দেব।

আমি বললাম, আপনি সদাশয় ধর্মপ্রাণ, সঙ্গে যাওয়ার কী আছে, আপনি নিজেই যান। যা ভালো বিবেচনা করবেন, সেই দামে বেচে আসুন।

বৃদ্ধ বললে; ঠিক আছে, চল না, এখানকার বাজারটাও তোমার দেখা হবে।

আমি আর 'না' করলাম না।

বাজারে এসে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এক দঙ্গল দালাল ঘিরে ধরেছে—আমার চন্দন কাঠের ডালগুলো। নানাভাবে তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছে।

এরপর বৃদ্ধ ডালগুলো নীলামে তুললো। একজন দাম দিল এক হাজার দিনার। অপর একজন বললো, দুই হাজার। আর একজন—তিন। এইভাবে দাম বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে দশ হাজার দিনার পর্যন্ত উঠলো। বৃদ্ধ আমার দিকে তাকায়, কী, ছেড়ে দেবে?

কি করবো ভাবছি, বৃদ্ধ বললো, এখন বাজার ভীষণ মন্দা। সব

জিনিসের দরই পড়তির দিকে। আমার মনে হয়, বেচে দেওয়াই ভালো। আচ্ছা যাক—আরও একশো দিনার বেশি দেব আমি। আমাকেই দিয়ে দাও তুমি।

—ইয়া আল্লাহ, আপনি নিজে কিনবেন? তার জন্যে বাজারে আসতে হলো। এত যাচাই করতে হলো। আপনি চান জানলে, আমি এমনিতেই দিয়ে দিতাম আপনাকে। যা উপকার করেছেন আমার, তা কি কোন মূল্য দিয়ে শোধ করা যাবে?

বৃদ্ধ তার এক অনুচরকে বললো, কাঠগুলো আমাদের গুদামে নিয়ে যাও।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, চল বাবা, ঘরে ফেরা যাক।

বাড়ি ফিরে এসে বৃদ্ধ আমাকে গুণে দশ হাজার একশো সোনার মোহর দিয়ে বললো, আমি একটা বাক্স দিচ্ছি, এগুলো বাক্সে বন্ধ করে সঙ্গে নাও।

এরপর আমরা দুজনে একসঙ্গে বসে খানাপিনা করলাম। বৃদ্ধ আমাকে বললো, বেটা তোমার কাছে একটি জিনিস আমার চাইবার আছে—

আমি কৃতার্থ হয়ে গেলাম, আপনি কোনও সংকোচ করবেন না। বলুন, কী চান? আপনাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।

বৃদ্ধের চোখ নেচে উঠলো, বাবা, আমি বুড়ো হয়েছি। আর বোধহয় বেশিদিন বাঁচবো না। আমার আপন বলতে সংসারে একটি মাত্র মেয়ে। দেখতে শুনতে বেশ সুন্দরী। আদব কায়দাও বড় ভালো। আমার মরার পর এই বিশাল সম্পত্তির একমাত্র মালিক হবে সে-ই। এই কারণে, আমার সম্পত্তির লোভে, আমার মেয়েকে শাদী করার জন্যে হাজারো ছেলে পাগল। কিন্তু আমি জানি, আমার মেয়ে তাদের লক্ষ্য নয়, তারা কব্জায় পেতে চায় আমার এই বিপুল বৈভব। তাই ভয় হয়, মেয়েটার একটা হিল্লে করে না যেতে পারলে, একটা সুপাত্র দেখে শাদী দিয়ে যেতে না পারলে সে বোধহয় সুখ শান্তি পাবে না। কিন্তু বাবা, অনেক চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত এমন একটা ছেলের সন্ধান পেলাম না, যে সত্যিই আমার সম্পদের লোভে নয়, মেয়েটির রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে শাদী করতে পারে। তোমাকে দেখা ইস্তক আমার মনে বড় আশা হয়েছে। তোমার মতো সৎ, নিষ্ঠাবান. উদার-হৃদয় ছেলেই আমি খুঁজছিলাম। আমার একান্ত অনুরোধ, বাবা, তুমি আমার মেয়েটি গ্রহণ কর। আমি জানি, টাকা পয়সা, ধন দৌলতের উপর তোমার কোনও মোহ নাই। তুমিই পারবে আমার মেয়েকে সুখী করতে। আর আমিও শান্তিতে মরতে পারবো।

কোনও কথা না বলে আমি মাথা নত করে বসে থাকি। বৃদ্ধ বলে, আমার খুব বেশি আব্দার নাই, বাবা। শুধু যে কটা দিন বাঁচি, মেয়েটাকে নিয়ে তুমি আমার কাছে থাক, এই আমার ইচ্ছা। তারপর, তোমার ইচ্ছা হয়, আমার সব বিষয় সম্পত্তি বেচে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে দেশে ফিরে যেও।

আমি বলতে পারলাম, আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে আর আলাদা কিছু নাই। আপনি যা বলবেন, আমি তাই করবো। কারণ এইটুকু জানি, আজ যে এই হেসে গেয়ে চলে ফিরে বেড়াতে পারছি সে তো শুধু অপানারই

কল্যাণে। বলতে গেলে, এ আমার দ্বিতীয় জীবন লাভ। আপনি যা বলবেন, তাই আমি করবো।

বৃদ্ধের চোখ আনন্দে নেচে ওঠে। —যাক, বাবা, এতদিনে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। কি বলে যে তোমাকে দোয়া জানাবো, ভাবতে পারছি না।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো চৌদ্দতম রজনীতে আবার সে শুরু করে :

কাজী, ও সাক্ষী ডেকে সেইদিন শাদীপর্ব সমাধা করা হলো। বড়লোকের একমাত্র মেয়ে। মহাধুমধাম করে অনেক লোকজন খাওয়ানো হলো। গরীব দীন ভিখারীরা খানাপিনা ছাড়াও নগদ বিদায় নিয়ে পাত্র-পাত্রীর শতায়ু কামনা করে চলে গেল।

এতদিন এখানে আছি, কিন্তু সেই শাদীর রাতেই প্রথম দেখলাম বৃদ্ধের মেয়েকে। সে তখন আমার বিবি সে আমার এখনও বিবি। নানা রত্নাভরণে সেজেগুজে এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। তার রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। অনেকদিন বাদে একটি সুন্দরী নারীর কবোষ্ণ দেহ বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে নিজেকে হারিয়ে দিলাম।

এইভাবে সুখের সায়রে গা ভাসিয়ে দিয়ে অনেকদিন কাটালাম সেখানে। তারপর একদিন আমার শ্বশুর দেহ রাখলো। যথাযোগ্য মর্যাদায় তাকে সমাহিত করা হলো। তার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সারা দেশের লোক ভেঙ্গে পড়েছিল সেদিন। আজকালকার দিনে অমন ধর্মপ্রাণ সদাশয় মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। বিরাট লম্বা শোকমিছিলের পুরোভাগে ছিলাম আমি। এমন একজন মানুষের জামাই হয়ে গর্বে বুক ফুলে উঠেছিল আমার।

এদেশের মানুষ ফি বছর বসন্তকালে উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে। সারা বছর ধরে প্রতীক্ষা করে তারা বছরের একটি দিনের জন্য। বসন্তকালের এই নির্দিষ্ট দিনে তারা এক অদ্ভুত খেলার ভাগীদার হয়। এখানকার মানুষ পিঠে ডানা বেঁধে পাখীর মতো আকাশে ওঠার এক বিচিত্র কৌশল জানে। বসন্তকালের সেই নির্ধারিত দিনে সবাই দল বেঁধে এরা আকাশে ওড়ে। উড়তে উড়তে নিঃসীম নীল আকাশের পারাবারে হারিয়ে যেতে চায় এরা। কেউ কেউ যে একেবারে হারিয়ে যায় না, তাও নয়। সবাই মিলে সকালে আকাশে ওঠে। সন্ধ্যার আগে আবার নিচে নেমে আসে। কিন্তু যারা ফেরে না তারা আর কোনও দিনই ফেরে না। তাই এই আকাশ অভিযান এক দিকে যেমন সুখদায়ক আর এক দিকে তেমনি দুশ্চিন্তারও বাহক। তাই সমুদ্রযাত্রার মতো এই আকাশ অভিযানের সময় স্ত্রী পুত্র পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করার রীতি আছে।

সেবার আমার বড় সাধ হলো, আমিও আকাশে উড়বো। কিন্তু কেউই আমার কথায় আমল দিল না। এবং কিভাবে ডানা মেলে আকাশে ওড়া যায়, তার কৌশলও কেউ শিখিয়ে দিল না।

কিন্তু আমার বিবাগী মন কিছুতেই বাগ মানে না। শেষে অনেক

চেষ্টাচরিত্র করে একজনকে রাজি করালাম। সে আমাকে শিখিয়ে দিল ডানা বেঁধে ওড়ার কায়দা। সে বললো, চল, আমি উড়বো তোমার সঙ্গে।

নীল আকাশে ডানা মেলে উড়ে চলেছি আমরা। মনের আনন্দে গান গাইছি। হঠাৎ বিপর্যয় ঘটলো, একটা দমকা হাওয়া এসে ওলোট পালট করে দিল আমাদের। আমার সঙ্গীটি ডিগবাজি খেয়ে প্রচণ্ড বেগে নিচে পড়ে গেল। আমি নিচেই পড়তাম, আল্লাহর অপার করুণা, পড়তে পড়তে একটা পাহাড়ের চূড়ায় আটকে গেলাম। আমার পাখা দুখানা তার আগেই ভেঙ্গে নিচে পড়ে গেছে।

এখন এই অবস্থায় কীভাবে আমার বিবির কাছে ফিরে যাবো সেই ভেবে আমি ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকি। এখন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। একটা পাথরের টিলার ওপর বসে বসে কাঁদতে থাকলাম। এই সময় দুটি প্রিয়দর্শন বালকের দেখা পেলাম। এত রূপ আমি কোন মানুষের দেখিনি।

আমি ধীর পায়ে উঠে গেলাম তাদের সামনে। মাথা নেড়ে শুভেচ্ছা জানালাম। আমাকে দেখে তারাও বেশ খুশি—স্বাগত জানালো। এবার মনে কিছুটা ভরসা পেলাম। বললাম, আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন, আপনারা কে? এখানেই বা কি করছেন?

আমরা আল্লাহর বরপুত্র।

ওদের দুজনের হাতে দুখানা ছোট্ট সোনার লাঠি ছিল। একজন একখানা আমার হাতে দিয়ে বললো, এই পথে চলে যাও।

লাঠিখানা হাতে নিয়ে আমি ওদের দেখানো পথ ধরে এগিয়ে চললাম। চলতে চলতে শুধুই ভাবছি, কি সুন্দর ছেলে দুটি। কি করেই বা এল এখানে।

কিছু দূর এগোতেই রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে এক জায়গায়। সেই পথে পা বাড়াতে যাবো হঠাৎ নজরে পড়লো সামনে এক বিশালাকায় বিষধর সাপ। তার মুখে একটা মানুষ। প্রায় তিনভাগই মুখের মধ্যে পুরে ফেলেছে।

আমি আর এক মুহূর্ত সহ্য করতে পারলাম না এই বীভৎস দৃশ্য। প্রাণপণ শক্তিতে লাঠিটা ছুঁড়ে মারলাম সাপটার দিকে। কিন্তু কি আশ্চর্য, এই ছোট্ট সোনার লাঠিটার কি যাদু, ঐ লাঠিটার আঘাতে সাপটা লুটিয়ে পড়ে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে খতম।

লোকটাকে টেনে বের করলাম তার মুখ থেকে। আর একটু হলেই পুরো দেহটাই সে পেটে পুরে ফেলতো।

এই লোকটি আসলে কোনও মানুষ নয়। সে বললো, আমি জীন। উড়তে উড়তে তোমার মুখে তোমাদের ঈশ্বরের নাম শুনে আমি কক্ষচ্যুত হয়ে ঐ সাপের মুখে গিয়ে পড়ি।

আমি বললাম, আমার একটা উপকার করবে?

—স্বচ্ছন্দে। তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করলে, আর তোমার উপকার করবো না? বল কি করতে হবে।

—আমার পাখা দুখানা ভেঙ্গে গেছে। যদি তুমি আমাকে আমার বিবির কাছে পেঁছে দাও—

—এ আর এমন বেশি কি? আমার পিঠে উঠে বসো। এক্ষুণি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি তোমার বাড়ি।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে আমাকে বাড়ির দোরগোড়ায় নামিয়ে দিয়ে গেল।

আমার বিবি তো ততক্ষণে কেঁদে কেঁদে সারা। তার ধারণা, আমি আর বেঁচে নাই। যাই হোক, সে বললো, এই হতচ্ছাড়া দেশে আর এক দন্ড থাকবো না আমি। বিষয়সম্পত্তি যা আছে সব বেচেটেচে দাও। বাকী জীবনটা বাগদাদে গিয়েই বাস করবো। বাবার তাই ইচ্ছা ছিল, তার মৃত্যুর পর আমি যেন তোমার দেশেই চলে যাই। আমার বাবা অনেক রেখে গেছেন। এ সবই এখন তোমার। টাকা পয়সার তো অভাব নাই, তবে আর কী, একখানা ভালো দেখে সওদাগরী জাহাজ কিনে ফেল। সামানপত্র সব বোঝাই করে, আল্লাহর নাম নিয়ে পাড়ি দেওয়া যাক।

আমি বললাম, সেই ভালো।

যে-সব জিনিসপত্র সঙ্গে নেওয়ার অসুবিধা সবই এক এক করে নীলামে চড়িয়ে বেচে দিলাম। দাম নেহাত কম পাওয়া গেল না! বেশ ভালো দেখে আনকোরা একখানা জাহাজ কিনলাম। সামানপত্র বোঝাই করে, দিনক্ষণ দেখে, একদিন বসরাহর দিকে রওনা হয়ে পড়লাম।

কিছুদিনের মধ্যে প্রথমে আমরা বসরাহ, পরে বাগদাদে এসে পেঁছিলাম। আমার বিবিকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে আমি বাড়ি গেলাম। সেখানে আমার আত্মীয় পরিজন সবাই দেখে খুশির আনন্দে নেচে উঠলো। আমার নতুন বিবিকে বরণ করে ঘরে তুললো তারা। দীর্ঘ সাতাশ বছর পরে আমি দেশে ফিরে আসছি। আমার বন্ধুবান্ধবরা উপদেশ দিল, সিন্দবাদ, এইভাবে জীবনের প্রায় সব কটা দিনই তো বাইরে বাইরে কাটিয়ে দিলে। এবার একটু ঘরে সুস্থির হয়ে বসো।

আমি বললাম, আর নয় যথেষ্ট হয়েছে। জীবনের দেখার আর কিছুই বাকী রাখিনি। এবার আর আমার জন্মভূমি বাগদাদ ছেড়ে বাইরে একপা যাবো না। এত ঝড়ঝন্ঝা বিপদ আপদ কাটিয়ে আজও যে আমি বেঁচে-বর্তে আছি, সে তো সেই একমাত্র করুণাময় আল্লাহর দয়ায়।

এই হলো আমার সপ্তম এবং শেষ সমুদ্রযাত্রার কাহিনী।

এবার বৃদ্ধ সিন্দবাদ কুলি সিন্দবাদের দিকে তাকিয়ে বললো, আমার কাহিনী শুনলে তো মিতা। তাহলে এখন ভেবে দেখ, তুমি যত হাড়ভাঙা পরিশ্রমই করে থাক—আমার তুলনায় তা কত নগণ্য। একটা দিকে তোমার নিশ্চিন্ত ভরসা আছে, সারাদিন খাটাখুটুনির পর ঘরে ফিরে যেতে পারবে তুমি। কিন্তু আমার কথা ভাবো, ঘর ছাড়ার পর আবার যে কখনও ঘরে ফিরতে পারবো সে ভরসা ছিল কী? ফিরে আসতে পেরেছি—সে একমাত্র তাঁরই কল্যাণে।

একথা সত্যি, আজ আমি বাগদাদের সেরা ধনী। আর তুমি দীন হতে দীনতম এক কুলি। কিন্তু এটা তো মানো, আমার যে উদ্যম আমার যে জীবনমরণ পণ তার পুরস্কার কি আমি পাবো না?

কুলি সিন্দবাদ বৃদ্ধের হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে বলে, আমার দুঃখের,

ব্যথার গানগুলো শুনে আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না, মালিক। আমি বুঝতে পেরেছি আমার ভুল। এ সংসারে যে যেমন কর্ম করে, সে তেমনই তার মূল্য পায়।

এই কাহিনী শেষ হলেও দুই সিন্দবাদের দোস্তী খতম হয় না। বরং আরও বেড়ে যায়। প্রতিদিন সে নিয়ম করে বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে আসে—বৃদ্ধেরই অনুরোধে। খুব জোর খাওয়াদাওয়া গান বাজনা চলে। কুলি সিন্দবাদ, সারাদিন খাটুনির পর, সন্ধ্যাবেলা আবার নতুন জীবনের স্বাদ ফিরে পায়।

উজির কন্যা শাহরাজাদ সিন্দবাদ নাবিকের এই অপূর্ব কাহিনী শেষ করে চুপ করে বসে থাকে। এই সময় অবশ্য রাত্রিও শেষ হয়ে আসে।

দুনিয়াজাদ ছুটে এসে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে বলে, কি সুন্দর গল্প তোমার দিদি। আর কি মিষ্টি করেই না বলতে পারো। শুনতে শুনতে চোখের ঘুম উবে যায়। আচ্ছা, দিদি সত্যি কি সিন্দবাদের মতো ঐরকম দুঃসাহসিক নাবিক কেউ ছিল? এইভাবে সে বার বার সাত বার নিজের জীবন তুচ্ছ করে বিপদের সঙ্গে লড়াই করেছিল?

—মিথ্যে হবে কেন, বোন ? এতো ইতিহাস। যাই হোক, আজকের মতো ঘুমিয়ে পড়ো। কাল রাতে নতুন কাহিনী শুরু করবো। দেখবে কি মজার।

সুলতান শারিয়ার শাহরাজাদকে আদর করতে করতে বললো, সিন্দবাদের মতো এমন দুঃসাহসিক হয়তো না, কিন্তু আমি আর আমার ছোট ভাই শাহজামান একবার এক অভিযানে বেরিয়েছিলাম, সে কাহিনীও বড় চমৎকার। পরে একদিন শোনাবো তোমাদের। সে যাক, কাল রাতে কী কিস্‌সা শোনাবে শাহরাজাদ।

শাহরাজাদ সুলতানের কোলে মাথা রেখে বলে, কাল শোনাবো, সুন্দরী জুমুরুদ আর আলী শার-এর কাহিনী।

শাহরাজাদের চিবুকে হাত বুলিয়ে ঠোঁটে সোহাগ করতে করতে শারিয়ার ভাবে, এই সব মজাদার কিস্‌সাগুলো না শুনে তো মেয়েটাকে মারা যাচ্ছে না। জানি না কত গল্প সে জানে। আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে সে।

যথাকার্য সমাধার পর ওরা দুজনে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সেদিন সুলতান শারিয়ারের দরবারে পেঁছিতে কিছুটা দেরিই হয়ে থাকবে। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি তার ওপর আদর সোহাগের অবসাদ—সব মিলে প্রিয়াবাহুডোর খুলে আসতে হয়ত বা কিছুটা দেরিই হয়েছিল।

দরবারে সবাই উদ্বিগ্ন। চিন্তিত। সুলতানের তবিয়ৎ কি আচ্ছা নাই। এমন দেরি তো বড় একটা হয় না তার।

যাই হোক, সুলতান দরবার কক্ষে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে জল্পনা কল্পনার গুঞ্জন একেবারে থেমে গেল। শাহরাজাদ পিতা উজির সুলতানের বাহুতে কন্যার মাথার ওড়নাখানা দেখে আঁৎকে ওঠে। মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে তার। তাহলে বুঝি শাহরাজাদ আর বেঁচে নাই। এতদিন সে কোনও রকমে গল্প বলে ভুলিয়ে রেখেছিল, কিন্তু আজ হয়তো সে

পারেনি। সুলতান তার মুণ্ডচ্ছেদ করে এসেছে। দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে সে অপেক্ষা করতে থাকে। এই বুঝি সুলতান তার কন্যার দণ্ডবিধানের কথা ঘোষণা করে। কিন্তু না, সে সব কিছুই বললো না শারিয়ার। প্রতিদিন সে যেমন বলে। 'কই কি কাজকাম আছে বল', সেই কথাই আজও জিজ্ঞেস করলো।

সারাটা দিন কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়ে সন্ধ্যা হতেই আবার সে ফিরে আসে শাহরাজাদের ঘরে। তারপর প্রাত্যহিক সুরতরঙ্গ সমাধা করে আবার উন্মুখ হয়ে বসে গল্প শোনার জন্যে।

তিনশো ষোলতম রজনীতে শাহরাজাদ নতুন কাহিনী বলতে শুরু করে:

দুনিয়াজাদ এতক্ষণ নিচে গালিচার ওপর ঘাপটি মেরে শুয়ে ছিল। এবার সে দিদির পাশে এসে বসে।

শাহরাজাদ শুরু করে—

অনেকাল আগের কথা। খোরাশান শহরে এক ধনী ব্যবসায়ী থাকত। তার নাম ছিল প্লোরি। আলী শার নামে তার চাঁদের মত ফুটফুটে একটা ছেলে ছিল। খুব বুড়ো হয়ে পড়ায় ব্যবসাদারের শরীরটাও অকেজো হয়ে পড়েছিল। শেষ সময় ঘনিয়ে আসছে বুঝতে পেরে বুড়ো একদিন ছেলেকে ডেকে বলে, আমি তো চললাম, যাবার আগে তোকে কটা কথা বলে যাই।

ছেলে জিজ্ঞেস করে,—কী কথা আব্বাজান?

ব্যবসায়ী বলে,—বাপজান, এ দুনিয়ার সঙ্গে কখনো যেন জড়িয়ে না পড়িস। বলতে গেলে সারা দুনিয়াটাই তো একটা কামারশালা। তোকে হয় পোড়াবে, নয়ত ওর আগুনের ফুলকিতে তোর চোখ দুটো কানা করে দেবে। আর তাও যদি না পারে তাহলে ধোঁয়ার চোটে দম বন্ধ করে দেবে। তাই ত কবিরা বলেন—

জীবনের এই আঁধার পথে নেইকো বন্ধু নেইকো আশা।
কোথাও খুঁজে পাবে নাকো প্রাণ-পিয়াসী ভালবাসা।
ভাল যদি বাসতে চাওরে, ভালবাস নির্জনতা।
নির্জনতা একাই খাঁটি, তার নেইকো কোন আবিলতা।

অথবা

এই দুনিয়ার দেখবে ছবি? দুই পাশেতেই আঁকা সে কি?
হয়ত হবে!—তাই তো মোরা সবাই দেখি!
সামনেতে তার ভণ্ডামি আর আঁকা আছে মিথ্যা আচার,
পেছনেতে মিথ্যা আঁকা, আর যা আছে তাই তো মেকি!

আর একজন কবি এ বিষয়ে কি বলেছেন শোন—

ভ্রান্ত এক নিষ্ফলতা এ পৃথিবী জামার মতন পরে আছে
কোটের খোলস যেন। কোন দিন সেই শূন্য আঙ্গিনার মাঝে

বন্ধু যদি কদাচিৎ মিলে যায় আল্লার দয়ায়। দাওয়াই-এর মত
তাদের প্রলেপ দিও অতি সন্তর্পণে, সারে যেন পৃথিবীর ক্ষত।

আব্বাজানের কথা শুনে আলী শার বলে,—আমি তোমার কথাগুলো মনে রাখব। আর কিছু বলবে আব্বাজান?

বুড়ো বলে,—পারলে কারো ভাল করবি, তবে তার বদলে কিছু আশা করবি না। মনে রাখবি ভালো কাজ করার সুযোগ সব সময় আসে না।

—আমি মনে রাখব আব্বাজান।

—শোন যে সব ধনদৌলত রেখে গেলাম, সেগুলো নষ্ট করবি না, উড়িয়ে দিবি না। এ দুনিয়ায় যার পয়সা আছে লোকে তাকেই মানুষ বলে মানে। একটা বয়েৎ শোন—

সেদিন আমার বদান্যতায় কুৎসা যারা করেছিল
আজো তারা কুৎসা রটায়—যদিও আজ শিথিল মুঠোর পেশী।
সোনার খনি খুঁড়তে গিয়ে শত্রু যত হয়েছিল
আজকে আমি দীন দরিদ্র, শত্রু তবু অনেক বেশী।

অভিজ্ঞতা যার বেশী তাকে কখনো অবহেলা করবি না। পাকা মাথার সঙ্গে পরামর্শ না করে কখনো বিদেশে যাবি না।

কবি বলেন—

সামনে থেকে দেখতে গেলে একটি কাচেই কাজ হবে।
পেছন থেকে দেখতে গেলে আরো একটি নিতে হবে।

আমার শেষ কথা—কখনো সরাব ছুঁবি না। দোজখের দোর হলো সরাব। সরাব খেলে ভালমন্দ জ্ঞান থাকে না। মাতালকে লোকে সব সময় ছোট নজরে দেখে। আমার কথাগুলো মনে রেখো বাপজান। অন্তর থেকে তোকে দোয়া করছি। এ দোয়া তোকে সব সময় ঘিরে থাকবে।

এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলে বুড়ো হাঁপাতে থাকে, একটু চোখ বোজে। দেহের সমস্ত শক্তি জড় করে প্রার্থনার ভঙ্গীতে হাত দুখানি তোলার চেষ্টা করে। ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে মোনাজাত জানায়। আল্লাহর ওপর তার অসীম বিশ্বাসে সে যেন তাঁর পদপ্রান্তে পেঁছিতে পারে।

আশপাশের ছেলে-বুড়ো-জোয়ান, ধনী-দরিদ্র সকলেই এসেছিল বুড়োর শেষকৃত্যের সময়। কবরের ফলকে আলী শার লিখে দিল:

আমি যখন বেঁচে ছিলাম তখন ছিলাম ধূলি
কেমন করে ভুলি!
এখন আমি ধূলির মধ্যে ধূলি হলাম
এ যে অন্যরকম ধূলি!

বাবা মারা যাবার পর আলী শার দোকান দেখাশোনা করতে লাগল। তাঁর প্রতিটি উপদেশ সে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলল কি? না, বরং বলতে গেলে, বাপের একটা নির্দেশও সে মানল না। প্রথম থেকেই আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাংক্ষীদের সে এড়িয়ে চলতে লাগল। এসে জুটল একদল সুযোগ-সন্ধানী লোক। বছর ঘুরে গেল। এর মধ্যে আলী শার-এর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কতকগুলো বদমাশ মাতোয়ালা ছোকরার কাছে নিজেকে যেন বিকিয়ে দিল সে। এসব বদমাশদের প্রায় সব কটার মা বা বোন দেহ বিক্রী করে পেট চালায়। ধীরে ধীরে ব্যভিচারের জোয়ারে ভেসে গেল আলী শার। সরাবের সায়রে ক্রমেই সে নাকানি চোবানি খেতে থাকে। নানা পাপাচারে মনের চেহারাটাও তার পালটে গেল। নিজেকে নিজে চোখ ঠেরে সে বলে, আব্বাজানের ধনদৌলত সে ভোগ না করলে অন্যলোকে করবে। তাই অন্য লোককে করতে না দিয়ে সে নিজেই ভোগ করবে। ভোগের পরে এলো দুর্ভোগ। হাতের টাকাপয়সা শেষ হয়ে গেল। রাতের খরচ মেটাতে একদিন দোকানটাও বিক্রী করে দিল। শেষ পর্যন্ত বসত বাড়ি বেচতে হল, বেচতে হল সমস্ত আসবাবপত্র। দামী পোশাকগুলোও বেহাত হয়ে গেল। সব হারিয়ে এক সময় নিঃস্ব ফকীর বনে গেল আলী শার।

এভাবে সব কিছু খুইয়ে নিজের অবিমৃশ্যকারিতার চেহারাটা তার চোখের ওপরে স্পষ্ট হয়ে উঠল। আব্বাজানের কথাগুলো বড় যেন বুকে বাজে এখন। এতদিন যারা বন্ধুবান্ধবের বেশে তার আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল তারা সব সরে পড়তে লাগল নানান অজুহাত দেখিয়ে। দিনের খানাটাও আর জোটাতে পারে না আলী শার। ভিক্ষা করা ছাড়া আর উপায় রইল না তার। ভিক্ষার থালা নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দাঁড়ায় আলী শার। ঘুরতে ঘুরতে বাজারের কাছে এসে পড়ে একদিন, দেখে কিছুলোক জটলা করছে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। কি হয়েছে দেখার জন্য ভিড়ের মধ্যে ঢুকে দেখে ভিড়ের ঠিক মাঝখানে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে—বেশ ফুটফুটে সুন্দর দেখতে।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চুপ করে গেল।

তিনশ সতেরতম রজনীতে শাহরাজাদ আবার বলতে শুরু করল :

মেয়েটিকে বিক্রীর জন্য বাজারে আনা হয়েছে। ছোটখাট দেখতে মেয়েটি। ঠোঁট দুখানি যেন গোলাপের পাঁপড়ি। মুখখানি পানের মত। উজ্জ্বল রঙ। রোদের আলোয় চিকচিক করছে। আলী শারের মনে হল স্তনভারে আনত যেন মেয়েটি। বুকের দিকে তাকিয়ে আলী শার বুকটা ঢিপঢিপ করে। গুরুভার নিতম্বটিকে পোশাকে ধরে রাখতে পারছে না। একমুঠো সরু কোমর। সব মিলিয়ে অপরূপ। আলী শার বিড়বিড় করে বলে—

কুঁচ বরণ কন্যা সে যে কোকিল কালো কেশ।
নিঃশ্বাসে তার মৃগ-গন্ধ চাকন চুকুন বেশ।

তার কুচের ওপর দেখতে পাবে মুক্তামালার মঞ্জরী
শিশির-গলা মুক্তা-ঝুরি কোন বেহেস্তের অপ্সরী।
সেই বুকেতে তুষার ধবল চাঁদের কিরণ পড়ে—
তার রূপের আলোয় ভুবন কালো নয়ন নাহি সরে।

মেয়েটির রূপের মাদকতায় ডুবে যায় আলী শার। চার পাশের কথা, নিজের অবস্থা সব ভুলে মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে মেয়েটাকে। ভীড়ের মধ্যে বাজারের ব্যবসায়ীরাই ছিল সংখ্যায় বেশী। ওরা বলাবলি করছে' একে বাঁদী করে নেওয়ার ক্ষমতা এখানে একমাত্র গেলারিদেরই আছে। তারা অবশ্য গেলারির ছেলের গোল্লায় যাওয়ার খবরটা তখনো শোনেনি।

মেয়েটিকে যে বেচতে এনেছে তার প্রধান দালাল মেয়েটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ভিড়টা একবার ভালভাবে দেখে নিয়ে সে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, আসুন, এই মরুভূমির দেশের আমির, ওমরাহ, ব্যবসাদার সবাই এসে দেখুন! চাঁদের রানী আর গোলাপের রানী এই সুন্দরীর নাম—জুমুরুদ। কোন পুরুষ এখনো একে ছোঁয়নি। রাতে বিছানায় সব মেয়েকেই নিয়েহ শোয়া যেতে পারে কিন্তু এর মত মজা কেউ দিতে পারে না। এ যেন একঝুড়ি ফুল—যার গন্ধে নেশা ধরবে, মৌতাত লাগবে। নিন, নিন, নীলাম ডাকতে শুরু করুন। নীলামের নাম শুনে ভয় পাবেন না। যার যেমন খুসী দর হাঁকতে পারেন। আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে চাঁদের সলতানিয়তের মহারানী লজ্জাবতী কুমারী জুমুরুদ—এখনো সে কোন পুরুষের সঙ্গে শোয়নি,—ফুলের মত শরীর—ডাকুন, ডাকুন—

প্রথমে এক ব্যবসায়ী চেঁচিয়ে বলে উঠল,—আমি পাঁচশ দিনার দর দিলাম। অন্য একজন সঙ্গে সঙ্গে বলল পাঁচশ দশ। ভিড়ের ভেতরে দাঁড়িয়ে ছিল কুৎসিত চেহারার একটা বুড়ো, নাম রশিদ-অল দিন। তার নীল চোখের কোণে পিচুটি জমে শক্ত হয়ে আছে। ভীড় ঠেলে সে সামনে এসে দাঁড়াল। চিলের মত গলার আওয়াজ তুলে বলে,—ছয়শ। আর একজন ছয়শ দশ বলতেই বুড়োটি প্রায় লাফিয়ে উঠল, একহাজার দিনার।

যারা এতক্ষণ ডাকছিল তারা চুপ করে গেল। দালাল বিক্রেতার কাছে গিয়ে বলে, এক হাজার দিনারে কি মেয়েটাকে ছেড়ে দেবেন?

—হ্যাঁ, ছেড়ে দেব। কিন্তু বেচে দেওয়ার একটা শর্ত আছে যে! মেয়েটাকে আমি কথা দিয়েছি ওর পছন্দমত লোকের কাছেই আমি ওকে বেচতে পারব। তুমি মেয়েটাকে একবার জিজ্ঞেস কর।

মেয়েটির কাছে গিয়ে দালাল বলে,—জুমুরুদ তুমি এই বৃদ্ধ রশিদ অল-দিনের কাছে বিক্রি হবে?

রশিদ অল-দিনকে জুমুরুদ একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখে নিল। দেখে বুড়োটা ওর দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে। জুমুরুদ কেঁদে ফেলল,—দালাল তুমি কি এই বুড়োটাকে চেননা? এই ভামটা দিনের আলো সহ্য করতে পারে না। দিনের বেলা তাই বাইরে বেরুতে পারে না। ওর মত লোকেদের জন্য একটা কবিতা আছে, শোন:

আমি তার রাঙা ঠোঁটে চুমু চেয়েছিলাম, সে
অপরাধ নেয়নি কো—শুধু এক ঊর্ধ্ব গ্রীব জিরাফের বেশে
উদাসীন চোখ দুটি দিয়েছিল মেলে—
রাঙা অধরের কোণ থেকে একটি জবাব শুধু পড়েছিল হেলে
আমার প্রার্থনায়—শ্বেত পক্ক কেশ আমি ভালবাসি না যে—
তুলোর মত তারে লালা দিয়ে দ্রব করি রাঙা মোর অধরের মাঝে।

দালাল বলল,—তোমাকে কথা যখন দিয়েছি তখন তুমি এই বুড়োকে নাও পছন্দ করতে পার। তাছাড়া তোমার মত রূপ এক হাজার দিনারে পাওয়া যায় না। নিদেন পক্ষে দশ হাজার দিনার হওয়া উচিত।

ভিড়ের দিকে তাকিয়ে দালাল বলল—এই ভদ্রলোকের দেওয়া দামে আর কেউ নেবেন ?

—আমি নেব।

জুমুরুদ দেখল, রশিদ অল-দিনের মত কুৎসিত নয়। ওর চোখের কোনায় পিচুটিও লেগে নেই। কিন্তু এ লোকটাও বুড়ো। যদিও বয়স লুকোবার জন্য চুল দাঁড়িতে কলপ মেখে আছে। জুমুরুদ চেঁচিয়ে ওঠে—ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এই লোকটা ! কি লজ্জা মাগো ! এ বুড়োটা ছোঁড়া হওয়ার জন্য মুখে রঙ মেখেছে !

এই বলে সে একটা বয়েৎ ধরল—

আমি তোমার সঙ্গী হতাম, সত্যি বলি শোন—
প্রাণের অর্ঘ দিতাম তোমার পায়—
তোমায় আমি গুরু বলে নিতাম তুলে শিরে
যদি তোমার শ্মশ্রু গুম্ফ থাকত সাদা হয়ে।
কিন্তু তুমি রঙ মেখেছ, লাল করেছ দাঁড়ি।
তোমার সাথে আর কি যেতে পারি ?
তোমায় দেখে ভয় করে যে, করব কি আর বল—
তোমায় দেখে ঝরে যাবে প্রেম অমৃত ফল।

—বাঃ, বাঃ, কি অমৃত বলছ গো ! উচ্ছ্বাসে বলে উঠল দালাল।
—তুমি সাচ্চা বাতই বলেছ।

দ্বিতীয়জন নাকচ হবার সঙ্গে সঙ্গে আর একজন জুমুরুদকে কিনতে চাইল। লোকটার একটা চোখ কানা। জুমুরুদ হেসে বলল—ওগো আমার এক চোখা নাগর শোন :

মিথ্যেবাদী আর কানার মাঝে তফাৎ কিছু জান ? জান না ?
জানবে কেমন করে ? কানা মানুষ মিথ্যেবাদী,
মিথ্যেবাদী কানা।

এবার দালাল আরো একজনকে দেখাল। বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা লোক। একগাল দাঁড়ি, ভুঁড়ি পেট পর্যন্ত নেমে এসেছে। জুমুরুদ বলল—এই

লোমওয়ালা লোকটার সঙ্গে যেতে বলছ? শোন তবে:

বাঁদিকে আর ডানদিকে তার গালপাট্টা দাড়ি।
তাই দেখে হায় কাঁপতে কাঁপতে চুপসে গেল নারী।

—চারজনকেই অপছন্দ? দালাল আর ধৈর্য রাখতে পারে না। নাঃ, এ আমার কম্ম নয়। তোমার জিনিস তুমিই বাছো বাপু। এঁরা সব নামি-দামী আর মান্যগণ্য ব্যবসায়ী—এদের মধ্য থেকে একজনকে তুমি পছন্দ করে নাও। তোমাকে সওদা করে তিনিও বাড়ি চলে যান।

মেয়েটি এবার ভিড়ের দিকে চোখ তুলে তাকাল। প্রত্যেকটি লোককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। চোখ ঘুরতে ঘুরতে এসে আলী শারের ওপর আটকে গেল। ভিড়ের মধ্যে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের সঙ্গে আলী শার রূপ বা স্বাস্থ্যের কোন তুলনাই হয় না। ওর দিকে আঙুল দেখিয়ে জুমুরুদ দালালকে বলল—একেই খুঁজছি আমি, একেই আমার চাই। ও আমাকে কিনে নিক। ওকে দেখে আমার চোখে রঙ ধরেছে। কি সুন্দর মুখ! কি দারুণ স্বাস্থ্য! ওর আলিঙ্গনের জন্য মনটা আমার আকুলি-বিকুলি করছে। ওর গরম রক্তের আঁচ আমার গায়ে এসে লাগছে, আমি ক্রমেই পাগল হয়ে উঠছি। ও যেন কেমন মিষ্টি হাওয়া! ওকে দেখেই বোধ হয় কবি বলেছেন:

অমরা যারা যুবক ছিলাম, তোমরা যারা বৃদ্ধ।
তোমার দিকে চেয়ে চেয়ে সবাই হল তৃপ্ত।
যৌবন রে, তুমি দেখ নয়ন মেলে
রূপটা তোমার ঢাকার তরে যাচ্ছে ফেলে ফেলে
হাজার হাজার ওড়না যত
এই দুনিয়ায় সব হারানো মানব শিশুর মত।

আর এক কবি বলেছেন:

প্রিয়, তুমি বুঝতে পার নাক?
এমনি করে রূপটাকে তাই লুকিয়ে রাখ।
এ রূপতো লুকিয়ে রাখার নয়
এ রূপ যে বিশ্বভুবন ছড়িয়ে দিতে হয়
ভারি তোমার জঙ্ঘা দুটি, সরু তোমার কটি;
প্রিয়া-মিলন লাগি তোমার একটু কি নাই ত্বরা?
তোমার অঙ্গে আমার অঙ্গ মিশিয়ে দিতে কি সুখ!
প্রিয় যখন আসবে উঠে তখন আমার কি দুখ!
ক্ষুধার্তকে অন্নদান,
ঈশ্বর বিধান।
জীবহত্যা পুণ্য নয়
এ কথা সর্বশাস্ত্রে কয়।

প্রিয়, হে প্রিয় আমার
তোমার বিহনে মোর জগত আঁধার।

ওকে দেখে কবিতা কি ফুরোতে চায়?

কোঁকড়া চুলের ওই যে হরিণ শিশু
গালেতে যার অস্ত রবির রঙ্গীন আলো
শপথ নিয়ে বলতে পারি
আমার ঘরে আসবে বলে কথা যে সে দিয়েছিলো।
সেই কথাটা বলতে গিয়ে লাজে
এখনো সে চক্ষু দুটি বন্ধ করে আছে।
মিলন শেষে, আছেই আমার জানা
ও আমার সাথে করবে প্রতারণা।
কিন্তু ধর...

দালাল মেয়েটার কবিতার তোড় দেখে অবাক হয়ে গেল। বিক্রেতার কাছে গিয়ে কথাটা সে বলেই ফেলল।

বিক্রেতা হেসে বলল—মেয়েটার রঙ্গরস দেখে তোমার তাজ্জব বনে যাবারই কথা। ওর রূপ তো দেখছো। মেয়েটা খালি যে অন্যের কবিতাই বলতে পারে তা না ; ও নিজেও একজন কবি। সাতটা কলমে সাতটা কবিতা লিখতে পারে এক সঙ্গে। তাছাড়া ও সুন্দর দুটি হাতের কত গুণ আছে জান? রেশমী কাপড়ের ওপর সুন্দর সুন্দর নকসা তুলতে পারে ও। ওর হাতের তৈরী কার্পেট বা পর্দা বাজারে কম করে পঞ্চাশ দিনারে বিকোয়। একখানা কার্পেট বা পর্দা করতে ওর সময় লাগে মাত্র সাত থেকে আট দিন। ওকে যে কিনবে, কয়েক মাসের মধ্যেই তার দাম উশুল হয়ে যাবে।

এতগুণ মেয়েটার! দালাল বলল—এ ধন যার ঘরে যাবে, সে কত ভাগ্যবান! মেয়েটা নিজেই এক অমূল্য রত্ন। ওকে পাহারা দিয়ে রাখতে হবে। আলী শার কাছে গিয়ে ওর হাত দুখানা টেনে চুম্বন করে বলল—

ভোর হতে দেখে শাহরাজাদ চুপ করে গেল।

তিনশ উনিশতম রজনীতে আবার শুরু করল শাহরাজাদ:

দালাল বলে—তোমার নসিবকে হিংসে করতে হয়। কত লোক তো কিনতে চাইল, সে তো চোখের সামনেই দেখলে। কেউ পারল না। এই সুন্দরীর যে-সব জিনিস আছে, সে কথা কী আর বলব! হাজার হাজার দিনার দিলেও এসব জিনিস পাওয়া যায় না। শিকে যে শেষ পর্যন্ত তোমার ভাগ্যেই ছিঁড়ল! মেয়েটার যখন তোমাকেই পছন্দ তখন বিক্রেতা তোমার হাতেই তুলে দেবেন ওকে। নিয়ে যাও মেয়েটিকে দোস্ত—জীবনে সুখ পাবে। ও ভাগ্যবতী!

এসব দেখেশুনে আলী শারের মাথা নীচু হয়ে যায়। ফুটে ওঠে

মুখে অপ্রস্তুতের হাসি। কিছু যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সে। কোথায় সে দাঁড়িয়ে আছে তা-ই বোঝার চেষ্টা করছে। ফিসফিস করে বলে, অদৃষ্টের কি পরিহাস! ওরা সবাই ভাবছে, মেয়েটাকে কেনার মত যথেষ্ট পয়সা আমার আছে। হায় আল্লা! একটুকরো রুটির দাম যেখানে জিজ্ঞেস করতে পারি না, সেখানে····। এখানে আমার মুখ না খোলাই ভাল। সবার সামনে বেইজ্জত হই আর কি! —ও মাথা নীচু করেই রইল।

জুমুরুদ বিলোল কটাক্ষে আলী শারকে ঘায়েল করতে চাইল। মুখ ঘুরিয়ে ফিসফিস করে দালালের হাত ধরে বলল—ওর কাছে আমাকে নিয়ে চল, ওর সঙ্গে কথা বলব। আমাকে যাতে ও কিনে নেয় তার জন্য ওকে আমি বোঝাব। আমি ওর সঙ্গেই যাব—আর কারুর সঙ্গে না—না—না।

দালাল কি আর করে! তাকে নিয়ে আলী শার কাছে দাঁড় করিয়ে দিল। আলী শার সামনে যেন বেহেস্তের হুরী। জুমুরুদ বলে—ওগো আমার ভালবাসা, তোমার যৌবন আমার শরীরে যে আগুন ধরিয়ে দিল! দাম বলছ না কেন? আমাকে খুব দামী বলে মনে হলে না হয় দাম বেশীই বল। আর কম মনে হল কমই বল। যাহোক একটা কিছু বল। যে দাম দেবে তাতেই আমি চলে যাব। আমি শুধু তোমার সঙ্গেই যাব।

আলী শারের চোখ ফেটে জল আসে আর কি। মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলে—বেচার দিব্যি তো কেউ দেয়নি, কেনার কথাই বা ওঠে কেন?

—হাজার দিনার বেশী মনে হচ্ছে?

আলী শার মাথা ঝাঁকিয়ে চলে।

—ঠিক আছে, আট শ-তে কেনো। সাতশ? তাও না? থাক তুমি একশ দিনার দিয়ে দাও।

আলী শার বলে অত নেই আমার কাছে।

—কত কম পড়ছে? পুরো একশ দিনার না দিতে পারলে পরেই না হয় দিও। —জুমুরুদ হেসে আলী শার গায়ে ঢলে পড়ে।

শক্ত হয়ে যায় আলী শার। অক্ষম পুরুষের প্রাণে জ্বালা ধরে। জ্বালা চেপে রেখে সে বলে—একশ দিনার তো দূরের কথা আমার কাছে এক দিনারও নেই। আমি আল্লার নামে শপথ করে বলছি আমার কাছে এক কানা কড়িও নেই। তুমি ফালতু সময় নষ্ট করছ। যাও, অন্য খদ্দের দেখ।

ওর কাছে এক পয়সাও নেই সেটা জুমুরুদ বুঝল। জুমুরুদ বলল—ঠিক আছে। কেনার জন্যে তোমায় কোন পয়সা দিতে হবে না। আমার হাত ধরে এই জামাটা পরিয়ে দাও আর একখানা হাত দিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধর। ব্যস, আমি তোমার হয়ে যাব। আমাকে যে তুমি নিলে এতেই তা বোঝা যাবে।

যন্ত্রচালিতের মত আলী শার জুমুরুদকে জামা পরিয়ে দিয়ে ডান হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরার জন্যে হাতখানা ঘুরিয়ে আনলো, আর ঠিক সেই সময় জুমুরুদ হঠাৎ একটা দিনার ভর্তি থলি তার হাতে গুঁজে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে—এতে এক হাজার দিনার আছে। মনিবকে নশ দিয়ে দাও। বাকী একশ নিজের কাছে রাখ। সামনে কষ্টের দিন আসছে

কাজে লাগবে তখন।

আলী শারও ওর কথা মত ন শ' দিনার দিয়ে জুমুরুদকে ঘরে নিয়ে গেল।

আলী শার দীনকুটির দেখে জামরুদ মোটেই অবাক হল না। অপরিসর একখানি ঘর। আসবাবপত্র বলতে শত ছিন্ন ময়লা আর তেলচিটে একখানি মাদুর। মাদুরখানা যে কবে কেনা হয়েছিল তা বলা মুশকিল। এছাড়া ঘরে আর কিছু নেই। একটা হাজার দিনারের থলি আলি শার হাতে দিয়ে জুমুরুদ বলে—এক্ষুণি বাজারে যাও। সুন্দর আসবাব আর একখানা চমৎকার কার্পেট কিনবে। ভাল ভাল খাবার দাবার আনবে। শরাবও এনো ভাল দেখে। আর আনবে আমার জন্যে একখানা বড়সড় চৌকো দামাস্কাস সিল্কের কাপড়ের টুকরো। বাজারের সেরা জিনিসটি কিনবে। কাপড়ের রংটা চাই টকটকে লাল। এক লাচি সোনালী সুতো, এক লাচি রুপালী সুতো আর নানান রং-এর সাত লাচি সুতো আনবে। দাঁড়াও আরো আছে। বড় বড় কয়েকটা সুঁচ আর আমার আঙ্গুলে পরার জন্য একটা টোপর। মনে থাকবে তো সব? ভুলো না যেন। যাও তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

বেশ কিছুক্ষণ পর বাজার সেরে আলী শার বাড়ি ফিরল। জুমুরুদ প্রথমেই মেঝেতে কার্পেট বিছিয়ে ফেলল। তার ওপর তোশক পাতল। বালিশ তাকিয়া সুন্দর করে সাজানো হল। ঘরটর আগেই সে ঝেড়ে পুছে রেখেছিল। এবারে মোমবাতি ধরাল। তোশকের ওপর পাতল সাদা ধবধবে চাদর।

সব কাজ সারা হলে দুজনে মনের আনন্দে খানাপিনা শুরু করল পাশাপাশি বসে। শরাব খেল, অনেক কথা, অনেক ভাবনা দুজনে দুজনকে বলল। অবরুদ্ধ বাসনার উন্মেষ হতে লাগল ধীরে ধীরে। এবার বিছানায় যাবার পালা। দুজনেই ক্লান্ত। নতুন বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল দুজনে। নতুন বিছানার নতুন গন্ধের মাঝে গভীর আবেগে একে অন্যকে জড়িয়ে কাছে টেনে নিল। জুমুরুদের যৌবনে অনাঘ্রাত ফুল এই প্রথম নিবেদন করল তার বাঞ্ছিতের কাছে। মুহূর্তের জন্যও ছাড়াছাড়ি হল না। অচ্ছেদ্য বাহুবন্ধনে আরো গভীর কোন সুখের দেশে পাড়ি জমায় তারা। কিন্তু সুখের রাত যেন বড়ই ক্ষণস্থায়ী। রাত ভোর হয়ে এল। এক জোড়া যুবক-যুবতী ভোরের আলোয় যেন স্নান করল।

সূর্যের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে জুমুরুদ কাজে বসে গেল। রাতের সুখটুকু গায়ে লেপটে রয়েছে। গাল দুটো একটু বেশী লালচে লাগছে। দামাস্কাস সিল্কের টুকরো দিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে একটা বাহারি পর্দা তৈরী করে ফেলল সে। নানান পশুপাখীর নকসা কি সুন্দর করে তুলে ফেলল পর্দায়। পর্দার মাঝে বিরাট বিরাট গাছের ছবি। ডালগুলি ফলভারে নুয়ে পড়েছে। গাছের ছায়ায় বসে দুদণ্ড জিরোতে মন চায়। সমস্তটা মিলিয়ে এক অনবদ্য প্রাণবন্ত প্রকৃতির ছবি। এত বড় কাজটা তুলতে জুমুরুদের সময় লেগেছে মাত্র আট দিন। জুমুরুদের দক্ষতা দেখে আল্লাকে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাল আলী শার।

পর্দার কাজ শেষ হলে ভাল করে সেটাকে ভাঁজ করে নিল জুমুরুদ; তারপর সেটা আলী শারের হাতে দিয়ে বলল—বাজারের কোন দোকানদারের কাছে এটা নিয়ে যাও। পঞ্চাশ দিনারের কমে বেচো না যেন। সেই সঙ্গে আর একটা কথা ভাল করে শুনে যাও। একদম ভুলো না, অচেনা কোন ফেরীওয়ালার কাছে পর্দাটা বেচো না। বেচলে, আমাদের দুজনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। বুঝেছ? অনেক শত্রু আমাদের রয়েছে। সুযোগের অপেক্ষায় অনেকেই রয়েছে ওৎ পেতে। তাই, অচেনা কাউকে বেচবে না, সাবধান!

কথাগুলি শুনল আলী শার; তারপরে বাজারে গিয়ে চেনা একটি দোকানদারকে পঞ্চাশ দিনারে সেই সুন্দর পর্দাটা বেচে দিল।

ভোর হয়ে আসছে দেখে চুপ করে গেল শাহরাজাদ।

তিনশো কুড়িতম রজনী:

পরের দিন গল্প শুরু করতে দেরী হয়ে গেল অনেকটা। শাহরিয়ারের মনের তাপ জুড়োতেই মাঝ রাত প্রায় কাবার হয়ে এল। দুনিয়াজাদ অধীর হয়ে বলে, কই, শুরু কর।

—হ্যাঁ বলছি।

ফেরা পথে অনেক সিল্কের কাপড় আর সোনালি-রুপালি সুতোর গুলি কিনে নিয়ে এল আলী শার। এগুলি দিয়ে তৈরি হবে অনেক সুন্দর-সুন্দর পর্দা বা কার্পেট। দেরী করল না জুমুরুদ; কাজ শুরু করে দিল। ঠিক আট দিনের মাথায় সে একখানা বেশ চমৎকার কার্পেট বুনে ফেলল। প্রথমটির চেয়ে এটি অনেক বেশী সুন্দর। এটিও বিক্রী হল পঞ্চাশ দিনারে। এইভাবে সারা বছর ধরেই তারা কাজ করে গেল। কাজের চাপে তাদের ভালবাসায় গায়ে এতটুকু জঙ ধরেনি; বরং, দিন-দিন তা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। প্রেম-সাগরের দুর্বার তুফানে ভেসে গিয়েছে তারা।

একদিন আলী শার একটা পোঁটলা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। সেই পোঁটলাতে ছিল জুমুরুদের হাতে তৈরি একটা কার্পেট। বাজারে গিয়ে কিন্তু কোন ব্যবসাদারের কাছে বেচল না; একটা দালাল ধরল। তাকে সঙ্গে নিয়ে দালালটা দোকানে-দোকানে ঘুরে চেঁচাতে লাগল। এমন সময় একজন খ্রীস্টান যাচ্ছিল তাদের পাশ দিয়ে। এই সব খ্রীস্টানরা সাধারণত বাজারে ঢোকার পথে এক জায়গায় দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। কেনা-বেচার কাজে ক্রেতা-বিক্রেতাদের প্রয়োজনবোধে হাতে-পায়ে ধরতে পর্যন্ত তাদের বাধে না।

খ্রীস্টান দালালটা আলী শার দালালকে বলল—আমাকে কার্পেটটা দাও। আমি তোমাকে ষাট দিনার দেব।

কিন্তু জুমুরুদের সতর্কবাণী আলী শার ভুলে যায় নি। লোকটা অচেনা তো বটেই। তার ওপরে সে খ্রীস্টান। খ্রীস্টানদের সে দু চোখে দেখতে পারত না, ঘৃণা করত। ওকে সে কার্পেট বেচবে না।

খ্রীস্টান ছাড়নেওয়ালা নয়। সে দাম চড়িয়ে দিয়ে বলল—একশ

দিনার।

আলী শারের দালাল তার কানে-কানে বলল—এমন পয়মন্ত খদ্দের ছেড়ে দেবেন না হুজুর।

আলী শার যাতে কার্পেটটা তাকেই বিক্রী করে এই জন্যে খ্রীস্টানটা অবশ্য আগেই তার দালালকে দশ দিনার ঘুষ দিয়ে রেখেছিল। দালালটি তাকে এমনভাবে বিরক্ত করতে লাগল যে বেচারা শেষ পর্যন্ত সেই খ্রীস্টানকেই একশ দিনারে কার্পেটটা বেচে দিতে বাধ্য হল। কিছুটা ভয়ও যে সে পেল না সে কথা সত্যি নয়। ভয়ে-ভয়ে দিনারগুলি হাতে নিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বাজার থেকে বেরিয়ে এল সে।

বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ এক সময় কী জানি কেন ঘাড় ফিরিয়ে দেখল আলী শার। খ্রীস্টানটা তার পিছু নিয়েছে। দাঁড়িয়ে পড়ল সে; তারপরে সে জিজ্ঞাসা করল—এ মহল্লায় তো কোন খ্রীস্টান থাকে না; এদিকে কোন খ্রীস্টানকেও তো আসতে দেখিনি কোনদিন। তা, এপথে আপনার আগমন কেন?

খ্রীস্টান বলল—মাপ করবেন, মালিক। এই রাস্তার মোড়ে আমার একটা কাজ রয়েছে, তাই আসছি। আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন।

কী আর বলবে আলী শার। বাড়ির দিকে সে হাঁটতে শুরু করে। বাড়ির মুখে এসে হঠাৎ কী মনে করে সে আবার পেছন ফিরে একবার তাকাল। কী ব্যাপার! খ্রীস্টানটা রাস্তার ওপার থেকে তারই দিকে এগিয়ে আসছে যে! রাগে গরগর করে উঠল আলী শার; চেঁচিয়ে বলল—ব্যাটা হতচ্ছাড়া কোথাকার! আমার তুই পিছু নিয়েছিস কেন?

খ্রীস্টানটি হাত কচলিয়ে বলল—আমি হঠাৎই এদিকে এসে পড়েছিলাম, মালিক। বিশ্বাস করুন, এটা নিছক একটা দুর্ঘটনা ছাড়া তার কিছু নয়। তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। একটু পানি খাওয়াবেন? আল্লাহ্ আপনাকে অনেক দেবেন।

আলী শার ভাবল—কোন মুসলমান পাগলা কুকুরকে পানি দিতে পারবে না এমন কথা আল্লাহ্ কোথাও বলেন নি। সেই জন্যে সে পানি আনার জন্যে দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। পানি নিয়ে ফিরে আসছে এমন সময় জুমুরুদের সঙ্গে দেখা। দরজা খোলার আওয়াজ পেয়েই জুমুরুদ ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আলী শারকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলল—ফিরতে এত দেরী হল কেন তোমার? খু-উ-ব ভাবনা হচ্ছিল আমার। কার্পেটটা তুমি কোথায় বেচলে? কোন নামকরা দোকানদারকে, না, কোন অচেনা খদ্দেরকে?

বেশ অস্বস্তিতে পড়ল আলী শার। কোনরকমে ঢোক গিলে জবাব দিল সে—আজ বাজারে কী ভিড় তা তোমাকে কী বলব? তাই ত ফিরতে এত দেরী হয়ে গেল। তবে কার্পেটটা আমি এক চেনা দোকানদারকেই বেচেছি।

জুমুরুদ বলল—আল্লাহ্‌র নামে বলছি, আজ আমার মনটা কেমন ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে। তা তুমি পানি নিয়ে চললে কোথায়?

আলী শার বলল—দালালের বড় তেষ্টা পেয়েছে। আমার পিছু পিছু

বেচারা তাই বাড়ি পর্যন্ত এসে পড়েছে।

আলী শার জবাবে খুব একটা খুশী হতে পারল না জুমুরুদ। পানি নিয়ে বেরিয়ে গেল আলী শার। উদ্বেগাকুল কণ্ঠে আবৃত্তি করল জুমুরুদ—

হায়রে মূঢ় মানুষ তুমি ভাবছ বুঝি
একটি চুমু হবে তোমার চিরদিনের পুঁজি?
ঠোঁটের ওপর আঙ্গুল দিয়ে
একটু দূরে দেখ্ তাকিয়ে
রাহুগ্রস্ত চাঁদের হাসি
ঘুরে বেড়ায় খুঁজি।

পানি এনে আলী শার দেখল খ্রীস্টানটি এরই ভেতরে খোলা দরজা দিয়ে সটান বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার চোখের ওপরে অন্ধকার ঘনিয়ে এল যেন। ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে—শালা কুত্তার বাচ্চা কুত্তা। আমার অনুমতি না নিয়ে আমারই ঘরের দাওয়ায় আসিস—তোর এত বড় সাহস।

খ্রীস্টানটি হাত কচলিয়ে বলল—আমার গোস্তাকি মাপ করুন হুজুর। হাঁটতে-হাঁটতে আমার পা দুটো এমনি টনটন করছিল যে আর আমি দাঁড়াতে পারছিলাম না। তাইত বাধ্য হয়ে চৌকাঠের এদিকে এসে পড়েছি। অবশ্য দরজা বারান্দার মধ্যে তফাত-ই বা কতটুকু? তাই না? একটু জিরিয়ে নিয়ে চলে যাব। আমাকে জোর করে বার করে দেবেন না। আল্লাহ্ও আপনার ওপরে জোর করবেন না।

এই বলে লোকটি আলী শারের হাত থেকে পানির পাত্রটি নিল; তারপরে অনেকটা পানি ঢকঢক করে খেয়ে পাত্রটি তার হাতে ফিরিয়ে দিল।

আলী শার চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। লোকটি চলে না যাওয়া পর্যন্ত সে পেছন ফিরতে সাহস করল না। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের ভেতরেও লোকটির ওঠার যখন কোন লক্ষণ দেখা গেল না তখনই সে চেঁচিয়ে উঠে বলল—বাড়ি থেকে বেরোবি, না, মতলবটা তোর কী? বেরো, বেরো, এখনই বেরিয়ে যা।

লোকটি বলল—মালিক, এ-দুনিয়ায় এমন কিছু মানুষ আছেন ভাল কাজ করার জন্যে যাঁদের লোকে চিরকাল মনে রাখে। আপনি দেখছি তাঁদের মত ভাগ্যবানদের খাতায় নাম লেখাতে চান না। কোন এক কবি আপনাদের মত মানুষদের জন্যেই বিলাপ করে লিখেছেন—

যাদের মনটা ছিল নদীর দিলের মত
না চাইতেই সবাই পেত জল
আজ তারা নেই। আজকে মানুষ কৃপণ হল যত।
পানি-পিয়াসী পথিক দেখে নাড়ছে তারা কল,

বলছে ডেকে, জল নিয়ে যাও শূন্য কলস ভরি
তার আগেতে বাপু তোমায় ফেলতে হবে কাড়ি।

তেষ্টায় আমার কলিজা ফেটে যাচ্ছিল। মেহেরবানি করে আপনি পানি দিয়েছেন। আমার তেষ্টা মিটেছে। কিন্তু খিদের জ্বালায় আমার জান যায়-যায়। আপনাদের এঁটোকাঁটা কোথাও যদি কিছু পড়ে থাকে তাই আমাকে দিন না খানিক, সেটুকু পেলেও আমার যথেষ্ট হবে। আর তাও যদি ফেলে দিয়ে থাকেন তাহলে অন্তত এক টুকরো পোড়া রুটিই দিন, আর সেই সঙ্গে এক টুকরো পেঁয়াজ। আজ তাই আমার কাছে কাবাব বলে মনে হবে।

আলী শার তো ক্ষেপে লাল। সে চিৎকার করে বলল—না। আর একটা কথাও না, বেরোও—অভি নিকালো। এ-বাড়িতে আর কিছু পাবে না তুমি—ভাগো...ভাগো..

কিন্তু কিছুই হল না। একভাবেই দাঁড়িয়ে রইল লোকটা; বলল—মাপ করবেন, হুজুর। বাড়িতে আপনার সত্যিই যদি কিছু না থেকে থাকে তো একশটা দিনার তো রয়েছে। কার্পেট বেচে সেগুলি আপনি পেয়েছেন। তাই থেকে কিছু খাবার কিনে দিন, খাই। দোকান তো পাশেই। আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করবেন। কেউ অন্তত বলতে পারবে না যে আপনার বাড়ি থেকে শুধু হাতে আমি ফিরে গিয়েছি। আপনার আমার মধ্যে যে নুন-রুটি দেওয়া-নেওয়া হয়নি সেকথাও বলতে পারবে না কেউ।

আলী শার ভাবল—এ ব্যাটা সত্যিকার পাগল। গলা ধাক্কা দিয়ে ওকে রাস্তায় বার করে দিই; তারপরে দেব কুকুর লেলিয়ে।

এই ভেবে, লোকটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাইরে বার করে দেওয়ার জন্যে যে-ই না সে হাতটা তুলেছে অমনি লোকটা বলে উঠল—আমি আপনার কাছে চেয়েছি এক টুকরো রুটি আর এক টুকরো পেঁয়াজ। এর বেশী তো কিছু চাইনি। ওতেই আমার খিদে মিটে যাবে। আমার জন্যে ওর বেশী আপনি মোটেই খরচ করবেন না। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও এর বেশী আর কিছু চান না।

এক চিলতে শুকনো রুটি
তাই ত জ্ঞানী রাজার খানা।
শহর-বোঝাই সুখাদ্য খেয়েও
পেটুক জনের পেট ভরে না।

তিতিবিরক্ত হয়ে ভাবল আলী শার—এ লোকটার হাত থেকে রেহাই নেই তার। এই ভেবে সে খাবারই কিনতে গেল। বেরুনোর আগে লোকটাকে এক পা-ও নড়াচড়া করতে নিষেধ করল; তারপরে দিয়ে গেল দরজায় তালা। বাজার থেকে কিনে নিয়ে এল মধুমাখানো ছানার পিঠে, শশা, কলা আর গরম-গরম রুটি। চেঁচিয়ে বলল—এখন গেলো।

এত গালাগালিতে মানুষটি চটল না; বলল—মালিক, আপনি

সত্যিই মহানুভব! এত খাবার এনেছেন যে দশজনেও খেয়ে শেষ করতে পারবে না। আপনিও বসুন। এক সঙ্গে খাই।

আলী শার বলল—অত আদিখ্যেতা তোমাকে দেখাতে হবে না। তুমি একাই গেলো। তা ছাড়া আমার ক্ষিদে নেই।

কিন্তু লোকটি নাছোড়বান্দা। সে বলল—সব জাতের মধ্যে একটা রীতি রয়েছে যে অতিথিদের সঙ্গে বসেই গৃহস্বামীকে খানা খেতে হয়। যে খায় না সে বেজন্মা।

ভোর হয়ে আসতেই গল্প থামিয়ে চুপ করে রইল শাহরাজাদ।

তিনশো একুশতম রজনী:

আগের রাতের জের টানল শাহরাজাদ।

খ্রীস্টানটির সঙ্গে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছিল না আলী শার; কিছুতেই সে এড়াতে পারছিল না লোকটাকে। অগত্যা তার পাশেই বসে পড়ল আলী শার, শুরু করল খেতে। মনে মধ্যে তার তখন নানান চিন্তা। ভাবতে-ভাবতে আনমনা হয়ে যায় আলী শার। সেই সুযোগে লোকটা একটা কলা ছাড়িয়ে দুখানা করে ফেলল। তারপরে আফিঙে জ্বাল দেওয়া একটা বড় ভাঙের ডালা সেই টুকরোর মধ্যে পুরে দিল। এই ভাঙের টুকরো যেমন-তেমন একটা হাতিকে খাওয়ালে এক বছর তার ঘুম ভাঙার কথা নয়। সেই কলার গায়ে মধু মাখিয়ে তার ওপরে ছানার মোটা প্রলেপ দিয়ে আলী শারের হাতে তুলে দিয়ে লোকটা বলল—আপনার জন্যেই এটা আমি মনের মত করে তৈরি করেছি, মালিক। বিশ্বাসের প্রতিদান হিসাবে আপনাকে এটা আমি খেতে দিলাম। অনুগ্রহ করে খেয়ে নিন।

চমকে উঠল আলী শার। তাড়াতাড়ি কলাটা হাতে তুলে নিল সে, তারপর গিলে ফেলল গোগ্রাসে। পেটের মধ্যে যেতে-না-যেতেই হঠাৎ সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। আলী শার জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সেই লোকটা চিতা বাঘের মত লাফিয়ে উঠল; তারপরে রাস্তায় বেরিয়ে এল নিঃশব্দে। জন কয়েক লোক একটা খচ্চর নিয়ে রাস্তার ধারে ঘাপটি মেরে বসেছিল। তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা। তাদের ভেতরে সেই বুড়ো লম্পট রশিদ অল-দিনও দাঁড়িয়েছিল। খ্রীস্টানকে দেখে বুড়োর ফ্যাকাসে চোখ দুটো লালসায় চকচক করে উঠল। জুমুরুদ নীলাম ডাকার দিন তাকে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছিল। সেইদিনই বুড়ো প্রতিজ্ঞা করেছিল, যেমন করেই হোক, যে কোন মূল্যেই হোক জুমুরুদকে তাকে পেতেই হবে। আসলে লোকটা ছিল একজন গোঁড়া খ্রীস্টান। বাজারে ঠাঁই পাওয়ার জন্যেই ইসলামের ভেক নিয়েছিল সে। সে জানত মুসলমানপ্রধান বাজারে এই কৌশল ছাড়া সে কোন পাত্তা পাবে না। এই-মাত্র সে খ্রীস্টানটা আলী শারকে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে এসেছিল সে এই রসিদের ভাই—নাম বরসুম।

আলী শারকে কেমন করে খতম করে এসেছে সে সব কথা বরসুম তার দাদাকে খুলে বলল। পরিকল্পনা মত সব কাজই হয়েছে। এবার শেষ করতে হবে বাকি কাজটুকু। সেই কাজ করার জন্যে সবাই তাড়াতাড়ি আলী

শার বাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল। বেচারা আলী শার জুমুরুদের জন্যে বাড়ির ভেতরেই ছোট্ট একটা হারেম তৈরি করে দিয়েছিল। লোক-গুলো হুড়মুড় করে সেই হারেমের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে জুমুরুদের মুখে কাপড় বেঁধে দিল দস্যুরা। বাইরে দাঁড়িয়েছিল খচ্চর। লোকগুলো সেই খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে তাকে সোজা নিয়ে হাজির করল রসিদের বাড়িতে। সব কাজই শেষ হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি।

জুমুরুদকে নিয়ে নীল চোখো বুড়ো তার শোয়ার ঘরে ঢুকল। চোখমুখের আবরণ খসিয়ে নেওয়ার পরে জুমুরুদ দেখল বুড়ো রসিদ তার গা ঘেঁষে বসে রয়েছে। বুড়োর চোখ দুটো তখন লালসায় চকচক করে উঠেছে। চোখের কোনে তার ড্যালা-পাকানো পিচুটি থিকথিক করছে।

বুড়ো বলল—সুন্দরী, এখন তুমি আমার মুঠোর মধ্যে। আলী শারের মত বুড়বাকের ক্ষমতা নেই আমার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আমার এই দু হাতের আলিঙ্গনের মধ্যে একদিন তুমি ধরা দেবে, সুন্দরী; আমার ভালবাসার দুর্বার বেগও সহ্য করতে হবে তোমাকে। কিন্তু সে সব কথা এখন থাক। তার আগে ওই নোংরা ধর্মবিশ্বাস তোমাকে ছাড়তে হবে। হ্যাঁ, শপথ করেই ছাড়তে হবে। তারপরে তুমি হবে খ্রীস্টান —আমার মত। তারপরে বসতে পারবে আমার কোলে। আমার ইচ্ছে মত যদি না চল, অথবা উলটো-পালটা কিছু করে বস তাহলে তোমার ওপর এমন নির্মম অত্যাচার শুরু হবে যে সে কথা কোনদিনই তুমি ভুলতে পারবে না। জানালা দিয়ে দেখ। কী দেখছ? একটা ঘেয়ো কুকুর। অবাধ্য হলে, তোমার অবস্থাও হবে অবিকল ওইরকম।

জুমুরুদের সুন্দর গাল বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল। ঠোঁট দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল তার। সে বলল—ওরে বদমাশ। ঢেড়ে বুড়ো। আমাকে কেটে কুঁচি করে ফেললেও আমার ধর্ম আমি ছাড়ব না। আমার ওপরে যত ইচ্ছে-তুই অত্যাচার করতে পারিস, যত ইচ্ছে তুই মারধোর করতে পারিস আমাকে—আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছি আমাকে তুই কোনদিনই পাবি নে। ধেড়ে বোকা পাঁটার মত কোনদিন তুই যদি আমার ঘাড়ে চেপে বসিস তাহলেও আমার মন তাকে কিছুতেই সায় দেবে না। তোর পাপ কোনদিন অপবিত্র করতে পারবে না আমাকে। আর তার জন্যে খোদাতাল্লা কোনদিনই তোকে ক্ষমা করবেন না।

শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না বুঝতে পেরে বুড়ো তার কয়েকটা ক্রীতদাসকে ডেকে বলল—উপুড় করে শুইয়ে দে হারামজাদীকে। চেপে ধর —বেশ শক্ত করে চেপে ধর।

তারপরে প্রকাণ্ড একটা চাবুক নিয়ে বুড়ো তাকে প্রচণ্ড জোরে মারতে থাকে। চাবুকটা কেটে-কেটে তার পিঠের ওপরে বসে যায়। এক-একটা চাবুক পিঠে পড়ে আর জুমুরুদ যন্ত্রণায় চিৎকার করে বলতে থাকে—আল্লাহ্ ছাড়া কোন ঈশ্বর নেই। আল্লাহর রসুল হজরৎ মোহাম্মদ।

যতক্ষণ পারল বুড়ো তাকে চাবুক মেরে চলল। তারপর হাত দুটো অবশ হয়ে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল—একে তোরা রান্নাঘরে নিয়ে যা। তোদের সঙ্গে ও থাকবে। ওকে কোন খাবার বা সরাব দিবি নে। যা

—নিয়ে যা হারামজাদীকে।

এদিকে বেচারা আলী শার পরের দিন পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল। নেশা কেটে গেলে কিছুটা ধাতস্থ হল সে; তারপরেই জমুরুদ-জমুরুদ বলে ডুকরে কেঁদে উঠল। জবাব দেওয়ার কেউ ছিল না—দিলও না কেউ জবাব। অগত্যা নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল আলী শার। টলতে-টলতে ঘরের ভেতরে গেল। ঘর শূন্য; জিনিসপত্র সব ছড়িয়ে রয়েছে চারধারে। জমুরুদ নেই।

ধীরে-ধীরে সব কথা মনে পড়ে গেল আলী শারের। মনে পড়ে গেল খ্রীস্টান লোকটার কথা। সে বেশ বুঝতে পারল সেই বদমাইস জমুরুদকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছে। তার প্রাণের প্রতিমাকে লোকটা এইভাবে ধরে নিয়ে গেল। এ যে সে সহ্য করতে পারছে না, মেঝেতে পড়ে সে হাউ-মাউ করে কাঁদতে লাগল—দু হাত দিয়ে ছিঁড়তে লাগল মাথার চুল। টেনে-টেনে ছিঁড়তে লাগল গায়ের জামা। দু গাল বেয়ে তার ঝরে-ঝরে পড়তে লাগল চোখের জল। হায়রে আজ সে সর্বস্বান্ত।

মনের আবেগ সামলাতে না পেরে সে দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল। কুড়িয়ে নিল দুখানা বড়-বড় পাথর। রাস্তা দিয়ে পাগলের মত ছুটতে-ছুটতে সে পাথর দুটো সে তার বুকে ঠুকতে লাগল। মুখে তার এক বুলি—'ও জমুরুদ, তোমাকে ওরা কোথায় ধরে নিয়ে গেল। কোথায় ধরে নিয়ে গেল!' কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তায় লোক জড় হয়ে গেল; শিশুরা তাকে পাগল মনে করে হৈচৈ করতে করতে তার পিছু পিছু ছুটল। যে সব বয়স্কেরা তাকে চিনত তারা তার দুঃখে জানাল সহানুভূতি। ব্যাপারটা জানতে পেরে তারাও দুঃখ করে বলতে লাগল—বেচারা গ্লোরির ছেলে! সত্যিই ওর দুঃখের শেষ নেই আজ।

কোন দিকে যাবে বুঝতে না পেরে চারদিকে ছোটাছুটি করল আলী শার। পাথর ঠুকে-ঠুকে ঝাঁঝরা করে ফেলল তার বুকের পাঁজর। এই-ভাবে ছুটতে-ছুটতে সে একটি সৌম্যদর্শনা বৃদ্ধার সামনে এসে দাঁড়াল। তার এহেন অবস্থা দেখে বৃদ্ধা বললেন—বাছা, আল্লাহ্ তোমাকে শান্ত করুন, রক্ষা করুন তোমাকে। তোমার এ-দশা কেন হল বাছা?

আলী শার বলল—

প্রেম-হীনতাই অসুখ আমার
হে ডাক্তার,
আমার রোগের অন্য কারণ নাই।
ওই নারীকে আমি যে চাই—
দাও না ফিরে ওকে।
ও-যে আমার ব্যথার প্রলেপ
আনন্দ মোর শোকে।

বৃদ্ধাটি পরম স্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো। সে বেশ বুঝতে পারলো মানুষটি বিরহের আগুনে জ্বলে যাচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে।

তাই সে বললো—বাছা, আমাকে সব তুমি খুলে বল। ভয় বা সংকোচ করো না। কিসের কষ্ট তোমার। তোমাকে সাহায্য করার জন্যেই বোধ হয় রসুল আল্লাহ্ আমাকে এই পথে পাঠিয়েছেন।

তার জীবনের কথা, খ্রীস্টান দালালের কথা সব তাঁকে খুলে বলল আলী শার। বৃদ্ধাও তার সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলো। তারপরে আলী শার দিকে তাকিয়ে বললো—তুমি এখনই বাজারে চলে যাও। সেখান থেকে ফেরি করার একটা ঝুড়ি কিনে আনবে; সেই সঙ্গে আনবে নানান জাতের কাচের চুড়ি, দুল, আর পুঁতির মালা। বড়-বড় বাড়ির ঝি-চাকরানীদের এই সব বিক্রী করার জন্যে বুড়ি ফেরিওয়ালীনিরা যেমন বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায় আমিও তেমনি ওই ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে, সেইরকম বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বেড়াব। এই শহরের কোন বাড়ি বাদ দেব না। জুমুরুদের হদিশ না পাওয়া পর্যন্ত বাড়ি-বাড়ি আমি ফেরি করব। আল্লাহর ইচ্ছায় সে আমাদের কাছেই ফিরে আসবে। তুমি আর ভেব না। জলদি বাজারে চলে যাও।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ থামল।

তিনশো বাইশতম রজনী:

পরের দিন রাত্রিতে শাহরাজাদ আবার শুরু করল গল্প বলতে।

আনন্দে চোখে জল বেরিয়ে এল আলী শারের। বৃদ্ধার দুটো হাত ধরে চুমু খেল সে। তারপরে সে যা যা চেয়েছিলো সব কিনে এনে দিল বাজার থেকে। এর মধ্যে একজন রূপকার এসে তাঁকে ফেরিওয়ালীর সাজে সাজিয়ে দিয়ে গেল। মুখে দেওয়া হল তামাটে রঙের প্রলেপ, যেন দেখলেই মনে হয় রোদে ঘুরে-ঘুরে মুখটা পুড়ে গিয়েছে। মাথায় জড়ালো একখানা কাশ্মীরী শাল। পরলেন বিরাট একটা সিল্কের বোরখা। ঝুড়িটা চাপালো মাথার ওপরে। হাতে নিলো একটা লাঠি। বয়সের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেল চেহারাটা। তারপরে ঠুকঠুক করে তিনি বেরিয়ে পড়লো। শহরের বিভিন্ন এলাকায় যত ব্যবসায়ী আর ইনামদার ছিল তাদের হারেমের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ঘুরতে-ঘুরতে এসে পৌঁছলো রসিদ অল-দিনের দরজার কাছে। হতচ্ছাড়া খ্রীস্টান রসিদ। আল্লাহ্ তাঁর দোজখে অনন্ত কাল ধরে তাকে পুড়িয়ে মারবেন।

বৃদ্ধা যখন রসিদ অল-দিনের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো ঠিক সেই সময় অর্ধমৃতা জুমুরুদকে টেনে-হিঁচড়ে রান্নাঘরে ক্রীতদাসদের মধ্যে নিয়ে আসা হল। বেচারার ওপরে এতক্ষণ ধরে অত্যাচার চলছিল। প্রচণ্ড ঘুষির চোটে কপাল ফেটে গালের পাশ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছিল তার। যন্ত্রণায় তখন কাতরাচ্ছিল জুমুরুদ। কাতরানির শব্দ জানালা দিয়ে বেরিয়ে তাঁর কানে এসে ঢুকল।

কড়া নাড়লো বৃদ্ধা। একটি ক্রীতদাস এসে দরজা খুলে দিল। তাঁকে অভিবাদন জানাল ক্রীতদাসটি। বৃদ্ধা বললো—বাছা, অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস রয়েছে আমার ঝুড়িতে, তোমাদের এখানে এমন কেউ কি নেই যে কিছু জিনিস কিনতে পারে?

ক্রীতদাস বলল—আছে আছে। এমন লোক নিশ্চয় রয়েছে। আপনি আসুন।

এই বলে সে বৃদ্ধাটিকে সোজা রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে বসতে দিল। তারপরে বাড়ির প্রায় সব দাসদাসীরাই ঘিরে দাঁড়াল। তিনি চুড়ি, হার, দুল এত সস্তায় বেচতে আরম্ভ করলেন যে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অনেকেরই মন জয় করে ফেললো।

তাদের খুশী করে তিনি দেখতে পেলো একটু দূরে মাদুরে শুয়ে একটি মেয়ে কাতরাচ্ছে। সবই বুঝতে পারলো সে। এ সেই জুমরুদ। একেই তো সে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে সে তার কাছে উঠে গেল ; তার পাশে বসে ফিসফিস করে তাকে বললো —বাছা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তোমার সব কষ্ট দূর করবেন। তোমাকে উদ্ধার করার জন্যে তিনিই আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। তুমিই তো সেই প্লোরির ছেলে আলী শারের প্রেমিকা ক্রীতদাসী জুমরুদ!

তারপরে ছদ্মবেশে সেখানে ফেরীওয়ালীর বেশে সে কেমন করে, এসেছে সে সব কথা সে তাকে বললো। তারপরে বললো—কাল সন্ধ্যেবেলা পালানোর জন্যে তৈরি থকো। এই রান্নাঘরের জানালার পাশেই থাকবে। এখান থেকে রাস্তা দেখা যায়। রাস্তার ওপাশে অন্ধকার থেকে শিস্ শুনলে তুমিও পালটা শিস দিয়ো। তারপরে পাঁচিল টপকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ো। সেইখানে আলী শার তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে জুমরুদ তাঁর হাত দুটি ধরে চুমু খেল।

রসিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বৃদ্ধা সরাসরি আলী শারকে সব কথা জানিয়ে বললো—কাল সন্ধ্যাবেলা রসিদের বাড়ির জানালার নিচে তুমি অবশ্যই গিয়ে দাঁড়াবে। আর যা-যা বললাম সেই সব ঠিক-ঠিক করবে। বুঝেছ?

আলী শার কী বলে যে বৃদ্ধাকে ধন্যবাদ জানাবে বুঝতে পারল না। নিদেনপক্ষে একটা উপহার দিতে পারলেও হয়ত সে স্বোয়াস্তি পেত। কিন্তু উপহারের কোন প্রয়োজন ছিল না তাঁর। আল্লাহর নির্দেশেই সে সব করেছে।

তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বৃদ্ধা বিদায় নিলো। আগামীকাল যাতে সে সফল হতে পারে সেজন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানালো। জুমরুদ তাকে যে সাবধান করেছিল সে কথাটা মনে পড়ে গেল আলী শারের। কী যে হয়ে গেল! কী করে এখন সে জুমরুদের কাছে মুখ দেখাবে?

পরের দিন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নির্ধারিত স্থানে হাজির হল আলী শার। সুযোগের অপেক্ষায় চুপচাপ বসে রইল। ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলল রাত্রি। উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় গত দুটি রাত তার চোখের পাতা পড়ে নি। বসে-থাকতে-থাকতে এক সময় সে ঘুমের কোলে ঢোলে পড়ল। তারপরে কোন আর জ্ঞান ছিল না তার। প্রয়োজনের সময় যে জেগে থাকে ভাগ্য তার হাতে বাঁধা—ভগবানের রাজত্বে এইটাই নিয়ম।

কিন্তু ভবিতব্য কেউ এড়াতে পারে না। তা না হলে, ওই রাত্রিতেই এক দুর্ধর্ষ ডাকাত কেনই বা ওই অঞ্চলে হঠাৎ এসে পড়বে? আর এলই

যদি, তাহলে ডাকাতির সুযোগ-সুবিধে খুঁজে বার করার জন্যে কেনই বা সেদিন রসিদের বাড়ির পাশে ওৎ পেতে বসে থাকবে ? এইভাবেই নির্যাতি আলী শারকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়; আর এইভাবেই সে ডাকাতকেও টেনে আনে।

যাই হোক, রসিদের বাড়ির চারপাশে ডাকাতটা যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেই সময় অন্ধকারে তার গায়ে কী যেন একটা লাগল। চমকে উঠল ডাকাত। জিনিসটা আর কিছু নয়। আলী শার ঘুমন্ত দেহ। তার পরণে অনেক দামী পোশাক ছিল। ডাকাতটা সেই সব পোশাক তার গা থেকে খুলে নিল। হঠাৎ রসিদের বাড়ির একটা জানলা খুলে যেতেই ডাকাতটা চমকে পাশে সরে গেল। ওপরের দিকে তার মনে হল একটি মেয়ে শিস দিয়ে যেন তাকে ডাকছে। ডাকাতটার লোভ গেল বেড়ে। সে-ও একটা শিস দিল। তারপরেই সে অবাক হলে দেখল একটা মেয়ে জানালা বেয়ে দড়ি ধরে পাঁচিল টপকাচ্ছে। মেয়েটা লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ার আগেই ডাকাতটা তাকে পিঠের ওপরে চাপিয়ে চোঁ-চোঁ দৌড় দিল। ব্যাটার গায়ে অসুরের মত ক্ষমতা। বেচারা আলী শার যেমন ঘুমিয়েছিল তেমনি ঘুমিয়ে রইল। জানতেও পারল না কিছু।

ডাকাতটা বেশ জোরেই দৌড়াচ্ছিল। তার পিঠে চড়ে যাচ্ছে জুমুরুদ তা বুঝতে পারে নি। তাই সে বাহককে লক্ষ্য করে বলল—তবে যে বুড়ির কাছে শুনলাম শোকে-দুঃখে তুমি একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছ। কিন্তু এখন তো দেখছি আলী শার, ঘোড়ার চেয়েও জোরে দৌড়চ্ছ তুমি।

কোন উত্তর দিল না ডাকাতটা। শুধু তার গতিটা বাড়িয়ে দিল। চুলের মুঠি ধরে ঘাড়টা বাঁকিয়ে তার মুখটা দেখার চেষ্টা করল জুমুরুদ। একী, ডাকাতটার চুলগুলো যে শনের মত শক্ত। তখনই সে বুঝতে পারল তাকে অন্য কেউ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আঁতকে অস্থির হয়ে সে ডাকাতটার মুখে জোরে একটা ঘুসি মারল, চিৎকার করে উঠল—কে রে তুই ? কী রে তুই ?

তখন শহর ছেড়ে তারা বিরাট একটা মাঠের মধ্যে এসে পেঁৗছেছে। এখানে চিৎকার করলেও কেউ শুনবে না। চারিদিকে অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা থম-থম করছে। ডাকাতটা তাকে পিঠ থেকে নামিয়ে বলল—আমি একজন কুর্দ। আমার নাম জবান। আহমদ অল-দানাফ-এর দলে আমার চেয়ে গায়ে বেশী জোর আর কারও নেই; বদমাইসিতে আমার জুড়িদার সেখানে নেই বললেই হয়। আমাদের দলে আমার মত চল্লিশজন দুঃসাহসী বীর রয়েছে। অনেক দিন আমরা নরম তুলতুলে মাংস পাইনি। কালকের রাতটা আমাদের যে কী আনন্দে কাটবে তা তুমি নিজেই বুঝতে পারবে। তোমার জীবনে অত সুখ কোনদিন তুমি পাওনি সুন্দরী। সত্যি সত্যিই তুমি ইনামদার। কাল রাত্রিতে একের পর এক আমরা তোমার ওপরে চাপব; তোমার তলপেটে সুড়সুড়ি দেব ; তার পরেই তোমার ওই দুটি উরুর মাঝখানে অন্ধকারে ডুবে যাব। কেবল আমি একা নই—আমরা সবাই—একজন একজন করে চল্লিশজন।

বাপস। বলে কী। কী সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে পড়েছে সে।

অবস্থাটা ভাবতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল জমুরুদ। নিজের গালেই চড় মারতে লাগল। কী ভুলই না সে করেছে! এসে পড়েছে একেবারে চল্লিশ জোড়া হাতের মধ্যে।

চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বেচারা কাঁদতে শুরু করল। অজস্র চোখের জল তার গাল দুটি ছাপিয়ে ঝরতে লাগল অঝোর ধারায়। সে বুঝতে পারে ঠিক এই মুহূর্তে তার জীবনে ভয়ানক একটি দুর্যোগ নেমে এসেছে। সে কোপে পড়েছে শয়তানের। বেশী চেঁচামেচি করে এখন আর লাভ নেই তার। শক্তি ফিরে পাওয়ার জন্যে পরমেশ্বরের কাছে সে মনে-মনে প্রার্থনা করতে থাকে।

সে মনে-মনে বলে—আল্লাহ ছাড়া আমার আর কোন দেবতা নেই। তাঁর প্রতি রয়েছে আমার অচলা ভক্তি। তাঁর নির্ধারিত ভাগ্য আমাদের মেনে নিতেই হবে। নিয়তির বিধান কেউ খণ্ডাতে পারে না।

ভোর হয়ে আছে দেখে শাহরাজাদ চুপ করে গেল।

তিনশো তেইশতম রজনী :

রাত্রিতে আবার শুরু করল শাহরাজাদ।

সেই ভীষণদর্শন কুর্দ জোয়ান জুমুরুদকে পিঠে চাপিয়ে আবার ছুটতে শুরু করল। ছুটতে-ছুটতে অনেকক্ষণ পরে পাহাড় ঘেরা একটা গুহার সামনে এসে থামল। এই গুহাটি চল্লিশ চোরের প্রধান ঘাঁটি। ওদের দলের সর্দারও এইখানে থাকে। গুহার সামনে এসে জুমুরুদকে পিঠ থেকে নামিয়ে দিল। জোয়ানের বুড়ো মা-ও এইখানে থাকে। দলের সকলকে দেখাশোনা করে, রান্নাবাটনাও করে দেয় তাদের। গুহার দায়িত্ব তারই হাতে।

জুমুরুদকে নামিয়ে দিয়ে জোয়ান তার মাকে হাঁক দিল, মা বেরিয়ে এলে জুমুরুদকে তাঁর হাতে জমা দিয়ে জোয়ান বলল—আমি না ফেরা পর্যন্ত এই হরিণ শিশুটাকে দেখো। ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে দেখা করতে চললাম। কাল দুপুরের আগে ফিরতে পারব না। আজ রাত্রে কয়েক জায়গায় চুরি করতে হবে কিনা? ভাল করে তোয়াজ করো মেয়েটাকে। এতগুলো মানুষের ভালবাসা সহ্য করার মত ওর তাগদ চাইত।

এই বলে জোয়ান যেমন ছুটে এসেছিল তেমনি দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

জোয়ান চলে যাওয়ার পর বুড়ি এক মগ জল এনে দিয়ে বলল—বাছা, কী সুখই না তোমার হবে! চল্লিশটা জোয়ান মদ্দ তোমাকে যখন দলাই-মালাই করবে তখন কী আনন্দ-ই না পাবে তুমি? অবশ্য ওদের মধ্যে সর্দারটারই তাগদ সব চেয়ে বেশী। ও একা চল্লিশ জনের মহড়া নিতে পারে। ঈশ্বর তোমার রূপ আর যৌবন দুই-ই দিয়েছেন। ওদের মনে ধরবে তোমাকে। তোমার কপাল ভাল।

সব কথাই শুনল জুমুরুদ; কোন কথার জবাব দিল না। বোরখা খুলে মাথার নিচে রেখে শুয়ে পড়ল। সারারাত একটুও পারল না ঘুমাতে সমস্ত রাত ধরে নিজের মনকে শক্ত করল সে। ভোরবেলা নিজের মনে মনে বলল—এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া শয়তানেরও সাধ্য নেই। এখানে থাকার কথাও ভাবা যায় না। চল্লিশটা দানো আমার দেহটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাবে,

আর তারই জন্যে আমি অপেক্ষা করে বসে থাকব? কভী নেহি। আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমার আত্মা, আমার দেহকে যেমন করে হোক রক্ষা আমি করবই।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে সে বুড়ির সামনে এসে বলল—মা, তোমার আদর-যত্ন আর বাড়ির বিশ্রামে শরীরটা আমার একেবারে তাজা হয়ে উঠেছে। লোকজনের আদর আপ্যায়ন করতে আর আমার অসুবিধে হবে না। কিন্তু এতক্ষণ আমরা কী করব বলত? তার চেয়ে বাইরে চল। রোদে বসে তোমার মাথার উকুন বেছে দেব।

কথা শুনে বুড়ি তো আনন্দে একেবারে গদগদ; বলে—তুমি কী সোনা মেয়ে গো। ভালই বলেছ...

তারপরেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—দেখ, এখানে আসা অবধি একদিনও জল ঢালতে পারিনি। আমার মাথাতো নয়—একখানা ধর্মশালা, হ্যাঁ, হ্যাঁ—উকুনের অতিথিশালা। জন্তু জানোয়ারদের মাথায় যতো রকমের উকুন থাকে তারা সবাই আমার মথায় বাসা বেঁধেছে—সাদা উকুন, কালো উকুন, বুড়ো উকুন, চ্যাপসা উকুন—উকুনে উকুনে একেবারে ছয়লাপাকার। সৈন্য সামন্তের মত রাত্রির বেলা তারা সব দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়—ছড়িয়ে পড়ে সারা গায়ে। একটা দেখেছিলাম আবার লেজওয়ালা, আর কী বিচ্ছিরি গন্ধ গো, উঁ! চল চল! আমাদের সঙ্গে যতদিন আছ বাছা, তোমার ভালমন্দ সব আমি দেখব। কথা দিলাম।

এই বলে জুমুরুদকে সঙ্গে নিয়ে বুড়ি বাইরে এসে বসল।

মাথার কাপড় সরিয়ে উকুন বাছতে বসল জুমুরুদ। বুড়ি ঠিকই বলেছে। রাশি-রাশি উকুন তার মাথার উপরে কিলবিল করছে। কয়েক মুঠো উকুন তুলে বাইরে ফেলে দিল সে। তারপরে শক্ত চিরুনী দিয়ে চুলের গোড়াশুদ্ধ দিল আঁচড়িয়ে। আর একটা-একটা উকুন তুলে দুই আঙুলের ভেতরে ধরে মারতে থাকে মটমট করে। তারপরে চুলের ফাঁকে-ফাঁকে আঙুল দিয়ে আস্তে-আস্তে ইলিবিলি কাটতে থাকে। আরামে বুড়ি ঢুলতে থাকে। তারপরে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

বুড়িকে ঘুমাতে দেখে আর দেরী করল না সে। গুহার ভেতরে ঢুকে পুরুষের পোশাক পরল। ডাকাতরা কোত্থেকে একটা বিশাল পাগড়ী চুরি করে এনেছিল। সেটাকে সে চাপাল মাথার ওপরে। কাছেই একটা ঘোড়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ঘাস খাচ্ছিল। এটাকেও তারা চুরি করে এনেছিল। ঘোড়াটাকে ধরে জিন লাগাল সে। তারপরে তার ওপরে উঠে আল্লাহর নাম নিয়ে দমে ছুটিয়ে দিল ঘোড়াটা।

সারাদিন ছুটতে-ছুটতে নেমে এল রাত। ঘোড়া থামিয়ে বিশ্রাম নিল জুমুরুদ; ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আবার ছুটিয়ে দিল ঘোড়া। চলার ফাঁকে-ফাঁকে একটু থেমে কয়েকটা ফলমূল সে খেয়েছে মাত্র, ঘোড়াটাকেও দিয়েছে ঘাস-বিচালি খেতে। আবার ছুটেছে ঘোড়া নিয়ে।

এগার দিনের দিন মরুভূমি ছাড়িয়ে সে এসে দাঁড়াল ঘাসের দেশে। ভারি সবুজ দেখতে ঘাসগুলি। এরকম সবুজ ঘাস সচরাচর দেখা যায় না। এখানে খাবার জলও রয়েছে, রয়েছে বড়-বড় চোখ-জুড়ানো গাছের সারি।

আবার গাছে-গাছে ফুটছে ফুল। গাছের ছায়া, ঝর্ণার জল, আর গোলাপের গন্ধ সব মিলিয়ে পরিবেশটি বেশ মনোরম। গাছে-গাছে পাখির ডাক, হরিণ শিশুর দৌড় ঝাঁপ, আর ঈশ্বরের জগতে বিচিত্র পশুর সমাবেশ স্থানটিকে নয়নাভিরাম করে তুলেছে। বসন্ত যেন এখানে চির-বিরাজমান।

এই মনোরম পরিবেশে ঘন্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে জুমরুদ আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। কিছুটা দূরে একটা জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যে একটা রাস্তা সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। সেই রাস্তা ধরে সে এগিয়ে চলল। চলতে-চলতে বিরাট এক শহর চোখে পড়ল তার। শহরের মসজিদের চূড়াগুলি সূর্যের আলোতে ঝকমক করছিল। অনেক দূর থেকেই সেই ঝকমকানি তার চোখে এসে লাগছিল।

শহরের কাছাকাছি আসতেই জুমরুদ শুনতে পেল এক সঙ্গে অনেক লোক চেঁচাচ্ছে। শহরের ফটকের সামনে আসতেই তার মনে হল লোক-গুলো যেন বিজয়োল্লাস করছে। সে কাছে আসতেই দরজা খুলে গেল। আমীর, ওমরাহ, ইনামদার, আর বিভিন্ন দলের নেতারা তাকে সম্বর্ধনা জানাল। তাকে কুর্নিশ করে নিচু হয়ে শুয়ে মাটিতে চুমু খেল তারা।

জমরুদ তো অবাক। রাজা বা বাদশাহরা দেশ জয় করে ফিরে এলে সাধারণত এই ধরনের সংবর্ধনা জানান হয়। জনতা একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে—আল্লাহ আমাদের সুলতানকে দিগ্বিজয়ী করুন। হে সুলতান, আপনার আগমনে প্রজাদের মঙ্গল হোক। আল্লাহ আপনার রাজ্যশাসন আরও জোরদার করে তুলুন।

এমন সময় হাজার-হাজার সৈন্য সারিবন্দী হয়ে এগিয়ে আসে; সরিয়ে দিতে থাকে উৎফুল্ল জনতাকে। সুসজ্জিত উটের পিঠে চেপে এগিয়ে এল একজন ঘোষক, চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে সে সুলতানের শুভাগমন ঘোষণা করল।

ছদ্মবেশী জুমরুদ এসবের অর্থ বুঝতে পারে না। নগর প্রধান পাশে-পাশে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে আসছিল। তাকেই সে বাধ্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে—মালিক, ব্যাপারটা কী বলুন তো? আমাকে নিয়েই বা কী করতে চান আপনারা?

জবাবে সামনে এগিয়ে এল রাজপ্রাসাদের রক্ষী। আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করে বলল—জাঁহাপনা, আল্লাহর কী করুণা। তাই তিনি আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন। তাঁকে সেলাম। এদেশের রাজমুকুট তিনিই আপনার মাথায় পরিয়ে দিয়েছেন। মঙ্গলময় আল্লাহ আপনার মত সুন্দর তরুণ সুলতানকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কী চকচক করছে আপনার মুখ। যেন খাস তুর্কী এক যুবক। খোদাতাল্লাকে ধন্যবাদ। তিনি কোন ভিক্ষুককে পাঠাতে পারতেন, বা পাঠাতে পারতেন কোন সামান্য লোককে। কিন্তু তা তিনি পাঠাননি। এজন্যেও তাঁকে ধন্যবাদ। সেই ভিক্ষুক এলেও আমরা তাকেও সুলতান বলে মেনে নিতাম। তাঁকেও আমাদের এই রকমই সংবর্ধনা জানাতে হোত।

ভোরের আলো ফুটে উঠল। চুপ করে গেল শাহরাজাদও।

পরের দিন রাত্রি শাহরাজাদ আবার শুরু করল গল্প—

রাজপ্রাসাদের রক্ষী বলে গেল—আপনি বোধহয় আমাদের দেশের রীতি শুনেছেন। আমাদের দেশের সুলতান যদি কোন পুত্র সন্তান না রেখে মারা যান যে পথ দিয়ে আপনি এলেন সেই পথের দিকে আমরা তাকিয়ে থাকি ; ভাবি কবে, আল্লাহ আমাদের নূতন সুলতান পাঠাবেন। সুলতানের মৃত্যুর পরে যিনিই এই পথে প্রথম আসবেন ঠিক আপনার মত তাঁকেই আমরা সুলতান বলে বরণ করে নিই। তাঁকেও আমরা ঠিক এইভাবে কুর্নিশ করি। আমাদের পরম সৌভাগ্য আল্লাহ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আর সবচেয়ে সুন্দর সুলতানকে আমাদের রাজ্যে পাঠিয়েছেন। এমন সুন্দর আর সুঠাম চেহারার সুলতান আর কোনদিনই আমরা দেখিনি, বা শুনিনি।

জুমুরুদের মাথায় নানান ফন্দি ফিকির ঘুরে বেড়ায়। প্রাসাদ রক্ষীর কথা শুনে সে চট করে ঠিক করে নিল যে সে এমন কিছু করবে না যাতে তার আসল রূপটা ধরা পড়ে যায়। তার মুখে তাই কোন ভাবান্তর দেখা দিল না। সে সবাইকে ডেকে বলল—অনুচরবৃন্দ, আমার কথা আগে শোন। আমি তুর্কী বটে ; কিন্তু সামান্য বা অজ্ঞাতকুলশীল কোন বংশে আমার জন্ম হয়নি। সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমার জন্ম। দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াব বলে আমি দেশ ছেড়েছি। অবশ্য, দেশ ছাড়ার আগে আত্মীয়স্বজনদের জন্যে আমার মনোমালিন্য কিছু হয়েছিল। পথ আমাকে এক নূতন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। এই অভিজ্ঞতার সুযোগ আমি ছাড়তে রাজি নই। কথা দিলাম, আমি তোমাদের সুলতানের মুকুট পরব।

এই বলে সে সকলের আগে-আগে চলতে লাগল। হর্ষধ্বনি আর বিজয়োল্লাসের মধ্যে দিয়ে সে শহরে এসে ঢুকল। তারপরে শোভাযাত্রার সঙ্গে সে এসে দাঁড়াল রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকের সামনে। আমীর-ওমরাহ, প্রাসাদরক্ষী, সভাষদেরা ঘোড়া থেকে তাকে নামিয়ে নিল। সংবর্ধনার জন্যে বিরাট হল ঘরে তাকে নিয়ে গেল তারা। গায়ে চড়ালো রাজ পোশাক। মৃত সুলতানের মুকুট তার মাথার ওপরে পরিয়ে দিয়ে সবাই মাটিতে লুটিয়ে তাকে সম্মান জানাল। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে পাঠ করল আনুগত্যের শপথ বাক্য।

জুমুরুদ রাজ্য শাসন শুরু করল। কোষাগারের দরজা খুলে দেওয়া হল। বিলি করা হল ধনদৌলত। বংশ পরম্পরায় বহু যুগ ধরেই রাজকোষ উপছে পড়ছিল। রাজকোষের বেশীটাই সে বিলিয়ে দিল সৈন্য আর দরিদ্র-দের মধ্যে। দু'হাত তুলে তারা আশীর্বাদ করল—'আমাদের সুলতান দীর্ঘজীবী হোন। বহুকাল ধরে তিনি আমাদের শাসন করুন।' বড়-বড় ওমরাহদের বিভিন্ন পদে ভূষিত করল। আমীর, প্রাসাদরক্ষী, তাদের মহিষী আর হারেমের মেয়েদের সে জানাল তার শুভেচ্ছা। তুলে নিল অনেক কর আর শুল্ক। মকুব করে দিল বকেয়া কর। বন্দীশালার দরজা খুলে দেওয়ার আদেশ দিল। মুক্তি দিল বন্দীদের। সমস্ত মকোদ্দমা নিল তুলে। ফলে, ছোট-বড় সকলের ভালবাসা তার উপরে বর্ষিত হল অবশ্য ওর পেছনে আরও বড় কারণ ছিল। পুরুষ হয়েও সে হারেমের দরজা মাড়ায় না, এ-তো

পয়গম্বর ছাড়া আর কেউ নয়। কী সংযম। আসল সত্যটা অবশ্য কারুরই জানার কথা নয়। রাত্রে তাকে পাহারা দিত দুটি বাচ্চা খোজা। ইচ্ছে হলে তারা ঘুমোতেও পারত। এরা ছাড়া রাত্রে আর কারও প্রবেশাধিকার ছিল না।

প্রজারা সুখেই ছিল। সুখ ছিল না জুমুরুদ্দের মনে। দিন রাত সে আলীশার কথাই ভাবত। তার কথা মনে করে বড় দুঃখে দিন কাটত জুমুরুদ্দের। তার মনের অবস্থা কারুরই জানার কথা নয়। গোপনে-গোপনে সে আলী শারের অনুসন্ধান করে ; কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি। একান্তে চুপচাপ বসে কাঁদে। উপোস করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানায় যাতে সে তার মনের মানুষকে খুঁজে পায়। সে সাচ্চা মুসলমান। তাই তার স্থির বিশ্বাস আলী শারকে সে খুঁজে পাবেই।

প্রতীক্ষায় একটা বছর কেটে যায় তার। হারেমের রমণীরা হতাশায় ভেঙে পড়ে বলে—হায়, আমাদের কী দুর্ভাগ্য! আমাদের সুলতান জিতেন্দ্রিয় তপস্বী।

একটা বছর গেল কেটে। জুমুরুদ একটা পরিকল্পনা তৈরি করল। সেই পরিকল্পনাটি তাড়াতাড়ি যাতে কার্যকরী হয় সেই জন্যে সে রাজ্যের উজির আর অন্যান্য মন্ত্রীদের ডেকে এনে বলল—আমার রাজ্যে যত রাজ-মিস্ত্রী আর প্রযুক্তিবিদ রয়েছে সবাইকে খবর দিন। এক প্যারাসাঙ [আনুমানিক সওয়া তিন মাইল] লম্বা আর এক প্যারাসাঙ চওড়া একটা জায়গা সমান করে তার চারদিকটা ঘেরার ব্যবস্থা করুন। তার ঠিক মাঝখানে থাকবে বড় গম্বুজাকৃতি একটি প্রাসাদ। প্রাসাদের ভেতরে থাকবে একটি সিংহাসন। মেঝেতে বিছানো থাকবে সবচেয়ে সুন্দর লাল পারস্য দেশের একটা গালিচা। রাজ্যের প্রধানদের জন্যেও বসার ব্যবস্থা সেখানে থাকবে।

তার নির্দেশমত সব কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। এইখানে শহরের আর প্রাসাদের সমস্ত গণ্যমান্য মানুষদের সে ডাকলো। বিরাট ভোজ হল। এমন এলাহি ভোজ আগে কেউ কোনদিন দেখেনি ; স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। ঝর্নার মত সরাবও উপছিয়ে পড়ল চারপাশে।

খানাপিনার শেষে জুমুরুদ সবাইকে বলল—প্রতিটি মাসের প্রথমে আমি আপনাদের এইখানে নিমন্ত্রণ করব। যোগ্যতা অনুযায়ী আপনারা এইখানে আসন গ্রহণ করবেন। সেই একই সময়ে আমার রাজত্বের সমস্ত প্রজারা আপনাদের সঙ্গেই ভোজের অনুষ্ঠানে যোগ দেবে। সমস্তই যিনি দেন সেই খোদাতালাকে তারা ধন্যবাদ জানাবে ঘোষকের মারফৎ প্রচারিত হবে আমার এই নির্দেশ। যে অমান্য করবে তাঁর ফাঁসী হবে।

পরের মাসের প্রথমেই শহরের পথে-পথে ঘোষকের কণ্ঠ শোনা গেল —ক্রেতা-বিক্রেতা, ধনী-নির্ধন, ক্ষুধার্ত-অক্ষুধার্ত,—আমাদের সুলতান সবাইকে তাঁর নূতন প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করেছেন, সেখানে তোমরা খানাপিনা করবে আর খোদাতালাকে ধন্যবাদ জানাবে। যে নিমন্ত্রনে যাবে না তার ফাঁসী হবে। যে যেখানে আছ সবাই দোকান-পাট, কেনা-বেচা বন্ধ করে নিমন্ত্রণে চলে এল ; চলে এল হাতের কাজ ফেলে। না এলে, গর্দান যাবে।

দলে-দলে, কাতারে-কাতারে, হাজারে-হাজারে লোক বন্যার মত নূতন প্রাসাদের দরজায় আছাড় খেয়ে পড়ল। সিংহাসন আলো করে বসে রয়েছেন সুলতান ; তাঁকে ঘিরে বসে রয়েছেন আমীর-ওমরাহের দল। নানা রকম খাবার পরিবেশন করা হল প্রজাদের, ভেড়ার মাংস, বিরিয়ানি, দই আর চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি কিস্ক নামে অপূর্ব এক রকমের খাবার। খাবার সময় সুলতান তাদের খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিল, প্রজারাও তা লক্ষ্য করতে ভোলে নি। খেতে-খেতে একজন তো তাদের পাশের লোককে ফিসফিস করে বলেই ফেলে—আল্লাহ কসম। আমার ভয় করছে। সুলতান আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছেন কেন ?

যে যার আসনে বসে আমাত্যরা তাদের উৎসাহিত করতে লাগলেন—'খাও, খাও ; বাছারা পেট পুরে খাও। কোন লজ্জা করো না। যে যত বেশী খাবে সে-ই তত সুলতানকে খুশী করতে পারবে।' নিজেরাও তারা বলাবলি করতে থাকে—সুলতান আমাদের খুব ভালবাসেন। আমাদের মঙ্গলের জন্যে তাঁর কত চিন্তা। এরকম সুলতান জীবনে আর কখনও দেখি নি আমরা।

এমন অপরূপ খাবার কোনদিন তারা যেন খায়নি—এইভাবে প্রতিটি খাবার তারা চেখে চেখে তারিফ করে খাচ্ছিল ; কিন্তু তাদের ভেতরে একটা লোক ছিল যে হচ্ছে সব চেয়ে পেটুক। সেই লোকটা থালার পর থালা টানছে আর নিঃশেষে তা উড়িয়ে দিচ্ছে। এই হাভাতে লোকটা হল সেই খ্রীস্টান বরসুম। ওই লোকটাই তার দাদা রসিদ অল-দিন আর সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে আলী শারকে অজ্ঞান করে জুমুরুদকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। প্রচুর মাংস আর বিরিয়ানি খাওয়ার পরেও তার থালা সকলের আগেই শেষ হয়ে যাচ্ছিল। নিজের থালা শেষ করে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দেখল সে। ঘিয়ে সপসপ করছে একথালা বিরিয়ানি একটু দূরে রাখা ছিল। গরম মশলার গন্ধে মাতোয়ারা এই থালাটা তার নাগালের বাইরে থাকায় সে একজনের ঘাড়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ; তারপরে যতটা পারল মুঠো করে এক খাঁমচা বিরিয়ানি নিয়ে গপ করে মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। মনের আনন্দে চোখ দুটো বুজে এল তার।

ভোর হয়ে আসছে দেখে চুপ করে গেল শাহরাজাদ।

তিনশো পঁচিশতম রজনী :

পরের দিন রজনীতে আবার গল্প শুরু করল শাহরাজাদ।

যে লোকটি বরসুমের পাশে বসে খাচ্ছিল সে খেঁকিয়ে উঠল তার রকম দেখে—'ছি-ছি। কী রকম হ্যাংলা গো তুমি। ওরকম লম্বা হাত বাড়িয়ে খাবারটা তুলে নিতে তোমার একটুও লজ্জা করল না ? পাতে যেটুকু পড়বে সেইটুকু খাওয়াই তো শিষ্টাচার—এটা তুমি জান না ?' আর একজন বলল—'অত যে খাচ্ছ। পেট ছাড়লে তখন বুঝবে ঠেলা।' একটা ভাঙখোর মজা করে বলল—আমার কাছে উঠে এস বাপধন ; আমার খাবারটা ভাগ করে খাব। আমি খাব একমুঠো। বাকিটা সব তুমিই গেলো।

বরসুম চোখ পাকিয়ে বলে—ওরে গেঁজেল ভাঙখোর। তোর দাঁতই নেই ; ভাল মাংস খাবি কী করে ? ওসব রান্না আমাদের মত ভদ্রলোকদের জন্য।

এই বলে সে ভাঙখোরের থালার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ; সঙ্গে-সঙ্গে সুলতানের চারটি রক্ষী তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ; টেনে ফেলে দিল তার মুখ থেকে মাংসের টুকরোটা। বরসুমকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিল জুমরুদ। তাকে চিনতে পেরে দেহরক্ষীরা সুলতানের কাছে ধরে নিয়ে এসে ঘাড় নিচু করে দাঁড় করিয়ে দিল। সবাই তো হতভম্ব। ব্যাপারটা কী হল ! একজন চুপিচুপি পাশের লোককে বলল—'হাড় কিপ্‌টে পেটুক হলে কী দশা হয় দেখ। অন্যের খাবার তুলে নেওয়াটা কি সোজা পাপ।' সে ভাঙখোরটা মন্তব্য করল—আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়েছেন। ভাগ্যিস আমার বিরিয়ানিটা নেওয়ার জন্য ওকে বলিনি। বললে, আরও কী সাংঘাতিক শাস্তি ও পেত কে জানে।' খানাপিনা থামিয়ে সবাই তার দিকে তাকিয়ে রইল।

জুমরুদের চোখে তখন আগুন জ্বলছে। স্বর যথাসম্ভব সংযত করে সে বলে—তোমার চোখ দুটো দেখছি নীল। এ চোখ পাপের চোখ। তোমার নাম কী ? কী কর তুমি ? তুমি তো এদেশের মানুষ নও। এদেশে এসেছ কেন ?

খ্রীস্টান লোকটার মাথায় ছিল একটা শাদা পাগড়ী। অবশ্য মাথার ওপরে সাদা পাগড়ী চাপালেই মুসলমান রেহাই পায় না। বরসুম বলল—মালিক সুলতান, আমার নাম আলী। আমি ফিতে তৈরি করে খাই। আপনার দেশে এই ব্যবসা করেই আমি দুবেলা দুখানা রুটির যোগাড় করে বেঁচে আছি।

জুমরুদ ওর একটা বাচ্চা খোজাকে বলল—আমার টেবিলে আল্লাহর দোয়া দেওয়া বালি রয়েছে। নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। সেই সঙ্গে আমার কলমটাও নিয়ে আসবি।

জিনিসপত্র আনা হলে, জুমরুদ সামনের টেবিলে খুব সাবধানে বালিগুলি বিছিয়ে দিল। কলম দিয়ে কী সব যে আঁকিবুকি কাটল। দেখা গেল সে একটা বাঁদর এঁকেছে। সেই সঙ্গে টেনেছে কয়েকটা রেখা। সেগুল ঠিক কী তা বোঝা গেল না। চারপাশ চুপচাপ। কিছুক্ষণ সে ছবির দিকে একমনে তাকিয়ে রইল জুমরুদ। তারপরে সবাই শুনতে পায় এই ভাবে হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল—তুই একটা কুত্তা ! সুলতানের সামনে দাঁড়িয়ে তুই মিথ্যে কথা বললি !! তুই তো খ্রীস্টান, তাই না ? তোর নাম বরসুম। এদেশে তুই এসেছিস একটা ক্রীতদাসীর খোঁজে। মেয়েটাকে তুই তার বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলি। শয়তান, এই সিদ্ধবালির সামনে কিছুই লুকানো যায় না। কুকুরের অধম তুই—স্বীকার কর তোর দোষ।

ভয়ে ঠকঠাক করে কাঁপতে-কাঁপতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে বরসুম। জোড়হাত করে বলে—ক্ষমা করুন, হুজুর। দোয়া মাগছি। আমি আপনার কাছে আর কিছু লুকাব না। ভগবান আপনাকে রক্ষা করবেন। সত্যি-সত্যিই আমি খ্রীস্টান। নিচু ঘরে আমার জন্ম। আমাদের বাড়ি থেকে একটা ক্রীতদাসী পালিয়ে গিয়েছে। তাকেই খুঁজতে আমি এদেশে এসেছি।

অবশ্য মেয়েটাকে আমিই চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলাম। অত্যাচারও তার ওপরে যথেষ্ট করা হয়েছে।

উপস্থিত প্রজাদের মধ্যে সবাই প্রায় ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল—আল্লাহর কসম, তামাম দুনিয়ায় এমন সবজান্তা সুলতান আর কোথাও আমরা দেখিনি। বালি দিয়ে কী চমৎকারই না তিনি সব বলে দিলেন।

জহ্লাদকে ডেকে বলল জুমুরুদ—শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে এর জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেবে। সেই ছাল শুকনো করে শহরের দরজার গায়ে পেরেক দিয়ে দেবে সেঁটে। ওর দেহটা ঘুঁটে দিয়ে পোড়ানোর পরে সেটা ফেলে দেবে নর্দমায়।

আদেশ পালন করতে জহ্লাদের দেরী হল না। সেই শাস্তি অনুমোদন করে যে যার ঘরে ফিরে গেল।

ঘটনাটা নিয়ে বরসুমের প্রতিবেশীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করল। একজন বলল—'আল্লাহর কসম, বিরিয়ানির ওপরে আর কোনদিন লোভ দেখাব না। খেতে ভাল লাগলেও, আর না বাবা!' ভাঙখোর ভয়ে পেটটা চিপে ধরে বলল—'ওই শয়তান বিরিয়ানির হাত থেকে আল্লাহ আমাকে খুব বাঁচিয়েছেন।' সেদিন সকলেই এক বাক্যে শপথ নিল আর কোন দিন তারা ওই বিরিয়ানির ধার দিয়ে হাঁটবে না।

পরের মাসে প্রথম সপ্তাহে যথারীতি আবার ভোজের আয়োজন হল। এবার বিরিয়ানির প্লেট থেকে সবাই দূরে গিয়ে বসল। নিজের নিজের পাতের খানা আর সরাব খেয়ে তারা অবশ্য সুলতানকে খুশী করার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। সেই সঙ্গে আর একটা জিনিস দেখা গেল নিজের পাত ছাড়া কেউ আর পরের পাতের দিকে নজর দিচ্ছে না।

ভোজ পুরোদমে চলছে এমন সময়ে সবাইকে ধাক্কা দিয়ে একটা ভীষণ-দর্শন লোক ভোজঘরে এসে ঢুকল। এই লোকটাই কেবল বিরিয়ানির থালার সামনে বসল। ভয়ে-ভয়ে সবাই দেখল লোকটা দুহাতে করে বিরিয়ানি খাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে জুমুরুদ চিনতে পারল লোকটাকে। এ সেই ভীষণ চেহারার কুর্দ—চল্লিশ চোরের এক চোর। এদের সর্দার হল আহমদ অল দানাফ। সেদিন দুপুরে মেয়েটাকে নিয়ে শোবে বলে সে দলবল নিয়ে গুহায় ফিরে এসেছিল। মেয়েটা পালিয়ে গিয়েছে শুনে সে ভীষণ চটে গিয়ে নিজের হাতেই ঘুষি মেরে বলেছিল—দুনিয়ায় যেখানেই থাক মেয়েটাকে সে ধরে আনবেই। সে যদি পাতাল বা গুটিপোকার মধ্যে লুকিয়ে থাকে তাহলেও তার রেহাই নেই। খুঁজতে-খুঁজতে সে এইখানে এসে পড়েছে। ভগবানের মার একেই বলে। যাকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে-ই এখানকার সুলতান। ওর নিয়তিই শেষ পর্যন্ত ওকে এইখানে টেনে আনল—এই-খানেই ওর মৃত্যু লেখা ছিল।

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প বলা থামিয়ে দিল শাহরাজাদ।

তিনশ ছাব্বিশতম রজনী:

পরের দিন রাত্রিতে আবার শুরু হল গল্প।

বিরিয়ানির থালার সামনে বসে বিরিয়ানির ভেতরে সটান হাত ঢুকিয়ে

দিল জবান। সেই দেখে সবাই ভয়ে চিৎকার করে উঠল—'আরে আরে, কর কী! কর কী! তোমার জ্যান্ত ছাল তুলে দেবে জহ্লাদ। ওই পাপের খানায় হাত দিয়ো না বাপু; সাবধান'। চারপাশ থেকেই শব্দ শোনা যায়—আরে আরে গিদধোড় কাঁহাকার…

চারপাশ তাকিয়ে চোখ দুটো পাকিয়ে জবান দাঁত খিঁচিয়ে বলল—থাম ব্যাটারা! বিরিয়ানি আমার খুব ভাল লাগে। ওই খেয়েই পেট ভরাব আজ।

পাশ থেকে একজন বলল—পেট ভরাবে? আর জ্যান্ত যখন গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেবে? খেয়েছ কি মরেছ। ফাঁসীতে লটকাতে হবে। তখন বুঝবে বিরিয়ানি খাওয়া কাকে বলে।

কে কার কথা শোনে? যে-হাতটা সে বিরিয়ানির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল সেই হাত দিয়েই সে থালাটা টেনে নিল; থালার ওপরে ঝুঁকেও গন্ধও শুকলো প্রাণভরে। মুখ থেকে খানিকটা লাল ও পড়ল গড়িয়ে। তার কাছে বসেছিল সেই ভাঙখোরটা। এসব দেখে তার নেশা গেল ছুটে। সে তাড়া তাড়ি দূরে সরে গেল। বাপরে! এসবের মধ্যে সে আর নেই।

কাকের পায়ের মত মিশোমিশে কালো জবানের দুটো হাত। খাবল খাবলা বিরিয়ানি তুলে নেওয়ার সময় সেই হাত দুটোকে মনে হচ্ছিল উটের পায়ের মত। বিরাট বিরাট বলের মত করে দলা পাকিয়ে বিরিয়ানি হাতে তুলে নিয়ে গলার ভেতরে ছুঁড়ে দেয়; তারপরে কোঁৎ করে গিলে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে বিকট একটা আওয়াজ করে—মনে হবে গুহার ভেতরে ভীষণ একটা বাজ পড়ল বুঝি। সেই আওয়াজ প্রাসাদের গায়ে ধাক্কা লেগে প্রতিধ্বনি তোলে। থালাটার ওপরে চূর করে বিরিয়ানি সাজানো ছিল। কয়েকটা খাবলা তুলে নেওয়ার পরে বিরাট একটা গর্ত দেখা গেল সেখানে। সকলেই দেখে সেই গর্তের নিচে থালাটা বেরিয়ে পড়েছে।

সেই ভাঙখোর চিৎকার করে উঠল—ওরে বাব! এক মুঠোয় যে সবটাই তুলে নিয়েছে রে! আল্লাহ আমায় বাঁচিয়েছেন। ভাগ্যিস আমাকে বিরিয়ানি করে পাঠাননি। ওর যে ছাল ছাড়ানো হবে সেটা ওর কপালেই লেখা রয়েছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। উঃ! কী গেরাস যে বাবা। ওই গেরাসের বাছাধন, তুমি খতম।

কোন ভ্রূক্ষেপ নেই কুর্দ ডাকাতের। কে কী বলছে গায়ে মাখলো না সে। দ্বিতীয় গ্রাস তোলার মত খাবার মত হাতটা সে আবার ঢুকিয়ে দিল বিরিয়ানির ভেতরে। খপ করে একটা আওয়াজ হল। মুঠো ভর্তি করে দলা পাকাতে লাগল বিরিয়ানিটা। গ্রাসটা মুখে পোরার ঠিক আগে জুমরুদ রক্ষীকে বলল—ওই গ্রাসটা মুখে পোরার আগেই লোকটাকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এস।

রক্ষীরা ঝাঁপিয়ে পড়ল জবানের ওপরে। মুখ নিচু করে গ্রাসটা মুখে তুলছিল বলে সে রক্ষীদের দেখতে পায়নি। হাত দুটো পিঠ মোড়া করে তাকে সুলতানের কাছে হাজির করা হল। সবাই বলাবলি করতে লাগল—কেমন সাজা! পইপই করে বারণ করলাম—ব্যাটা, বিরিয়ানি ছুঁসনে। শুনলে আমাদের কথা? এবার বোঝ ঠেলাটা, ওই অভিশপ্ত বিরিয়ানি যে

ছোবে তারই সর্বনাশ হবে।

জুমুরুদ জিজ্ঞাসা করে—কী নাম তোমার? কর কী? আমাদের শহরে এসেছ কেন?

জবান বলল—আমার নাম অট্‌মান। পেশায় মালী। শহরে এসেছি কাজের খোঁজে।

সেই মন্ত্রপূতঃ বালি আর কলম নিয়ে আয়—রক্ষীদের আদেশ দিল জুমুরুদ।

বালি আর কলম এল। আগের মতই বালির ওপরে আঁকাজোকা শুরু হল। অনেকক্ষণ কী জানি কী সব হিসাব করে হঠাৎ জোরে চেঁচিয়ে উঠল জুমুরুদ—মিথ্যেবাদী, তোর কপালে দুঃখ আছে। গুণে দেখলাম, তোর আসল নাম হচ্ছে জবান। তোর পেশা হল চুরি, ডাকাতি, আর খুন করা। শুয়োরের বাচ্চা। ঠেঙিয়ে তোর মুখ থেকে সত্যি কথা বলাব।

জবান বুঝতে পারল না যাকে সে ধরে নিয়ে গিয়েছিল এই সুলতানই মেয়ে। ভয়ে লোকটা কেমন নীল হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত লেগে একটা কটকট আওয়াজ বেরুতে লাগল তার মুখ থেকে। ঠোঁট দুখানা সামনে পড়েছে ঝুলে। সত্যি কথা বললে রেহাই পেতে পারে এই ভেবে সে বলল—মালিক আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। এখানে আসাটাই আমার ভুল হয়েছে বুঝতে পারছি। এই শহর ছেড়ে আমি সোজা বেরিয়ে যাব। কথা দিচ্ছি, আর কোনদিন এমুখো হব না।

জুমুরুদ বলল—তোর মত শয়তানকে বাঁচিয়ে রাখলে গুনাহ হবে। তুই মুসলমানের কুলাঙ্গার...একে বাইরে নিয়ে গিয়ে জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নে। লোকে যাতে দেখতে পায় এই ভাবে প্রাসাদের সামনে ওর চামড়াটা ঝুলিয়ে রাখবি। খ্রীস্টানের লাশটা যেভাবে পাচার করেছিলি এর লাশটাও সেইভাবে নর্দমায় ফেলে দিবি।

রক্ষীরা তাকে টনতে-টানতে বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময় ভাঙখোরটা বিরিয়ানির দিকে পেছন করে বসল, বলল—ওরে বিরিয়ানি, গরম মশলা দেওয়া বিরিয়ানি, আর কোন দিন তোর মুখ আমি দেখব না। তুই মহাপাপী তোর সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। তোকে দেখে আমার ঘেন্না হয়। তোর মুখে আমি থুথু ফেলি।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চুপ করে গেল।,

তিনশো সাতাশতম রজনী:

পরের দিন রাত্রিতে আবার শুরু করল।

আগের মতই তৃতীয় ভোজের আয়োজন হল। সিংহাসনে বসে আছেন সুলতান। চারপাশ ঘিরে পাত্র-মিত্র-সভাসদ। সামনে প্রজারা প্রাণভরে আহার করছে, পান করছে সরাব, স্ফূর্তিতে চেঁচাচ্ছে। একটা জায়গা ছাড়া প্রাসাদের সারা কক্ষটাই গিয়েছে ভরে। বিরিয়ানির থালাটা যেখানে ছিল সেখানে কেউ বসে নি। সব বসেছে পেছন করে। শাদা দাড়ীওয়ালা একটা লোক ঘরে ঢুকে বিরিয়ানির সামনে যে ফাঁকা জায়গাটা ছিল সেইখানে বসে পড়ল। লোকটাকে চিনতে পারল জুমুরুদ। লোকটা হচ্ছে রসিদ অল-দিন।

এই লোকটাই সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

রসিদ অল-দিন এখানে এল কী করে? মেয়েটার খোঁজ করতে তার ভাই বরসন্ম তো আগেই এসেছিল বেরিয়ে। একমাস কেটে গেল তবু তো ফিরল না। ভাই-এর খোঁজ করতে তাই এবার সে নিজেই বেরিয়ে পড়ল। নিয়তিই তাকে টেনে আনল এইখানে। আর এমনি কপাল যে ঘরে ঢুকেই সে বসে পড়ল বিরিয়ানির সামনে। জুমুরুদ ভাবে—আল্লাহর কী অদ্ভুত খেয়াল। বদমাইশ লোকগুলো ঘরে ঢুকে ঠিক সেই বিরিয়ানির সামনে বসে পড়ে। সব বদমাইশ-এর ওই একই রা। কিন্তু এরকম হওয়া তো ঠিক নয়। প্রজাদেরও বিরিয়ানি খেতে হবে। আমি আজই আদেশ দেব যে খাবে না তার ফাঁসী হবে। কিন্তু তার আগে ওই বুড়ো শয়তানটাকে ঢিট করে দিই।

রক্ষীদের বলল—বিরিয়ানির সামনে যে বুড়োটা বসে রয়েছে ওকে ধরে নিয়ে এস।

টানতে টানতে রক্ষীরা বুড়োটাকে তার সামনে এনে হাজির করল।

—কী তোমার নাম? পেশা কী? এদেশে এসেছ কেন?

রসিদ বলল—হে পুণ্যতম সুলতান, আমার নাম রুস্তম। আমার কোন পেশা নেই। নেশা আমার ঘুরে বেড়ানো। আমি দরবেশ।

আবার সেই বালি এল; এল কলম। আবার সেই আঁকাজোকা চলল। আবার কিছুক্ষণের জন্যে চুপচাপ সুলতান—ভাবাবেগে তন্ময়। তারপরেই সে চেঁচিয়ে উঠল—দরবেশ, না, শয়তান তুই! সুলতানের সামনে মিছে বাত! তোর নাম রসিদ অল-দিন। মেয়েদের ওপরে অত্যাচার করাই তোর নেশা; পরের বাড়ি থেকে মেয়ে চুরি করাই তোর পেশা। বাইরে তুই মুসলমান সেজে বেড়াস; ভেতরে তুই পাকা খ্রীস্টান। নানান বদ কাজ করার ফলে নিজের ধর্মেও তুই পতিত। আমার প্রজাদের কাছে সব স্বীকার কর। নইলে ধড় থেকে তোর মুণ্ডটা নামিয়ে দেব।

মাথাটা বাঁচানোর তাগিদে সব কবুল করল রশিদ।

জুমুরুদ রক্ষীদের বলল—লোকটার পা দুটো ওপর করে মাথাটা নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখ। এক একটা পাছায় হাজারটা করে জুতো মার।

জুতো মারা শেষ হলে জুমুরুদ বলে—আগের দুটো কুত্তার চামড়ার সঙ্গে এর চামড়াটা ঝুলিয়ে রাখ।

রশিদকে টেনে বার করে নিয়ে যাওয়ার পরে সবাই আবার খাবারে মন দিল। সুলতানের দিব্যজ্ঞান আর বিচারের দক্ষতায় তারা মুগ্ধ।

দিন যায়। কিন্তু যাকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে কোথায়? জুমুরুদের মনে সুখ নেই। রাজপ্রাসাদে ফিরেও কিছুই ভাল লাগে না তার। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনেই সে বলে—আল্লাহ পরম করুণাময়, প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা যেন আমার থাকে।...হে ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান তুমি। আমাকে করুণা কর। আমার আলী শারকে ফিরিয়ে দাও। এ-দুনিয়ায় আমার মত কত হতভাগিনী রয়েছে। হে আল্লাহ, তাদের মনে তুমি শান্তি দাও প্রভু।

আলীশারের স্মৃতিটা তাকে তুঁষের আগুনের মত দগ্ধ করছে। সারা রাত তার চোখে ঘুম নেই। চোখের জলে শেষ হয়ে যায় রাত। আবার আশায় সে পরের মাসের জন্যে বুক বাঁধে।

সেই প্রাসাদ, সেই ভোজনকক্ষ, সেই প্রজাবৃন্দ, আর সেই একই পরিবেশ। অমাত্যপরিবৃত হয়ে সুলতান বসে বসে প্রজাদের ভোজন দৃশ্য দেখছে। জুমুরুদ্দ দুরু দুরু বুকে বলে—আল্লাহ, যোশেফকে তুমিই তার বাবার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলে। আলী শারকে তুমি আমার কাছে এনে দাও। আলী শারকে এনে দাও তার এই ক্ষুদ্র বাঁদীর কাছে। ভুল পথে যারা চলে তুমিই তো তাদের ঠিক পথ দেখিয়ে দাও।

তার প্রার্থনা শেষ হতে-না-হতেই, ভোজনকক্ষে এক দিব্যকান্তি যুবক এসে ঢুকল। প্রশস্ত বুকের ছাতি তার, সিংহের মত সরু কোমর। চলার মধ্যে বেশ একটা সম্ভ্রান্ত ভাব। পথশ্রমে যুবকটিকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ভেতরে ঢুকে চারদিকে সে একবার তাকাল। দেখল, কোথাও কোন ফাঁকা জায়গা নেই। বাধ্য হয়ে সে বিরিয়ানির সামনেই বসে পড়ল। ভয় পেয়ে সকলে তার দিকে তাকাল।

আগন্তুককে দেখেই চিনতে পেরেছে জুমুরুদ্দ। হঠাৎ কী যেন বলতে গিয়ে সে সামলে নিল নিজেকে। ঠোঁট দুখানা তার তখন থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। বুকটা করছে দুরু দুরু। পেটে দিচ্ছে মোচড়। হৃদপিণ্ডের শব্দটা কি কেউ শুনতে পাচ্ছে?

হ্যাঁ। এই আলী শার।

ভোর হয়ে এসেছে দেখে চুপ করে যায় শাহরাজাদ।

তিনশো আঠাশতম রজনী:

আবার রাত্রি এল। আবার গল্প শুরু হল শাহরাজাদের।

জাঁহাপনা, আলী শার যে জুমুরুদ্দকে উদ্ধার করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে-কথা নিশ্চয় আপনার মনে রয়েছে। এক ঘুমেই রাত কাবার হয়ে গেল তার। পরের দিন দোকানদাররা যখন দোকানপাঠ খুলতে শুরু করেছে ঠিক সেই সময় ঘুম ভাঙলো তার। থতমত খেয়ে গেল বেচারা। রাস্তায় শুয়ে আছে কেন? মাথায় হাত দিয়ে দেখে পাগড়ী নেই। গায়ে যে দামি কুর্তা ছিল। সেটাও কোথায় আত্মগোপন করেছে। ধীরে-ধীরে সব কথা মনে পড়ে গেল তার। দীর্ঘ নিঃশ্বাস একটা ফেলে সামনের বাড়িটার দিকে একবার সে তাকাল। তারপরে বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে গিয়ে সেই বৃদ্ধার কাছে সে সব খুলে বলল।

বৃদ্ধাটি ফিরিওয়ালীর বেশে আবার বেরিয়ে গেলো; কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বললো—সে ওখানে নেই। কী আর করবে বাছা! সবই তোমার নসীব। ও মেয়েকে খুঁজে পাওয়ার আশা তুমি ছেড়ে দাও। আল্লাকে ডাক। তিনিই তোমার একমাত্র ভরসা। তোমার এই দুঃখে একমাত্র তিনিই তোমাকে শান্তি দিতে পারবেন। তোমার ভুলের জন্যেই এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এল আলী শারের। এখন মৃত্যুই তাকে চির-শান্তি দিতে পারে। বৃদ্ধার কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদল। কাঁদতে-কাঁদতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। সেবা যত্ন করে বৃদ্ধা তার জ্ঞান ফেরালো। কিন্তু আলী শার বিছানা নিল। রুচি নেই আহারে, সুখ নেই বিহারে, ঘুম নেই চোখে, কবরেই চলে যেতে হোত তাকে। কেবল

বৃদ্ধারই সেবা যত্ন সেটা হয়নি। সব সময়েই সে তাকে সাহস দিত। একটা বছর বিছানায় শুয়ে ছিল আলী শার। একটা বছরই বৃদ্ধা তার সেবা করছে। বাড়াবাড়িটা কমলো বটে ; কিন্তু দুর্বলতা গেল না। আলী শারের রোগশয্যার পাশে বসে বৃদ্ধাটি তাকে অনেক বিরহের কবিতা শুনিয়েছিল। তাদের মধ্যে একটি হল :

এই যে আমার হৃদয় জর-জর
নয়ন-কোণে অশ্রুত ঝর-ঝর
আমার মনের আগুনটারে নিবিয়ে দিয়ে যায়।
আমার রঙিন সুতো টুকরো করে
আশার তীক্ষ্ণ অসির জোরে
সেই সাথে এক বেদন কাঁপায় মোরে
শাশ্বত এক রঙিন কামনায়।

অনেক-অনেক বিরহ-বিচ্ছেদের কবিতা শুনিয়ে বৃদ্ধাটি তাকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছে ; কিন্তু আলী শার জানত জুমুরুদকে না পেলে ও কিছুতেই শান্তি পাবে না, বাঁচবে না কিছুতেই। দুর্বলতাও তাই তার কাটে না। ছেলেটিকে কী-ভাবে সুস্থ করে তুলবো এই কথা ভেবে-ভেবে সারা হল বৃদ্ধা। এক সময় সে বললো—বাছা, এমনি ভাবে শুয়ে-শুয়ে কাতরালে জুমুরুদকে তুমি পাবে কেমন করে ? পুরুষ মানুষ তুমি। শক্ত হও, দুর্বলতা দূর কর। শহরে-শহরে ঘুরে বেড়াও, ঘুরতে থাক দেশে-দেশে। তবেই তো একদিন-না-একদিন তাকে তুমি খুঁজে পাবে। এমন করে বিছানায় পড়ে থাকলে কোনদিনই তাকে তুমি পাবে না।"—এইভাবে রোজই তাঁকে উত্যক্ত করতে থাকে। মাঝে-মাঝে সাহসও যে দেন না সেকথা ও সত্যি নয়।

তারপরে একদিন আলী শার আলস্য ছেড়ে সত্যি-সত্যিই উঠে বসে। আলী শারকে নিয়ে গোছল করিয়ে দেয় বৃদ্ধা। পেস্তা দেওয়া সরবৎ খেতে দিল তাকে। নিজের হাতে মুরগীর ঝোল রান্না করে দেয়, এইভাবে মাসখানেক পরে ঘুরে বেড়ানোর মত শক্তি ফিরে এল আলী শারের দেহে। মনে এল বল। তারপরে বৃদ্ধার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একদিন আলী শার বেরিয়ে পড়ল জুমুরুদকে খুঁজতে। ঘুরতে-ঘুরতে হতাশ হতে-হতে আজই সে এই শহরে এসে পেঁাচেছে। জুমুরুদ এখানকারই সুলতান। তারপরে সে বিরিয়ানির সামনে বসেছে।

বেশ খিদেও পেয়েছে তার। খাওয়ার জন্যে আস্তিন গুটিয়ে সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। খেতেও শুরু করেছে। বিরিয়ানি খেতে দেখে আশপাশের লোকেরা আঁৎকে উঠে তার দিকে তাকালো। ওটা খেতে সকলেই তাকে নিষেধ করল। তাদের কথা তার কানে গেল না। তখন সে ভাঙখোরটা বলে উঠল—সাবধান, সাবধান! ওদিকে তাকিয়ো না যাদু। মুখে দিয়েছ কি তোমার দফা রফা। গায়ের চামড়া খুলে নিয়ে ফাঁসীতে লটকে দেবে। মরণ তোমার কেউ ঠেকাতে পারবে না।

আলী শার বলল—যে ভাবে আমার দিন কাটছে তাতে আমার কাছে মরণই অনেক ভাল। অত ডেকেও মরণকে পাই নি। আজ যদি তোমাদের কথা মত মৃত্যুই আমার হয়, ভালই তো। বিশেষ করে সেই জন্যেই আমি এটা খাব।

আর কোন দিকে না তাকিয়েই সে বিরিয়ানিটা খেতে শুরু করল।

জুমুরুদ সব লক্ষ্য করছিল। ভাবছিল—আহা বেচারা, পেট পুরে খেয়ে নিক। তারপরে ডাকিয়ে আনব।

তার ঠোঁট দুখানা কেবল নড়তে থাকে। বিড়বিড় করে সে বলে—আল্লাহ, তুমি এই বাঁদীর কথা শুনেছ। তারপরে সে রক্ষীদের বলল—ওই যে লোকটি বিরিয়ানি খাচ্ছে ওকে বেশ ভদ্রভাবে বলবে আমার কাছে এসে দুটো কথা শুনে যেতে।

আদেশ পেয়ে রক্ষীরা তার কাছে গিয়ে কুর্নিশ করে বলল—মালিক, আমাদের মহামান্য সুলতান আপনাকে স্মরণ করেছেন।

উঠতে-উঠতে আলী শার বলল—তাই নাকি? চল যাচ্ছি। সুলতানের কথা অমান্য করা যায় না।

আলী শার এগিয়ে গেল সুলতানের দিকে।

প্রজারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে শুরু করল—আবার তাই হল নাকি গো! এবারের লোকটা আগেকারগুলোর মত বিশ্রী নয়। কী জানি, কী হবে বাপু?

কেউ কেউ বলল—ওর ভেতরে পাপ থাকলে সুলতান ওকে পেট ভরে খেতে দিতেন না। আগের মত এক গেরাস। ব্যস। তারপরেই ফাঁকা—বিলকুল ফাঁকা।

আর একজন বলল—দেখছ, প্রহরীরা কই ওকে তো টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল না। লোকটা তো নিজের পায়েই হেঁটে গেল। ওকে যথেষ্ট সম্মানও দেখাল প্রহরী। ব্যাপারটা কী!

সুলতানের সামনে গিয়ে মাটিতে চুমু খেল আলী শার।

খুব ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করল জুমুরুদ—গলাটা একটু যেন কেঁপে-কেঁপে উঠল—ওহে যুবক, তোমার নাম কী? পেশাটা কী তোমার? এই শহরে এসেছ কেন?

আলী শার বলল—মহামান্য সুলতান, আমার নাম আলী শার। গেলারির ছেলে আমি। খোরেসানে আমার বাবা একজন বড় ব্যবসাদার ছিলেন। আমারও পেশা তাই। আমার দুর্ভাগ্য এদেশে আমাকে টেনে এনেছে।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চুপ করে গেল।

তিনশো উনত্রিশতম রজনী :

পরের দিন রাত্রিতে আবার শুরু করলেন শাহরাজাদ।

আলী বলল—প্রিয়তমাকে হারিয়ে আমি এখন তার-ই খোঁজে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। খুঁজতে-খুঁজতে শেষ পর্যন্ত এসে পেঁচেছি এই শহরে। তার মিষ্টি ডাক, মিষ্টি স্বপ্ন আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কোথায় পাব তারে! দস্যুরা তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। দিকহারা এক

জাহাজে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি যেন। কোথায় তাকে পাব কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে। এই না-পাওয়ার বেদনা যে কী, কী করে আপনাকে বোঝাবো জাঁহাপনা ?

বলতে-বলতে দু'চোখ ছাপিয়ে জল ঝরতে লাগল তার। দয়িতার বিরহে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে সে লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপরে।

খোজা ছেলে দুটি তার চোখেমুখে গোলাপ জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনল তার।

জুমুরুদ বলে—মন্ত্রপূত বালি আর আমার কলমটা নিয়ে আয়।

আগের মতই টেবিলের ওপরে বালি ছিটিয়ে কলম দিয়ে সে নানা রকম আঁকজোক কাটল। নিজেকে সংযত করার জন্যে কিছুটা সময় সে নিল। হাজার হোক সে সুলতান। তার চারপাশে হাজার-হাজার প্রজা, পাত্র-মিত্র আর আমাত্যেরা বসে রয়েছে। এতটুকু বেচাল হলেই মাটি হয়ে যাবে সব। অথচ, নিজেকে সামলে রাখাও যে ক্রমশ কণ্টকর হয়ে উঠেছে।

অনেকক্ষণ নিজের সঙ্গে লড়াই করে মুখ তুলল জুমুরুদ। সকলেই শুনতে পায় এমনিভাবে বেশ মিষ্টি করেই বলল—গোবির ছেলে তুমি আলী শার। তুমি যে সাচ্চা মানুষ তা আমার গণনাতেই ধরা পড়েছে। তুমি যা বললে তার সবটুকুই ঠিক। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি তোমার ভালবাসার মানুষকে খুব শিগগিরই তুমি খুঁজে পাবে। আর দুঃখ করো না।

ভোজ শেষ হওয়ার পরে আলী শারকে গোছল ঘরে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিল জুমুরুদ। গোছল শেষ হলে রাজকীয় পোশাকে সাজিয়ে আস্তাবলের সব চেয়ে ভাল একটা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে আলী শারকে রাজ-প্রাসাদে হাজির করার নির্দেশ দিয়ে চলে গেল জুমুরুদ।

সুলতানের এ-হেন নির্দেশ শুনে প্রজারা তোওবা-তোওবা করতে লাগল। বলে, ব্যাপারটা কী, অ্যা ! এত খাতির, এত সম্মান !!—কেউ কেউ মন্তব্য করল—'বুঝলে না চাচা ! চাঁদপনা মুখ দেখে সুতানের মন গলেছে। একি আর তোমার মুখ হে ? এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই।' আর একজন মাথা নেড়ে বলল—'উহুঁ' ব্যাপারটা অত সোজা নয়, মিয়া। ওকে বিরিয়ানি খেতে তো তোমরা দেখেছ ? অথচ ওই বিরিয়ানি ছুঁলেই কী কাণ্ডটাই না হচ্ছিল—তা তোমরা স্বচক্ষে দেখেছ। এর বেলাতেই সব ওলট-পালট হয়ে গেল কেন ? না, ব্যাপারটা মোটেই অতটা সোজা নয় হে, অতটা সোজা নয়।

মাথা নাড়তে-নাড়তে, নানান জল্পনা করতে-করতে সবাই বাড়ির পথ ধরল।

রাতের অপেক্ষায় বসে রয়েছে জুমুরুদ। বসে-বসে ক্রমেই অধীর হয়ে উঠছে, হয়ে উঠছে অস্থির। কখন তাকে কাছে পাব। উঃ, কতকাল পরে আবার দুজনে কাছাকাছি আসব।

পশ্চিম আকাশে ধীরে-ধীরে ঢলে পড়ল সূর্য। শুরু হল সন্ধ্যের আজান। মসজিদে প্রার্থনার জন্যে লোক চলাচল শুরু হল। জুমুরুদের আর তর সইছে না। পোশাক পালটিয়ে নরম বিছানায় সে গা এলিয়ে দিল। পরণে তার স্বচ্ছ সেমিজ। অন্ধকারে থাকার জন্যে আলোর সামনে সে পর্দাটা দিল টেনে। আলী শারকে নিয়ে আসার জন্যে শুয়ে শুয়েই সে নির্দেশ দিল খোজা ছেলে দুটাকে।

সুলতানের এ-হেন অদ্ভুত ব্যবহারে অমাত্যরাও অবাক। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল—নিশ্চয় সুলতান ওই দরবেশটার প্রেমে পড়েছে। তবু যদি মেয়েছেলে হোত। আজ রাত্রিতে ওরা সম্ভবত এক জায়গাতেই থাকবে। কাল সকালে দেখবে ও নির্ঘাত প্রধানমন্ত্রী অথবা সেনাধ্যক্ষ হয়ে গিয়েছে।

এদিকে আলী শারকে ভেতরে পেঁাছে দিয়ে খোজা দুটি দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। আবছাওয়া অন্ধকার সুলতান দেখতে পেল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আলী শার চুম্বন করছে। সুলতানও হাত তুলে তাকে অভিবাদন জানাল। সুলতানের মঙ্গলকামনা করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল আলী শার। ভাবল, আগ বাড়িয়ে কিছু বলব না।

জুমরুদ ভাবল—আমার পরিচয় যদি এখনই দিই তাহলে ওতো আবেগের চোটেই মরে যাবে। তাই সে অন্ধকারে আলী শারের দিকে পেছন করে বল। ওহ ছোকরা, কাছে এগিয়ে এস। গোছল করেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, মালিক।

—হাত-পা ভাল করে সাফ করেছ? সুগন্ধী তেল পেয়েছিলে? এখন তবিয়ৎ ভাল লাগছে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মালিক।

গোছলের পরে তোমার ক্ষিদে পেয়েছে তো? ওই দেখ, তোমার সামনেই একটা সোনার থালায় খানা রয়েছে—মুরগীর মাংস, তন্দুরী—সব পাবে। খনিকটা খেয়ে নাও।

পেট পুরে খেয়ে নিল আলী শার।

এখন নিশ্চয় তোমার তেষ্টা পাচ্ছে? ওইখানে নানা রকমের সরাব রয়েছে। যত পার খেয়ে নাও। তারপরে আমার কাছে এসে বস।

সব সরাবই চেখে দেখল আলী শার। যতটা পারল খেল, তারপরে কাঁপতে-কাঁপতে সুলতানের বিছানার দিকে এগিয়ে গেল।

পিছন ফিরেই হাত ধরে সুলতান তাকে বিছানার ওপরে বসতে দিল; তারপরে বলল—যুবক, তুমি আমাকে খুব খুশি করেছ। তোমার মত সুন্দর মুখ আমি খুব পছন্দ করি। পায়ে বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। একটু টিপে দেবে?

কামিজের আস্তিন গুটিয়ে নিচু হয়ে আলীশার সুলতানের পা টিপতে লাগল দুলে দুলে। কিছুক্ষণ পরে সুলতান বলল—এবার পা আর উরু দুটো টিপে দাও।

পা আর উরুর কাপড় তুলে টিপতে গিয়ে আলী শার অবাক হয়ে যায়। অবাক কান্ড। পা আর উরুতে তো কোন লোম নেই। আর কী নরম তুলতুলে। মনে-মনে বলল—পুরুষ মানুষের পা এরকম হয়? আমি বাপু কোন পুরুষের পা এরকমটি দেখিনি।

—তুমি তো বেশ চমৎকার টিপতে পার ছোকরা। তোমার হাত বেশ পাকা দেখছি। আর একটু ওপরে টিপে দাও; এই কোমরের কাছাকাছি।

আলী শারের হাত হঠাৎ ঘেমে উঠল। ভয়ে-ভয়ে বলল—আমাকে মাপ করুন, মালিক। উরুর ওপরে কী রকম করে টিপে দেব বুঝতে পারছি নে। যতটুকু বুঝি ততটুকু করেছি।

ভোর হয়ে আসছে দেখে থেমে গেল শাহরাজাদ।

তিনশো ত্রিশতম রজনী :

পরের দিন রাত্রিতে আবার গল্প বলতে শুরু করল শাহরাজাদ।

আলী শারের কথায় যেন জ্বলে উঠল সুলতান ; একটু উঁচু গলাতেই বলে—আমার কথার অবাধ্য হচ্ছ, সাহস তো মন্দ নয়, যা বলছি কর। একটু দেরি হলেই আজ রাতে তোমার শিরশ্ছেদ করা হবে। আমাকে তৃপ্তি দাও। তার বিনিময়ে তোমাকে সব চেয়ে বেশী স্নেহ করব, ভালবাসব। আমীরের আমীর, সেনাধ্যক্ষের ওপরে বসিয়ে দেব তোমাকে। যা বলছি চট পট তামিল কর।

—কিন্তু জাঁহাপনা, আপনি ঠিক কী চাইছেন তাইত বুঝতে পারছিনে। কী ভাবে আপনার হুকুম তামিল করব বলে দিন।

তোমার পা-জামাটা খুলে ফেল। আমার পাশে উপুড় হয়ে শোও।

হাঁটু গেড়ে হাত জড় করে আলী শার বলল—সারা জীবনে কখনও আমি এসব কাজ করিনি। আপনি যদি এসব কাজ করতে আমাকে বাধ্য করেন তাহলে আল্লাহর কাছে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। দয়া করে আমাকে রেহাই দিন। আমি এখনই এদেশ ছেড়ে চলে যাব।

প্রচণ্ড ক্রোধের ভান করে সুলতান বলে—আমার আদেশ, পা-জামা খোল ? আমার পাশে উপুড় হয়ে শোও। নইলে এখনই তোমার গর্দান যাবে। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ কর। কী সুন্দর তোমার চেহারা। তুমি আমার কাছে শোবে এস। এর জন্যে তোমাকে অনুশোচনা করতে হবে না।

কী আর করে আলী শার ? সুলতানের আদেশ মত পা-জামা খুলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। তার পিঠের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সুলতান। আবেগে জড়িয়ে ধরল আলী শারকে।

আলী শার ভাবল—এবার আমার শেষ। তারপরেই হঠাৎ সে চমকে উঠল। পিঠের ওপরে তার গোলাকার কী যেন দুটি বস্তুর চাপ লাগছে যেন। সিল্কের মত নরম পেলব সে অনুভূতি। সুলতানের দেহ থেকে একটু একটু ঘাম বোধ হয় চুইয়ে পড়েছিল। সেই ঘাম তার পিঠে লাগল, হায় আল্লা, মেয়েদের মত এত নরম রোমাঞ্চকর সুলতানের দেহ। বেচারার প্রাণ তখন যায়-যায়। সে মড়ার মত চুপচাপ পড়ে রইল।

প্রায় ঘন্টাখানেক তার পিঠের ওপরে শুয়ে রইল সুলতান। ওপাশ থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে বেচারা বেশ ঘাবড়ে গেল। তারপরে একসময় পিঠ থেকে নেমে এলে সুলতান। এবারে সুলতান আলী শারকে তার পিঠে চাপানোর চেষ্টা করল। বেচারা আলী শার। এবারে আর তার নিস্তার নেই। তার মনে হল সুলতান পুরুষাঙ্গহীন। এখন যদি প্রমাণিত হয় যে সে-ও ওই রকম পুরুষাঙ্গহীন তাহলে আর তাকে বাঁচানো যাবে না। কথাটা ভাবতে গিয়েই সে আরও ঘাবড়ে গেল, সারা হয়ে গেল ভয়ে। দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগল তার।

আলী শারের তখন শেষ অবস্থা। এমন বিপাকেও কেউ পড়ে—ইয়া আল্লাহ ! জোরে-জোরে নিঃশ্বাস পড়তে লাগল তার। তার শরীরের ঘামে ভিজে গেল সুলতানের দেহ।

সুলতান বলল—কই, তোমার হাতটা দাও।

প্রাণের মায়া বড় মায়া। ভয়ে-ভয়ে হাত খানা বাড়িয়ে দিল আলী শার। অন্ধকারে যেখানে গিয়ে তার হাত পড়ল তাতেই সে চমকে উঠল।

এতো পুরুষ নয়। —আলী শারের চিন্তার জগতে বিপর্যয় নেমে এসেছে ততক্ষণে।—এরকম আশ্চর্য ঘটনা আমার জীবনে কোনদিনই ঘটতে দেখিনি। বিদ্যুৎ চমকের মত কী করে যে কী হয়ে গেল তা সে বুঝতে পারল না। একটা উদগ্র কামনা তাকে গ্রাস করে ফেলল।

সেই চরম মুহূর্তটির জন্যে জুমুরুদ-ও অপেক্ষা করছিল। এবার প্রচন্ড জোরে সে হেসে উঠল। ফুলে-ফুলে উঠল তার দেহটা। সেই হাসির গমকে পিঠ থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল আলী শার। হাসতে-হাসতে জুমুরুদ বলল—মালিক, তোমার প্রিয়তমা বাঁদীকে তুমি চিনতে পারলে না।

কিছুই বুঝতে পারল না আলী শার। কে মালিক, কে বাঁদী—কিছুই মাথায় ঢুকল না তার। জিজ্ঞাসা করল—জাঁহাপনা, কিসের মালিক, বাঁদীই বা কে, কিছুই মালুম হচ্ছে না আমার।

হেসে বলল জুমুরুদ—আলী শার, আমিই তোমার জুমুরুদ, আমাকে তুমি চিনতে পারছ না ?

কথাটা শুনেই আকুল আগ্রহে চমকে উঠে পড়ল আলী শার ; আপনার প্রাণ-পিয়াসী প্রিয়তমকে এবার চিনতে তার মোটেই দেরী হল না। চিনতে পেরেই প্রচন্ড আবেগে জড়িয়ে ধরল তাকে। আদরে সোহাগে ভরিয়ে দিল তার চোখ, মুখ, বুক, সারা দেহ।

জুমুরুদ বলে—কী গো মালিক, আর না-না করবে

উত্তর দেওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত আলী শারের এখন নেই। সিংহের মতই আলী শার তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে সব বাধা, সব দুশ্চিন্তা কেটে গেল তার। জুমুরুদকে কোলের ওপরে তুলে নিল সে। তাকে নিয়ে কী করবে কী না করবে কিছুই ভেবে পেল না সে। জুমুরুদের বুকের মধ্যেও তখন কামনার দাপাদাপি চলছে। আলী শারের প্রচণ্ড, উদ্দাম উচ্ছ্বাসকে সে এতটুকু বাধা দিল না, জৈব ক্ষুধায় তখন দুজনেই সমানভাবে ক্ষুধাতুর। দুটি দেহের পুনর্মিলনের অভিসার সারা রাত ধরেই চলতে থাকে তাদের। একজনের মুখ নিসৃত আওয়াজ আর একজনের নিশ্বাসের আর্তিতে চাপা পড়ে গেল। সুলতানের শয়ন কক্ষ সেই বিচিত্র স্বরধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল।

সেই শব্দে প্রহরাধীন খোজা দুটি কেমন ভয় পেয়ে গেল। সুলতান কোন বিপদে পড়েছেন বুঝতে পেরে ভয়ে ভয়ে তারা দরজার ফোকরে উঁকি দিতে লাগল। সুলতানের পিঠটাই কেবল তাদের চোখে পড়ল। আবার দেখল, সেই লোকটা সুতানকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। দুজনের শরীরই নড়ছে। মারামারি, কুস্তি হচ্ছে নাকি দুজনের ? দুজনের শরীর এমন-ভাবে লেপটে রয়েছে যে কাঁচি দিয়ে না কাটলে বোধ হয় তাদের আলাদা করা যাবে না। মাঝে-মাঝে কেঁপে-কেঁপে উঠছে তারা, ফুলে-ফুলে উঠছে।

রাত পুইয়ে আসছে দেখে চুপ করে গেল শাহরাজাদ।

পরের দিন রাত্রিতে আবার শাহরাজাদ গল্প বলতে শুরু করলো।

এসব দেখে দুটো বন্ধ করে শেষ পর্যন্ত সরে এল তারা। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল—আমাদের সুলতানকে মোটেই বেটাছেলের মত লাগছে না, তাই না রে। যেন একটা মেয়েমানুষ। কেমন যেন করছেন দেখলি।

ব্যাপারটা তারা আর ঘাঁটাঘাটি করল না। তবে আসল ব্যাপারটা মাথায় ঢোকেনি তাদের।

পরের দিন ভোরবেলা জুমুরুদ আবার সেই সুলতানের পোশাকই পরল। পাত্রমিত্র সবাইকে ডেকে পাঠাল প্রাসাদের বাগানে। সবাই উপস্থিত হলে সে বলল—আমার প্রিয় বিশ্বাসী অনুচরবৃন্দ, আমি যে-পথ দিয়ে এসেছিলাম তোমরা সেই পথের ধারে অপেক্ষা কর। আমার আদেশ, আমার মত তোমরা আর কাউকে নিয়ে এসে তোমাদের সিংহাসনে বসাও। আমি স্বেচ্ছায় এই সিংহাসন ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ঠিক করেছি এই যুবকের সঙ্গে আমি ওর দেশে চলে যাব। ওকেই আমি আমার সারা জীবনের সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করেছি। আমি ওকে ভালবেসে ফেলেছি। আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করুন।

পারিষদবর্গ শান্ত হয়ে সুলতানের নির্দেশ শুনল। ইতিমধ্যে দুটি খোজা প্রচুর খাবার, ধনরত্ন, মণিমাণিক্য সাজপোশাক উট আর খচ্চরের পিঠে ফেলল সাজিয়ে। সব শেষে জুমুরুদ আর আলী শার সুসজ্জিত একটা উটে টানা পাল্কির ভেতরে গিয়ে বসল। সঙ্গে নিল কেবল সেই দুটি খোজাকে। খোরাসান শহরে নিজেদের বাড়িতে পেঁছে গেল তারা। গরীব দুঃখীদের দু হাত দিয়ে দান করল। দান করল বিধবাদের, পিতৃ-মাতৃহীন ছেলেমেয়েদের। বন্ধুবান্ধবদের উপঢৌকন পাঠাল ভাল-ভাল। ওরা ফেরার আগেই সেই বৃদ্ধটি দেহ রেখেছিলেন। ওরা তাঁর কবরের ওপরে সুন্দর একটা বেদী তৈরি করে দিল।

অনেক দিন সুখে-শান্তিতে ঘর করল ওরা। একটি পুত্র সন্তানও হল ওদের। আনন্দে ভরে গেল ঘর। সেই আনন্দ ভেঙে গেল যখন আল্লাহ্ ওদের একজনকে তুলে নিলেন।

এই হল গ্লোরি, তার ছেলে, আর জুমুরুদের গল্প।

জাঁহাপনা এবার আপনাকে যে গল্পটা শোনাব সেটা এর চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। গল্পটি গড়ে উঠেছে ছ'টি মেয়েকে ঘিরে, নানান রঙের ছ'টি মেয়েকে ঘিরে, নানান রঙের ছ'টি মেয়ে। গল্পের চেয়ে এর কবিতা-গুলি দারুন চমৎকার। এতদিন তো আপনাকে অনেক কবিতাই শুনিয়েছি : কিন্তু এর কবিতার কাছে ওগুলি যে কিছু নয় সেকথা আপনাকে আমি হলফ করেই বলতে পারি। এর পরেও যদি আপনার ভাল না লাগে আপনি আমার গর্দান নিয়ে নেবেন যখন খুশী।

শুরু হল শাহরাজাদের গল্প :

জাঁহাপনা, আপনি নিশ্চয় বাদশাহ আল-মামুনের নাম শুনেছেন।

আমি যাঁর কথা বলছি তিনি সেই ধার্মিক মামুন। একদিন তিনি পাত্র-মিত্রদের নিয়ে রাজপ্রাসাদে সিংহাসনে বসেছিলেন। পাত্রমিত্রদের মধ্যে ছিলেন না কে? ছিলেন উজির, আমীর, ছিলেন নামী-নামী পণ্ডিতেরা, আর সভাকবি। এঁদের মধ্যে তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিলেন বসোরার মহম্মদ। খুব সুন্দর সুন্দর গল্প বলতে পারতেন তিনি। বাদশাহ তাঁকে কাছে ডেকে বললেন—মহম্মদ, সুন্দর একটা গল্প বলত। যা কোনদিন এখানে বল নি সেই রকম একটা গল্প বল।

মহম্মদ বললেন—সে আর এমন কী কথা। শোনা গল্প বলব, না, নিজের চোখে দেখেছি এমন কোন কাহিনী শুনবেন?

বাদশাহ বললেন—সে তুমি বুঝবে। মোদ্দা কথা হচ্ছে গল্পটা ভাল হওয়া চাই। সবাই যেন শুনে তোমার তারিফ করতে পারে।

মহম্মদ শুরু করল গল্প:

আমি একটি ধনী লোককে চিনতাম। তাঁর নাম আলী। তিনি থাকতেন অল-ইয়ামনে। নিজের দেশ ছেড়ে তিনি বাগদাদে এসে বাস করছিলেন। বাগদাদের শান্ত জীবনযাত্রা তাঁর খুব ভাল লাগত। জীবন-টাকে ভোগ করার কোন আয়োজনেরই অভাব সেখানে ছিল না। সেইটাও টেনে রেখেছিল তাঁকে। বাগদাদে তিনি বেশ মানিয়ে নিতে পারবেন এই ভেবে অল-ইয়ামনে তাঁর যে সব সম্পত্তি ছিল সেই সব সম্পত্তি নিয়ে এলেন বাগদাদে; মায় তাঁর হারেমটি পর্যন্ত। সেই হারেমে ছিল ছ'টি বাঁদী। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে ওই ছ'টি মেয়েই রূপে-রঙে-ঢঙে একেবারে স্বতন্ত্র প্রকৃতির—কারুর সঙ্গেই কারুর মিল ছিল না এতটুকু। ছ'জনেই যেন ছ'টি হুরি। যেমন গায়ের রঙ, তেমনি তাদের স্বাস্থ্য। তাদের মধ্যে কে যে বেশী সুন্দরী তা বাছাই করা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

প্রথম মেয়েটি ফর্সা, দ্বিতীয়টি বাদামী; তৃতীয় মেয়েটি স্বাস্থ্যবতী—একটু মোটাই বলা যায়; চতুর্থ জনের চেহারা একাহারা। পঞ্চম জনের গায়ের রঙ পীতাভ বা সোনালি। ষষ্ঠজনের গায়ের রঙ আবলুস কাঠের মত কালো। বিদ্যা-বুদ্ধি, সাহিত্য-কলা, সঙ্গীত-নৃত্য—কোন বিষয়েই কম যায় না কেউ।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চুপ করে গেল।

তিনশো বত্রিশতম রজনী:

পরের দিন রাত্রে আবার শুরু করল শাহরাজাদ:

আদর করে আলী সাহেব ছ'টি মেয়েকে ছ'টি নামে ডাকতেন। ফর্সা মেয়েটির নাম ছিল বদরুন্নেসা (চন্দ্রমুখী), বাদামী রঙের মেয়েটির নাম ছিল শোলা (বহ্নিশিখা), স্বাস্থ্যবতী মেয়েটির নাম হচ্ছে বদর-এ-কামিল (পূর্ণিমা) পাতলা মেয়েটির নাম বেহেস্তের হুরী, পীতাভটির নাম মেহেরুন্নিসা (সূর্যমুখী), আর কৃষ্ণাঙ্গিনীটির নাম কাজল।

কিছুদিনের মধ্যেই বাগদাদের সব কিছুই আলীর ভাল লাগতে শুরু করল। অবশ্য ভাল লাগার কথাই। তখন দুনিয়াজোড়া বাগদাদের নাম। আকাশই বলুন, বাতাস-ই বলুন, আর খানাপিনাই বলুন—বাগদাদের সব

কিছুই সুন্দর, চিত্তাকর্ষক। একদিন সকালে আলী সাহেবের মেজাজটা খুব ভাল ছিল। গল্প করার জন্যে তাঁর মেয়েদের ডেকে পাঠালেন। তাঁর সঙ্গে মেয়েরা পান ভোজন করবে, করবে নানান রঙ্গতামাসা নাচে-গানে তারা মাতিয়ে রাখবে সাহেবকে।

যথারীতি হাজির হল মেয়েরা। শুরু হল হাসি ঠাট্টা, রঙ তামাসা, গল্পগুজব। দুনিয়ায় হেন জিনিস নেই যা বাদ পড়ল। অনেকক্ষণ এইভাবে চলার পরে আলী সাহেবের মেজাজ আরও সরিফ হয়ে গেল। খুশীতে ভরে উঠল মেয়েদের মনও। রঙ-তামাসার ফোয়ারা উঠল চারপাশে। ঢল-ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি ছড়িয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। হাসতে-হাসতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ল।

এমন সময় আলী সাহেব এক পেয়ালা সরাব নিয়ে বদরুন্নেসার কাছে গিয়ে বললেন: সুন্দরী, তোমার গানে তো মধু ঝরে। তোমার সেই সুরেলা কন্ঠে মজাদার একটা গান শোনাও না আমাদের।

জাঁহাপনার মর্জি। —এই বলে বীণা হাতে তুলে নেয় মেয়েটি। ধীরে-ধীরে ঝঙ্কার ওঠে বীণার তারে; মিঠে সুরেলা ঝঙ্কার।—সুরের সেই আবেশে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ; নিষ্প্রাণ পাথরের বুকেও বুঝি বা জীবনের স্পন্দন জেগে ওঠে। ঝঙ্কারের সঙ্গে তাল দিয়ে গাছপালারাও বুঝিবা নেচে-নেচে ওঠে। বীণার সুরের সঙ্গে তাল মিশিয়ে গান ধরল বদরুন্নেসা:

আগুনের প্রলেপ দিয়ে আমার চোখে
প্রিয়তমের রূপটি আছে আঁকা।
আমার জাফরানী এই বুকের মাঝে
তার ছবি আছে গাঁথা।
আমার চোখের সুমুখ থেকে
যায় যদি সে চলে,
আমি তখন থাকব চেয়ে
আমার হৃদয় তলে।
আবার যদি সামনে থাকে মোর
(আমি) থাকব তখন আঁখির নেশায় ভোর।

গান শেষ হল; কিন্তু রেশ আর কাটে না তার। আলী সাহেব তো খুব খুশী। সরাবের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে আদর করে এগিয়ে দিলেন মেয়েটির দিকে। পেয়ালা নিঃশেষ করে মেয়েটি তাঁর হাতে সেটি ফিরিয়ে দিল কুর্নিশ করে। পেয়ালাটি দ্বিতীয়বার পূর্ণ করে বাদামী রঙের মেয়েটির কাছে গিয়ে তিনি বললেন—শোনো সুন্দরি, গানের গলা তো তোমার খাসা। উচ্চারণও বড় সুন্দর। তোমার গান শুনলে মানুষের সব দুঃখকষ্ট দূর হয়ে যায়। তোমার মনের মত করে শোনাও না আমাদের একখানা গান।

যথা আজ্ঞা, জাঁহাপনা।—এই বলে বীণা তুলে নিল মেয়েটি। করুণ সুরে বাজাল প্রথমে। সুরের আর্তিতে ভরে গেল চারপাশ। সেই সুর

হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করে ঘুমন্ত বেদনার ঢেউকে জাগিয়ে তুলল। তার উদ্বেল তরঙ্গগুলি কল্পনার তটপ্রান্তে আছাড় খেয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে গান করতে লাগল। সুরের মৃদু আলাপের সঙ্গে সঙ্গে তার দেহটিও কাঁপতে লাগল তালে-তালে :

আমার প্রিয়তমের মুখটি রাঙা
গোলাপ ফুলের মত।
তার কাছেতে শিখছে বসে
রূপবিলাসী যত।
যে সব হতভাগ্য নারী
কাজ করে যায় অবিরত
আল্লা তাদের আদর করে
জুড়িয়ে দিলেন মনের ক্ষত।
তাদের হাতে তুলে দিলেন
মানুষ ধরার ফাঁদ।
বিশ্বে তো এর নেইক জোড়া
তাইতো পরমাদ।

কী সুন্দর গান! হৃদয়টাকে একেবারে তরল করে দেয়। আলী সাহেবও খুশীতে ডগমগ। হাতের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সোহাগ করে মেয়েটির হাতে সেটি তুলে দিলেন। মেয়েটি কুর্নিশ করে পেয়ালাটা নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে ফেলল। আলী আবার পেয়ালা ভরে নিয়ে স্থুলাঙ্গিনীর কাছে গিয়ে বললেন—ও বদর-এ-কামিল, তোমার বপুটি কিঞ্চিৎ স্থূল। তাতে হয়েছে কী? সোজা সরল, মিষ্টি ব্যবহারে তোমার জুড়িদার নেই। তুমি যেমন সোজা, সেই রকম একখানা গান আমাদের শোনাও দেখি।

এই শুনে মেয়েটি বীণা তুলে নিল হাতে। ধীরে-ধীরে বাজাতে লাগল বীণা। এমন বাজনা যার সুরে পাষাণ হৃদয়ও গলে যায়। প্রথমে গুনগুন করে শুরু করে তারপরে আসল গানটি ধরল :

একটি হাসির তরে আমি বিশ্ব দিতে পারি,
যদি আমি ভাঙতে পারি তোমার জারিজারি।
তোমার মুখে একটি কথা শুনতে যদি পাই,
মাটির পরে হাঁটিবে রাজা অন্যাথা তার নাই।
রাজাদের সব টুটবে মুখের বাঁধ,
তোমার যদি হাঁটার জাগে সাধ।
খুশ করতে পারলে তোমায়
থাকব তোমার পায়ের তলায় ;
তোমায় যদি হারাতে হয় ভাসব আঁখি লোরে।
বিশ্বটাকে ছাড়তে পারি একটি চুমুর তরে।

এবারেও আলী সাহেব খুব খুশী হলেন। ঠোঁট দিয়ে সরাবের পেয়ালা ভিজিয়ে এগিয়ে দিলেন মেয়েটির কাছে। সরাবের পেয়ালা গ্রহণ করল মেয়েটি। পেয়ালাটা আবার পূর্ণ করে নিলেন তিনি। পাতলা মেয়েটির কাছে গিয়ে বললেন—ওগো বেহেস্তের হুরি, তোমার পরিচয় তো তোমার নামেই। বীণার তারে সুর তুলে আমাদের একটা গান শোনাও দেখি।

জাঁহাপনার যা আদেশ—এই বলে বীণাটি হাতে তুলে নিল সে। তারপরে গান ধরল—

আমার প্রেম সে তুচ্ছ করে
এর যে আমি বিচার চাই।
প্রেম করে যে ভুল করেছি, তার
জরিমানা লক্ষ হাজার
দেওয়ার মত জর্জটি কোথায় পাই।
সওয়াল শেষ হওয়ার পরে
উদাসীনতার তরে
ফরিয়াদী ডিক্রী পাবে
এমন জজ যে চাই।

গান তো নয়—একেবারে সুরের ঝর্ণা। সেই ঝর্ণার তালে-তালে পায়ের নূপুর বেজে চলেছে ঠুন-ঠুন করে। আলী সাহেব বেজায় খুশী—একেবারে বেহেড হয়ে গেলেন। আমেজটা একটু থিতিয়ে এলে হাতের পেয়ালাটায় একটু ঠোঁট দিয়ে মেয়েটির হাতে সেটি তুলে দিলেন। মেয়েটিও কুর্নিশ করে সেটি নিঃশেষ করে ফেলল' শূন্য পেয়ালাটি আবার ভরিয়ে নিয়ে সোনালি রঙের মেয়েটির সামনে এগিয়ে গেলেন আলী সাহেব।

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প থামিয়ে দিল শাহরাজাদ।

তিনশ তেত্রিশতম রজনী :

সরাবের পেয়ালাখানি হাতে নিয়ে মেয়েটির কাছে গিয়ে আলী সাহেব বললেন—মেহেরুন্নেসা, কী সুন্দর রঙ তোমার। গলানো সোনার রঙ-ও তোমার ওই রঙের কাছে কিছু নয়। তুমি একখানা প্রেমের গান শোনাও দেখি। যে প্রেমের কাছে মানুষ নিজের জীবনকেও তুচ্ছ বলে মনে করে। যার কাছে জগত-সংসার-ও অসার। এই রকম একটা গান গাও।

আলী সাহেবের আদেশে কুর্নিশ করে বীণাটা তুলে নেয় মেহেরুন্নেসা। বেহাগের সুর ধরে, সঙ্গে তার কন্ঠ মেলায়। ছন্দের তালে-তালে নেচে ওঠে তার কটি দেশ, হিল্লোল জেগে ওঠে তার শিরায় শিরায়, অঙ্গের লাবনিতে। ধীরে-ধীরে জেগে ওঠে গানের কলি :

তার চোখ থেকে যে ছিটকে এল, ভ্রমর কালো
হুল বেঁধানো বিষম বাঁকা শর।
নিবিয়ে দিল আমার চোখের রঙিন যত আলো
তখন বলি হৃদয়টারে আহত জর্জর

'হায় অভাগা হৃদয় আমার শোনো,
বিষের ক্ষতে ভুগছ তুমি জেনো।
কোথায় তুমি দাওয়াই পাবে বল ?
বৃথাই তোমার ঝরবে আঁখিজল।'
তবু যদি হৃদয় কিছু বলে
তারে আমি শুনতে নাহি পাই ;
কেমন করে শুনব বল
হৃদয় সেথায় নাই।
সে যে আজ হারিয়ে গেছে
পথের ধূলির মাঝে—
কামনার ফাঁস পরেছে
লাগবে কী আর কাজে।

হৃদয়ের নিভৃত কন্দরের রুদ্ধ দরজায় আঘাত করল মেয়েটি, জাগিয়ে তুলল সুপ্ত বেদনার আর্তিকে। কেমন যেন উদাস হয়ে গেল আলী সাহেবের মনটিও। সরাবের পেয়ালায় ঠোঁট দিয়ে তিনি সেটি এগিয়ে দিলেন মেয়েটির দিকে কৃতজ্ঞচিত্তে মেয়েটি তা গ্রহণ করল। সুরাপাত্র আবার পূর্ণ করে এগিয়ে গেলেন তিনি কৃষ্ণাঙ্গীর কাছে, বললেন—চোখের নীল অঞ্জন তুমি। চেহারাটা কৃষ্ণ ভ্রমর হলে কি হবে? মনটা তোমার বরফের মত সাদা। তোমাকে দেখলে আল্লাহর পরম করুণার কথা মনে পড়ে যায়। এ-দুনিয়ার ব্যথা-বেদনার যেন প্রতীক তুমি! তোমার মুখের দিকে তাকালে জীবনের সব দুঃখ, ব্যথা আর বেদনার কথা আমি ভুলে যাই। মনটা যে তোমার গোলাপের মত সুগন্ধী। তোমার মনের মত একটা গান শোনাও না আমাদের।

মাথা নিচু করে প্রভুর নির্দেশে মেয়েটি বীণা তুলে নিল হাতে।

বীণার তারে সুরের ফুলঝুরি ছড়িয়ে পড়ল। দুঃখের সুরে কতখানি মাদকতা রয়েছে আলী সাহেব তা যেন বুঝতে পারলেন। বিভিন্ন সুরের আমেজে মুগ্ধ হয়ে উঠল সবাই। তারপরে মেয়েটি তার সেই প্রিয় গানখানি গাইল :

আমাদের প্রেমের যে স্বর্ণ শিখা জ্বলছে তার জন্য
শোক কর ; কারণ আমার প্রেমিক অন্য
নারীদের প্রীতির চোখে দেখে। কিন্তু গোলাপকে
ভালবাসতে তোমরা বাধা দিয়ো না আমাকে।
যে হৃদয় গোলাপের স্বপ্নে মাতোয়ারা, হায়,
তাকে নিয়ে কী কাজ হবে দুনিয়ায়।
আমার সামনে কুড়িটি পেয়ালা সাজানো
সেগুলি সব সরাব দিয়ে ভরানো
আর রয়েছে কেবল চুমু খাওয়ার জন্য
একটি পুরানো গিটার, আমার প্রিয়তম সে-ই ;
কিন্তু আমার কাছে কোন সুগন্ধী নির্যাস নেই।

আমার গোলাপগুলি সোনালি আগুন হয়ে উঠেছে
কিন্তু আরো অনেক অনেক ফুল ফুটেছে
তারা হয়নিক হতমান,
এবং স্বর্গে চিরবসন্ত বিরাজমান।
ভগবান, যাকে সবাই ভালবাসে, তাকে
ভালবাসা কি অপরাধ বলে গণ্য হয়ে থাকে।

এমন সুন্দর গান অনেকদিন শোনেননি আলী সাহেব। মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে গেল তাঁর। সরাবের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে এগিয়ে দেন মেয়েটির দিকে। মেয়েটি এক চুমুকে পেয়ালাটি উজাড় করে দিল।

এবার ছ'জনেই উঠে এসে আলী সাহেবকে কুর্নিশ করে মাটিতে চুম্বন করল। মেয়েরা জানতে চাইল কার গান তাঁর সব চেয়ে ভাল লেগেছে। গানের সুরই বা কার ভাল, বীণার ঝংকারই বা কার সব চাইতে ভাল?

আলী সাহেব তো মহা ফাঁপরে পড়লেন। এ-সমস্যার সমাধান তিনি কেমন করে করবেন? রাখবেন কাকে, কাকে ফেলবেন? প্রত্যেকেরই গান, সুর, ঝংকার এত সুন্দর হয়েছে, প্রত্যেকেরই দেহ-হিল্লোল এত অনবদ্য হয়েছে যে তাদের আলাদা করে বিচার করাটা কেবল কণ্টকরই নয়, একেবারে অসম্ভব।

তবু যখন সমস্যা একটা উঠেছে তার সমাধানের একটা চেষ্টা করা উচিৎ। সেই সৎচেষ্টাতেই তিনি চোখ দুটি বুজিয়ে প্রতিটি গান আলাদা আলাদা করে ভাবার চেষ্টা করলেন। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকার পরে অপ্রত্যয়ের ঘাড় নাড়লেন তিনি। এ অসম্ভব, এ অসম্ভব। কারোও কোন খুঁৎ নেই; কেউ কিছু কম যায় না।

আলী সাহেব বললেন—আল্লাহকে ধন্যবাদ, তোমাদের মত গুণবতী মেয়েদের আমি পেয়েছি। এটাই আমার পরম সৌভাগ্য। তোমরা আমার গর্ব। আমি সাচ্চা কথাই বলছি, তোমাদের আমি সমানভাবে ভালবাসি। আমি তোমাদের কাউকেই আলাদা করে দেখতে পারব না। তার চেয়ে তোমরা আমার কাছে এস। সবাই মিলে আমাকে আদর কর।

যে কথা সেই কাজ। ছ'টি মেয়েই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল আলী সাহেবের বুকে। নানানভাবে সোহাগে-আদরে ভরিয়ে তুলল তাঁকে।

বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পর আলী সবাইকে গোল করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। নিজে মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন—সোহাগীরা তোমাদের মধ্যে থেকে একজনকে শ্রেষ্ঠ বলে বেছে নেওয়ার সাধ্য আমার নেই। আর সে-চেষ্টা করাও আমার পক্ষে উচিৎ হবে না। তাতে সুবিচার হবে না, তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে সেটা বিচার করার ভার আমি তোমাদের ওপরেই ছেড়ে দিলাম। তোমরা সকলে নিশ্চয় কোরান পড়েছ। ভালভাবেই পড়েছ; সেই সঙ্গে অন্য পড়াশুনাও তোমাদের কম নেই। পুরানো ইতিহাস বা পিতৃপুরুষদের নানান কাহিনীও তোমাদের জানা রয়েছে ভাল করেই। আমি দুজন-দুজন করে ঠিক করে দেব। একজন নিজের গুণপনা আর রূপের কথা বলবে। যত সুন্দর করে পার বলবে। তোমার বিরোধী যে থাকবে সে সঙ্গে সঙ্গে তোমার বক্তব্য খন্ডন করবে। অর্থাৎ, তুমি যাকে উত্তম বলবে সে

সেটাকে নিকৃষ্ট বলে প্রতিপন্ন করবে। এইভাবে তিনটি জোড় হবে তোমাদের। বিতর্ক চলবে দুজনের মধ্যে, প্রথমে ফরসা আর কালো বাঁদী, তারপরে পাতলা আর মোটা ; শেষকালে সোনালী আর বাদামী। হ্যাঁ ; এই সঙ্গে একটা কথা বলে দিই। তর্ক চলার সময় আজেবাজে কথা বলবে না ; ব্যবহার করবে না অশ্লীল কোন শব্দ। ভাল-ভাল কথা বলবে। প্রয়োজন মনে করলে জ্ঞানী লোকের বা নামকরা কবির উদ্ধৃতি দিতে পার।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামাল।

তিনশো চৌত্রিশতম রজনী :

পরের দিন দুপুর রাতে যথারীতি গল্প শুরু করল শাহরাজাদ।

বাঁদীরা সকলেই এক সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। বিতর্কের শর্ত অনুযায়ী প্রথম জুড়িটি বলতে উঠল—ফরসা আর কালো বাঁদী। বদরুন্নেসা সামনে গিয়ে দাঁড়াল কাজলের। চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে বদরুন্নেসাই শুরু করল প্রথম :

আরে কালো মেয়েটা, শাদা বা ফরসা রঙ নিয়ে জ্ঞানীরা কী বলছেন শোন তাহলে, বলেছেন—আলো শাদা, চাঁদের আলো শাদা, আর শাদা হচ্ছে বীর্যবান পুরুষ। ভাগ্য ভাল হলে ফরসা মানুষের কপাল চকচক করে। তাই বোধ হয় সেই বিখ্যাত কবি আমার জন্যেই বলেছেন—

সৃষ্টি করার সময় মেয়েটিকে
ভগবান মুক্তার ফেনা দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন।
তারপরে শিশিরে মেদিগাছ ভিজিয়ে
তৈরি করেছিলেন তার অপরূপ তনু।
সেই সঙ্গে শাদা গোলাপও নিয়েছিলেন কিছু ;
কিন্তু শেষ কালে আরও কিছু তিনি যোগ করেছিলেন—
সেগুলি হল তাঁর উজ্জ্বল বাগান, আর
তার সঙ্গে দোদুল্যমান পান্থপাদপ।

কবিতাটি শেষ করে বদরুন্নেসা বলল—এই শেষ নয়। আরও, আরও আছে শোন। দিনের আলো শাদা, কমলা ফুল শাদা, আর শাদা ভোরের শুকতারা।

এবারে শোন এই শাদা নিয়ে কোরাণে কী বলেছে। একবার মুসার হাতে কুষ্ঠরোগ হল। আল্লাহ মুশাকে বললেন—তোমার হাতটা পকেটে ঢুকিয়ে দাও ; সঙ্গে সঙ্গে হাতটা শাদা হয়ে যাবে। পবিত্র হবে হাত। যা ক্ষয়ে গিয়েছিল তা উঠবে ভরে।

আমাদের ধর্মগ্রন্থে বলেছে—যাদের মুখ ফরসা, যাদের মুখ পোড় খায়নি, আল্লাহ কেবল তাদেরই করুণা করেন।

সব রঙের রানী হলো আমার গায়ের রঙ। সেই রঙেই আমার রূপের জলুস, আর সেই রূপেই আমার রঙ খোলতাই।

দামি-দামি পোশাক আর দামি-দামি অলঙ্কার কাদের গায়ে মানায়

জানিস ? আমার মত গায়ের রঙ যাদের তাদের। এসব কথা কে না জানে ?

ওই যে বেহেস্তের বরফ যা এই দুনিয়ার বুকে নেমে এসেছে তার রঙও শাদা। ধার্মিকরা যে ফেজ পরেন তার রঙও শাদা। এ-রঙ রঙ-তামাসা করার বস্তু নয়।

আমার রঙ নিয়ে আর কত বলব ? এ-দুনিয়ায় যত ভাল-ভাল কথা রয়েছে আমাকে বাদ দিলে তাদের একটা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। আমার ফর্সা রঙ সূর্যের আলোর মত সত্য। তাই আমাকে নিয়ে আর কিছু বলছি নে। এবার তোর ওই পোড়া রঙ নিয়ে কিছু বলব। ওরে কালো, শ্মশানের কাক। দোয়াতের কালি, ঘরে যে ঝুল পড়ে তার রঙও তো কালো ! কালো কাকের রঙ। কিন্তু কাক কি ভাল গান গাইতে পারে ?

একজন কবি এই শাদা-কালো নিয়ে কী সুন্দর কবিতাই না একটা লিখেছেন। মন দিয়ে শোন :

বন্দী রাজার অর্থ দিয়ে একটি তারা মুক্তা কিনে।
কিন্তু এক বস্তা কয়লা বেচে একটি শিলিঙ দামে ;
শাদা মুখ আর শাদা পাখায় স্বর্গটাকে নাও চিনে,
নইলে স্বর্গ থাকত নাক—শুধু নামে।
তোমরা যদি রাজি থাক—বলতে পারি সত্যি কথাটাই
নরক আমরা যাকে বলি সেত শুধু কালোতে বোঝাই।

ধার্মিক নোওয়ার একটা গল্প বলি শোন। তার দুই ছেলে—সাম ও হাম। ছেলে দুটিকে পাশে বসিয়ে একদিন তিনি ঘুমোচ্ছেন। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় নোওয়ার কাপড় গেল উঠে। পুরুষাঙ্গ বেরিয়ে পড়েছে দেখে খুব হাসতে লাগল হাম। মানুষের ইতিহাসে নোওয়া হলেন দ্বিতীয় পুরুষ। তাঁর সেই বিচিত্র জীবনের গৌরব কাহিনী কে না জানে ? সাম কিন্তু হাসেনি। বাবার ধর্ম, বাবার গৌরব যে কত বড় তার কিছু কিছু সে জানত। কোন কথা না বলে চুপচাপ উঠে সে তাঁর কাপড়টা ঠিক করে গুছিয়ে দিল। ইতিমধ্যে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। জেগে উঠে হামকে হাসতে দেখে তিনি তাকে অভিশাপ দিলেন। সামের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হামের মুখ কালো হয়ে গেল ; শাদা হয়ে গেল সামের মুখের রঙ। সামের বংশধররা হলেন ঋষি, ধর্মপ্রচারক, পুরোহিত, আর রাজারা। আর অভিশপ্ত হাম কী করল জান ? ওই কালো মুখ পাছে কেউ দেখতে পায় এই ভয়ে সে সংসার ছেড়ে পালিয়ে গেল। তার বংশে জন্ম নিল সুদানের কালো কুচ্ছিৎ নিগ্রোরা। এদের বংশে আজ পর্যন্ত কোন সাধু-সন্ত, পয়গম্বর, অথবা দেবদূত জন্মাননি। এ-কথা কেবল জ্ঞানীগুণীরাই নয়, সাধারণ মানুষও জানে।

আলী সাহেব বদরুন্নেসাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—তুমি এবার চুপ কর। এবারে কাজল বলবে।

কাজল এতক্ষণ খুব মনোযোগ দিয়ে সব শুনছিল। এবারে সে বদরুন্নেসার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলতে শুরু করল—তুই কিছুই

জানিস নে, বদর। কিছু বুঝিসই না তা বলবি কী করে? কোরাণে কী বলেছে শোন: পরমেশ্বর আল্লাহ শপথ নিতেন গভীর রাতে। দুপুর বেলাতেও যে নিতেন না সে কথা ঠিক নয়। তবে মাঝ রাতটাকেই তিনি পছন্দ করতেন বেশী। তা বাপু হে, মাঝরাতটা কি শাদা, না কালো? ভালো করে মাথাটা খাটিয়ে ভেবে দেখ।

এবার বলি কলো চুলের কথা। কালো চুল কীসের প্রতীক বল দেখি? বলতে পারলি নে? শোন তবে। কালো চুল হল যৌবনের প্রতীক। বার্ধক্যের প্রতীক শাদা চুল। বার্ধক্যেই ভোগ-বাসনা-কামনার শেষ। এক কথায় পূর্ণচ্ছেদও বলতে পারিস।

ভোর হয়ে আসছে দেখে চুপ করে গেল শাহরাজাদ।

তিনশো পঁয়ত্রিশতম রজনী:

পরের দিন রাত্রিতে গল্প বলতে আবার শুরু করল শাহরাজাদ।

কাজল বলল—কালো যদি রঙের রাজাই না হবে, তো আল্লাহ কেন চোখের মণি আর কলিজার রঙ কালো করেছেন বল? কোন এক কবি কী সুন্দর কথাই না বলেছেন:

> কৃষ্ণবর্ণ দেহের মাঝে আগুন ভরা আছে।
> কৃষ্ণ কালো শিরায়-শিরায় ভোগ-বাসনা নাচে।
> কালো দেহে উপছে ওঠে যৌবন চঞ্চল।
> হে বিধাতা, রক্ষা কর, ফেলছি আঁখি জল
> ডিমের খোলা নিয়ে আমার বাঁচার ইচ্ছা নাই।
> খোলাটাকে ভালবাসা সেইত বিপর্যয়। তাই
> সেই খোলস নিয়ে বাঁচার কথা ভাবতে গেলে হায়
> আমার বাঁচাই হবে দায়।
> সত্যি আমি দেখতে নারি মৃতের শাদা ঢাকনা;
> পক্ককেশীর ভালবাসা, সে তো কবরখানার কান্না।

এই প্রসঙ্গে আরও একজন কবি কী বলেছেন শোন:

> অমন করে চাইছ কেন? ভাবছ বুঝি কী জঞ্জাল!
> কালো মেয়ের অন্বেষণে বুদ্ধি আমার উধাও হল নারে!
> ডাক্তারেরা, বলছি শোন, বলছে চিরকাল
> কালো চিন্তা বুদ্ধিমানে, পাগল করে ছাড়ে।

আরও রয়েছে। শুনবে? শোন তাহলে:

> দুপুর রোদে কোনদিনই কাউকে আমি ভালবাসিনি
> শ্বেতীর মত শাদা মেয়েদের আমি ঘৃণা করি
> ওরা সব বস্তাপচা ময়দার মত।
> ওদের ভালবেসে কোন ফয়দা নেই।

এক ঘণ্টার বেশী ওদের সঙ্গে প্রেম করা যায় না।
কালো মেয়েদেরই আমি ভালবাসি বেশী
সেখানে কোন রাত্রির বালাই নেই
চাঁদ থাকবে কেমন করে ?

খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুরা এক জায়গায় কখন জড় হয় ? রাত্রিতে। প্রেমিক-প্রেমিকারা কাকে খুঁজে বেড়ায় ? ছায়াকে কেন বলতো ? কারণ, ছায়ার রঙ কালো। রাত্রির অন্ধকার ডানা মেলে ওদের ঢাকা দিয়ে রাখে যাতে দিনের আলো তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে না পারে। দিনের আলোতে ওসব হলে তো তুই-ই ঢাক নিয়ে বেরিয়ে পড়বি। ফুলশয্যা শেষ হয়ে গেলে দম্পতীরা কী বলে আক্ষেপ করে বল দেখি। বলে, হায়রে, এত তাড়াতাড়ি রাত পুইয়ে গেল ? কেন বলে ? বলে এই জন্যে যে রাতকে তারা পছন্দ করে, ভালবাসে। কালো যে কত ভাল তার প্রমাণ কি আরও চাও ? একটা বয়েৎ শোন ঃ

শাদায়-কালোয় মেশা ছেলে যত
চর্বি খেয়ে বেঁচে থাকে যারা
তাদের আমি ভালবাসি নাত।
একটা কালো ছেলে যার অঙ্গ দোহারা
সত্যি কথা বলছি—সেত
ওদের বিশজনদের মত।
অর্থাৎ ? মনের কথা বলছি আমি বলে
তুমি অবাক হলে ?
কালো ঘোড়া জোরসে ছুটে চড়তে ভালবাসি।
শাদা খোঁড়া হাতি যত বুড়োর জন্যে রাখি।

আরও একটা শুনবে ? বহুৎ আচ্ছা, শোন ঃ

কালো রাতই চুমু খাওয়ার শয্যা।
শাদা সকাল সেত দারুণ লজ্জা।
আমার যদি চেয়ে নেওয়ার থাকত অধিকার,
আমি কালো রাতই চেয়ে নিতাম সন্দেহ নেই তার।
বিধির কাছে আর্জি দিতাম—এ জীবনে যত আছে আলো
সবই যেন ভরিয়ে দে'যায় নিতল ঘন কালো।

ওরে, শাদা, কালোর প্রশংসা আর বেশী করব ? রঙের জগতে কালোই একমাত্র সাচ্চা ; বাকি স-ব কাঁচা। ব্যস—এইখানেই শেষ। যা বলেছি এই যথেষ্ট। কথায় বলে না, অল্প কথায় যুক্তি বেশী। কালোর প্রশংসা শেষ করে এবারে শুরু করছি তোর কথা। পুরুষকে আমি যতখানি টানতে পারি তুই ততটা পারিস নে। তোর অঙ্গটা একেবারে খেলো—এলোমেলো-ও

বলতে পারিস।, তোর শাদা রঙটাত কুষ্ঠের মত একটা দুষ্ট রোগ। কী বিশ্রী গন্ধ বলত—একথা সবাই জানে। একটু আগে নিজেকে তুই বরফের সঙ্গে তুলনা করেছিলি না? তাহলে শোন। দোজখের নাম শুনেছিস তো? সেখানে পাপীদের ঠাণ্ডায় জমিয়ে ফেলার জন্যে বরফ জমিয়ে রাখা হয়। ঠাণ্ডা বলে ঠাণ্ডা! আগুনের চেয়েও সাংঘাতিক। আর তার রঙটা হচ্ছে বরফের মত শাদা। প্রেমিক-প্রেমিকা তাই বরফটাকে বরবাদ করে দিয়েছে। তারা চায় উম্‌। তুই আমাকে লেখার কালির সঙ্গে তুলনা করেছিলি তাই না? আল্লাহর কিতাব কীসে লেখা হয়েছে রে? এই কালো কালিতেই। মৃগানাভীর গুণ কী জানিস তো? তার রঙটা কী? কালো। তাইত কবি বলেন:

সবার সেরা মৃগনাভী রঙটা তার কালো
পচা নাসপাতি হল শাদা
আমার চোখে কালো মেয়ে সবার চেয়ে ভালো
অন্য সবাই জীবন-পথে বাধা।
কালো চোখের মণি দিয়ে দেখতে তুমি পাও।
অন্ধ জনের শাদা চোখে সমস্ত উধাও।

ব্যস...ব্যস! দারুণ বলেছ তোমরা। তোমাদের তারিফ না করে পারছিনে—বললেন আলী সাহেব—তোমাদের বিতর্ক খুব ভাল হয়েছে। এবারে দ্বিতীয় দল এগিয়ে এস।

এই কথা শুনে কালো আর ফরসা মেয়ে নিজেদের জায়গায় ফিরে গেল। এগিয়ে এল মোটা আর পাতলা মেয়ে।

আলী সাহেবের নির্দেশে প্রথমে শুরু করল মোটা মেয়ে বদর-এ-কামিল। শুরু করার আগেই সে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। জামা খুলল, বসন খুলল। একটা একটা করে সব খুলে ফেলে একেবারে উলঙ্গ হয়ে গেল। ঘুরে ঘুরে দেখাল তার প্রতিটি অঙ্গ। দেখাল কবজি, পায়ের গোড়ালি। দেখাল উরু আর পায়ের গোছা; উদ্ধত কুচযুগের নিচে সুন্দর রেখায় তার উদরটি অঙ্কিত রয়েছে সেটি দেখাল। দেখাল পরিপুষ্ট পরিসরমর্দন কুচযুগল; গুরুভার নিতম্ব দেখাল। অবশ্য সেমিজে ঢাকা ছিল সব; কিন্তু সে নামকে ওয়াস্তে। ফিনফিনে পাতলা সেমিজ ভেদ করে তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সেই ঠুনকো আবরণ তার উদ্ধত যৌবনকে কিছুতেই ধরে রাখতে পারছিল না। বিলোল কটাক্ষে নগ্ন দেহে মৃদুকম্পন তুলে সে আলী সাহেবের কামনার আগুনে ধুনা ছিটিয়ে দিল যেন; তারপরে পাতলা মেয়েটির সামনে গিয়ে বলল—

শেষ হয়ে এল রাত। শাহরাজাদ থামাল তার গল্প।

তিনশো ছত্রিশতম রজনী:

পরদিন রাত্রিতে আবার শুরু করল শাহরাজাদ:

বদর-এ-কামিল বেহেস্তের হুরীর সামনে কোমরে হাত দিয়ে চোখ নামিয়ে বলল—আল্লাহর মেহেরবানীতে গুহা-পাহাড় পর্বত এ-দুনিয়ার

সর্বত্র নরম গালিচা পাতা। নরম তুলতুলে জিনিস বড়ই পছন্দ করেন তিনি। আমার গায়ে এই যে চর্বি দেখছ এই নরম তুলতুলে জিনিসটিও সে-ই আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর দয়ায় আমার শরীরে তাই পদ্ম-গন্ধ, মধুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। আমার গায়ে প্রচুর মাংসও দিয়েছেন তিনিই, দিয়েছেন প্রচুর শক্তি। এক ঘুষিতে শত্রুকে আমি মাটিতে পাট করে ফেলে একেবারে লোপাট করে দিতে পারি। সে তাগদ আমার রয়েছে।

ওরে রোগা-প্যাটকা মেয়ে, তালপাতার সেপাই—বিজ্ঞ মানুষেরা এ বিষয়ে কী বলেন তা আমার কাছ থেকে শোন: আনন্দ বলতে জীবনে তিনটি জিনিসে রয়েছে। সেই তিনটি জিনিস হল—মাংস খাও, মাংসের ওপরে চড়, আর মাংস নিয়ে খেলা কর।

কথাটা ঠিক। স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের দেখলে কার না ভাল লাগে! চড়াই-উৎরাই দেখে কেউ কি মুখ ফেরায়? আমাদের আল্লাহ নরম চর্বি কত ভালবাসেন জানিস? সেই জন্যেই তো তিনি হৃষ্টপুষ্ট মেদবহুল মেষ-শাবক আর বাছুরকে কোরবানি দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

জামাকাপড় খুলে প্রকৃতির পোশাকে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার দিকে একবার নয়ন মেলে তাকা। এ যেন প্রকৃতির সাজানো একটা বাগান। বুকে ধরেছে ডালিম, গালে ধরেছে লাল পিচফল, আর আমার কোমরের নিচে ধরেছে তরমুজ।

ইজরাইল ছেড়ে মিশরে উড়ে গিয়েছে তিতির পাখি। সেই থেকে ইজরাইলের ছেলেমেয়েরা আর তিতিরের মাংস খেতে পায় না। কী দুঃখ তাদের? তা খুকুমনি, এই তিতিরের মাংস কতটা হয় তা জান? আর খেতে কত সুস্বাদু সে সম্বন্ধেও কি জ্ঞান রয়েছে তোমার? অত মাংস ওর গায়ে রয়েছে বলেই না ওর এত কদর?

মাংসের দোকানে গিয়ে মাংস বাদ দিয়ে হাড় কিনতে কাউকে দেখেছ কোনদিন? না, কোনদিন সেই তাজ্জব ব্যাপার তুমি শুনেছ? মাংসের দোকানদার তার ভাল-ভাল খদ্দেরদের জন্যে লুকিয়ে রাখে রান আর গর্দানের মাংস। সে কি এমনি এমনি?

আমার মত কোন স্বাস্থ্যবতী মেয়েকে দেখেই কবি বলেছেন:

দেখ দেখ ধনি তার হাঁটার লাবনী।
গুরু নিতম্ভভারে তার কাঁপিছে মেদিনী।
পরনে বিদরে মোর চকিত-নয়নী।
দেখ ওই বিশ্রামিছে চতুরা ভামিনী।
মূর্তিমতী কামনার রানী।
দেখ দেখ নাচত ও বররঙ্গিনী
বঙ্কিম নয়নে তার ক্ষণে-ক্ষণে ছুটত দামিনী,
জঙ্ঘা কাঁপিছে তার
কাঁপে হৃদি বসুধার
হৃদয় ভরল আজ জীবন সফল বলে মানি।

আর তোর চেহারাটা দেখ একবার। একেবারে বসানো দাঁড়কাক। কাকের মত সরু সরু পা, লোহার শিকের মত উরু তোর। তোর বুক দেখে কার সুখ হয় বলতে পারিস? কী শক্ত তোর দেহের হাড়! ভুল করে কোন পুরুষ তোকে জড়িয়ে ধরলে, খোদার কসম সে জখম হতে বাধ্য। তোর মত মেয়েকে দেখেই কবি বলেছেন:

আল্লা করুন, কভু যেন রোগার ঘাড়ে চাপতে না হয়,
রোগা নারী বেশ আনাড়ি তাইত তারে বিষম ভয়।
তাদের বুকে কোথাও যদি এক চিলতে আরাম পাই
ভোর বেলাতে দেখব উঠে শিরায় আমার রক্ত নাই।

আলী হাত তুলে বলেন—ব্যস, ব্যস। আর না। বেহেস্তের হুরী এবার তোমার পালা। এবার তুমি জবাব দাও।

বেহেস্তের হুরী হচ্ছে ছ'টি মেয়ের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট। মোটা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে সে বলতে শুরু করল:

আমাকে এই দেহ কে দিয়েছেন জানিস? দিয়েছেন পরম করুণাময় আল্লাহ। তাঁকে আমি শতকোটি সেলাম জানাই। লম্বা ইয়েলো গাছ যখন বাতাসে দোলা খায় সেই অপরূপ দৃশ্য তুই দেখেছিস? তার ডালগুলি কী সুন্দর নাচে বল দেখি! প্রচণ্ড ঝড়ে বাঁশ যখন মাথা নাচায় তখন কী ভালই না লাগে! পদ্ম ডাঁটার ওপরে যে ফুল ফোটে তার চেয়ে সুন্দর জিনিস দুনিয়ায় আর কিছু রয়েছে? ইয়েলো গাছের ডাল, মাতাল বাঁশ, আর পদ্মফুলের ডাঁটা এরা সবাই তো হালকা, পাতলা, আর সরু। নেহাৎ গরু ছাড়া এদের কেউ খারাপ বলতে সাহস করবে? কক্ষনো না।

আমার শরীর হালকা। তাই তাড়াতাড়ি আমি যেমন বলতে পারি তেমনি তাড়াতাড়ি চলতে পারি। হালকা শরীর নিয়ে চলাফেরা করা কত আরামের বলত? আমি হাঁটি সোজা মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে। কচ্ছপের মত থপ-থপ করে মাড়িয়ে-মাড়িয়ে হাঁটার অভ্যাস আমার নেই। মোটা লোকদের দেখলেই তাই আমার গা-টা ঘিনঘিন করে।

তাছাড়া, প্রেম নিবেদন করার সময় কোন পুরুষ কি তার প্রেমিকাকে বলে—প্রিয়তমে, তোমার হাতির মত মোটা দেহটা কী সুন্দর! দেখে আর ভালবেসে আমার জীবন সার্থক হল! অথবা, তোমার দেহে পর্বতপ্রমাণ এই মেদের স্তূপ দেখে আমি একেবারে বিমোহিত হয়ে গিয়েছি। আমি তোমাকে কত ভালবাসি! এরকম কথা কোন পুরুষকে বলতে শুনেছিস কখনও?

বরং তারা বলে—তোমার কোমরটি কত সরু, সিংহীর কটিদেশের মত এক বিঘৎ। মুঠোর মধ্যে ধরা যায় তোমাকে। আর কী নরম তুলতুলে তোমার দেহ—মোওয়া ছানার মত। কী সুন্দর হালকা পায়ে ঘুরে বেড়াও তুমি মনে হচ্ছে যেন পাখির ডানার ওপরে ভর দিয়ে তুমি উড়ে বেড়াচ্ছ। এক টুকরো ধুলো পর্যন্ত পড়ে না তোমার গায়। কত অল্প খাওয়ায় তোমার পেট ভরে। তোমার গালে চুমু খেতে পেলে বেহস্তেও ঘুমোতে

আমি রাজি নয়। হে প্রিয়তমে, যখন তুমি আমাকে তোমার ওই দুটি হালকা বাহুলতা দিয়ে জড়িয়ে ধর তখন কী একটি অপূর্ব আবেশে আমার মন ভরে যায়। তুমি চড়াই পাখির চেয়েও চঞ্চল, হরিণীর চেয়েও তুমি প্রাণবন্ত। বাঁশের মত যেমন করে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা তোমাকে বাঁকানো যায়, ভাঙার ভয় থাকে না এতটুকু। আর তোমার হাসি ? সেত তোমার মতই হালকা। আর তোমার শরীরটা হালকা বলেই তো ইচ্ছামত তোমাকে আমার বুকের ওপরে টেনে নিতে পারি। আমার উলঙ্গ হাঁটুর ওপরে, হে আমার প্রিয়তমে, তুমি পশমী চাদর।

ওরে ও ধ্যাবড়া মেয়ে, তোর ওই থ্যাবড়া দেহ কি কোনদিন পুরুষদের মনে আগুন জ্বালাতে পেরেছে ? পারেনি, কোনদিন পারেনি। পেরেছে আমাদের মত পাতলা মেয়েরাই। আমাদের মত পাতলা মেয়েরাই পুরুষদের পাগল-ছাগল বানিয়ে দেয়, তাদের নামিয়ে আনে আমাদের পায়ের কাছে। আঙুরলতা যে কাণ্ড জড়িয়ে ওপরে ওঠে পুরুষরাও তেমনি আমাকে জড়িয়ে ফুটতে চায়, আমার সর্বাঙগ চুম্বন করতে-করতে তার প্রেম কুসুমকে ফোটাতে থাকে। সজল-নয়না ময়না পাখি আমি। মালিক কি আমাকে বেহস্তের হুরী বলে ফালতুই আদর করেন ?

ভোরের পাখি ডেকে উঠল দেখে থেমে গেল শাহরাজাদ।

তিনশো সাঁইত্রিশতম রজনী :

পরের দিন রাত্রিতে আবার গল্পের জের টানলো শাহরাজাদ :

বেহস্তের হুরী বলল—আমার কথা আর তোকে কিছু বলব না। এবার তোর ওই মোটা দেহ নিয়ে গোটা কত কথা বলি। মন দিয়ে শোন। ওরে ও থলমলে চর্বিওয়ালি, তোর ওই চাতুরালি ছেড়ে সত্যি কথাটা বল দেখি। তুই যখন হাঁটিস তখন নিজের চেহারাটা কি তুই দেখতে পাস ? পাস না। কিন্তু আমরা পাই। তখন তোকে দেখে শোকে আমরা একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়ি। মরি, মরি কী শোভা ! হাঁসের মত বিশ্রী ঢঙে পাছা দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটিস। দেমাকে একেবারে ফেটে পড়িস। আমরা তো হেসে বাঁচি নে আর। খোরাকটা তোর হাতির মত। যতই মাতামাতি করিস সঙ্গমের সময় কোন পুরুষেকে তুই তৃপ্তি দিতে পারিস নে। তোর ওই পাহাড়ের মত উরু আর ভুঁড়ি। ওই তিন পাহাড়ের ফাঁকে গুহার খোঁজ করতে-করতে কতগুলি পুরুষাঙ্গ যে দিশেহারা হয়ে পড়ে তা কে বলবে ! কোন রকমে খুঁজে পেলেই কি কোন সুরাহা হবে ? তোর ওই ভুঁড়ির ঠেলায় তুড়ি দিয়েই সে ছিটকে আসবে বেরিয়ে। তোর কাছে পুরুষ মানুষ আসবে কোন সুখে ?

কোন গুণেই বাজারে বিকোবি না তুই। কোন মাংসওয়ালা তোর ওই ওজন দেখে হয়ত তোকে কিনতে পারে ; কিন্তু কোন ভদ্দরলোক তোর ধারে ঘেঁষবে না। তোর আত্মাও তোর চেহারার মত থ্যাবড়া। তোর রঙ-তামাশাও তোর ওই শরীরের মতই খাসা। ও বাপু কারুর মাথায় ঢোকার কথা নয়। তোর ওই ফুলো-ফুলো গালে কোন পুরুষই ঠোঁট ছোঁয়াবে না। তোর হাসির চোটে কানের পর্দা যাবে ছিঁড়ে।

তোর হাত তো নয় যেন বাড়ির থাম। ওর ভেতরে কোন প্রেমিকই

ধরা দেবে না। তোর নিঃশ্বাসে তো ঝড় বইতে শুরু করে। ওর ধাক্কা কে সহ্য করবে বল? তোর শরীর থেকে সব সময়েই ঘাম ঝরছে। ঘাম তো নয়, একেবারে ফোয়ারা। ধর, কোন লোক তোকে একটু আদর করল। তুই করবি কী তাকে জড়িয়ে ধরবি। ব্যস! ব্যাচারার জামা-কাপড় সব সপসপে হয়ে যাবে। শুধু কি তাই? তোর তেল-চিটচিটে ঘামের দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবে রে, উঠে আসবে।

ঘুমোলে তোর নাক ডাকে ঘড়র...ঘড়র...ঘো-ঙ। নিঃশ্বাস ফেলিস মোষের মত—ভোঁয়োস...ভঁস। নড়ে বসতেই তুই হাপরের মত হাস-পাস করিস। শুয়ে থাকতেও তোর কষ্ট। শরীরের ওজন যেন তোর ওপরে চেপে বসে। দিন-রাত তোর খিদে লেগেই রয়েছে। কাকের মত মুখ নাড়ছিস হরদম। তুই এত মোটা যে প্রকৃতির ডাকে তুই বেসামাল হয়ে পড়িস। চলার সময় পায়ের তলায় পাপোশ পড়লেই তার দফা একেবারে রফা হয়ে যাবে। স্নান করার সময় শরীরের সব জায়গায় হাত পেঁছয় না তোর। ফলে, বোটকা গন্ধ ছাড়ে তোর গা থেকে।

সামনে থেকে তোকে দেখতে লাগে হাতির মত; পাশ থেকে তুই উট; আর ভিস্তির মত তোকে দেখতে লাগে পেছন থেকে। এ আমার কথা নয়—কবির কথা:

ওরে ও ধ্যাবড়া মেয়ে, গ্যাবড়া মুখী, এক বস্তা ময়দা হেন,
হাঁটলে পরে তোর পায়ের ভারে ভূমিকম্প হয়রে যেন।
পশ্চিমে তুই নেচে বেড়াস সদ্য যেন ঘূর্ণী বায়ু
প্রাচ্যে হেলা যায় রে বাপু শান্তশিষ্ট মোদের আয়ু।

হা-হা করে হেসে উঠলেন আলী সাহেব; বললেন—বাপস! কী সব সাংঘাতিক কথা? তা, তোমরা দুজনে বলেছ ভালই। তোমরা যে যার জায়গায় বসে পড়। এবারে তোমরা এস। প্রথমে বল মেহেরুন্নেসা।

সোনালি মেয়েটি বলতে শুরু করল—দিনের আলো আমার গায়ে। আমার রঙ নিয়ে কোরানে অনেক কথাই লেখা রয়েছে। আমাকেই প্রশংসা করে আল্লাহ বলেছেন—সোনালি বা হলুদ রঙ চোখে আমার খুব ভাল লাগে। আল্লাহর মেহেরবানীতে আমার রঙটা খুবই সুন্দর।

আমার রঙে আছে যাদু। রূপের শেষ কথাটা হচ্ছে আমার রূপ; আনন্দের শেষও আমারই ভেতরে। সোনার দাম যে এত বেশী তার কারণ হচ্ছি আমি। সূর্য-চন্দ্র-তারকা আমার রঙ নিয়েই সুন্দর। সোনালি আপেল বা পীচ দেখতে কত ভাল লাগে। বিশ্বে যত দামী-দামী পাথর রয়েছে তাদের রঙ আমারই গায়ের রঙ। ফসল পাকলে আমার রঙ ধরে। শরৎকালে ফসল পাকে। ফসলের রঙ সোনা হয়ে যায়। সেইজন্যেই তো শরৎ এত আদরের। সূর্যের তাপে গাছের পাতা হলুদ হয়ে ঝরে যায়। তাইত সবুজ এত ভাল লাগে দেখতে।

এবার বাদামী রঙ, অর্থাৎ, তোর কথাই বলি। বাদামী রঙ যার তারই দাম কম। কেন কম বল দেখি! শুধু ওই রঙের জন্যে। তোর রঙটা খুবই

সাধারণ ; আর সাধারণ বলেই তো এত বিশ্রী। কেউ তা পছন্দ করে না।

এমন কোন ভাল মাংস দেখেছিস যার রঙ বাদামী ? কোন ফুল বা পাথরই বাদামী নয়। অবশ্য অনেকদিন পরিষ্কার না করলে তামার রঙ বাদামী হয়ে যায়।

সবচেয়ে বড় কথাটা কী জানিস ? তুই ফরসাও নস, কালোও নস। এ দুটো রঙের জন্যে যত প্রশংসা মানুষে করে তার এক কণাও তোর কপালে নেই।

আলী সাহেব বললেন—হয়েছে। তুমি এবার থাম। বলতে দাও শোলাকে।

বাদামী মেয়ে শোলা, একগাল হাসল। মেয়েটি হাসলে মুক্তো ঝরে যেন, কী সুন্দর তার দাঁতের পংক্তি যেন মুক্তোর সারি। মধুর মত ঘন গাঢ় বাদামী ওর গায়ের রঙ। গড়নটিও কত চমৎকার। হাত-পা-চোখ-কান-মুখ-বুক সবই একেবারে মাপা, যাকে বলে নিখুঁৎ। ঢেউ-খেলান কোমর সব সময়েই নাচের তালে-তালে দুলতে থাকে। দোহরা দুখানা হাত দুপাশে ঝুলছে। মাথায় এক রাশ কালো মেঘের মত চুল। সেই চুল নেমে এসেছে তার ভারি নিতম্বের ওপরে। সেই চুল দুলিয়ে নিজেকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সে দেখাল আলী সাহেব, আর সেই সোনালি মেয়েটিকে। তারপরে সে মেহেরুন্নেসার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—আল্লাহকে ধন্যবাদ, তিনি আমাকে ধুমসো করে পাঠাননি, পাঠাননি রোগা ডিগডিগে বা বিকলাঙ্গ করে। শ্বেতীর মত শাদা, কামলা রোগীর মত হলদে, কিংবা কাঠ কয়লার মত ময়লা করেও এ-দুনিয়ায় তিনি আমাকে পাঠাননি। আমার গায়ের রঙ সব রঙকেই টেক্কা দিয়েছে। নানান রঙের মশলা দিয়ে আল্লাহ আমার গায়ের রঙ তৈরি করেছেন। আর তাঁর তুলির টানে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কী সুন্দরই না ফুটে উঠেছে। আল্লাহ যে কত বড় শিল্পী আমাকে দেখলেই তা বোঝা যায়।

এ-দুনিয়ার সব কবিই আমার মত মেয়ের দিকে মশগুল হয়ে তাকিয়ে থাকে। হাজার-হাজার বন্দনাগীতি তারা আমার জন্যেই রচনা করেছে। সেসব কথা বলতে গেলে এক জীবনে কুলোবে না তাই সে চেষ্টা না করে আমি কেবল দু-চারটে কবিতা বলছি।

ভোর হয়ে এল দেখে থেমে গেল শাহরাজাদ।

তিনশো আটত্রিশতম রজনী :

পরের দিন আবার শুরু করল শাহরাজাদ :

সবাই কি আর হতে পারে আমার প্রিয়তমার মত
রঙিলা সে, চটুল গতি, নয়কো মোটা, নয়কো রোগা,
ছোট একটি নারী সে যে রবির আলোয় পল্লবিত
রঙিন স্বপন সম আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা।

তোর গায়ের রঙ তো রঙই নয়। সবুজ সতেজ প্রকৃতিতে ও-রকম কোন রঙই নেই। গাছের পাতা হলদে হলে ঝরে যায় ; সবুজ জীবন হলদে

হয়ে মরে যায়। তোর রঙটা তাই জীবনের প্রতীক নয়, ইঙ্গিত হল মৃত্যুর।

গিরিমাটির রঙ হলদে। হরিতালের রঙও তাই। এ দুটো জিনিস দিয়ে যে ওষুধ তৈরি হয় তা গায়ে লাগলে রোম যায় উঠে। সবুজ ঘাস কী নরম বল তো? শুকিয়ে গলে গেলে সেই ঘাস এমন শক্ত হয়ে যায় যে গরুও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

দোজখেতে জাকুম নামে এক ধরনের গাছ জন্মায়। তাতে খুনী, বদমাস, আর শয়তানদের মাথা ঝুলিয়ে রাখা হয়। সেই গাছে তোর মুখের মত এক রকম তামাটে ফলও ধরে। তোর মত মেয়েদের দেখেই কবি বলেছেন—খোদা আমাকে একটি স্ত্রী দিয়েছিলেন। তার রঙটা ছিল হলদে। সেই থেকে আমি সারাটা জীবন মাথার যন্ত্রণায় ভুগেছি। একবার আমি বলেছিলাম, দোহাই তোমার। এবার আমরা যে যার পথ দেখি এস। শুরু হল আমাদের মধ্যে বিরোধ; আর তারই ফলে, দাঁতগুলি হারাতে হয়েছে আমাকে।

আলী সাহেব তো হেসেই অস্থির। হাসির দাপটে মাথাটা তাঁর নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। মেয়ে দুটিকে তিনি দুহাতে জড়িয়ে ধরেন। বাকি চারজনকে কাছে ডেকে নেন তিনি। সকলেই সমমূল্যের দামি-দামি পোশাক আর গহনা উপহার দেন।

গল্প শেষ করে বাসোরার মহম্মদ বলল—এই হল ছটি মেয়ের গল্প। এর পরে তারা আলীর সঙ্গে বাগদাদেই সুখেস্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগল।

আল মামুনের বাদশার গল্পটা শুনতে বেশ ভালই লাগল। তিনি মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলেন—ওই মেয়েদের মালিকের বাড়ি তুমি চেন? মেয়ে কটিকে আমাকে বেচবে কিনা তুমি মালিকক জিজ্ঞাসা করে এস।

মহম্মদ বলল—আজ্ঞে জাঁহাপনা, যতদূর জানি, মেয়েগুলিকে আলী সাহেব খুব ভালবাসেন। তাদের ছেড়ে দিতে তিনি রাজি হবেন না।

বাদশাহ বললেন—ষাট হাজার দিনার নিয়ে তার বাড়ি যাও। মেয়ে পিছু দশ হাজার দর দেবে। আলী সাহেবকে বলো আমি মেয়েদের কিনতে চেয়েছি।

বাসোরার মহম্মদ তথাস্তু, জো হুকুম বলে ষাট হাজার দিনার নিয়ে আলী সাহেবের বাড়ি হাজির। সব কথা খুলে বলে আলী সাহেবের হাতে মহম্মদ টাকাটা তুলে দিল। একে বাদশার অনুরোধ। তার ওপরে ষাট হাজার দিনার! লোভে আলী সাহেবের চোখ দুটো চকচক করে ওঠে। অথচ, মেয়েগুলিকেও তিনি বড় ভালবাসতেন। কী করবেন ভাবতে লাগলেন। ভাবতে-ভাবতে শেষ পর্যন্ত লোভের কাছে হেরে গেলেন তিনি। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ছটি মেয়েকেই তিনি তুলে দিলেন বাদশাহর হাতে। মেয়েদের নিয়ে মহম্মদ সোজা চলে গেল বাদশাহর কাছে।

মেয়েদের গায়ের রঙ দেখে বাদশাহর চোখ ট্যারা হয়ে গেল। এমন রঙের ফুলঝুরি তিনি আর কোথাও দেখেননি। ওদের দেহের গঠন আলাদা ওদের রঙ-তামাসা, হাসি। সবই মনোরম। বাদশাহ খুব খুশি হলেন ওদের পেয়ে। প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটি ঢঙ রয়েছে, আকর্ষণের বৈশিষ্ট্য রয়েছে একটা। হারেমে ওদের জন্যে ভাল ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। অনেকদিন

ঘরে নাচে, গানে, রঙ-তামাসায় বাদশাহকে তর করে রাখল।

বেচারা আলী সাহেব! মেয়েদের বেচে দিয়ে নিঃসঙ্গ জীবন তাঁর আর কাটে না। ষাট হাজার দিনারের লোভ তিনি ছাড়তে পারলেন না? ছিঃ-ছিঃ! অনুতাপে মরে গেলেন তিনি। মেয়েরা তাঁকে যে আনন্দ দিয়েছিল তার তুলনায় ষাট হাজার দিনারের দাম কতটুকু! নিজের ওপরে ধিক্কার জন্মে গেল তাঁর। এভাবে জীবন কাটানো তাঁর কাছে অসম্ভব হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল আলী সাহেবের। বাদশার কাছে নিজের মনোবেদনা জানিয়ে তিনি একটা চিঠি লিখলেন।

আমার বিষণ্ণ হৃদয় প্রজাপতি
ওই ছ'টি পুষ্পলাবী মধুকন্যাকে চুম্বন করার জন্যে
পাখা মেলে উড়ে যায়।
ওরাই আমার চোখের দৃষ্টি
আমার বাঁচার রসদ
আমার তৃষ্ণার পানি
আমার জীবন
এক সঙ্গে সব।

সেই উপহার পেলে
আমি আমার চোখ দুটি বুজিয়ে ফেলতে পারি
ওই ছটি কন্যাকে আমি দুচোখ দিয়ে দেখতে চাই...
আমার জীবন প্রদীপের তৈল, আমার কামনা
আমার বেঁচে থাকার উষ্ণতা ওরা,
কিন্তু তৈজসে যার বাতি নেই, সেখানে কোন আলো জ্বলে না।

যথা সময়ে আল মামুন পত্রটি পেলেন। বাদশার উদার হৃদয়ের কথা দুনিয়ায় কে না জানে? আলী সাহেবের বেদনার ঝঙ্কার বাদশার হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করল। তাড়াতাড়ি ছ'টি মেয়েকে ডেকে পাঠালেন তিনি। প্রত্যেককে দিলেন প্রচুর উপহার। এছাড়া প্রত্যেককে দিলেন দশ হাজার করে দিনার। দিলেন বহুমূল্য অলঙ্কার। তারপরে তাদের ফিরিয়ে দিলেন আলী সাহেবকে।

দূর থেকে মেয়েদের আসতে দেখে আলী সাহেব ছুটে গিয়ে তাদের বুকে জড়িয়ে ধরেন। বাদশার হারেমে থেকে ওদের রঙ আরও ফুটেছে। স্বাস্থ্যও হয়েছে বেশ সুন্দর। বাদশার একটা পত্র তারা আলী সাহেবের হাতে দিল। মেয়েদের মূল্যবাবদ আলী সাহেবকে যে ষাট হাজার দিনার দিয়েছিলেন বাদশা সেটা মকুব করে দিয়েছেন। আলীর আনন্দ আর ধরে না।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আলী সাহেব তাদের নিয়ে সুখে দিন কাটালেন।

—জাঁহাপনা, নানান রঙের ছ'টি গল্প এইখানেই শেষ।

শাহরাজাদ বলে—এখন আপনাকে যে গল্পটা বলতে চাইছি তার নাম

হল তাম্র নগরীর গল্প। আজ পর্যন্ত আপনাকে যে সব গল্প বলেছি এটি হচ্ছে তাদের চেয়ে অনেক ভাল। অর্থাৎ, এর কাছে সেগুলি কিছুই নয়। জাঁহাপনার মর্জি হলে গল্পটা কাল রাত থেকে শুরু করতে পারি।

দুনিয়াজাদ অস্থির হয়ে বললেন—না, না। আজই তুমি শুরু কর গল্পটা। কিছুটা তো বল।

মুচকি হেসে শুরু করল শাহরাজাদ:

জাঁহাপনা, আল্লাহই রাজার রাজা। কোন এক সময় এক নগরীতে একটি রাজা রাজত্ব করতেন। সেই নগরীর নাম...

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প থামিয়ে চুপ করে গেল শাহরাজাদ।

তিনশো উনচল্লিশতম রজনী:

এক সময় দামাস্কাসে রাজত্ব করতেন ওমিয়াদ বংশের খলিফারা। সেই বংশে একজন খলিফা ছিলেন। তাঁর নাম হল আবদ আল-মালিক বিন মারবান। গুণী ব্যক্তিদের তিনি সম্মান দেখাতেন, করতেন আপ্যায়ন। দেশ-বিদেশের নানান কাহিনী শুনতে তিনি খুব ভালবাসতেন। এই সব গল্প বলতেন জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা। ডেভিডের পুত্র আমাদের মালিক সুলেমানের গল্প শুনতেই বিশেষ করে ভালবাসতেন তিনি। সুলেমানের গুণাবলী, বিচক্ষণতার কাহিনী, মরুভূমির সবরকমের পাশবিক অত্যাচারকে তিনি যে দমন করেছিলেন সেই কাহিনী, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যেসব ইফ্রিদ আর জিন ঘুরে বেড়ায় তাদের কেমন করে যে তিনি বশে এনেছিলেন সেই সব কাহিনী বারবার তিনি শুনতে চাইতেন।

একদিন এক ভূ-পর্যটক তাঁর রাজসভায় এসে উপস্থিত হলেন। এঁর নাম তালিব-বিন-সাল, খলিফাকে ইনি নানান কাহিনী শোনালেন। সেই সঙ্গে শোনালেন তামার জালার গল্পটাও। গল্পটা এমনই অদ্ভুত যে খালিফা তা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তামার জালাটা কালো ধোঁয়ায় ভর্তি। এই ধোঁয়া নাকি ধোঁয়া নয়, আসলে দৈত্য-দানোর গায়ের রোঁয়া। এ কি বিশ্বাস করা যায়?

খলিফার বিশ্বাস উৎপাদন করানোর জন্যে তালিব-বিন-সাল বললেন—জাঁহাপনা, আপনি ধার্মিক ব্যক্তি, মহাপ্রাণ। আপনাকে মিথ্যা কথা বলার সাহস আমার নেই। আপনাকে সত্যি ঘটনাই বললাম।

অনেককাল আগে সুলেমানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল জিন। তারই শাস্তিস্বরূপ তাকে তিনি ওই তামার জালাটার ভেতরে আটকে রেখেছিলেন। তারপরে মুখটা বেশ ভাল করে এঁটে পশ্চিম আফ্রিকার মঘরিব-এর বাইরে বিলাপ-সাগরে সেই জালাটা ফেলে দেওয়া হয়েছিল। জালাটা তলিয়ে যাওয়ার আগে কিছু ধোঁয়া বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। সেই ধোঁয়া হচ্ছে ইফ্রিদের জমাট বাঁধা আত্মা। বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে আবার সে তার নিজের রূপ ফিরে পেল।

খলিফা তো অবাক! এও কখনো হয়! নিজের চোখে দেখতে হবে তো ব্যাপারটা। তিনি তালিব-বিন-সালকে বললেন—ইহুদিদের ধোঁয়ায় ভরা কয়েকটা জালা আমি দেখতে চাই। এটা কি সম্ভব? কী বল তুমি? সম্ভব হলে, আমার সঙ্গে চল। নিজের চোখে দেখে আসি ব্যাপারটা।

তালিব-বিন-সাল বললেন—ধর্মাবতার, আপনি অযথা কষ্ট করবেন কেন? আপনার আদেশে এখানেই দেখানো যাবে। এ আর এমন কথা কী? এর জন্যে একটু কষ্ট করে আপনাকে একটা চিঠি লিখতে হবে—এই যা। আপনার প্রতিনিধি হিসাবে আমীর মুশা মঘরিব প্রদেশ শাসন করছেন। তাঁকেই একটা চিঠি লিখে দিন। লিখবেন—পাহাড় যেখানে শেষ হয়ে সমুদ্রে মিশেছে সেইখানে এক টুকরো শুকনো জমি রয়েছে। তারই কাছে সমুদ্রে তামার জালাগুল রয়েছে। আপনার নির্দেশ পেলে মুশা সেই জালা-গুলো আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

—তাহলে, তুমি নিজেই যাও। আমার মোহরের ছাপ দিয়ে চিঠি লিখে দিচ্ছি তাকে। জালাগুলো এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা কর। লোকজন যা চাই নিয়ে যাও। যাও, তাড়াতাড়ি।

নিজের হাতে একটা চিঠি লিখলেন খলিফা; তাতে মোহর দিলেন নিজের। তারপরে সেটি তুলে দিলেন তালিবের হাতে। তালিব সেটি নিয়ে সোজা চলে গেলেন মুশার কাছে মঘরিবে।

যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে তালিবকে সংবর্ধনা জানালেন মুশা। চিঠিটা খুলে পড়লেন। তারপরে সেটি তাঁর ঠোঁট আর মাথায় বুলিয়ে তিনি বললেন—বুঝেছি! মহামান্য ধর্মাবতার খলিফার আদেশ। আমাকে তা পালন করতেই হবে।

মুশা তাঁর সেনাধ্যক্ষ আব্দ আল-সামাদকে ডেকে পাঠালেন। দুনিয়ার হেন জায়গা নেই যেখানে আব্দ আল-সামাদের গতিবিধি ছিল না। বেশ বয়স হয়েছে তাঁর। বংশধরদের জন্যে তিনি এখন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা লিখে রাখছেন। অনেক লোমহর্ষক কাহিনীর বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল।

আব্দ আল-সামাদ হাজির হলে মুশা তাঁকে বললেন—ধর্মাবতার বিশেষ একটি দূত এখানে পাঠিয়েছেন সামাদ সাহেব। জিনের আত্মা-ভর্তি কয়েকটা তামার জালা তাঁর চাই। ডেভিডের পুত্র সুলেমান এই জিনগুলোর আত্মা জালায় বন্দী করে রেখেছিলেন। জালাগুল নাকি রয়েছে সমুদ্রের তলায়। সেগুলিকে খুঁজে আনতে হবে। মঘরিব প্রদেশের একেবারে শেষ সীমান্তে পাহাড় রয়েছে। সমুদ্রের ঢেউ এসে সেই পাহাড়েরই গায়ে প্রচণ্ড আবেগে আছড়ে পড়ে ভেঙে চুরমার হয় যাচ্ছে, তারই পাশে সমুদ্রের ভেতরে ওগুলি নাকি রয়েছে। অনেক দিনই আমি এদেশ শাসন করছি। এদেশের সবই প্রায় আমার জানা। কিন্তু তালিব সাহেব সমুদ্রের যে অংশটার কথা বলছেন তা আমি কোনদিনই শুনিনি। কোন পথ ধরলে সেখানে পেঁছানো যাবে তাও আমার অজানা। কিন্তু সারা দুনিয়ায় তো আপনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। পৃথিবীর হেন জায়গা নেই যা আপনি জানেন না। তালিব সাহেব যে পাহাড় আর সমুদ্রের কথা বলছেন তাদের আপনিও নিশ্চয় জানেন—তাই না?

মুশার কথা শুনে বৃদ্ধ সামাদের কপালের রেখাগুলি কুঞ্চিত হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ চিন্তা করে তিনি বললেন—মুশা বিন নুশায়ের, মনে পড়েছে। পাহাড় যেখানে সমুদ্রে মিশেছে সেখানে আমি গিয়েছিলাম। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে আমি একা আর সেখানে যেতে সাহস করছিনে। ইচ্ছে থাকলেও, শক্তিতে কুলোবে না এখন। পথ দুর্গম। পথের ধারে তেষ্টা মেটানোর মত কোন পানি নেই। সেখানে পেঁছুতেই লেগে যাবে দু'বছর কয়েক মাস। ফিরতে লাগবে আরও বেশী সময় ; অবশ্য, সেই ভয়ঙ্কর জায়গা থেকে একেবারেই ফেরা যাবে কি না সেদিক থেকেও সন্দেহ কম নেই। সে দেশে জীবন্ত মানুষের কোন চিহ্ন নেই। দাঁড়ে যেমন পাখি ঝুলে পাহাড়ের ওপরে মানুষগুল সেইরকম ঝুলে রয়েছে। বাইরে থেকে কেউ আজ পর্যন্ত সেই শহরে ঢুকতে পারেনি। এই শহরের নাম 'তাম্র নগরী'।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বৃদ্ধ সামাদ আবার বলেন—আমীর আপনার কাছে আমি কিছুই লুকোইনি, লুকোবোও না। ওপথ কেবল দুর্গমই নয়, রীতিমত ভয়াল, ভয়ঙ্কর রকমের বিপজ্জনক। পথে একটা মরুভূমি পড়বে। ইফ্রিদ আর জিনেরা সেই পথ আর মরুভূমি পাহারা দিচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টা। আজ পর্যন্ত কোন মানুষ ও অঞ্চলে বসবাস করতে পারেনি। আমীর মুশা, আপনি নিশ্চয় জানেন যে আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্ত চিরকালই মানুষের কাছে নিষিদ্ধ স্থান। আজ পর্যন্ত মাত্র দুটি মানুষই সেখানে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের একজন হচ্ছেন ডেভিডের পুত্র সুলেমান, আর একজন হচ্ছেন জোড়া সিঙ্গের আলেকজান্দার। তাঁদের পরে আর কেউ সেখানে যাননি। জায়গাটা হচ্ছে অনন্ত এক নীরবতার রাজত্ব। ধু-ধু করছে মরুভূমি —খাঁ-খাঁ করছে বালি। ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেই বালি তাথৈ-তাথৈ নৃত্য করছে। কবরখানার এক ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা সেখানে থমথম করছে।

আমীর মুশা বললেন—সবই সত্যি সামাদ সাহেব ; স্বীকার করছি, ওপথে বিপদ আছে আপদ রয়েছে। কিন্তু ও-সবই তো উপেক্ষা করতে হবে। আপনি যদি যেতে না চান তো আমাকেই যেতে হবে। জাঁহাপনার নির্দেশ অগ্রাহ্য করলে চলবে না।

সামাদ বললেন—আমি ছাড়া আর কেউ বোধ হয় একাজ পারবে না। ওদেশে পেঁছানোর পথ আমারই কেবল জানা রয়েছে। এক কাজ করুন আমীর মুশা। সঙ্গে নিন দুহাজার উট। এক হাজার বইবে জল, এক হাজার খাবার-দাবার। বেশী সৈন্য সামন্ত নেওয়ার দরকার নেই। আমরা যেদেশে যাচ্ছি তারা কেউ জীবন্ত মানুষ নয়। তারা সব প্রেতলোকের বাসিন্দা, ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ওদের গায়ে লাগবে না। রেগে গেলে ওদের ঠেকিয়ে রাখার শক্তি সৈন্য-সামন্তের নেই। তাই ফালতু বেশী অস্ত্রশস্ত্র আর লোকজন নিয়ে গিয়ে লাভ কী? এতে ওরা আরও ক্ষেপে যেতে পারে। সব গোছগাছ করে নিন। আমিও তৈরি থাকব। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন।

তিনশো চল্লিশতম রজনী :

পরের দিন রাত্রিতে পুরানো গল্পের জের টানলো শাহরাজাদ।

সামাদ চলে যেতেই বেশ ঘাবড়ে গেলেন আমীর মুশা। যাই হোক,

আল্লাহর নাম নিয়ে সব কিছু গোছগাছ করতে শুরু করে দিলেন। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শাখার অধিনায়ক আর সর্বাধিনায়কদের ডেকে পাঠালেন তিনি। নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করে সকলের সামনেই পুত্র হারুণকে তিনি সিংহাসনে বসালেন। ঠিক হল, তাঁর অবর্তমানে হারুণই রাজ্যশাসন করবেন।

হারুণকে সিংহাসনে বসিয়ে আল সামাদ যা যা বলে গিয়েছিলেন সেই-সেই জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে লেগে গেলেন মুশা। তাঁর সঙ্গে তালিব-বিন-সাল আর বৃদ্ধ সামাদ ছাড়া আর কয়েকজন বাছাই করা যোদ্ধাও চলল। সব যোগাড়যন্ত্র শেষ হলে ভাল দিন দেখে আল্লাহর নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তাঁরা।

দু'হাজার উটের বিরাট বাহিনী এগিয়ে চলল ধীরে-ধীরে। দিনের পর দিন কেটে গেল। মাসের পর মাস। এমনিভাবে কয়েকটি মাস কাটার পরে দল বিশাল একটা বালির সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়ল। সে এক নিস্তব্ধ মরুভূমি—যেদিকে তাকাও শুধু বালি আর বালি। কোন প্রাণেরই চিহ্ন নেই সেখানে।

একদিন হঠাৎ দিগন্তরেখার ধারে এক টুকরো চকচকে মেঘের মত কী জানি একটা জিনিস তাদের চোখে এসে পড়ল। মেঘ? না, মেঘের মত কিছু একটা? উটের মুখ তারা সেইদিকে ঘুরিয়ে দিল। কিছুটা এগিয়ে যেতেই তারা বুঝতে পারল, ওটা মেঘ নয়। চক-মেলানো একটা বাড়ি। শাদা উঁচু ইস্পাতের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। চারটি সোনার থামের ওপরে বাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাড়ির পরিধি হবে হাজার দশেক ফুটের মত। বাড়িটার গম্বুজ শীসে দিয়ে তৈরি, হাজার-হাজার কাক যাতে বসতে পারে সেইজন্যে গম্বুজের চারধারে বিরাট একটা কার্নিশ। এখানে তাহলে প্রাণী বলতে কি ওই হাজার-হাজার কাক? কাক ছাড়া আর কোন প্রাণীই তো চোখে পড়ছে না, বিশাল পাঁচিলের তলায় প্রধান ফটক। দরজার পাশে একটা ফলক। কালো পাথরের চারধারে সোনার মোটা দাগ। সেই কালো পাথরের ওপরে রোমান হরফে কয়েক ছত্র লেখা। লেখার হরফগুলি কোন লাল ধাতু দিয়ে তৈরি। রোমান হরফ কেবল সামাদই পড়তে পারতেন। কবিতাটি পড়ে মুশাকে তার অর্থটা তিনি বুঝিয়ে দিলেন।

> এইখানে প্রবেশ কর।
> তাহলেই তোমরা রাজাদের কাহিনী কী তা জানতে পারবে।
> আমার এই গম্বুজের ছায়ায় একটু বিশ্রাম করেই
> তারা হাওয়ায় মিশে গিয়েছে।
> সূর্য ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা
> ছায়ার মত হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে।
> মৃত্যুর ঝড়ের সামনে
> কুটোর মত উড়ে গিয়েছে তারা।

বাণীটার অর্থ বুঝতে পেরে মুশা খুব দুঃখ পেলেন। ফিসফিস করে বললেন আল্লাহ ছাড়া ভগবান নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দলবল নিয়ে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকে পড়লেন মুশা। ভেতরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরা বিরাট কালো একটা গ্রানাইট পাথরের মিনার দেখতে পেলেন। মিনারের চারপাশে এত কালো কাক বসেছিল যে দরজার বাইরে থেকে তাঁরা বুঝতেই পারেননি যে ওটি একটি মিনার। স্তম্ভের চারপাশে অজস্র কবর। সমাধিগুলির ওপরে একটা বিরাট পাথরের স্তম্ভ। তারই গায়ে রোমান হরফে সোনার পাতে একটি কবিতা উৎকীর্ণ করে রয়েছে :

যৌবনের উন্মত্ততা বিকারের ঝোঁকের মত গেছে কেটে—তথাপি
অনেক অনেক কিছু আমি দেখিলাম। কদাপি
কি ভোলা যায় যৌবনের জয়োদীপ্ত বলক্ষিপ্ত দিন
যদিও স্বীকার করি আজ আমি ধূলিমাঝে হয়েছি বিলীন ?
উন্মাদ যুদ্ধের নেশায় রোষদৃপ্ত অশ্বক্ষুরধ্বনি
আজও আমি কান পেতে শুনি।
অগ্নিবর্ষী ঝড়ের আবেগে অজগর শহরের করেছি বিনাশ
বারবার। ত্রস্ত নর-নারী যত সভয়ে ফেলেছে নিঃশ্বাস।
আমার রথের চাকায় রাজাদের করেছি জবাই
কোন ক্ষমা করি নাই।
কিন্তু বর্তমানে,
যৌবনের উদ্দামতা বিকারের স্বপ্ন শুধু আনে।
বালির চরেতে আঁকা ফেনার অক্ষর
বিবর্ণ, বিশীর্ণ যেন মৃত যাদুঘর।
মৃত্যু আমাকে করেছে আজিকে বন্দী—
ব্যর্থ আমার সেনানী, ব্যর্থ ফিকির ফন্দি।
হে পথিক শোন,
আমার মৃত্যুর বাণী কান দিয়ে শোন
কারণ, আমার জীবনের কথা সেত নয়।
আত্মার করো না অপচয়।
কালই হয়ত এ মাটি বলিতে পারে
জঠরের মাঝে আমি যে নিয়েছি তারে।

কবিতা পড়ছেন সামাদ। মুশা আর তাঁর সঙ্গীদের বুক ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। সমাধিগুলির সামনে নির্বাক হয়ে তাঁরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। আল্লাহর অভিশাপে বেচারাদের কী কষ্টই না ভোগ করতে হয়েছে ?

এবারে তাঁরা স্তম্ভটির দিকে এগিয়ে গেলেন। মিনারের নিচেও আবলুস কাঠের একটা বিরাট দরজা। সেই দরজার গায়েও আর একটি সোনার পাতে রোমান হরফে উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে—

মহাকালের নামে
সেই পরম শক্তিমানের নামে

সেই চিরস্থিতিশীল পরমেশ্বরের নামে,
বলছি,
তোমরা যারা এখানে এসেছ তোমাদের বলছি
তোমরা কোনদিন আয়নার দিকে তাকিয়ো না।
তোমাদের একটি নিঃশ্বাসই তাকে ভেঙে টুকরো টুকরো
করতে পারে।
মায়াটাই মানুষের পা মচকানোর ফাঁদ।
আমার শক্তির কথা তোমাদের বলি:
আমার ঘোড়া ছিল দশ হাজার
তাদের সহিস ছিল বন্দী রাজার দল
আমাকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে
হারেমে আমার ছিল হাজারটা অনূঢ়া রাজকুমারী।
তাদের কুচগুলি চাঁদের মত মিষ্টি।
সারা বিশ্ব থেকে তাদের আমি সংগ্রহ করেছিলাম।
পূর্ব আর পশ্চিম
আমার কাছে মাথা নত করেছিল সবাই।
ভেবেছিলাম আমার ক্ষমতা অনন্ত
তারপর তারপর
যিনি অজর অমর সেই তাঁর কাছ থেকে
আমার ডাক এল।
আমি আমার হাজার হাজার সেনানীদের ডাকলাম
ডাকলাম আমার অধীনস্থ শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গকে
তাদের সামনে আমার কোষাগার খুলে দিয়ে বললাম:
'আমার এই পাহাড় প্রমাণ সোনা-দানা, হীরা-মুক্তা
তোমরা সব নিয়ে যাও।
প্রতিদানে আর একটা দিন কেবল আমাকে
বাঁচিয়ে রাখ।'
মাটির দিকে মাথা নিচু করে
চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল তারা।
আমার মৃত্যু হল।
মৃত্যু এসে অধিকার করল
আমার সিংহাসন।

সামাদের কবিতা পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সকলেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনা কান্নার স্রোতে দুর্নিবার বেগে এল বেরিয়ে। অনেকক্ষণ কান্নার পরে চোখের জল মুছে একজন একজন করে ভেতরে ঢুকলেন সবাই। বিরাট বিরাট হলঘর শূন্য—আদিগন্ত নিঃস্তব্ধতার মধ্যে নিঃসাড়ে পড়ে রয়েছে। কয়েকটা এই রকম হলঘর পেরিয়ে সব শেষে তাঁরা একটি বড় সাজানো গোছানো ঘরে এসে দাঁড়ালেন। এ ঘরখানা বেশ বড়—অন্য ঘরগুলির চেয়ে অনেক বড়। মাঝখানে বিরাট একটা টেবিল পাতা।

টেবিলটি চন্দন কাঠের। টেবিলের ঠিক মাঝখানে ছোট একটি গাথা উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে—

এই টেবিলের চারপাশে
একদিন অনেক শকুনি রাজারা বসে থাকত
তাদের সঙ্গে বসে থাকত কানা রাজার দল।
এখন তারা সবাই অন্ধকারে শুয়ে আছে,
এখন তারা কেউ আর উঠতে পারে না,
এখন কেউ আর পায় না দেখতে।

ধাঁধাঁ লাগে মুশার। এ কবিতার অর্থ কী? এর উদ্দেশ্যটাই বা কী? এক টুকরো চামড়া বার করে বয়েতটা লিখে নিলেন তিনি। তারপরে প্রাসাদ ত্যাগ করে তাম্রনগরীর দিকে যাত্রা করলেন তাঁরা।

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প বলা থামালো শাহরাজাদ।

তিনশো একচল্লিশতম রজনী:

পরের দিন রাত্রিতে আবার শুরু করল শাহরাজাদ।

তিনদিন ধরে একটানা চলছেন তাঁরা। তৃতীয় দিন বিকালের দিকে দিকচক্রবালের কাছাকাছি একটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল তাঁদের। দেখতে পেয়েই অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন তাঁরা। একটা ঘোড়াসওয়ার চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সূর্যাস্তের লাল রঙ তার গায়ের ওপরে পড়ে চকচক করছে। কিছুটা এগিয়ে গিয়েই বোঝা গেল ওটা একটা মূর্তি। উঁচু বেদীর ওপরে বসানো। ঘোড়াসওয়ারের ডান হাতে বিরাট একটা তরোয়াল, লোহার। তরোয়ালশুদ্ধ হতখানা জামার ওপরে তোলা। সেই তরোয়ালের ওপর শেষ সূর্যের আলো পড়ায় দূর থেকে লাল দেখাচ্ছিল। দূরে দিকচক্রবালে তখন লাল আলোর ফুলঝুরি ঝরছে। ধীরে ধীরে তাঁরা মূর্তিটার কাছে এসে পেঁছিলেন। বেদী, ঘোড়া, আর তার সওয়ার সব কিছুই তামার পাতে তৈরি। একমাত্র তরোয়ালটিই যা লোহার। বেদীর ওপরে একটি বয়েৎ। লেখার ধরনটি দেখলে বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে:

এই নিষিদ্ধ দেশে
যদি তুমি পথ হারিয়ে ফেল
তাহলে সর্বশক্তি দিয়ে তুমি আমাকে ধাক্কা দাও।
সেই ধাক্কা খেয়ে
যেদিকে আমি মুখ করে দাঁড়াব
সেইটি তোমার পথ।

মুশা এগিয়ে গিয়ে মূর্তিটার গায়ে একটা ধাক্কা মারলেন। সঙ্গে-সঙ্গে মূর্তিটা ঘুরে তাঁরা যেদিকে এগোচ্ছিল তার ঠিক উলটো দিকে মুখ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আব্দ অল সামাদ ভুল পথে যাচ্ছিলেন। মূর্তির

নির্দেশিত পথটাই যে আসল পথ তা তিনি বুঝতে পারলেন। নির্দিষ্ট পথে আবার তাঁরা চলতে শুরু করলেন।

চলছেন, চলছেন, চলছেন। একটানা অনেকদিন ধরে তাঁরা চলছেন। পথে পড়ল বালি আর বালি। চারদিকে চুপচাপ। সেই নিস্তব্ধতার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললেন তাঁরা। নেই কোন জীবন্ত প্রাণী ; সবুজ পান্থপাপদ দূরস্থান, একমুঠো সবুজ ঘাসও কোথাও পড়ল না চোখে। তবু তাঁদের হাঁটার বিরাম নেই। তবু তাঁরা চলছেন··চলছেন চলছেন।

বেশ কিছুদিন চলার পরে একদিন রাত্রিশেষে তাঁরা বিশাল একটা কালোপাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সেই পাহাড়ের গায়ে একটা অদ্ভুৎ প্রাণী। কে বা কারা তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। প্রাণীটার আধখানা মাটির তলায় পোঁতা ; বাকি অর্দ্ধেকটা মাটির ওপরে। ওপরের চেহারা ভয়ঙ্কর একটা দৈত্যের মত। মনে হল, দোজখের কোন শয়তান সম্ভবত অনন্তকাল ধরে এই জীবটাকে শাস্তি দিচ্ছে। দুটো কালো রঙের পাখনাও রয়েছে তার। চারটে হাত তার। দুটো হাত সিংহের থাবার মত। বড়-বড় নখ বেরিয়ে রয়েছে। মাথাটা দেখতে গাধার মত। তার ওপরে কালো-কালো কোঁকড়া চুল ঝড়ো হাওয়ায় দুলছে। ভাঁটার মত চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। মাথার দুপাশে দুটো লম্বা-লম্বা শিং। চোখের ভুরু দুটো পাগলা ষাঁড়ের ভুরুর মত দেখতে। জীবটার চোখ তিনটে। তাদের মধ্যে একটা দুটো ভুরুর মাঝখানে স্থির হয়ে বসে রয়েছে। শিকার ধরার আগে চিতাবাঘ যেমন করে তাকায় এই চোখটার দৃষ্টি সেই রকম ভয়ঙ্কর। রঙটাও তার সবুজ। কিন্তু সেই জীবটার দেহের রঙ একেবারে কালো মিশমিশে। শরীরটা বিরাট একটা তালগাছের মত।

মুশার দলকে সামনে দেখে দৈত্যটা গর্জন করে শেকল ছেঁড়ার চেষ্টা করল। ভাগ্যিস দৈত্যটাকে কালো পাথরের দেওয়ালে শেকল দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তা না হলে, শেকল ছিঁড়ে সে একটা কান্ড করে বসত। শেকল ছেঁড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতো সে, আর তা না পেরে আর্তনাদ করছে দারুণ। মুশার দল তো ভয়েই অস্থির। ভয়ে-বিস্ময়ে যেখানে তাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। এক পাও আর এগোতে সাহস করলেন না।

সামাদকে জিজ্ঞাসা করলেন মুশা—এই দৈত্যটার কী হয়েছে ? আপনি কিছু জানেন ?

ওকেই জিজ্ঞাসা করুন না। মনে হচ্ছে কিছু জিজ্ঞাসা করলে ও জবাব দেবে। আচ্ছা, দাঁড়ান ; আমিই জিজ্ঞাসা করছি।

এক মুহূর্ত দেরী না করে সামাদ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—দিন-দুনিয়ার মালিক পরমেশ্বর আল্লাহ এ জগতের সব দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তোমাকেও সৃষ্টি করেছেন তিনি। আল্লাহ নামে তোমাকে অনুরোধ করছি, আমি যা যা তোমাকে প্রশ্ন করছি, তুমি তাদের জবাব দাও। তুমি কে ? কী তোমার পরিচয় ? কত দিন তুমি এইখানে এইভাবে শাস্তি পাচ্ছ ?

প্রশ্নগুলি শুনে কুকুরের মত ঘেউ-ঘেউ করে উঠল দৈত্যটা। তারপরে

সে বলল—আমার নাম দাহিশ বিন আল-আমাশ। আমি ইব্লিসের একজন ইফ্রিত। জিনের বাবা আমি। অদৃশ্য কোন শক্তি আমাকে এখানে বেঁধে রেখেছে। অনন্তকাল ধরে আমার এই শাস্তি ভোগ চলবে।

সমুদ্রের রাজা এক সময় এই দেশ শাসন করতেন। লাল-পাথরের একটি মূর্তি "তাম্রনগরী" পাহারা দিত। মূর্তিটাকে আমি দেখাশুনা করতাম। থাকতামও তারই ভেতরে। নানান দেশ থেকে কাতারে-কাতারে মানুষ আসত আমার দৈববাণী শুনতে।

আমি ছিলাম সমুদ্রের রাজার একটি সামন্ত। ডেভিডের ছেলে সুলেমানের ফরমান অমান্য করে অনেক জিনই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। সমুদ্রের এই রাজা সেই জিনদের দলপতি হয়েছিলেন। আসলে এই রাজা কোনদিনই জিনদের প্রভু ছিলেন না। জিনদের প্রভুর সঙ্গে এই রাজার একদিন প্রচণ্ড লড়াই হল। এই লড়াই-এ রাজা আমাকে তাঁর প্রধান সেনাপতির পদে বরণ করলেন। লড়াইটা অকারণে শুরু হয়নি। এর পেছনে যে কারণটা ছিল সেটাই আমি বলছি—

সমুদ্রের রাজার একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। তার রূপের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল দুনিয়ার সর্বত্র। একদিন সুলেমানের কানেও সেই সংবাদটা পেঁছিলো। সুলেমানের বিবি ছিল অনেক। কিন্তু তাতে কী হয়েছে? বিবির ভাঁড়ারে আরও একটি রত্ন সংগ্রহ করার বাসনা হল তাঁর। রাজার মেয়েকে শাদী করার প্রস্তাব দিয়ে তিনি একদিন দূত পাঠালেন। দূতের হাতে শাদীর প্রস্তাব ছাড়া আর দুটি নির্দেশ ছিল তার। একটি হল, সেই লাল পাথরের মূর্তিটা ভেঙে ফেলতে হবে। দ্বিতীয়টি ছিল, আল্লাহ ছাড়া কোন ঈশ্বর নেই; আর সুলেমানই হচ্ছেন সেই আল্লাহর প্রেরিত একমাত্র ধর্মপ্রচারক।—

এই দুটি নির্দেশ তাঁকে মেনে নিতে হবে।

দূতের কাছ থেকে এই নির্দেশ পেয়ে সমুদ্রের রাজা তাঁর সমস্ত উজিরদের ডাকলেন; সেই সঙ্গে ডাকলেন আমাকে। আমরা সবাই জমায়েৎ হলে তিনি বললেন—সুলেমান আমাকে সাবধান করে দিয়েছে, ভয় দেখিয়েছে আমাকে। তার প্রথম নির্দেশ তার সঙ্গে আমার মেয়ের শাদী দিতে হবে। তার দ্বিতীয় নির্দেশ জিনদের সেনাপতি দাহিশ দিন আল-আমাশ যে পাথরের মূর্তির ভেতর থাকে সেই মূর্তিটা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। এবার তোমরাই বল এ নির্দেশ আমি মানব কি না।

উজিররা বললেন—জাঁহাপনা আপনি সুলেমানকে মোটেই ভয় পাবেন না।

আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন—আমাদের সৈন্যরা সব ওঁর মত শক্তিশালী।

রাজা আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললাম—জাঁহাপনা, আদেশ দিন, ওই দূতটাকে ধরে আমি উত্তম মধ্যম দিয়ে দিই। তাহলেই সুলেমানের চিঠির উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।

আমার কথামতই কাজ হল। ভাল করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে ছেড়ে দেওয়া

হল দূতকে—যা ব্যাটা, তোর মালিককে সব বলিস। যা—

অপমানিত দূত সুলেমনের কাছে ফিরে গেল। দূত অবধ্য। তাকে অপমান করার নীতি সভ্য সমাজে কোথাও নেই। দূতের কাছে সব শুনে সুলেমান প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়লেন। চোখদিয়ে তাঁর আগুন বেরোতে লাগল। সেই সঙ্গে সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে জড় হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁর সৈন্যদের ভেতরে মানুষ ছিল, জিন ছিল, এমন কি পশু পাখিও ছিল। মানব সেনানীর ভার দিলেন আসব বিন বারখিয়ার হাতে; ইফ্রিতের রাজা দিমিরয়াৎ সমস্ত জিন সৈন্যদের পরিচালনার ভার নিলেন; সেই সঙ্গে নিলেন পশু আর পাখিদের দায়িত্ব। সমগ্র আর বিচিত্র সেনাবাহিনীর সর্বময় দায়িত্ব নিলেন সুলেমান নিজে। তাঁর সেই বিরাট বাহিনীটি জল, স্থল, আন্তরীক্ষ—এই তিনটি দলে ভাগ হয়ে গেল। তারপরে শুরু হয় যুদ্ধ যাত্রা।

চার শারিতে পশুদের সেনাবাহিনী সাজানো হল পাশাপাশি। বড়-বড় পাখিরা উড়তে লাগল মাথার ওপরে। আমাদের সৈন্যদের গতিবিধি গুপ্তচরের মত আকাশ থেকে দেখে নিল তারা। সুযোগ পেলেই পাখিগুলো এক একবার ছোঁ-মারার ভঙ্গীতে নীচে আসে তীরের মত; তারপরে আমাদের সেনানীদের কারও কারও চোখ খুবলে নিয়ে আবার উড়ে যায় আকাশের ভেতরে। তারপরে এগিয়ে এল মানব-বাহিনী। সকলের শেষে জিন। সর্বাধিনায়ক সুলেমান তাঁর ডানদিকে রাখলেন উজির আসফ বিন বারখিয়া আর বাঁয়ে নিলেন ইফ্রিতদের রাজা দিমিব্যাতকে। স্বয়ং সুলেমান চললেন সোনা দিয়ে মোড়া পাথরের সিংহাসনের ওপরে চেপে সকলের মাঝখানে। চারটে হাতি টেনে নিয়ে চলল তাঁর সিংহাসন।

শুরু হল যুদ্ধ।

সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হল প্রচণ্ড কোলাহল। বেজে উঠল দাদামা আর কাড়ানাকড়া। অশ্বারোহীরা ঘোড়ায় চড়ে ছুটে এল। সে শব্দের সঙ্গে মিশে গেল জিনদের চিৎকার। কর্কশ আওয়াজ শুনে শিকারী পাখিরা আকাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে শত্রু সেনাদের ওপরে। বাঘ-সিংহ-চিতা-হায়নারা ছুটে এসে আমাদের সৈন্যদের মুখে করে ধরে নিয়ে গিয়ে বসে-বসে কড়মড় করে চিবোতে লাগল তাদের হাড়। লক্ষ লক্ষ মানুষের পায়ের দাপাদাপিতে মাটি উঠল কেঁপে। লক্ষ লক্ষ পাখির পাখার ঝাপটায় আকাশটা ফালাফালা হয়ে গেল। আহতদের আর্তনাদে খানখান হয়ে গেল আকাশ বাতাস। সে এক বীভৎস দৃশ্য। মনে হল যেন সারা দোজখই নেমে এসেছে পৃথিবীর ওপর।

বিদ্রোহী জিনদের সেনাপতি আমি। আমিও আমার সৈন্যদের যুদ্ধ করতে আদেশ দিলাম। আমার সৈন্যরা দিমিরয়াত পরিচালিত জিনদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সামনে থেকে সেনাবাহিনী পরিচালনা করলাম আমি।

ভোর হয়ে আসছে দেখে চুপ করল শাহরাজাদ।

তিনশো বিয়াল্লিশতম রজনী:

পরের দিন আবার শুরু করল শাহরাজাদ।

আমি ভাবলাম সুলেমানকে খুঁজে বার করে নিজের হাতে তাঁকে শেষ

করে ফেলব। যেই তাঁর কাছাকাছি গেছি অমনি সুলেমান তাঁর আগ্নেয়গিরির মত মুখব্যাদন করে আগুনের গোলা ছুঁড়তে লাগলেন। তাঁর ওপরে সোঁ করে লাফিয়ে পড়ব বলে আমি আকাশের অনেক ওপরে উঠে গিয়েছিলাম। আগুনে গোলার হলকা আমাকে নীচে নামিয়ে আনল। আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। জ্বলন্ত কয়লা লেগে আমার সারা শরীরটা জ্বলতে লাগল। জ্বলন্ত কয়লার গোলা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়তে লাগল আমাদের সৈন্যদের ওপরে।

এভাবে কতক্ষণ যুদ্ধ করা যায় বল? তবু আমি হাল ছাড়িনি—আপ্রাণ লড়তে লাগলাম সৈন্যদের নিয়ে। কিন্তু সুলেমানের সৈন্য এত বেশী, আর এত বিচিত্র ধরনের যে পিছু হটা ছাড়া আমাদের আর উপায় রইল না। সৈন্যদের পিছু হটার নির্দেশ দিলাম আমি। আর সে সঙ্গে আমিও প্রাণ-পণ শক্তি উড়ে পালানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। পশু-পাখি-মানুষ আর জিন দিয়ে সুলেমান আমাকে ঘিরে ফেললেন। আমাদের অনেকেই একেবারে মারা গেল; অনেকেই জানোয়ারদের পায়ের চাপে চ্যাপটা হয়ে গেল। সুলেমানের পাখিরা আমাদের সৈন্যদের মধ্যে অনেকেরই চোখ নিল খুবলে, মাংস খেল ছিঁড়ে খুঁড়ে।

প্রায় তিন মাস পালিয়ে বেড়ানোর পরে ধরা পড়লাম আমি। শাস্তি-স্বরূপ তারা আমাকে এই কালোপাহাড়ের গায়ে শক্ত করে বেঁধে রাখল। এ শাস্তি আমাকে চিরকালই ভোগ করতে হবে। আমার সৈন্যদের ধোঁয়ায় রূপান্তরিত করে তামার জালার ভেতরে বন্দী করে রাখা হল। সেই জালা-গুলির মুখ ভাল করে এঁটে সুলেমান তাঁর নিজের শীলমোহরের ছাপ দিয়ে দিলেন। তারপরে সেগুলিকে সমুদ্রের গর্ভে ফেলে দেওয়ার দিলেন নির্দেশ। সেই সমুদ্রের ঢেউ তাম্র-নগরীর প্রাচীরে এসে ক্রমাগত ধাক্কা খাচ্ছে।

যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর থেকেই আমার এই অবস্থা। এই দেশের আর সকলের নসীবে কী ঘটছে তা আমি জানি নে। তবে তাম্র-নগরীর ভেতরে গেলে কাউকে-না-কাউকে নিশ্চয় তোমরা দেখতে পাবে। তারাও হয়ত আমারই মত বন্দী। তাদের সঙ্গে দেখা হলে নিশ্চয় তোমরা তাদের-ও কাহিনী শুনতে পাবে।

কাহিনী শেষ করে দৈত্যটা প্রচণ্ড বেগে গা ঝাড়া দিল একটা। সেই শব্দে চারপাশে বিরাট একটা আড়োলন জেগে উঠল। ভয় পেয়ে মুশা তাঁর দলবল নিয়ে একটু পিছিয়ে গেলেন। দৈত্যটার কাহিনী শুনে মুশার একটু দয়াও হয়েছিল। হয়ত, বাঁধনটা তার খুলেও দিতেন তিনি; কিন্তু তার এই বর্বর ব্যবহারে, তাঁর মায়া নষ্ট হয়ে গেল। দৈত্যটিকে পেছনে ফেলে তাঁরা তাম্র-নগরীর দিকে যাত্রা করলেন। ওই তো কাছেই তাম্র-নগরী। তার মিনারের, স্তম্ভের, প্রাচীরের গায়ে সূর্যাস্তের অজস্র লাল রঙ ছড়িয়ে পড়েছে। দ্রুত পায়েই এগিয়ে গেলেন তাঁরা।

তাম্র-নগরীতে পেঁছিবার আগেই অন্ধকার নেমে এল; তারপরে এল রাত। সমস্ত নগরীটিই নিস্তব্ধ অন্ধকারে থমথম করছে। কী যেন একটা ভয়ে তাঁদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

কী করা উচিৎ পরামর্শ করলেন মুশা। তারপরে ঠিক হল—রাত্রিতে

নগরীতে প্রবেশ করে কাজ নেই। ভোর হলেই না হয় যাওয়া যাবে। তাই হল।. সিংহ দরজার কাছে তাঁবু খাটিয়ে সকলেই শুয়ে পড়লেন। পথ-শ্রমে ক্লান্ত হওয়ার ফলে শোওয়া মাত্র সবাই গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়লেন।

ভোরের আলো সবেমাত্র ফুটে উঠেছে। সবাইকে জাগিয়ে দিলেন মুশা। তাড়াতাড়ি সব কিছু বেঁধে ছেঁদে রওনা হল দলটি। যে-কোন একটা দরজা দিয়ে ভেতরে চল। ভোর পেরিয়ে সকাল এগিয়ে এল। চারপাশে আলো ঝলমল করছে। সেই আলোতে তাম্র-নগরীর তামার পাঁচিল গেল দেখা। কী চমৎকার ঝকমক করছে। দেখলেই মনে হবে, এইমাত্র যেন পাঁচিলটা কারখানা থেকে তৈরি হয়ে এসেছে। খুব উঁচু পাঁচিল চারপাশে পাহাড়টাকে আড়াল করে রেখেছে। পাহাড়ের সঙ্গে তামার পাতগুলি বেশ শক্ত করে আঁটা। হঠাৎ দেখলে মনে হবে ওটা পাহাড়েরই একটা অঙ্গ।

প্রযুক্তিবিদ্যার এমন নিখুৎ কাজ আগে কেউ দেখেনি। অবাক বিস্ময়ে সবাই সেই পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু দরজা কোথায়? তাজ্জব ব্যাপার! সকলের চোখই দরজা খুঁজতে ব্যস্ত। সেই দরজার অনুসন্ধানে পাঁচিলের পাশ দিয়ে সবাই হাঁটতে লাগলেন। ভেতরে ঢোকা পথ নিশ্চয় কোথাও না কোথাও রয়েছে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কোন দরজাই মিলল না। নিদেন পক্ষে একটা আধটা ফোকর পেলেও চলত। তা-ও চোখে পড়ল না কারও। এত বড় একটা নগরী। এখানে একটা প্রাণীকেও তাঁরা ঢুকতে বা বেরিয়ে আসতে দেখলেন না। সত্যিই বড় আশ্চর্য ব্যাপার।

এদিকে বেলা বাড়তে লাগল। অথচ নগরীর ভেতর থেকে আওয়াজ নেই। জীবন্ত প্রাণী থাকলেই কিছু-না-কিছু একটা শব্দ হয়। কিন্তু এখানে সেরকম একটা শব্দও তাঁদের কানে এল না। নিজেদের পায়ের শব্দ আর কথা বলার শব্দ ছাড়া কোথাও আর কোন শব্দ নেই।

কিন্তু মুশা হাল ছাড়ার পাত্র নন। সকলকেই তিনি উৎসাহ দিতে লাগলেন। আগে চল, আগে চল, চলতে চলতে এগিয়ে এল বিকাল। তার-পরে একসময় তাও গড়িয়ে গেল। সামনে সেই নিশ্ছিদ্র তামার প্রাচীর। মনে হল যেন পৃথিবী ফুঁড়ে তাদের সামনে উঠে দাঁড়িয়েছে। এর না আছে আদি না আছে অন্ত। সন্ধ্যার অন্তরালে একটা প্রাগৈতিহাসিক ছায়া যেন তাঁদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে

ধীরে ধীরে নেমে এল রাত্রি। বিশ্রাম করার জন্যে সবাইকে নির্দেশ দিলেন মুশা। আগের দিনের মত তাঁবু খাটিয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। একা জেগে রইলেন কেবল মুশা। ভাবতে লাগলেন এ-হেন পরিস্থিতিতে কী করবেন তিনি, কী তাঁর করা উচিৎ। যেমন করে হোক ভেতরে ঢোকার পথ তো একটা তাঁকে খুঁজে বার করতেই হবে। সৈন্যদের ওপরে তাঁবু রক্ষার ভার দিয়ে সামাদ আর তালিব বিনকে নিয়ে তিনি পাহাড়ে ওঠার জন্যে রওনা হয়ে গেলেন। দেখতে হবে ভেতরে কী রয়েছে। চারপাশটাও একবার দেখা দরকার। কেন ভেতরে ঢোকার পথ পাওয়া যাচ্ছে না। তাও খুঁজে বার না করলে আর চলছে না।

রাত্রি শেষ হতে চলল দেখে গল্প বলা থামিয়ে দিল শাহরাজাদ।

তিনশো তেতাল্লিশতম রজনীতে আবার শুরু করল শাহরাজাদ :

সটান পাহাড়ে উঠে গেলেন তিনজন। চারপাশে একেবারে নিতল কালো অন্ধকার তার ডানা মেলে চুপচাপ বসে রয়েছে। সেই দুকূলপ্লাবনী অন্ধকারে চোখগুলি থিতিয়ে নিতে সময় গেল তাঁদের। হঠাৎ পুব দিক থেকে একটা জোরালো আলো এসে পড়ল। দেখা গেল পাহাড়ের পেছন থেকে চাঁদ উঠছে। দেখতে-দেখতে চাঁদটা পাহাড়ের ওপরে উঠে এল। এবার পাহাড় আর সমতল সবই ভরে গেল অপরূপ একটি রূপালি আলোতে। সেই আলোয় তাম্র-নগরীর ভেতরে তাকালেন তাঁরা। যা দেখলেন, তাতে তাদের চোখ আপ্লুত হয়ে উঠল বিস্ময়ে। বিস্মিত হতবাক হয়ে গেলেন তাঁরা।

এ যেন এক স্বপ্নময় শহর।

সারা শহর চাঁদের আলোতে ভেসে যাচ্ছে। অনেক দূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব কিছু। সে আলোকে তাঁরা দেখতে পেলেন বড়-বড় প্রাসাদ আর তাদের গম্বুজগুলি সারা শহর ছড়িয়ে রয়েছে। কী সুন্দর তাদের গঠন-ভঙ্গিমা। দেখা যাচ্ছে বড়-বড় প্রাসাদের ছাদ, আর অলিন্দ। শহরের মাঝখান দিয়ে বেশ বড় একটা খাল যাচ্ছে বয়ে। তার দুপাশে অজস্র সবুজ গাছের সারি। সেই সব গাছের ছায়ার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে-খেলতে খালের জল বয়ে চলেছে। প্রাচীরের বাইরেই সমুদ্র। দূর থেকে দেখতে লাগছে অনেকটা ধাতুর পাহাড়ের মত। তামার প্রাচীর, বাড়ির ছাদ, সমুদ্র, খাল, আর পশ্চিমের পাহাড়ের ছায়া সব মিলিয়ে ওই চাঁদের আলোয় রাত্রের মিঠে হাওয়া এক অপার্থিব পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

সেই আলোতে বিস্তীর্ণ সমাধিক্ষেত্র নিঝুম হয়ে পড়ে রয়েছে। কোন মানুষ নেই, মানুষের কোন চিহ্ন ওখানে নেই। সমাধিক্ষেত্রের ওপরে তামার ঘেরা টোপ, পাথরে কুঁদা অশ্বারোহীর বিরাট মূর্তি, আকাশের পাখি, বিরাট-বিরাট প্রাসাদ যেন কোন এক মায়ামন্ত্র বলে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে। বাদুড় বা প্যাঁচা—তারাও বোধ হয় এই বিশাল স্তব্ধতাকে এড়িয়ে চলেছে।

তাম্র-নগরী সুপ্ত। এ ঘুম বোধ হয় আর ভাঙবে না তার।

এ এক অভিশপ্ত পুরী।

সবই দেখলেন মুশা ; কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না তিনি। সঙ্গীদের নিয়ে নীচে নেমে এলেন তিনি। পাহাড় থেকে নেমে আবার তাঁরা প্রাচীরের সামনে এসে থামলেন। প্রাচীরের দিকে তাকাতেই চারটি উৎকীর্ণ লিপি চোখে পড়ল তাঁদের। এগুলির হরফ-ও রোমান। সেখ আব্দ-অল-সামাদ লিপিগুলি একটি-একটি করে পড়ে তাদের অর্থ বুঝিয়ে দিলেন সবাইকে।

প্রথম কবিতাটি পড়লেন সামাদ—

> হে মানুষের সন্তান, তোমরা কেবল
> ভবিষ্যতের সঙ্গে ভবিষ্যৎ যোগ করে যাচ্ছ ;
> কিন্তু মৃত্যুর ধূসর শূন্যতা
> তোমাদের সমস্ত সঞ্চয় নষ্ট করে দিচ্ছে।
> সকলের ওপরে এক প্রভু রয়েছেন—

তিনি সৈন্যবাহিনীকে বাঁচিয়ে রেখেছেন
রাজচক্রবর্তীদের জন্যে তিনি ছোট-ছোট
অন্ধকারে কুঠারি ঠিক করে দিয়েছেন।
রাত্রির অন্ধকারে তারা সব ধূলিশয্যা থেকে উঠে
সব একাকার হয়ে যায়।

বুকের বেদনা চেপে রাখতে পারলেন না মুশা ; বলে উঠলেন—উঃ! কী নিষ্ঠুর!! আত্মা অবিনশ্বর। এ-দুনিয়ায় আল্লার চোখে সবই সমান! কিন্তু আত্মাকে তো ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায় না। সে জাগবেই। সত্যি বলছি সামাদ সাহেব, বয়েৎটি আমার মনে গেঁথে গেল।

দ্বিতীয় কবিতাটি পড়লেন সামাদ

হে মানুষের সন্তান, চোখের ওপরে
তোমরা হাত চাপা দাও কেন?
ভয়ে-ভয়ে তুমি এই পথে খেলা কর কেন?
এই পথই তো তোমাকে আর একটি ঠিকানায় নিয়ে যাবে।
সেই রাজারা আজ কোথায়?
কোথায় বা সেই সব বলদীপ্ত মানুষগুলি?
হে মানুষের সন্তান,
সেই ইরাকের প্রভু আজ কোথায়?
কোথায় আজ সেই ইস্পাহানের সম্রাট?

এই কবিতাটিও বড় ভাল লাগল মুশার। তৃতীয় কবিতাটি পড়তে লাগলেন সামাদ :

হে মানুসের সন্তান, পথের ওপরে
অপরিচিত একটি মানুষকে তুমি দেখতে পাচ্ছ,
তুমি তাকে ডাকলে, সে থামল না।
সেইত তোমার জীবন।
এখন সে ভারত আর চীন সম্রাটের সঙ্গে
তাড়াতাড়ি দেখা করতে ছুটছে
সিনহা আর নুবিয়ার সম্রাটের সঙ্গে
তার যে জরুরী দরকার।
তাঁরা তো তোমারই মত
দুর্নিবার কোন এক নিঃশ্বাসের ঝড়ে
পাহাড়ের চূড়া থেকে গড়িয়ে পড়েছে নীচে।

হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন মুশা—কোথায় গেল সেই নুবিয়া আর সিনহার সুলতানেরা? সব শেষ হয়ে গিয়েছে তাদের এক দুর্নিবার ঝড়ে প্রভুত্বের শিখর থেকে নীচে গড়িয়ে পড়েছে তারা।

শেষ কবিতাটি পড়তে শুরু করলেন সামাদ—

হে মানুষের সন্তান, কৃশাঙ্গী মৃত্যু
তোমার কাঁধের ওপরে পাখির মত বসে রয়েছে,
তোমার সুরার পেয়ালার দিকে তাকিয়ে রয়েছে
তাকিয়ে রয়েছে তোমার প্রিয়ার কুচ যুগের দিকে।
বিশ্বের চাতুরীর জালে ধরা পড়েছ তুমি—
আর মাকড়সা তোমারই পেছনে ওৎ পেতে বসে রয়েছে—
শূন্যতাই এই মাকড়শার আর একটি নাম।
পাহাড়ের শিখরের মত যাদের আশা ছিল উঁচু
তারা আজ কোথায় ?
তারা পঁ্যাচারই আগে থাকত কবর খানায়
আজ তারা প্রাসাদের বাসিন্দা।

অন্তরের বেদনা চোখ দিয়ে উপছে পড়ল মুশার। চোখ দুটো দিয়ে তাঁর জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল। কপাল টিপে মুখ নিচু করে আপনার মনেই তিনি বললেন—হে জন্ম-মৃত্যুর নিয়ন্তা, মেরেই যদি ফেলবে তাহলে অযথা আর মানুষের জন্ম দিলে কেন ? আমরা তুচ্ছ মানুষ। পরম পিতা আল্লাহই আমাদের আসল ঠিকনা জানেন। এই প্রশ্নের জবাব কী হবে একমাত্র তিনিই জানেন। আমাদের কাজ কেবল তাঁর আরাধনা করা, তাঁর নির্দেশ বিনা অভি-যোগে মেনে নেওয়া।

সঙ্গীদের সঙ্গে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে এলেন মুশা। তাঁবুতে ফিরে নির্দেশ দিলেন সেনানীদের—এখনই দু'খানা মই তৈরি কর। সেই মই বেয়ে আমরা তামার প্রাচীর টপকে ভেতরে যাব। একখানা মই থাকবে বাইরে ; সেটা দিয়ে উঠব। একটা থাকবে ভেতরে, সেটা দিয়ে নামব।

সেনানীরা সঙ্গে-সঙ্গে পাহাড় থেকে কাঠ কেটে নিয়ে এল। ফালাফালা করল কাপড়। সেই ফালা কাপড় আর কোমর বন্ধনী দড়ির মত করে নিল। সেই সঙ্গে নিল কিছু উটের লাগাম। তাই দিয়ে বেশ শক্ত করে দুটো মই তৈরি করে ফেলল। পাথরের ছোট টুকরো দিয়ে শক্ত করে নিল মই-এর গোড়া। মই লাগানো হল দেওয়ালের গায়ে। আল্লাহর নাম করে উঠতে লাগল সবাই । আগে উঠলেন মুশা নিজে।

ভোর হয়ে আসছে দেখে চুপ করে গেল শাহরাজাদ।

তিনশো চুয়াল্লিশতম রজনী :

পরের দিন রাতে আবার শুরু হল শাহরাজাদের কাহিনী।

তাম্র নগরীতে ঢোকার আগে মুশা জন কয়েককে রেখে গেলেন তাঁবু পাহারা দেওয়ার জন্যে। বাকি সকলকে নিয়ে তিনি উঠলেন প্রাচীরের মাথায়। প্রাচীরটা বেশ চওড়া। কিছুটা পথ প্রাচীরের ওপর দিয়েই হেঁটে গেলেন সকলে ; থামলেন দুটো উঁচু বুরুজের মাঝখানে। বুরুজ দুটো দু'খানা তামার দরজা দিয়ে শক্ত করে আঁটা। দরজা দুটো এমনভাবে আঁটা

যে তাদের ফাঁক দিয়ে একটা সঁূচ-ও গলানো যায় না। দরজার পাল্লার ওপরে সোনার তৈরি নিরস্ত্র একটি অশ্বারোহীর মূর্তি। একখানা হাত দিয়ে কী যেন বলতে চাচ্ছে সে। ভাল করে পড়তেই দেখা গেল রোমান হরফে একটি নির্দেশ লিপি। লিপিটি যথারীতি রোমান হরফে পাঠোদ্ধার করার পরে বোঝা গেল সব। লেখা রয়েছে—নাভির কাছে একটা পেরেক আছে। বারোবার সেটা টিপে দাও।

তাড়াতাড়ি মূর্তিটার কাছে এগিয়ে গেলেন মুশা। মূর্তিটার নাভির কাছে সত্যিই একটা সোনার পেরেক রয়েছে। গুণে-গুণে বারোবার সেই পেরেকটা টিপে দিলেন মুশা। আর সঙ্গে-সঙ্গে ম্যাজিকের মত পাল্লা দুটো ফাঁক হয়ে গেল। দেখা গেল, দরজার পাশ দিয়ে লাল গ্রানাইট পাথরের বিশাল একটা সিঁড়ি নিচে নেমে গিয়েছে। দেরি না করে মুশা তাঁর দলবল নিয়ে নিচে নামতে শুরু করলেন। নেমে এসে একটা হল ঘরের মধ্যে দাঁড়ালেন তাঁরা। হলঘরের সামনে রাস্তার ওপরে কয়েকজন প্রহরী পাহারা দেওয়ার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের এক হাতে ধনুক, আর এক হাতে তরবারি।

মুশা বললেন—ওরা যাতে আমাদের বাধা না দেয় সে কথা ওদের বলতে হবে আমাদের।

প্রহরীদের কাছে গিয়ে দলবল নিয়ে মুশা দাঁড়ালেন; বললেন—আমি এদের দলপতি। আপনাদের সঙ্গে শান্তি বজায় রাখতে চাই। আমরা ওপরওয়ালার সঙ্গে কথা বলব।

কেউ নড়ল না, চড়ল না। যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। —নিথর নিস্পন্দ। আগন্তুকের দিকে কেউ তাকিয়েও দেখল না। তবে কি এরা আরবি বুঝতে পারছে না?

সামাদকে বললেন মুশা—আপনার জানা যত ভাষা রয়েছে সেই সব ভাষাতে এদের সঙ্গে কথা বলে দেখুন, এরা বুঝতে পারে কি না।

গ্রীক ভাষা দিয়ে শুরু করলেন সামাদ। কোন কাজ হল না। হিন্দু, হিব্রু, ইথিওপিয়ান, এমনকি শেষ পর্যন্ত পারশিয়ান আর সুদানিজ ভাষাতেও কথা বললেন তাঁদের সঙ্গে। বৃথা চেষ্টা। কেউ কোন সাড়া পর্যন্ত দিল না।

মুশা বললেন—আমরা কেউ ওঁদের অভিবাদন জানাই নি। সেই জন্যেই সম্ভবত এঁরা আমাদের ওপরে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আপনি একটা কাজ করুন। সামাদ সাহেব। দুনিয়ায় যত রকমের অভিবাদনের রীতি রয়েছে সে সবগুলিই আপনি এঁদের কাছে দেখান তাতে কোন কাজ হয় কি না দেখি।

ত্রিকালজ্ঞ বৃদ্ধ সামাদ বিভিন্ন দেশের রীতিতে অভিবাদন জানালেন। না; এতেও তাদের মুখে কোন কথা ফুটল না। কেউ সাড়া দেবে না বলেই যেন মনে হচ্ছে। আর ফালতু চেষ্টা আর সেই সঙ্গে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। সবাইকে পিছু পিছু আসার নির্দেশ দিয়ে মুশা রাস্তায় নেমে চলতে শুরু করলেন। প্রহরী যেমন ছিল তেমনি নির্বিকার ভাবেই পড়ে রইল।

যেতে-যেতে সামাদ বললেন—আল্লাহ দুনিয়ায় অনেক ঘুরেছি আমি, দেখেছি অনেক। কিন্তু এমন তাজ্জব ব্যাপার কোন দিনই আমার চোখে

পড়েনি। এমেন আমাকে একেবারে হতবুদ্ধি বানিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

হাঁটতে-হাঁটতে দলটি একটা বাজারে এসে পড়ল। দোকান পাট সব খোলা। হাটের ভেতরে গিজগিজ করছে লোকে। থরে-থরে জিনিসপত্র সব সাজানো দোকানে। জোর বাজার চলছে ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে। কিন্তু কী অদ্ভুত! কেউ নড়াচড়া করছে না। যে যার জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এতবড় বাজার। এত লোক। কিন্তু টু শব্দটিও নেই কোথাও। দেখে মনে হচ্ছে, পরদেশী দেখে সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভিনদেশী মানুষেরা চলে গেলে আবার যে যার কাজে মন দেবে। কিন্তু তাঁদের দিকে কেউ ভ্রূক্ষেপ করছে না। নাকি, অবজ্ঞা দেখিয়েই তারা ওঁদের আগমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে নীরবে।

বাজার থেকে বেরিয়ে তাঁরা আবার চলতে শুরু করলেন। চলতে-চলতে আর একটা ছন্দওয়ালা বাজারে হাজির হলেন তাঁরা। কিন্তু সেই একই ব্যাপার। লোক আছে, লস্কর আছে, জিনিস আছে, পত্র আছে, ক্রেতা আছে, বিক্রেতা আছে। যা নেই তা হচ্ছে আলোড়ন; মুশার দলের লোকের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না।

রাস্তার ওপরের দৃশ্যও সে-ই একই। দুপাশে চক মেলানো বাড়ি। রাস্তায় অনেক লোকজন। তাঁরা চলছেন। কেউ তাঁদের লক্ষ্য করছে না; আহ্বানও করছে না, বিরক্ত-ও হচ্ছে না। এমন কি তাঁদের দেখে কারও মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে ওঠেনি। পথের ধারে সোনার দোকান, রেশমী কাপড়ের দোকান, মশলার দোকান, গন্ধ দ্রব্যের দোকান। কিন্তু সব চুপচাপ সবই নিশ্চল।

একটা বাজারের সীমান্তে এসে থামলেন তাঁরা। সামনেই বিরাট একটা তামার চাদর। তারই ওপরে রোদ পড়ে ভীষণ চকচক করছে সব। ওরই আলোতে ঝলমল করছে বাজার। তামার চাদরের ওপাশে শ্বেত-পাথরের বিরাট একটা প্রাসাদ। তার দুধারে দুটো কেল্লা। কেল্লার পুরোটাই তামার তৈরি। কেল্লার মাথাটা এত উঁচু যে মাথা তুলে দেখতে গেলেই মাথাটা ঘুরে যায়। কেল্লার সেই তামার দেওয়ালে সোনার পাতে আঁকা-নানা রকম পশুর ছবি। সেই সব পাশুদের আবার পাখা রয়েছে। প্রাসাদের সামনে প্রহরীরা সব সারিবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের কারও হাতে তরবারী, কারও হাতে বল্লম। সূর্যের আলো পড়ায় তরবারী আর বল্লমগুলি যেন আগুনের মত জ্বলছিল। প্রাসাদের যে বিরাট দরজা সেটিও সোনায় তৈরি।

মুশা তাঁর দলবল নিয়ে প্রাসাদের ভেতরে প্রবেশ করলেন। ঢুকেই একটা বড় গ্যালারি দেখতে পেলেন। নিরেট পাথরের বিরাট বিরাট থামের ওপরে প্রাসাদটা দাঁড়িয়ে। গ্যালারির মাঝখানে সুন্দর এক ফালি চত্বর। রঙিন পাথর দিয়ে সেটি তৈরি। গ্যালারিটাকে একটা দুর্গ বলে মনে হচ্ছে। এর দেওয়ালে দেওয়ালে কত রকমের অস্ত্র শস্ত্র যে ঝুলছে তার আর ইয়ত্তা নেই। অস্ত্রগুলির হাতলে মূল্যবান পাথর বসানো। সেই গ্যালারিতে বসে-বসে অনেক দর্শক সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখছে। কালো মেহগনি কাঠের

ওপরে সোনার পাত দিয়ে মোড়া আসনগুলি। আশ্চর্যের কথা মুশার সৈন্য সামন্তদের দেখে কেউ কিন্তু আদৌ বিচলিত হল না। এমন কি তাঁদের কেউ বাধাও দিল না। নির্বিবাদে এগিয়ে চললেন তাঁরা।

ভোর হয়ে আসছে দেখে চুপ করে গেলেন শাহরাজাদ।

তিনশো পঁয়তাল্লিশতম রজনী :

পরের দিন রাত্রিতে যথারীতি গল্প শুরু করলো শাহরাজাদ।

গ্যালারির বাঁকানো কার্নিশের দিকে নজর পড়ল তাঁদের। সেখানেও সোনার পাতে রোমান হরফে একটা কিছু লেখা রয়েছে। সামাদ তার পাঠোদ্ধার করে বললেন :

হে মানুষের সন্তান,
তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে দাঁড়াও,
দেখবে, মৃত্যু তোমার পিছনে রয়েছে।
আদম তাকে দেখেছিল, দেখেছিল নিমরড ;
পারশ্যের সম্রাটরাও দেখেছিল তাকে।
আর দেখেছিল বিশ্বজয়ী আলেকজান্দার।
হামাম, কারুম, আর শাদাদ-ও দেখতে
ভুল করে নি তাকে।
এ-জগৎ ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ এসেছিল
তাদের ওপরে—
একটি প্রশ্নও করা হয়েছিল তাদের
যে প্রশ্ন এ-জগৎ করতে পারত না তাদের।
হে অমৃতের পুত্রগণ, শোন :
মৃত্যুর ভয়ই মানুষের মধ্যে জ্ঞানের
উন্মেষ করে ;
এ জীবনে যতটুকু ভাল কাজ তুমি করবে
এই রক্তাক্ত জীবনে
সেই গুলিই ফুল হয়ে ফুটে উঠবে।

ছত্র কটি লিখে নিলেন মুশা। সেই দেখে আরও কয়েকজন লিখে নিলেন বয়েতটি। তারপরে দলটি গ্যালারির পাশ দিয়ে আর একটি ঘরে ঢুকল। এই ঘরের মাঝখানে স্বচ্ছ পাথরের মুখ দিয়ে জলের ফোয়ারা বেরিয়ে আসছে। ভেতরে ছাদটা ঢাকা ছিল সোনালি সুতোয় কাজ করা সিল্কের কাপড়ে। শিল্পশৈলীর এ এক অপরূপ নিদর্শন। ফোয়ারার জল চারটি নালি দিয়ে বয়ে চলেছে। মেঝের ওপর দিয়ে আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে নালিগুলি কাটানো হয়েছে। চারটি নালির চারটি তলা ভিন্নভিন্ন রঙ দিয়ে তৈরি। প্রথমটি লাল পাথরের, দ্বিতীয়টি পোখরাজের, তৃতীয়টি পান্নার মত সবুজ পাথরের, চতুর্থটি তৈরি হয়েছে নীলকান্ত মনি দিয়ে। নালির ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় জলগুলিও ভিন্ন-ভিন্ন রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। সিল্কের

ছাদ থেকে আলো এসে পড়েছে সেই সব নালির জলের ওপরে। সেই রঙ ছিটকে পড়ছে শ্বেত পাথরের দেওয়ালের ওপরে। প্রতিবিম্বিত হয়ে সেই রঙ বিশাল সমুদ্রের আমেজ এনে দিচ্ছে ঘরের মধ্যে।

দ্বিতীয় দরজা দিয়ে বেরিয়ে আর একটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল দলটি। সেই ঘরে জমা হয়ে রয়েছে পুরানো আমলের সোনা রুপার মুদ্রা, হীরা, মুক্তা, মনি, জহরৎ। কিন্তু এত দামী-দামী পাথরগুলি ঘরের মেঝেতে ছত্রাকার হয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে ঘরের ভেতর দিয়ে হাঁটতে কষ্ট হয়।

এই ঘরের ভেতর দিয়ে দলটি আর একটি ঘরে প্রবেশ করল। এই ঘরে ছিল নানান জাতীয় অস্ত্রশস্ত্র—বহু দুষ্প্রাপ্য আর মূল্যবান ধাতু দিয়ে গড়া সেগুলি। রঙিন পাথর বসানো সোনার ঢাল, সাবেকী আমলের শিরস্ত্রান, ভারতীয় তরবারি, বর্শা, বল্লম ইত্যাদি। এসব অস্ত্র সব ডেভিড অথবা সুলেমানের আমলের। অস্ত্রগুলি সব চকচক করছে। মনে হল, যেন সবে তৈরি হয়ে এসেছে।

চতুর্থ ঘরটি জামা-কাপড়ে বোঝাই। দেওয়ালের ধারে চন্দন কাঠের আলমারিতে সাজ পোশাক সব যত্ন করে তোলা রয়েছে। দুর্মূল্য সিল্ক আর মসলিনে তৈরি এই সব পোশাক। এর পরের ঘরটিতে নানা রকমের বাসন কোসন ছিল। ফুলদানি থেকে শুরু করে খানাপিনার, মায় স্নানের বাসন পর্যন্ত রয়েছে। এসব বাসনই সোনা বা রুপোর তৈরি। স্নানের পাত্রটি স্বচ্ছ পাথরের, মূল্যবান পাথরের তৈরি পান পাত্র। খাবার বাসনগুলির দামী দামী নানান রঙিন পাথরের তৈরি।

মনে হয় যেন বেহেস্তের ঐশ্বর্য এক জায়গায় এসে জড় হয়েছে এইখানে। দেখে-দেখে আশা মেটে না কারও। হঠাৎ তাঁদের মনে হল, অনেকক্ষণ ঘুরছেন তাঁরা ; এবার ফেরার সময় হয়েছে। যে পথে এসেছেন সেই পথ ধরে ফেরাই সুবিধেজনক।

পেছন ফিরলেন তাঁরা। সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের একটা দেওয়ালের ওপরে তাঁদের চোখ আটকে গেল। সোনার কাজ করা মহামূল্যবান সিল্কের বিরাট একটা পর্দা ঝোলানো রয়েছে সেইখানে। তাতেই ঢাকা পড়েছে দেওয়ালটা।

পর্দাটা তুলতেই বিরাট একটা দরজা দেখা গেল। আবলুস কাঠের দরজায় রুপোর তালা ঝোলানো। কিন্তু ঘরটা খোলা যায় কেমন করে? ওর চাবিটা কোথায়? তালাটা খোলার কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না তারই জন্যে সামাদ সাহেব চারপাশে দেখতে লাগলেন। তালাটার নিচে ছোট একটা স্প্রিং লাগানো। সেইখানে চাপ দিতেই তালাটা গেল খুলে। তালাটা খুলে যেতেই সবাই ঢুকে পড়লেন ভেতরে। মার্বেল পাথরের বিরাট গম্বুজ রয়েছে ঘরের ভেতরে। আয়নার মত চকচক করছে পাথরের জানালা। তাতে নানান রকমের মূল্যবান পাথরের কাজ। বাইরের আলো সেই সব পাথরের ওপরে পড়ে মেঝের ওপরে লুটিয়ে পড়েছে। অপরূপ সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। ঘরের মাঝখানে মেঝের ওপরে পাতা সোনার কাজ করা কার্পেট। তার ওপরে বসানো পাখি। তার ঠোঁট দুটো রুবির ; পাখার পালক পান্নার। তাছাড়া রয়েছে সুন্দর সুন্দর ফুলের শোভা। কেবল গন্ধটাই নেই তাদের। চারধারে গাছের ডালে বসে রয়েছে পাখিরা।

এখনই যেন সঙ্গৎ শুরু হবে। ঘরের মাঝখানে একটা উঁচু বেদী।

কয়েকজনকে নিয়ে মুশা সেই বেদীর ওপরে এসে দাঁড়ালেন। একটা জিনিস দেখে তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন। মনিমুক্তার কাজ করা একটি মখমলের চাঁদোয়ার তলায় বড় একটি পালকের ফুলের মত একটি মেয়ে শুয়ে রয়েছে। টানা টানা ভুরুর দু'ধারে পদ্ম পাপড়ীর মত চোখ বুজিয়ে মেয়েটি ঘুমোচ্ছে। তার মাথার সোনার মুকুটখানি তার চুলগুলিকে জড়িয়ে রেখেছে, হাওয়ায় এলোমেলো হতে দেয় নি। মুক্তার হারটি তার কন্ঠলগ্ন হয়ে সলজ্জভঙ্গীতে পড়ে রয়েছে। দুধারে মেয়েটির মাথার কাছে দুটি ক্রীতদাসী দাঁড়িয়ে। একজন ফর্সা, আর একজন কালো, একজনের হাতে উন্মুক্ত কৃপান, আর একজনের হাতে বর্শা। মেয়েটির পায়ের কাছে একটি পাথরের ফলকে লেখা: আমার নাম তদমুর। আমালকাইৎসের রাজকন্যা। এ শহর আমার। চারদিকে ধনরত্ন যা পড়ে রয়েছে তা তোমরা ইচ্ছেমত নিয়ে যেতে পার। এখানে যে আসবে সব কিছু তারই। কিন্তু সাবধান। আমার রূপে অন্ধ হয়ে কেউ যেন আমাকে স্পর্শ করো না। যে করবে তার সর্বনাশ হবে।

ঘুমন্ত রাজকুমারীকে দেখে মুশা কেমন যেন সংবিৎ হারিয়ে ফেলছিলেন। সাবধান বাণীটা পড়ে হঠাৎ নিজেকে সামলিয়ে নিলেন তিনি।

মুশা বললেন—এখান থেকে এখন আমাদের চলে যেতে হবে। দুনিয়ার সব আশ্চর্য জিনিসই ত আমরা দেখলাম। এ দৃশ্য জীবনে কেউ ভুলতে পারবে না। এবার যেতে হবে সমুদ্রের দিকে। খুঁজে বার করতে হবে তামার জালাগুলি। সৈন্যগণ, তোমারা যার যা খুশি ধনরত্ন নিয়ে যেতে পার। কিন্তু সাবধান, রাজকুমারীর অঙ্গস্পর্শ কেউ করবে না।

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প থামিয়ে চুপ করে রইল শাহরাজাদ।

তিনশো ছেচল্লিশতম রজনী:

পরের দিন রাত্রিতে আবার শুরু হল গল্প।

সকলকেই সাবধান করে দিলেন মুশা।

তালিব বিন-সাল বললেন—আমীর, এই মেয়েটির রূপের কাছে এই প্রাসাদের সব কিছুই তুচ্ছ। ওকে দামাসকাসে তুলে নিয়ে গিয়ে খলিফাকে উপহার দিতে না পারলে আমার দুঃখের আর সীমা পরিসীমা থাকবে না। আমার বিশ্বাস, ইফ্রিতের জালা বয়ে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে এই মেয়েটিকে নিয়ে গেলে খলিফা আরও বেশী খুশি হবেন।

মুশা বললেন—রাজকন্যাকে আমরা স্পর্শ করতে পারব না।

তালিব বললেন—স্পর্শ করলে রাজকুমারী খুশিই হবেন। এটুকুর জন্যে উনি কিছু মনে করবেন না।

এই বলে রাজকুমারীকে কোলপাঁজা করে তুলে নিলেন তালিব। সঙ্গে-সঙ্গে একজন ক্রীতদাসীর কৃপাণের আঘাতে তাঁর ছিন্ন মুন্ডু মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। দ্বিতীয় ক্রীতদাসীর বর্শার ফলক তালিবের বুকে আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল। তালিবের মৃতদেহটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে কেউ বুঝতে পারল না কী হল।

প্রাসাদের ভেতরে মুশা আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন না। দ্রুত বেরিয়ে এলেন প্রাসাদ ছেড়ে, হাঁটতে লাগলেন সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রের পাড়ে এসে কয়েকজন জেলেকে দেখতে পেলেন। হ্যাঁ; এরাই প্রথম কথা বলল তাঁর সঙ্গে। জেলেদের এক বুড়ো সর্দারকে ডেকে তিনি বললেন—আমাদের মালিক খলিফা আব্দ আলি-মালিক-এর নির্দেশে আমি এখানে এসেছি। ধর্ম-প্রচারক সুলেমানের সময় কতকগুলি ইফ্রিতকে তামার জালায় পুরে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আমরা সেইগুলির খোঁজে এসেছি। এ ব্যাপারে তুমি আমাদের একটু সাহায্য করবে? আর একটা কথা রয়েছে আমার। এই শহরের লোকজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন জান?

বুড়ো জেলে বলল—সমুদ্র তীরের সমস্ত জেলে আল্লার নির্দেশে চলে আসছে। পরম পিতা আল্লার ধর্ম প্রচারকের নির্দেশও আমরা মেনে চলি। তাম্র নগরীর মানুষদের এই অবস্থা অনেকদিন থেকেই চলে আসছে। বিচারের দিন পর্যন্ত ওই রকমই চলবে।

ইফ্রিতের জালা পেতে আপনার কষ্ট হবে না। অনেক ইফ্রিৎ বন্দীই এখানে রয়েছে। জালার ঢাকনা খুলে ইফ্রিৎ বার করে মাছের সঙ্গে রান্না করে আমরা খাই। যতগুলি ইফ্রিৎ আপনার দরকার সবই আপনাকে আমি দিতে পারব। তবে খুব সাবধান। ঢাকনা খোলার আগে নিজের হাতে জালার মুখটা টিপে রাখবেন। ওদের দিয়ে শপথ করিয়ে নেবেন—ধর্ম প্রচারক মোহাম্মদের নির্দেশ আমরা মানবো। ডেভিডের পুত্র সুলেমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য আমরা প্রায়শ্চিত্ত করব।

খলিফা আব্দ আল-মালিকের প্রতি আমাদের আনুগত্য দেখানোর জন্যে দুটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে উপহার স্বরূপ আপনার সঙ্গে পাঠাব। এমন রূপ দুনিয়ায় আপনি দেখতে পাবেন না।

এর পরে বুড়ো জেলে মুশার হাতে বারোটি মুখ আঁটা তামার জালা তুলে দিল। প্রত্যেকটির ওপোর সুলেমানের মোহর রয়েছে। সমুদ্রের দুটি মেয়েকেও এনে দিল সেই সঙ্গে। সত্যিই অপূর্ব দেখতে মেয়ে দুটি। পিঠ ভর্তি ঢেউ খেলানো চুল। মুখখানা চাঁদের মত সুন্দর। বর্তুলাকার বক্ষ। নিম্নাঙ্গ আরও আকর্ষণীয়। গুরুভার নিতম্ব, সবল কদলী কাণ্ডের মত ঊরুদ্বয়। মনুষ্য জগতে এ রূপ সত্যিই দুর্লভ। চলতে গেলে মাছের মত একটু ডান দিকে একটু বাঁ দিকে হেলে। সেত চলে না নাচে। কেউ দেখছে বুঝতে পারলে নাচের ভঙ্গী আরও বেড়ে যায়। মিষ্টি গলার স্বর। হাসিটি আরও মিষ্টি। নেশা ধরে যায় যেন। জানা-অজানা কোন ভাষাতেই ওরা কথা বলতে পারে না, বুঝতে পারে না। কিন্তু বললে কেবল হাসে।

মুশা আর তাঁর সঙ্গীরা জেলেদের অজস্র ধন্যবাদ জানালেন। তারা তাঁদের অনেক সাহায্য করেছে। মুশা তাদের সর্দারকে বললেন—তোমরা আমাদের সঙ্গে দামাসকাসে চল—আমরা তোমাদের নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে রয়েছে বিরাট বহর। কোন কষ্ট হবে না তোমাদের। তাছাড়া, ফুলের শহর, ফলের শহর্ হচ্ছে এই দামাসকাস, বড় মিষ্টি শহর। খুব ভাল লাগবে তোমাদের।

মুশার আমন্ত্রণ গ্রহণ করল জেলেরা।

এবার ফেরার পালা। ফেরার সময় আবার তাঁরা তাম্র-নগরীতে প্রবেশ করলেন। যে যার ইচ্ছামত যতটা পারলেন সোনা, দানা, হীরা, মুক্ত, জহরৎ, দামী-দামী পাথর বোঝাই করলেন বস্তায়, উটের পিঠে। তারপরে ফিরে এলেন তাম্র-নগরীর প্রাচীরের বাইরে যে তাঁবু ফেলা ছিল সেইখানে। তারপরে গোটানো হল তাঁবু। মুশার বাহিনী দামাস্কাসের পথ ধরল। তাম্র-নগরীতে পড়ে রইল কেবল তালিব বিন-সাল। কামনার আগুনে বেচারা নিজের প্রাণটা পুড়িয়ে দিল নিষ্প্রাণ নগরীর চত্বরের মধ্যে।

দামাস্কাসে ফেরার পথে তাঁদের আর কোন বিপদে পড়তে হয়নি। মুশার মুখে সব শুনে খলিফা আব্দ আল-মালিক খুব খুশী হলেন ; বললেন ঃ আমার নসীব খারাপ। তাই তোমাদের সঙ্গে তাম্র-নগরীতে যেতে পারলাম না। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাই যাতে আমি নিজে একবার সেই শহরটা ঘুরে আসতে পারি। তাম্র-নগরীর রহস্য তখনই আমি ভেদ করার চেষ্টা করব।

খলিফা এবারে নিজের হাতে এক এক করে জালার ঢাকনাগুলিকে খুলে দিলেন। জালাগুলি থেকে প্রথমে ধোঁয়া বেরিয়ে এল ; তারপরে বেরিয়ে এল বিশালকায় ভীষণ দর্শন বারোজন ইফ্রিত।

তারা খলিফার পায়ের ওপরে পড়ে বলল—মালিক সুলেমানের বিরুদ্ধে আমরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলাম তার জন্যে আপনার কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনি আমাদের বাঁচান।

বলতে-বলতে ঘরের ছাদ ফুটো করে ইফ্রিৎগুল সব শূন্যে মিলিয়ে গেল। উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে ওদের দেখল।

মেয়ে দুটির রূপ, যৌবন, মিষ্টি হাসি আর মিষ্টি চাহনি দেখে খলিফা তো বেজায় খুশী, ফোয়ারার পাশে বসিয়ে দেওয়া হল তাদের। কিন্তু বেশীদিন বাঁচল না তারা। অত গরম সহ্য করতে না পেরে কিছুদিনের মধ্যেই তারা মরে গেল।

খলিফার কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে মুশা জেরুজালামে ফিরে গেলেন। যে-সব উৎকীর্ণ লিপি তাম্র-নগরী থেকে তিনি টুকে নিয়ে এসেছিলেন সেগুলি সামনে রেখে তাদের গভীর তত্ত্বগুলি বোঝার চেষ্টা করলেন ; তারপরে ধ্যান করতে-করতে একদিন জেরুজালামেই দেহ রাখলেন তিনি। ভগবানের এত বড় সাধক পৃথিবীতে খুব কমই জন্মেছেন।

গল্প শেষ করে শাহরাজাদ বলল—এই হল তাম্র-নগরীর গল্প।

শাহরিয়ার বলল—সত্যি, গল্পটি খুবই চমৎকার।

শাহরাজাদ বলল—রাত শেষ হতে এখনও বাকি রয়েছে। ইবন আল-মনসুরের জীবনে যেসব অদ্ভুত আর দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটেছিল তাদেরই কিছু আজ জাঁহাপনাকে শোনাব। রাতটা বৃথা নষ্ট করে লাভ কী?

শাহরিয়ার জিজ্ঞাসা করলেন—এই ইবন আল-মনসুরটি কে? এঁর নাম তো কোনদিন শুনিনি।

শাহরাজাদ বলল—শুনুন তাহলে।

জাঁহাপনা, এর আগে আপনাকে খলিফা হারুণ অল-রসিদের কাহিনী বলেছি। নিজের রাজ্য আর প্রজাদের মঙ্গলের চিন্তায় রাত্রে তাঁর ঘুম হোত না। একদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে আলি এপাশ-ওপাশ করছেন। ঘুমানোর অনেক চেষ্টা করে বুঝলেন ঘুম আর আসবে না। তখন বিরক্ত হয়ে গায়ের চাদরখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লেন তিনি। শয়নকক্ষের বাইরে মসরুর তরবারী হাতে নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল। হাতে তালি দিয়ে খলিফা তা'কে ডাকলেন। সে কাছে এসে কুর্নিশ করতেই তিনি বললেন—

মসরুর, আদৌ ঘুম আসছে না চোখে। মাথাটা বোধহয় গরম হয়েছে। এখন কী করি বলত?

মসরুর বলল—ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে। এই রাত্রে রাস্তার ওপরে একটু পায়চারি করবেন? মাথাটা তাহলে ঠাণ্ডা হবে; সেই সঙ্গে শান্ত হবে মন। তারপরে বোধহয় ঘুমোতে আর অসুবিধে হবে না। প্রাসাদের বাইরে রাত্রিটি কী ঠাণ্ডা, কী চমৎকার! আসুন, আমরা গাছের ফাঁকে-ফাঁকে ফুলের গন্ধ শুঁকে-শুঁকে ঘুরে আসি। তারাতে ছেয়ে গিয়েছে আকাশ; একটু পরেই চাঁদ উঠবে। চাঁদের আলো নদীর জলে নামবে গোছল করতে। খুব ভাল লাগবে আপনার।

খলিফা বললেন—না, মসরুর, আজ রাত্রিতে এসব ভাল লাগবে না আমার।

মসরুর বলল—তাহলে থাক। জাঁহাপনা, আপনার হারেমে তিনশ মেয়ে রয়েছে। প্রত্যেকের জন্যেই আলাদা-আলাদা ঘর রয়েছে। আপনি আসছেন বলে প্রত্যেককেই আমি সংবাদ দিয়ে আসি। তারা সব তৈরি থাকবে। লুকিয়ে-লুকিয়ে আপনিও তাদের নগ্ন চেহারা দেখবেন। ভাল লাগতে পারে আপনার।

—মসরুর, এই প্রাসাদ আমার, মেয়েরাও আমার। কিন্তু ওদের সঙ্গ পেতে আজ রাত্রিতে আমার ভাল লাগছে না।

—জাঁহাপনা, আপনার সাম্রাজ্যে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির অভাব নেই, অভাব নেই সাধু আর কবিদের। আদেশ পেলে, তাঁদের আমি নিয়ে আসতে পারি। সাধু-সন্তদের উপদেশ আপনাকে শান্তি দিতে পারে; জ্ঞানীরা শোনাবেন তাঁদের সদ্যলব্ধ আবিষ্কারের কাহিনী, কবিরা শোনাবেন মনোহর সুরে তাঁদের ভাল-ভাল কবিতা।

—মসরুর, আজ রাত্রিতে তাও আমার ভাল লাগবে না।

—জাঁহাপনা, এ-প্রাসাদে দুনিয়ার উৎকৃষ্ট সরাব রয়েছে।

—আমার কিছু ভাল লাগছে না।

—জাঁহাপনা, আমার মাথাটা কেটে নেবেন? তাহলে, হয়ত আপনার মনের অবসাদ কেটে যাবে।

রাত শেষ হয়ে এল দেখে শাহরাজাদ থামল।

পরের দিন রাত্রিতে আবার শুরু হল গল্প।

মসরুরের কথা শুনে হা-হা করে হেসে উঠলেন খলিফা হারুন অল রসিদ। তারপরে অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললেন—ভাল বলেছ। আজ হোক, কাল হোক, একদিন সে-প্রয়োজন আসতে পারে হয়ত। যাক, তুমি প্রাসাদে ঢুকে দেখে এস। যাকে দেখে বা যার কথা শুনে আমার ভাল লাগতে পারে এমন কেউ সেখানে রয়েছে কিনা জেনে এসে আমাকে সংবাদ দাও।

খলিফার নির্দেশ পেয়ে বেরিয়ে গেল মসরুর ; আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ফিরে এসে কপাল চাপড়ে বলল—জাঁহাপনা, বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা—সে রকম কাউকেই পেলাম না।

কাউকেই পেলে না ?

—আজ্ঞে, আপনার ভাল লাগতে পারে এমন কেউ আমার চোখে পড়ল না। তবে বুড়ো শয়তান ইবন আল-মনসুর গুঁড়িশুঁড়ি দিয়ে এক কোণে শুয়ে রয়েছে দেখলাম।

—কোন ইবন আলের কথা বলছ তুমি ? দামাস্কাসের ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, জাঁহাপনা ; সেই বদমাইশটার কথাই বলছি।

—যাও, তাকে শীগগির এইখানে নিয়ে এস।

মসরুর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে খলিফার সামনে নিয়ে এল। আল মনসুর কুর্নিশ করে বললেন—আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন, জাঁহাপনা।

প্রত্যাভিবাদন করে খলিফা বললেন—ইবন আল-মনসুর, আপনার জীবনের কিছু দুঃসাহসিক কাহিনী আমাকে শোনাবেন ?

—জাঁহাপনা, নিজের চোখে যা দেখেছি সেই রকম কোন কাহিনী আপনি শুনবেন, না, যা শুনেছি সেইরকম কোন কাহিনী ?

—নিজের চোখে যা দেখেছেন এরকম বিস্ময়কর কোন কাহিনীই বলুন। কানে শোনার চেয়ে চোখে দেখার ঘটনা অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক। নিন, তাড়াতাড়ি শুরু করুন।

—তাহলে, শুনুন জাঁহাপনা। সেই রকম একটি কাহিনীই আপনাকে আমি বলছি। মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, চোখ-কান-মন সব সজাগ রাখবেন। জাঁহাপনা, আপনি নিশ্চয় শুনেছেন, প্রতি বছরই কয়েক দিনের জন্যে আমি বাসোরাহয় যাই। সেখানে আপনার নায়েব আমীর মুহম্মদ আল-হাসামী থাকেন। তাঁরই সঙ্গে দিনকত কাটিয়ে আসি। একবার তাঁর প্রাসাদে গিয়ে দেখি আমীর সাহেব সেজেগুজে তৈরি। শিকারে যাবেন তিনি। ঘোড়ার ওপরে বসে রয়েছেন আমীর। যাত্রা শুরু করলেই হয়। আমাকে দেখেই বললেন—উঠে এসো সাহেব। শিকারে ঘুরে আসবেন।

আমি বললাম—মাফ করুন, জাঁহাপনা ; ঘোড়া দেখলেই আমার গা বমি-বমি করে। সেজন্যে আমি গাধাই বেশী ভালবাসি। শিকারে যেতে পারি, কিন্তু গাধার পিঠে, তাতে কি চলবে ?

আমার কথা শুনে আমীর তো হো হো করে হেসে উঠলেন—ঠিক আছে, ঠিক আছে। শিকারে তোমার যাওয়ার ইচ্ছে নেই বুঝতে পারছি। তুমি তাহলে প্রাসাদেই থাক। আমি থাকব না বলে কোন অসুবিধে হবে না

তোমার। না ফিরে আসা পর্যন্ত থেকো কিন্তু, পালিয়ে যেয়ো না।

শিকারে চলে গেলেন আমীর। আমি রয়ে গেলাম প্রাসাদে। দিন কয়েক থাকার পরে ভাবলাম—প্রতি বছরই তো আমি এখানে আসি। বেড়ানোর মধ্যে প্রাসাদ থেকে বাগান, আর বাগান থেকে প্রাসাদ। তা বাপনুহে, এইভাবে চললে, শেখার কথা দূরস্থান—কিছু জানতেও পারবে না, দেখতেও পাবে না, একবার শহরটাকেও তুমি ঘুরে দেখলে না। এবার সুযোগ এসেছে। সুযোগ তোমার হাতে অনেক। আমীরও নেই। এবার আল্লার নাম করে বেরিয়ে পড়। বাসোরার পথে-পথে কত মজার-মজার জিনিস ছড়িয়ে রয়েছে প্রাণ ভরে একবার দেখে নাও। তাছাড়া, পেটের কথাটাও ভাবতে হবে বৈকি! স্রেফ বসে থাকলে, এই সব গুরুপাক খাবার হজম হবে কেমন করে? হাঁটা চলা করলে ক্ষিদেও পাবে, মনও প্রফুল্ল থাকবে। গুরুপাক খাওয়া আর ততোধিক জমকালো পোশাকে হাঁপ ধরে যাচ্ছে। তাই প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে ঘুরতে শুরু করলাম।

জাঁহাপনা, বাসোরাতে রাস্তা রয়েছে প্রায় সত্তরটি। তাদের প্রত্যেকটিই প্রায় আড়ইশ মাইল করে লম্বা। এ সবই আপনি জানেন। একবার ঘুরতে-ঘুরতে রাস্তার গোলক ধাঁধায় আমি হারিয়ে গেলাম। পাছে লোক আমাকে বেয়াকুফ ভাবে এইজন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করতেও পারলাম না। আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি পাছে এটা কেউ বুঝতে না পারে সেইজন্যে আরও জোরে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতে-হাঁটতে ভেতরটা আমার শুকিয়ে গেল; মনে হল গায়ের চর্বিটুকুও বুঝি গলে যায়। সেই নিদারুণ রোদে, তেষ্টাও পেল খুব।

জল না পাই, একটু ছায়া পেলেও চলে। এই ভেবে একটা গলিতে ঢুকে পড়লাম। ছায়ায় একটু জিরিয়ে নিতেই হবে। নাহলে, মারা যাব। গলিতে ঢুকে সুন্দর একটা বাড়ি দেখতে পেলাম। বেশ বড় বাড়ি। দরজার ওপরে একটা সিল্কের পর্দা ঝুলছে—পর্দাটা আবার অর্ধেক গোটানো। সামনে সুন্দর একটা বাগানও রয়েছে। সেই বাগানের ভেতরে মার্বেল পাথরে বাঁধানো সারি-সারি বসার আসন। মাথার ওপরে আঙুর গাছের লতা ছায়া ফেলেছে সেই আসনগুলির ওপরে। এই রকম একটা আসনে গিয়ে আমি বসলাম।

কপালের ঘাম মুছে ফেলে সবেমাত্র বসেছি এমন সময় হঠাৎ মেয়েলী গলার একটা গানের কলি আমার কানে ভেসে এল। গানটি দুঃখের। অবাক হয়ে গানটা শুনলাম আমি:

আমার হৃদয় গুহা থেকে চঞ্চল হরিণটি
যখন উধাও হয়ে গেল, দুঃখ এসে তখন
সেই শূন্য স্থানটি পূর্ণ করে দিল। আমাকে
সে ছেড়ে গেল কেন? আমাকে যাতে
কুমারীরা ভালবাসে সেই জন্যে
আমি তো কোন ছলাকলার আশ্রয় নিইনি
চুম্বন অথবা অলকদামের।

আমার মনে হল এই গানের ভেতরে অদ্ভুত কোন রহস্য রয়েছে। এমন সুন্দর কণ্ঠের মত মেয়েটি যদি সুন্দর হয় তাহলে এ-বিশ্বে সে-ই হবে অদ্বিতীয়া।

আমি ধীরে-ধীরে উঠে ভেতরে ঢোকার দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। চেষ্টা করলাম পর্দাটা একটু তুলে ধরার। কিছুই দেখা গেল না। হঠাৎ পিছন ফিরে দেখি বাগানের ঠিক মাঝখানে দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় তাদের মধ্যে একজন বাঁদী। আর একটি মেয়েই গান গেয়েছিল। সে মেয়েটি দেখতে সত্যিই সুন্দরী। বাঁদীর হাতে একটা বীণা।

তাদের দেখে একটা বয়েৎ মনে পড়ে গেল আমার :

মেয়েটির প্রতিটি চোখের কোনে একটি
ক্ষুদে দুষ্টু ব্যাবিলনের আগুন জ্বলছে।
জুঁই ফুলের মত শাদা তার ঘাড়ের ওপরে
আলো, তরোয়াল আর কুসুমদান।
রাত্রির অন্ধকার তার সেই
শ্বেত সৌন্দর্যকে অভিনন্দন জানায়।
তার কুচ দুটি কি নরম মাংস পিণ্ড—
পরম স্নেহে গোল করা
কিংবা হস্তপুষ্ট আইভরী।
অথবা এমনও হতে পারে যে
ওই দুটি কুচ পরম স্নেহে দলা পকানো
শাদা মাংসের তাল।

বিশ্বাস করুন, জাঁহাপনা ; সেই রূপ দেখে নিজেকে আমি ধরে রাখতে পারিনি। একটি আবেশে আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম—ইয়া আল্লা। সম্ভব হলে চোখ দিয়ে তাকে আমি গিলেই ফেলতাম।

কে চেঁচাল দেখার জন্যে মেয়েটি মাথা ঘোরাল তার। পর পুরুষ দেখে সে তাড়াতাড়ি নিজের নাকাবে তার মুখটা ঢেকে ফেলল। আমার এই অভদ্র ব্যবহারে রেগে গিয়ে বাঁদীটাকে আমার কাছে পাঠাল। বীণাটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে বাঁদীটা আমার দিকে এগিয়ে আসতে-আসতে বলল—এই যে শেখ, বলি, ব্যাপারটা কী ? পরের বাড়ির অন্দর মহলে ঢুকে বাড়ির মেয়েদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে লজ্জা করে না তোমার ? এদিকে তো দেখছি বুড়ো বয়েস ; চুল, দাড়ি দুই-ই পেকেছে। সময় হয়েছে কবরে যাওয়ার। মেয়েদের রূপ দেখার জন্যে এত নোলা কিসের, অ্যাঁ ! এর আগে কী করেছিলে ?

বসে-থাকা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আমি বেশ চেঁচিয়েই বললাম—তোমার কথা কিছুটা সত্যি। বয়সটা তো আর লুকানোর উপায় নেই। কিন্তু যদি নোলা বা লজ্জার কথা বল সেটা হল অন্য ব্যাপার।

ভোর হয়ে আসছে দেখে চুপ করে গেল শাহরাজাদ।

তিনশো আটচল্লিশতম রজনী :

পরের দিন রাত্রিতে আবার শুরু করল শাহরাজাদ :

মনসুর বললেন—আমার কথা শুনে মেয়েটি গটমট করে আমার সামনে এগিয়ে এসে বলল—তোমার ওই শাদা চুলের চেয়ে লজ্জার আর কী থাকতে পারে ? চুল পেকেছে বলেই তো লজ্জা সরম সব শেষ হয়েছে। নইলে, অন্য লোকের হারেমের দরজায় এসে কোন আহম্মক এভাবে উঁকি দেয় ?

কুর্নিশ করে বললাম—আল্লার দিব্যি, আমার পাকা দাড়ির বদনাম করো না। এখানে ঢোকাটা লজ্জা সরমের ব্যাপারই নয়।

—তাহলে ব্যাপার কী জানতে পারি ?

—তেষ্টা। তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। তাইত ঢুকে পড়েছি ; মানে, নেহাৎ প্রাণের দায়ে।

—ঠিক আছে। আল্লার কসম খেয়ে যখন বললেন তখন আপনাকে বিশ্বাস করলাম।

এই বলে মেয়েটি ফিসফিস করে তার বাঁদীকে বলল—যাও, ভদ্রলোককে এক গ্লাস শরবৎ এনে দাও।

বাঁদীটা দৌড়েই গেল ; তারপরে সোনার গ্লাসে শরবৎ নিয়ে হাজির হল। এক হাতে তার ঢাকা দেওয়া শরবতের গ্লাস, আর এক হাতে তোয়ালে। শরবতের গ্লাসটা আমার হাতে সে এগিয়ে দিল। কী সুগন্ধ ঠাণ্ডা শরবৎ! ঢকঢক করে না খেয়ে চেকেচেকে একটু একটু করে খাই, আর সুন্দরীর দিকে আড়চোখে তাকাই। অর্থাৎ তাকেও পান করাই বলে ; তবে কিনা রূপসুধা। যত ধীরেই ধীরেই খাই না কেন, খাওয়া এক সময় শেষ হল ; সেই সঙ্গে ছলনাও। খালি গ্লাসটা ফিরিয়ে দিয়ে তোয়ালে দিয়ে চোখ আর মুখ মুছে ফেললাম। সেই গন্ধমাখা তোয়ালে দিয়ে ঘাড়, গদ্দান সব ভাল করে মুছলাম। তা-ও শেষ হল এক সময়। অগত্যা তোয়ালেটাও ফিরিয়ে দিতে হল। এবার ? না ; চলে আসতে পারলাম কই ? একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমার নড়বার কোন লক্ষণ দেখতে না পেয়ে মেয়েটি ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল—এবার পথ দেখ।

আবিষ্টের মত বললাম—যেতে তো হবেই। কিন্তু একটা চিন্তা আমাকে কুরে-কুরে খাচ্ছে। এইজন্যে মোটেই শান্তি পাচ্ছি নে। কী করব ভেবে পাচ্ছি নে তা-ও।

—চিন্তা কীসের ?

প্রতিটি ঘটনাকে যদি উলটো দিক থেকে দেখি তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে ? টুকরো টুকরো ঘটনাগুলি এক সঙ্গে করে দেখলে সেটাই বা কী দাঁড়াবে ? এ সব ঘটনা তো মহাকালের অঙ্গ।

—ওসব বড়-বড় ব্যাপার, বড়-বড় চিন্তা। ইহকালের নোংরামী অথবা পাপের জন্যে আমাদের দুঃখ ভোগ করতে হয়। যাক গে ওসব কথা। তা মশাই, তোমার এমন কী সমস্যা দেখা দিল যার সমাধানের জন্যে আমার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ?

বললাম—আমি এই বাড়ির মালিকের কথা ভাবছিলাম। তাঁর কথা বেশ মনে পড়ছে আমার। আর এক বাড়িতে গল্প করতে-করতে তিনি আমাকে

এই বাড়ির কথা বলেছিলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ ; বেশ মনে পড়ছে। আল্লাহর নামে বলছি তিনি আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। শ্রেষ্ঠ বন্ধুও বলতে পারি।

—তোমার সেই শ্রেষ্ঠ বন্ধুটির নাম মনে রয়েছে?

আলবাৎ। তাঁর নাম হচ্ছে আলি বিন মহম্মদ। তাঁর মত নামকরা জহুরী বাসোরায় দুটি ছিল না। কত লোক খাতির করত তাঁকে। অনেক কাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। মনে হচ্ছে তিনি আর নেই। তাঁর কি কোন সন্তান নেই?

মেয়েটির চোখদুটি কানায় কানায় ভরে উঠল ; তারপরে সেই জল মুক্তার বিন্দুর মত গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল ; বলল—আল্লা বিন মুহম্মদের আত্মাকে শান্তি দিন। আপনি যখন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু তখন আপনাকে বলতে বাধা নেই। তিনি একটি মেয়ে রেখে গিয়েছেন। তার নাম বুদুর মেয়েটিই তাঁর তাবৎ সম্পত্তির মালিক।

তুমি··তুমিই বোধহয় সেই বুদুর—না?

হ্যাঁ ; আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। —তার মুখে হাসি ফুটল।

আল্লার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে আশীর্বাদ করেন, মঙ্গল করেন তোমার। তোমার ওই ভারি সিল্কের নাকাব ভেদ করে দেখছি কী দুঃখ তোমার? এই বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়ে তোমার দুঃখটা কী? কী দুঃখ তোমার? খুলে বল। আল্লা বোধ হয় সেই জন্যেই আমাকে এইখানে পাঠিয়েছেন। তোমার সব দুঃখ কষ্ট আমি সারিয়ে দেব।

কিন্তু গোপনীয় কথা কেন আপনাকে বলব? আপনার নাম জানিনে, পরিচয় জানি নে। আপনার চরিত্রও আমার অজানা।

আমি কুর্নিশ করে বললাম—এ দাসের নাম ইবনু আল-মনসুর। নিবাস দামাস্কাসে। সকলের মালিক খলিফা হারুণ অল-রসিদ আমাকে স্নেহ করেন। বন্ধুর মর্যাদা দিয়ে আমাকে তিনি কিনে নিয়েছেন।...

আমার কথা শেষ হতে না হতেই বুদুর বলল—আর পরিচয়ের দরকার নেই। আসুন, আসুন। ভেতরে আসুন। আপনাকে স্বাগত জানাই। আপনাকে যথাযোগ্য সম্মান দেখানোর সুযোগ আমাকে দিন।

এই বলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে সে সোজা ভেতরের ঘরে চলে গেল। বসার ঘরটা বাগানের ধারেই। সেইখানে আমরা তিনজনে বসলাম। ভাল-ভাল খানা এল। খানা খেতে খেতে বুদুর বলল—আমার মুখে দুঃখ-কষ্টের ছাপ দেখে কারণ জানতে চেয়েছেন। সবই আপনাকে বলব ; কিন্তু একটি শর্তে। এই কাহিনী আপনি গোপনে রাখবেন। এ হলফ আপনাকে করতে হবে।

যেটা গোপন বলে মনে করব সেটা গোপনেই থাকবে। আমার এই মনটা বন্ধ ইস্পাতের বাক্সের মত। এর চাবি গেছে খোয়া।

বেশ, আমার তাহলে কাহিনী শুনুন।

বাঁদী আমার পাতে কিছু গোলাপজাম তুলে দিল। বুদুর শুরু করল তার কাহিনী: গল্পের সারাংশ, অর্থাৎ, বলতে গেলে আমারই কাহিনী, এই যে যখন ভালবাসলাম তখন আমার মনের মানুষ আমার কাছ থেকে অনেক দূরে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল বুদুর।

আমি বললাম—আল্লাহ তোমাকে দুহাত ভরে রূপ দিয়েছেন। তুমি যাকে ভালবেসেছিলে সে নিশ্চয় তোমার মত রূপবান, স্বাস্থ্যবান কোন যুবক। কী নাম তার?

আপনি যথার্থই বলেছেন মনসুর সাহেব। সে সত্যিই সুন্দর। তার নাম জুবাইর বিন উমাইর। তিনি একজন আমীর। তাঁর মত রূপবান যুবক এই বসোরাহয় অথবা ইরাকে আর একটিও নেই।

ঠিকই বলেছ তুমি। অমন না হলে তোমার ভালবাসা সে কেমন করে পাবে? তোমার ভালবাসার কাহিনী কিছু বল।

কাহিনীর কথা বলছেন? সে যে অনেক, অনেক। অন্তরঙ্গ হতে-হতে আমাদের দুটি হৃদয় কালের রজ্জুতে বাঁধা পড়েছিল। কিন্তু জুবাইর শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল—তাও একটি মাত্র সন্দেহের বশে।

চেঁচিয়ে উঠলাম আমি—ই আল্লা! তোমার মত মেয়েকে সন্দেহ? ঝড়ো হাওয়ায় পদ্মফুল কাদায় লোটাতে পারে। তাই বলে তাকে সন্দেহ করতে হবে? সন্দেহ খাঁটি হলেও তোমার মুখের দিকে তাকালে সব সন্দেহ দূর হয়ে যাওয়া উচিৎ।

ম্লান হেসে বলল বুদুর—তবু যদি কোন পুরুষঘটিত ব্যাপার হোত। কিন্তু ব্যাপারটা একটা মেয়েকে নিয়ে। এই যে দেখছেন, এই মেয়েটিকে নিয়ে সন্দেহ।

বললাম—আল্লাহ, জুবাইরকে করুণা করুন। এমন কথা শয়তানেও বিশ্বাস করবে না। একটা মেয়েকে আর একজন মেয়ে কেমন করে ভালবাসবে? ভারি বিশ্রী ব্যাপার তো! সন্দেহ হল কেমন করে?

গোছল করার সময় এই মেয়েটি আমার গা ঘষে দেয়। ওই সময়টা ও আমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকে। একদিন গোছলের পরে ও আমার চুল বেঁধে দিচ্ছিল। আমার গায়ে জড়ানো ছিল মাত্র একটা তোয়ালে। গরম কমানোর জন্যে মেয়েটি আমার গা থেকে সেই তোয়ালেটা সরিয়ে দেয়। চুল বাঁধা শেষ হলে আমার রূপ দেখে কী ভেবে গলা জড়িয়ে ধরে আমার গালে চুমু খেয়ে বলল—যদি পুরুষ হতাম তাহলে ভালবাসা কাকে বলে তা তোমাকে বুঝিয়ে দিতাম। এর চেয়ে ঢের বেশী দেখাতে পারতাম তোমাকে।

এই কথা বলে মেয়েটি নানান ঢঙে আমাকে চটকাতে লাগল। ছেলে-মানুষ তো! কতটুকুই বা আর জানে? ও এই সব করছে, হঠাৎ আমীর ঘরের ভেতরে ঢুকে এল। আমাদের দুজনকে ওইভাবে দেখামাত্র সে ঘর ছেড়ে চলে গেল। যে ভালবাসা কাউকে দেওয়া যায় না। সেই ভালবাসাই আমাদের দুজনকে আনন্দ দিতে পারে।

চিরকুট পেয়েই বাইরে বেরিয়ে এলাম। অনেক খুঁজলাম তাকে। পেলাম না। সে চলে গিয়েছে। তারপর থেকে তার সঙ্গে আর কোনদিনই আমাদের আর দেখা হয় নি। কোন খবরও দেয় নি সে।

তোমাদের শাদী হয় নি?

না। লোকজন সাক্ষী রেখে আমাদের শাদী হয় নি। ভালবাসাই ছিল আমাদের বন্ধন। আমরা একসঙ্গে থাকতাম। কোনো অনুসন্ধান করি নি আমরা।

আমি একবার চেষ্টা করব? দুটো হৃদয় আবার জোড়া দিতে পারলে আমিই সবচেয়ে বেশী খুশি হব। তুমি রাজি?

বুদুরের চোখে জল। সে বলল—আমাদের দুজনের পথ দুদিকে ভাগ হয়ে গিয়েছে। ঈশ্বর আপনাকে দুটি পথের মাঝখানে এনে দিয়েছেন। সব সময় মনে রাখবেন যার হৃদয়ে কোন দয়ামায়া নেই আপনি সেই লোকের উপকার করতে যাচ্ছেন। একখানা চিঠি লিখে আপনার হাতে আমি দেব। সেটি আপনি জুবাইরকে দেবেন। আপনার কথা যাতে সে শুনে সেদিকে চেষ্টা করবেন। এর বেশী আর কিছু বলার নেই আমার।

তারপরে বাঁদীকে দিয়ে দোয়াত কলম আনিয়ে সে চিঠি লিখল—

প্রিয়তম,

কতকাল আর বিরহ সইব বল? বেদনা আর মনকষ্ট রাতের ঘুম আমার কেড়ে নিয়েছে। অনেকদিন হল তুমি আমাকে ছেড়ে গিয়েছ। স্বপ্নে দেখলে তোমাকে ঠিক আমি চিনতে পারি নে।

তুমি দরজা খুলে চলে গিয়েছ। পাড়ার লোকে খোলা দরজা দিয়ে কত কথা বলে যায়। আমার গায়ে কাদা ছিটোয়। প্রিয়তম, আমি তোমার কাছে কী অপরাধ করেছি! ওঠো; চোখ তুলে দেখ। সন্দেহ ঝেড়ে ফেল। দেখবে, যেদিন এক হব সেদিনের কথা ভাবতেও কি আনন্দ। আমাদের মিলনে ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদই করবেন। ঈশ্বরও তাই চান তুমি আর মুখ ফিরিয়ে থেকো না। —ইতি।

এই সময় ভোরের পাখি ডেকে উঠল। চুপ করে গেল শাহরাজাদ।

তিনশো উনপঞ্চাশতম রজনী:

পরের দিন রজনীতে আবার গল্প বলতে শুরু করল শাহরাজাদ:

চিঠি লিখে, ভাঁজ করে, খামে সেটি বন্ধ করে তার ওপরে মোহরের ছাপ দিল বুদুর। তারপরে এক হাজার দিনারের সঙ্গে সেটি আমার পকেটে গুঁজে দিল সে। আমি বাধা দিয়েও পারলাম না। তার মৃত পিতার প্রতি আনুগত্যের সুবাদেই এটা আমার করা উচিৎ বলেই মনে করলাম আমি। আর বিলম্ব না করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম; তারপরে সোজা হাজির হলাম জুবাইর বিন উমাইর-এর বাড়িতে। উমাই এর বাবার সঙ্গেও যথেষ্ট পরিচয় ছিল আমার। তিনিও আজ আর বেঁচে নেই।

তাদের বাড়িতে গিয়ে শুনলাম শিকারে গিয়েছে উমাইর। কী আর করি! অপেক্ষা আমাকে করতেই হবে। সুতরাং বসে রইলাম। তবে বেশীক্ষণ বসতে হয় নি। তাড়াতাড়িই ফিরে এল উমাইর। আমার নাম ধাম পরিচয় পেয়ে হাত জড় করে অনেক ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলল—এতক্ষণ আমি ছিলাম না বলে দুঃখিত। কিন্তু আমার আতিথ্য গ্রহণ আপনাকে আজ করতেই হবে। এ-বাড়ি আপনার নিজেরই বলে ভাববেন। কোন রকম সংকোচ করবেন না।

কী বলব জাঁহাপনা? ছেলেটা আস্ত একটা দাবানল। অগ্নিশিখা নয়। মেয়েটার মুখে দুঃখের ছাপ কেন পড়েছে তা যেন এবার বুঝতে পারলাম। দুচোখ ভরে তাকেই দেখতে লাগলাম।

উমাইর ভাবল ভেতরে যেতে আমি বোধ হয় সঙ্কোচ বোধ করছি। তাই সে আমার হাত দুখানা ধরল। আমিও ধরলাম তার হাত ; মনে হল, চন্দ্র, সূর্য, তারা—সারা বিশ্বটাকেই আমি যেন আঁকড়ে ধরেছি। খানার সময় তখন উপস্থিত। পরম সমাদরে সে আমাকে খানা খাওয়ার ঘরে নিয়ে গেল। ক্রীতদাসরা সামনে পেতে দিল শাদা চাদর। চাদরের ওপরে সাজিয়ে দিল খোরাসানের সোনা আর রুপোর থালা। তারপরে এল থালাভর্তি কত রকমের রান্না মাংস। শুকনো, ঝোল, ঝাল। সব কটাই চমৎকার খেতে। সব চেয়ে সুখাদ্য ছিল পাখির মাংস। পেস্তা বাদাম, আর আঙুরের রসে ভেজানো সেই মাংস। তারপরে গরম রুটির সঙ্গে অদ্ভুৎ প্রক্রিয়ায় মেশানো এক রকমের মাছ। অবশ্য তার সঙ্গে সেই বিখ্যাত স্যালাডও ছিল যা মুখে দেওয়ামাত্র গলে জল হয়ে যায়। ক্ষিদেটাও চনমন করে ওঠে। তারপরে সেই সুগন্ধী চাল—তার আর তুলনা নেই। কী বলব জাঁহাপনা একেবারে কব্জী ডুবিয়ে খেয়েছি। সে কী অপরূপ গন্ধ বিরিয়ানীর! সরাবের কথা নাইবা আর বললাম।

জাঁহাপনা, আপনি ভাববেন না যে কাজের কথা ভুলে গিয়ে হঠাৎ আমি ভোজনবিলাসী হয়ে পড়েছিলাম। সত্যি কথাটা বলতে কি প্রথমটা খাবারের দিকে নজর না দিয়েই চুপচাপ বসে ছিলাম আমি। রীতি অনুসারে খাওয়া শুরু করার জন্যে নিমন্ত্রকই আহ্বান জানায়। সেই রীতিটি মেনে নেওয়ার আগেই আমি বললাম—আল্লাহর নামে শপথ নিয়ে বলছি, আপনার এই সব সুখাদ্য আমি স্পর্শ করব যতক্ষণ না আপনি কথা দেন যে আমার প্রার্থনা আপনি মঞ্জুর করবেন।

আপনার প্রার্থনা কী না জেনে কী করে তা মঞ্জুর করব? তবে আপনি আমার আতিথ্য গ্রহণ না করে চলে যাবেন এ কিছুতেই আমি হতে দেব না। আপনার প্রার্থনা নিশ্চয় মঞ্জুর হবে।

তার কথার জবাবে পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে তার হাতে দিলাম। চিঠিখানা খুলে পড়ল সে। পড়তে-পড়তে চোখমুখ লাল হয়ে উঠল তার। চিঠিখানা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে বাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষতে-পিষতে বলল—ইবন্ আল-মনসুর, আপনার যা ইচ্ছে হয় আমাকে বলবেন। আমি তা মেনে নেব। কিন্তু দয়া করে এই চিঠিটার বিষয়ে আমাকে আর কিছু বলবেন না। চিঠির জবাব আমি দেব না ; বা, এ ব্যাপারে আপনাকেও কিছু বলব না।

তার কথা শুনে উঠে চলে আসছিলাম। পেছন থেকে আমার জামা টেনে ধরে সে বলল—আপনি আমার অতিথি! আমি কেন ওকে ছেড়ে আসছি যদি শোনেন তাহলে এ-ব্যাপারে আপনিও আমাকে জোর করবেন না। আপনি ভাববেন না যে ওর চিঠি বা খবর নিয়ে আপনার আগে আর কেউ আসে নি। আমাকে আগে কিছু বলবেন না। ও আমাকে কী বলতে চেয়েছে আপনাকে আমি সব কিছু বলে দেব।

আশ্চর্যের ব্যাপার, সত্যিই ছেলেটি সব বলে দিল। তারপরে বলল—আমার কথা শুনুন, এর ভেতরে নিজেকে আপনি ফালতু জড়িয়ে ফেলবেন না। বরং এখানে বিশ্রাম করুন, যতদিন ইচ্ছে এখানে থাকুন। আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন আমাকে।

তার কথায় কেমন যেন অবাক হয়ে গেলাম আমি। কিন্তু আতিথ্য গ্রহণ না করে পারলাম না। সারাদিন খানাপিনা আর খোসগল্পে আমীরের সঙ্গে কাটিয়ে দিলাম। কোন গানও শুনলাম না, বাজনাও শুনলাম না। অথচ ও দুটোই হচ্ছে ভোজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। বেশ অবাকই হলাম আমি। কথাটা বলেই ফেললাম। আমীরের মুখখানায় কে যেন সঙ্গে-সঙ্গে এক শিশি কালি ঢেলে দিল। বুঝলাম, ভেতরে সে বেশ একটা অস্বস্তি বোধ করছে। একটু থেমে সে বলল—ভোজের আসরে গান বাজনার পাট অনেক দিনই আমি চুকিয়ে দিয়েছি। তবে আপনি যদি চান সে-ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি।

এই বলে উমাইর ক্রীতদাসীকে গান গাইতে বলল। ক্রীতদাসীটি কাপড়ে জড়ানো একটা ভারতীয় বীণা নিয়ে এসে আমাদের সামনেই বসে পড়ল; তারপরে একটা গৎ বাজিয়ে শোনাল:

> মধুর পেয়ালা আছে, সঙ্গে আছে পেয়ালা মদের
> তুমি কি এখনও তা পান করনি?
> যে যাতনা আমাদের আনন্দ দেয়
> যে চুম্বন আমাদের শীতল করে
> যে চুম্বন আমাদের বিরক্ত করে
> তা কি তুমি অনুভব করনি?
> যে গোলাপ অন্ধকারে পুড়ে যায়
> তার সুবাস কি এখনও তুমি গাওনি?

গানের রেশ কাটতে-না-কাটতেই উমাইর জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। গাইয়ে মেয়েটি বলল—শেখ, আপনিই এর জন্যে দায়ী। ওঁর সামনে অনেক দিনই আমি গান গাইনি, বা, বাজনা বাজাইনি। দুঃখের গান শুনলেই ওর ভেতরটা কেমন যেন জ্বলেপুড়ে যায়। তারপরই উনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

সত্যি সত্যিই আমি বড় অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। কৃতকর্মের জন্যে দুঃখ হল আমার। তাকে আর বিরক্ত করতে নিষেধ করে মেয়েটি আমাকে আমার শোওয়ার ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

পরের দিন ভোরবেলাতেই চলে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলাম আমি। একজন নফরকে ডেকে বললাম—আমি চললাম। তোমার মনিবকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে বলে দিয়ো।

এমন সময় অন্য একটি নফর এসে আমার হাতে এক হাজার দিনার আর একটা চিরকুট দিয়ে গেল। শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাকে বিদায় দিয়েছে উমাইর। গতকাল অজ্ঞান হওয়ার ফলে আপনার যে অসুবিধে হয়েছিল তার জন্যে সে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। তাকে আবার আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে

বেরিয়ে এলাম আমি। যে কাজের জন্যে এসেছিলাম তার কিছুই হল না। হতাশ হয়ে আমি বুদুরের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম।

বাড়ির সামনে বাগানের কাছে এসে দেখলাম বুদুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে। কোন কথা বলার আগেই সে বলল—ইবন আল-মনসুর, কোন কাজ হল না ত। হবে না যে তা আমি জানতাম।

তারপরে আমাদের মধ্যে যেসব কথা হয়েছিল সেসব কথা বুদুর হুবহু বলে গেল।

আমি তো অবাক। ও আমার পেছন গুপ্তচর পাঠিয়েছিল নাকি?

জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি এসব জানলে কেমন করে? তুমি কি ধারে-কাছে কোথাও লুকিয়ে ছিলে?

আল মনসুর, প্রেমিকার কাছে কোন কথাই লুকানো থাকে না। সবই আমার অদৃষ্ট। আপনার কোন দোষ নেই।

তারপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বলল—প্রেমের দেবতা, মনের দেবতা, আত্মার দেবতা—আল্লা আমাকে শক্তি দাও। আমার এই প্রেমিকহীন জীবনে আমি ভালবাসতে পারি। হে ঈশ্বর, জুমাইয়ের বুকে যদি এতটুকু প্রেম বলে কিছু থাকে সেইটুকু নিয়ে ওর বুক জুড়ে যন্ত্রণা দাও। জ্বলতে-জ্বলতে ও যখন আমার কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে হাজির হবে তখন আমি ওর দিকে ফিরেও তাকাব না।

তারপর মেহনতের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিল বুদুর। আমি আমীর মুহম্মদের সঙ্গে দেখা করে বাগদাদে ফিরে এলাম।

পরের বছর যথারীতি আবার বাসোরায় ফিরে গেলাম। একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি, জাঁহাপনা, আমীর মুহম্মদ একবার আমার কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছিলেন। বছরে একবার করে সেই টাকা আমি কিস্তিতে নিয়ে আসতাম। সেই কারণেই বাসোরাতে আমাকে যেতে হয়। সেবারে বাসোরায় পেঁৗছিয়েই মনে হল বুদুরের খবরটা একবার নিয়ে যাই। প্রেমিক যুগলের সংবাদ অনেকদিন পাইনি কি না।

বুদুরের বাড়ির বাগানের কাছে গিয়েই দেখি দরজা বন্ধ। চারপাশ চুপচাপ। বুকটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল। দরজার জাফরীর ভেতর দিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার সন্দেহটা ঘনীভূতই হল। দেখি নতুন একটা কবর বসেছে। কবরটা মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি। তার ওপরে একটা উইলো গাছ। গাছের ডালটা কবরের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে। কবরের ওপরে কী একটা যেন লেখাই রয়েছে। দূর থেকে সেটা পড়তে পারলাম না।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে। মেয়েটা শেষপর্যন্ত মরে গেল? আহা বেচারা! যৌবনের ফুল ভোগে লাগল না—বৃথাই ঝরে নষ্ট হয়ে গেল! এমন রূপ—এত যৌবন—ভোগে লাগল না!

রাত শেষ হয়ে এল। চুপ করে গেল শাহরাজাদ।

তিনশো পঞ্চাশতম রজনী:

পরের দিন শাহরাজাদ আবার গল্প বলতে শুরু করল।

ভারাক্রান্ত মনে উমাইরের বাড়িতে ফিরে এলাম। সেখানে আর এক

বিস্ময় আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। বাড়ি ঘর দোর সব ভেঙে চুরমার। খাঁ-খাঁ করছে সব। সেই প্রাচীর একেবারে ধূলিসাৎ। অমন সুন্দর বাগান কাঁটা ঝোপে ভরপুর। দরজা-জানালাও গিয়েছে ভেঙে। কোন লোকজন নেই। আমার কথার উত্তর দেবে কে? শেষ পর্যন্ত ছেলেটাও গেল মরে! ইয়া আল্লাহ। একটা বয়েৎ মনে পড়ে গেল আমার।

দুয়ারের গোবরাট দেখেই আমার চোখে জল এল,
সেই আতিথেয়তার যুবরাজ আজ কোথায়?
আমার সঙ্গে যাঁরা বসতেন
সেই আনন্দময় অতিথিরা আজ কোথায়?
মাকড়সারা প্রশ্ন করছে—
উত্তর দিচ্ছে বাতাস।

দুঃখে আমার বুকটা যেন ভেঙে যাচ্ছিল। কালো একটা ক্রীতদাস পেছন থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—চুপ কর বুড়ো। অমন করে চেঁচাচ্ছো কেন অ্যাঁ! দরজার কাছে অনবরত ভ্যাজ ভ্যাজ করছ।

বললাম—না না। চেঁচাব কেন? মনের দুঃখে কত কথাই না আজ মনে পড়ছে। আমার এক বন্ধু মারা গিয়েছে তারই জন্যে দুঃখ করছি আর কি।

—কে তোমার বন্ধু গো?

—জুবাইর বিন উমাইর।

—বালাই, ষাট। তিনি মরতে যাবেন কেন? ঈশ্বরের কৃপায় তিনি ভালই আছেন। লোকে কত মান্যিগণ্যি করে তাঁকে।

—তা'লে এই বাড়ি ঘর-বাগান সব গেল কোথায়? এমন খাঁ-খাঁ করছে কেন?

—ভালবাসার জন্যে।

—কী বললে! ভা-ল-বা-সা।

—হ্যাঁ, সাহেব, হ্যাঁ। আমীর উমাইর বেঁচে আছেন—এইটুকু শুধু বলতে পারি। তবে তিনি এখন মরোমরো। দিনরাত বিছানায় শুয়ে থাকেন। উঠতে পারেন না। কোন শক্তিই নেই ওঠার। বিছানার সঙ্গে একেবারে লেপটে রয়েছেন। ক্ষিদে পেলেও বলতে পারেন না, আমাকে খেতে দাও, তেষ্টা পেলেও বলতে পারেন না, আমাকে জল দাও।

নিগ্রো ক্রীতদাসটির কথা শেষ হ'তে না হতেই আমি বললাম—তুমি শিগগির ভেতরে যাও। উমাইরকে বল—মনসুর সাহেব এসেছেন। আমি এইখানে অপেক্ষা করছি—সেটাও বলে দিও।

ভেতরে ঢুকে গেল ক্রীতদাসটি; তারপরে ফিরে এসে আমাকে সঙ্গে নিয়ে আবার ভেতরে ঢুকল। যেতে-যেতে সে বলল—সাবধান, আমীর সাহেবের সঙ্গে কথা বলবেন না। বলবেন কোন্ কম্মে? কানে তো কিছুই শুনতে পান না তিনি। গায়ে হাত দিয়ে ইশারা করলে তবেই বোঝেন কিছুটা। আপনাকে কয়েকটা ইশারা শিখিয়ে দেব।

ঢুকলাম ভেতরে। দেখলাম, আমীর উমাইর একটা পালঙ্কের ওপরে

শুয়ে রয়েছেন। এমন হাড়িডসার হয়ে পড়েছেন যে বুকের পাঁজরাগুলিও স্বচ্ছন্দে গোনা যায়। রক্তশূন্য। প্রথমে তো আমি চিনতেই পারিনি। চোখেও তার দৃষ্টি বলতে কিছু নেই। কুর্নিশ করলাম ; অভিবাদন জানালাম। কাকস্য পরিবেদনা। ওপাশ থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই।

ক্রীতদাসটি আমাকে ফিসফিস করে বলল—কবিতা ছাড়া কিছু শুনতে পান না উনি।

কথাটা শুনে বেশ ঘাবড়ে গেলাম। একটু অসহায়-ও মনে হল নিজেকে। অবশ্য এ-অবস্থা বেশীক্ষণ থাকে নি। যেন অনেক দূর থেকে বলছি এই রকম উদাত্ত কণ্ঠে কবিতা বলতে শুরু করলাম—

> এখনও বুদুর তোমার ক্ষত-বিক্ষত আত্মাকে
> শিক্ষা দিচ্ছে। অথবা, তুমি কি এখনও তার
> নির্দেশ দেখতে পাচ্ছ না ? অথবা, এখনও কি
> তুমি বিনিদ্র রজনী যাপন করছ ?
> তুমি মূর্খ, মূর্খ, প্রেমিক মূর্খ তুমি।

এতেই কাজ হল। ধীরে-ধীরে চোখ খুলল জুমাইর। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল—স্বাগতম, ইবনু বিন-মনসুর। আমার অবস্থা তো দেখছেন। সব বিলিয়ে দিয়ে আজ আমি ফকির।

—আজ্ঞে, আপনার কি কোন কাজে লাগতে পারি ?

—কেবল আপনিই পারেন আমাকে বাঁচাতে। আমার একখানা চিঠি কি আপনি দয়া করে বুদুরের কাছে পেঁছে দিয়ে আমার সব কথা তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন ? আপনি ছাড়া আর কেউ একাজ পারবে না।

আপনার আদেশ শিরোধার্য।

অবাক কাণ্ড ! মুখ থেকে কথাটা বেরোতে না বেরোতে উমাইর পালঙ্ক থেকে উঠে বসল। তারপরে হাতের তালুতে এক টুকরো কাগজ নিয়ে লিখতে শুরু করল—

প্রিয়তমে,

আমি বোধহয় পাগল হয়ে গিয়েছি। হতাশার অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। এক সময় ভেবেছিলাম ভালবাসাটা বোকামি ; ভেবেছিলাম, ওর মত সহজ আর হালকা জিনিস আর নেই। কিন্তু তোমার অদৃশ্য ভালবাসার উত্তাল তরঙ্গের ধাক্কায় প্রতিদিনই আমি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি। ভালবাসাকে একদিন তুচ্ছ করেছিলাম। আজ মনে হচ্ছে এ মহাসাগরের সীমাও নেই, তলও নেই। হৃদয় আমার আজ ক্ষতবিক্ষত। তোমার কাছে না গেলে এ ক্ষত আমার সারবে না। তোমার বুকে আমার স্থান দাও। বিগত দিনের কৃতকর্মের জন্যে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি নতজানু হয়ে। আমাকে দয়া করে ক্ষমা কর। ভেবে দেখ, একদিন আমরা দুজনে দুজনকে কত ভালই না বাসতাম। তোমার বিরহে আমি মারা যাব। এতটা নিষ্ঠুর নিশ্চয় তুমি হবে না...ইত্যাদি—ইতি...

চিঠিখানা ভাঁজ করে খামের মুখ বন্ধ করল উমাইর। তারপরে

শিলমোহর করে আমার হাতে তুলে দিল। বদরের কী হয়েছে তাও জানি নে। তা সত্ত্বেও, খামটা আমি নিলাম। আবার ছুটলাম বদরের বাড়ির দিকে। সামনের বাগান পেরিয়ে সোজা ভেতরে চলে গেলাম। কাউকে কিছু বললাম না।

বসার ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলাম। মেঝেতে কার্পেট পাতা। দশটা ফরসা রঙের বাঁদী গোল হয়ে বসেছে বদরকে মাঝখানে রেখে। মনে হয় যেন সূর্য উঠেছে। চেহারায় চেকনাই দিয়েছে আগের চেয়ে অনেক বেশী। স্বাস্থ্যটাও বেশ ভাল হয়েছে। যৌবনের পুরো জোয়ার লেগেছে তার শরীরে। পরিধানে ছিল ওর সকালের পোশাক। কুর্নিশ করে জিজ্ঞাসা করলাম। আমার কথার জবাবে সে একটু হেসে বলল—আসুন, আসুন—ইবন আল-মনসুর ; কোন সংকোচ করবেন না। এতো আপনারই বাড়ি।

—আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। সব ভাল তো ? তা এখনও তোমার গায়ে সকালের পোশাক কেন ?

—আর বলবেন না, মনসুর সাহেব। সেই মেয়েটি মারা গিয়েছে। ওই বাগানে তার কবর। বলতে-বলতে ফুঁপিয়ে ওঠে মেয়েটি। বাঁদীরা তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে।

ভেবেছিলাম কথা বলব না। কিন্তু শেষে বললাম—পরম করুণাময় ঈশ্বর, তোমার মঙ্গল করুন, তার আত্মাকে শান্তি দিন। তুমি মেয়েটিকে খুব ভালবাসতে, দেখেছি। মেয়েটিও ভালবাসত তোমাকে। তার জন্যে যে তোমার কান্না পাবে সে কথাও ঠিক। খোদাতালা তাকে তাঁর কাছে টেনে নিয়েছেন।

—হ্যাঁ ; মেয়েটা আমার খুব প্রিয় ছিল।

বেশ নরম হয়ে পড়েছে বদর। ভাবলাম, এই সময়। আর দেরি না করে উমাইর চিঠিটা তাকে দিয়ে বললাম—তোমার জবাবের ওপরে তার জীবন মরণ নির্ভর করছে, বদর। তোমার উত্তরের আশায় বেচারার প্রাণটুকু এখনও কোনমতে টিকে রয়েছে।

চিঠিটা পড়তে-পড়তে বদরের মুখে তেতো হাসি ফুটে বেরোল। তারপরে সে বলল—এত গত বছরই না সে ঘেন্নায় আমার চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছিল ? আর এরই মধ্যে আমার অভাবে সে একেবারে মরমর ! থাক ; আমার উদ্দেশ্য সার্থক। গত বছর আমি তাকে আর কোন খবর দিই নি। আমার উদাসীনতা তাকে ক্রমেই হতাশ করেছে। সে যাতে আবার আমাকে ভালবাসতে শুরু করে তার জন্যে আমি কী না করেছি। কিন্তু প্রতিবারই সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

ভোর হয়ে আসছে দেখে চুপ করল শাহরাজাদ।

তিনশো একান্নতম রজনী :

পরদিন রজনীতে আবার শুরু করল শাহরাজাদ।

আমি বললাম—ঠিকই করেছ তুমি। সে যে অন্যায় করেছে তার জন্যে সামান্য একটু গালাগালি দিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়াটা তোমার উচিৎ হবে না। তবে একটা কথা আমি বলি। ক্ষমা কিন্তু মানুষের আত্মার একটি মহৎ গুণ। তা ছাড়া আরও একটা কথা রয়েছে। এই বিশাল প্রাসাদে এই

রূপ আর যৌবন নিয়ে একা একা নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে লাভ কী হবে তোমার? সে যদি মরেই যায়, তাহলে তুমিই কি শান্তি পাবে? সারা জীবনটা কি তোমার কষ্ট আর অনুশোচনায় কাটবে না?

—আপনি বোধ হয় ঠিকই বলেছেন। আমি তার চিঠির জবাব দেব।

তারপরে কাগজ-কলম নিয়ে সে লিখতে বসল। জাঁহাপনা, আপনাকে কী বলব সে চিঠির যেমন ভাব তেমনি ভাষা। ভাবে ভাষায় একেবারে গলাগলি। আপনার রাজত্বের সবচেয়ে ভাল লেখকও বোধ হয় ওভাবে লিখতে পারবেন না। আমি অবশ্য হুবহু উদ্ধৃতি দিতে পারব না; সেই চিঠির বিষয়বস্তুটাই কেবল আমি নিজের ভাষায় বলছি—

প্রিয়তম,

আমাদের যে কেন বিচ্ছেদ ঘটেছিল অনেক চেষ্টা করে তা আমি জানতে পারি নি। অতীতে আমার কোন অপরাধে হয়ত সেই বিচ্ছেদ সম্ভব হয়েছিল। তবে, সে-অতীতের আজ মৃত্যু হয়েছে। অতীতের সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে অসূয়াটুকুরও।

তুমি আমার কাছে কবে ফিরে আসবে তারই পথ চেয়ে বসে থাকব প্রিয়তম। তোমার গালে চোখ দুটো ডুবিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব আমি। কতকাল যে ঘুমোইনি, তা জান? এবার সোনার মিষ্টি ঘুম আসছে, জেনে কতই না আনন্দ হচ্ছে।

যে পানীয় জীবনের সব তৃষ্ণা মেটাতে পারে তুমি এলে আমরা দুজনে সেই পানীয় আকণ্ঠ পান করব। কেমন? পান করতে-করতে যদি মাতাল হয়ে যাই তাহলেও কেউ আমাদের কিছু বলবে না, বলার কেউ নেই।

তোমার আসার পথ চেয়ে রইলাম।

—ইতি

বুদুরের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে বললাম—এই চিঠিখানা তাকে নিঃসন্দেহে চাঙ্গা করে তুলবে। সব দুঃখের অবসান হবে তার।

আমি বেরিয়ে আসব এমন সময় আমার জামার আস্তিন ধরে বলল—মনসুর সাহেব, আজ রাত্রেই আমরা দুজনে বেহেস্তের রাত তৈরি করতে পারি—একথা তাকে বলতে পারেন।

আমার যা আনন্দ হচ্ছিল তা আর আপনাকে কী বলব জাঁহাপনা! প্রায় ছুটতে ছুটতে আমীর উমাইর-এর বাড়ি চলে গেলাম। দেখলাম, আমীর সাহেব দরজার দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে বসে রয়েছে।

চিঠিখানা পড়তে-পড়তেই তার চোখ দুটো জলে ভরে টইটুম্বর হয়ে গেল। আনন্দে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। হঠাৎ সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। ধীরে-ধীরে জ্ঞান ফিরে এলে সে জিজ্ঞাসা করল—ও কি নিজের হাতে এ চিঠি লিখেছে?

বললাম বিলক্ষণ। পায়ে করে কেউ চিঠি লিখতে পারে এতো আমি জানতাম না।

আমার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই পেছনের দরজায় চুড়ির ঝুনঝুন শব্দ আর সিল্কের কাপড়ের খসখস আওয়াজ আমার কানে এল। মনে হল, কোন মহিলা যেন পড়ি-কি-মরি ভাবে ছুটে আসছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ; যা ভেবেছি

তাই। হুড়মুড় করে ছুটে এল বুদুর। সে এক অপরূপ দৃশ্য জাঁহাপনা। ভাষায় বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই। দুটি প্রেমিক-প্রেমিকা বিপরীত দিক থেকে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এসে পরস্পরের কণ্ঠলগ্ন হয়ে একেবারে এক হয়ে গেল। কথা বলার শক্তি কারও নেই। থাকবে কেমন করে? এক জনের ঠোঁট যে আর একজনের মুখের মধ্যে।

তাঁরা দাঁড়িয়ে রইল আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে। প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে নিয়ে জুমাইর বুদুরের হাত ধরে তাকে বসতে বলল। কিছুতেই বসবে না বুদুর। অনেক অনুনয় বিনয়, সাধ্য-সাধনাতে তাকে বসানো গেল না। জুমাইর তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ই আল্লা, তরীটা তীরে এসে শেষ পর্যন্ত ডুবে যাবে নাকি?

আমি বললাম—কী হল বুদুর? বস!

—আমাদের মধ্যে চুক্তি হলেই আমি বসব।

—কিসের চুক্তি? —কিছুটা অবাক হয়েই প্রশ্নটা করি আমি।

বুদুর বলল—সেটা আমাদের দুজনের ব্যাপার। —এই বলে সে তার মনের মানুষের কানে-কানে কী সব কথা যেন ফিসফিস করে বলল। আমি অবশ্য শুনতেও পাই নি, বুঝতেও পারি নি।

জুমাইর বলল—বুঝতে পেরেছি। নিশ্চয় সেটা এখন করতে হবে।

এই বলে একটা ক্রীতদাসকে ডেকে সে যেন কিছু একটা নির্দেশ দিল।

কিছুক্ষণ পরে দেখি একজন কাজী এসে হাজির; তার সঙ্গে একজন সাক্ষী। শাদীর শর্তাবলী লেখা হল দুজনের। তারপরে দুজনকে শাদীর হলফনামা পড়ানো হল। তারা যখন চলে গেল বুদুর তাদের প্রত্যেককে এক হাজার করে দিনার দিয়ে দিল। খুব তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে গেল। তারা যখন চলে গেল। কাজীদের সঙ্গে আমিও চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছি এমন সময় আমীর বাধা দিয়ে বলল—দুখের দিনে আমাদের বন্ধু ছিলেন আপনি। সুখের দিনে আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন এ কেমন কথা?

কী আর করি। "আনন্দের ভোজে কে না যোগ দিতে চায় বলুন। বলুন, জাঁহাপনা।"

সারা রাত ধরে খানা পিনা আর হই হুল্লোড় চলল। আমার জন্যে ঘর একটা আগেই ঠিক করা ছিল। ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সেই ঘরে বিশ্রাম নিতে আমি চলে গেলাম।

পরদিন ঘুম ভাঙতে স্বাভাবিক ভাবেই দেরি হয়ে গেল আমার। গোছল সেরে প্রার্থনায় বসলাম। তারপরে বসার ঘরে গিয়ে তাদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে নবদম্পতী এসে হাজির হল। বাঃ! এক রাত্রির মধ্যেই তাদের চেহারা একেবারে পালটে গিয়েছে। চেনাই যাচ্ছে না আর। সুখ আর তৃপ্তিতে ঝকঝক করছে তাদের মন। সদ্য গোছল করে এসেছে তারা—দেখতে তাজা গোলাপ ফুলের মত। খুব ভাল লাগছিল আমার। তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বললাম—ভালোয় ভালোয় সব চুকে গিয়েছে। তোমাদের এই মিলনে আমারও কিছু ভূমিকা রয়েছে। এবার আমার বিদায় নেওয়ার পালা। যাওয়ার আগে একটা কৌতূহল মেটানোর

ইচ্ছে রয়েছে।

—কী আপনার কৌতূহল?—প্রশ্ন করল আমীর।

জিজ্ঞাসা করলাম—প্রথম দিন যখন তোমার বাড়িতে এলাম সেদিন দেখলাম তুমি বেশ চটে রয়েছ। কেন বলত? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে—তোমাদের বিচ্ছেদ হয়েছিল কেন? বন্দরের কথা আমি অবশ্য আগেই শুনেছি। বন্দরের বাচ্চা বাঁদী ওর খোঁপা বেঁধে দিচ্ছিল। তাই দেখে তুমি রেগে ওর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলে। এটা অবশ্য ওরই কথা। কিন্তু আমার মনে একটা খটকা লেগেছে। একমাত্র ওই তুচ্ছ ঘটনাটাই কি তোমার সেদিন বেরিয়ে আসার কারণ ছিল? আমার ধারণা, এর পেছনে নিশ্চয় অন্য কোন বড় কারণ রয়েছে। সেটা কী?

আমীর মৃদু হেসে বলল—আপনি যথেষ্ট বিজ্ঞ, এবং বুদ্ধিমান। বন্দরের সেই মেয়েটা মরে গিয়েছে। আমার রাগও তাই কমে গিয়েছে। তবে আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিটা প্রথম কেমন করে হল সেটা বলতে এখন আর কোন অসুবিধে আমার নেই।

—তাহলে বল।

—ব্যাপারটা খুবই সামান্য। আমরা একবার নৌকায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে বন্দরও ছিল। ওদের কয়েকটা ব্যাপার দেখে মাঝি আমাকে আড়ালে বলল—মালিক, যে মেয়ে তার স্বামীর চেয়ে বাঁদীকে বেশী ভালবাসে আর সেই বাঁদীকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে মস্করা করে, সেই বউকে কি কোন স্বামী বরদাস্ত করতে পারে? জানেন, ওরা একদিন আমার নৌকায় বসে জড়াজড়ি করে প্রেমের গান গাইছিল। কী সাংঘাতিক সে গান। শুনে তো আমি ভির্মি খাই আর কী! শুনবেন?

আমার ভেতরে যতটুকু উষ্ণতা রয়েছে
সবই ঠাণ্ডা হয়ে গেল।
কারণ, আমার প্রেমিক আর আগের মত নেই
তার প্রেম তাই গরল হয়ে গেল।
আজকাল আমি যতই ছলা-কলা দেখাই না কেন
তার পরিবর্তন হয়েছে অনেক।
তার হৃদয়টা এখন মাথায় রূপান্তরিত
তার বাকি সবই নরম তুলতুলে।

মাঝির কথা শুনে আমার মাথা গেল ঘুরে; চোখে নামল অন্ধকার! সত্যিই তো!! একদিন দৌড়ে গেলাম বন্দরের বাড়ি। যা দেখলাম সে কথা আপনি আগেই বলেছেন। মাঝির সন্দেহটা তাহলে মিথ্যে নয় সেটা আমি নিজের চোখেই দেখে এলাম। যাক গে; সে সব এখন অতীত। যা অতীত তা অতীত-ই থাক। আমরা দুজনে ওসবই ভুলে যাব।

ভোর হয়ে আসছে দেখে চুপ করে গেল শাহরাজাদ।

তিনশো বাহাত্তরতম রজনী:

পরের দিন রজনীতে আবার শুরু করল শাহরাজাদ:

কথা শেষ করে আমীর আমার দিকে একটা দিনারের থলে এগিয়ে দিয়ে

বলল—আপনি আমাদের জন্যে যা করেছেন সারা জীবনে তা আমরা ভুলতে পারব না। আপনি মাঝখানে না দাঁড়ালে হয়ত আমরা মারাই যেতাম। এটার মধ্যে তিন হাজার দিনার রয়েছে। আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এটা আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে। তা না হলে আমরা দুঃখ পাব।

আমি তাদের আর দুঃখ দিতে পারলাম না। থলেটা নিয়ে তাদের আশীর্বাদ করে বেরিয়ে এলাম।

যা বাবা! ওটা কিসের আওয়াজ! মনসুর সাহেব গল্প থামিয়ে যে দিক থেকে আওয়াজটা আসছিল সেই দিকে তাকালেন। তাজ্জব কী বাত্ রে বাবা! খলিফা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। আর এদিকে মনসুর সাহেব আপন মনে গল্প বলে যাচ্ছেন। মনসুরের সুন্দর গল্পটি শুনতে শুনতে খলিফার বিক্ষিপ্ত চিন্তা কখন শান্ত হয়েছে, কখন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন তা তিনি টেরই পান নি। পাছে হারুন অল-রসিদের ঘুম ভেঙে যায়। এই ভয়ে পা টিপে-টিপে তিনি বেরিয়ে এলেন খাস কামরার বাইরে। আরও আস্তে-আস্তে প্রধান খোজা প্রধান ফটক খুলে দিল। মনসুর বাইরে চলে গেলেন।

গল্প শেষ করে শাহরাজাদ চুপ করে বসে রইল একটু; তারপরে শাহরিয়ারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল—আশ্চর্য জাঁহাপনা, যে গল্প শুনে হারুন অল-রসিদ ঘুমিয়ে পড়লেন সেই গল্প শুনে আপনার চোখে ঘুমের বাষ্পটুকুও তো দেখা যাচ্ছে না!

শাহরিয়ার বললেন—ঘুম যাতে না আসে সেই জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি আমি। ঘুম আসবে কেমন করে? তুমি একটা শিক্ষামূলক গল্প বল দেখি, শুনি।

—কী ধরণের গল্প জাঁহাপনা?

ধর, কোন মেয়েদের গল্প—যে মেয়েরা স্বামীদের মনে কেবল নারী দেহের কামনা জাগায়, আর তাকে ভোগের পথে টেনে কবরের দিকে টেনে নেয়—এই রকম একটা গল্প। এই জাতীয় মেয়েদের কী রকম শাস্তি হবে তোমার গল্পের মধ্যে সেটারও ইঙ্গিৎ থাকে যেন।

শাহরাজাদ কিছুক্ষণ ভাবল; তারপরে বলল—জাঁহাপনা, এই জাতীয় একটা ভাল গল্প আমার মনে পড়েছে। সেইটাই বলছি। আপনি শুনুন।

এক সময় কায়রোতে ওয়ার্দা নামে একটি লোক থাকত। পেশায় লোকটা ছিল কসাই। কায়রো শহরে লোকটার একটা মাংসের দোকান ছিল। তার দোকানে একটি মেয়ে রোজ মাংস কিনতে আসত। মেয়েটির গায়ের রঙ বিবর্ণ, চোখ দুটো বড় ক্লান্ত। তার সঙ্গে থাকত একটা বিশেষ কুলি। কুলিটার মাথায় থাকত একটা ঝাঁকা। দোকানে এসে ভেড়ার সব চেয়ে মাংসল অংশটা কিনত; সঙ্গে নিত ভেড়ার এক জোড়া রাং। মাংস কিনে দাম দিয়ে যেত একটি করে সোনার ছোট মোহর। টুকরোটার দাম ছিল দুই

দিনার। মাংসটা কুলির ঝুড়িতে চাপিয়ে বাজারের অন্য অনেক দোকানেই সে ঘুরে-ঘুরে জিনিস কিনত। মেয়েটির গতিবিধিও ছিল প্রায় একই রকম। কারও সঙ্গেই সে প্রায় কথাবার্তা বলত না।

অনেক দিন ধরে একইভাবে আসা-যাওয়ার পরে কেমন যেন কৌতূহল হল ওয়ার্দার। মেয়েটির সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে হল তার। কিন্তু মেয়েটি তো নির্বাক। জানবে কেমন করে? তাই সে অপেক্ষা করতে লাগল।

একদিন সুযোগ এল। সেদিন মেয়েটির কুলি একাই যাচ্ছিল দোকানের পাশ দিয়ে তাকে ডাকল কসাই। সে এসে দাড়ালে তার হাতে বড় একটা ভেড়ার মাথা দিয়ে বলল—বাবুর্চিকে বলবে মাথাটা যেন সে গোটাই রান্না করে। আমি ছাড়িয়ে ঠিক করে দিয়েছি। আর বেশী কাটাকুটি করলে ওর স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে। ···তা হ্যাঁগো সাহেব, ওই যে মেয়েটি রোজ তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে বাজারে আসে ও কে বলত! ওর ব্যাপারটা আমার ঠিক মাথায় ঢুকছে না। ও থাকে কোথায়? মেয়েটি প্রতিদিন মাংসের সঙ্গে একটা করে অন্ডকোষ নিয়ে যায় কেন? ওকে সব সময় এত ক্লান্ত দেখায় কেন? কিছু বলতে পার?

কুলিটি বলল—আপনার খুব জানার ইচ্ছে, তাই না? আমি অবশ্য বেশী কিছু জানি না। তবে এই গরীবকে দয়া করে বিনা পয়সায় আপনি অত বড় একটা ভেড়ার মাংস দিলেন আপনাকে না বলে পারি?··; যেটুকু জানি তাই আপনাকে বলছি।···

—তাই বল।

বাজার করা শেষ হয়ে গেলে আমার মালকিন ওই কোণের খ্রীষ্টানের দোকানে গিয়ে একদিন খাওয়ার মত সরাব কেনে। তার পরে আমাকে সঙ্গে করে ধনী উজিরের বাগানবাড়িতে যান। সেখানে একখানা কাপড় দিয়ে আমার চোখ দুটো বেঁধে দেন; তারপরে আমার একটা হাত ধরে নিয়ে যান একটা সিঁড়ির কাছে। সিঁড়ি দিয়ে আমরা নিচে নামতে থাকি। খানিকটা যাওয়ার পরে কেউ একজন আমার মাথা থেকে ঝুড়িটা তুলে নিয়ে আমার হাতে আধ দিনার গুঁজে দেয়। তারপরে সেই চোখ-বাঁধা অবস্থায় আমাকে আবার ওপরে পেঁছে দেয়। আমিও চলে আসি। তার পরের দিন ওই একই ব্যাপার ঘটে। অত মাংস, বাদাম, মোমবাতি দিয়ে কী করেন তা আমি জানি নে।

কসাই বলল—আমার কৌতূহলটা তুমি আরও বাড়িয়ে দিলে ভাই।

এমন সময় দোকানে দু'চার জন খদ্দের এসে পড়ায় সেদিন এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু কথা হয় নি। কিন্তু ওয়ার্দার ভাবনাটা কাটলো না। এমন কি সারা রাত ধরেই মেয়েটির কথা সে ভাবতে লাগল।

পরের দিন যথা রীতি সেই মেয়েটি সেই কুলিটাকে নিয়ে দোকানে মাংস কিনে আর তার দাম দিয়ে বাজারের মধ্যে ঢুকে গেল। সে মনে-মনে ঠিক করে নিল যেমন করে হোক ব্যাপারটা আমাকে জানতেই হবে—আর আজই। কখন সে বাজার থেকে বেরিয়ে যাবে সেই তক্কে রইল সে। মেয়েটি যেই বাজার থেকে বেরোল অমনি কসাই একটা বাচ্চা ছেলের ওপর দোকানের

ভার দিয়ে তার পিছু নিল। তার হাতে যে পাঁঠা-কাটা ভোজালিটা ছিল সেটাও ভুলে সে সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

মেয়েটি যাতে তাকে দেখতে না পায় এইভাবে আড়ালে-আড়ালে লুকিয়ে সে তার পিছু পিছু চলতে লাগল। ধনী উজিরের বাগানের সামনে হাজির হল মেয়েটি। সে-ও একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখল, কুলির চোখ বেঁধে হাত ধরে তাকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে মেয়েটি। তারপর আবার কিছুক্ষণ পরে চোখের বাঁধন খুলে কুলিটি বেরিয়ে গেল সেখান থেকে। আরও একটু অপেক্ষা করল ওয়াঁদা। তারপরে গাছের আড়ালে নিজেকে ঢেকে খুব সন্তর্পণে সে মেয়েটিকে অনুসরণ করল। যেতে-যেতে একটা বড় পাথরের চাঁই-এর সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটি। চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখল। তারপরে পাথরের একটা বিশেষ জায়গায় আঙুলের চাপ দিল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা গর্ত বেরিয়ে পড়ল। সেই গর্তের মুখে দেখা গেল একটা সিঁড়ি। মেয়েটি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গর্তের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ওয়াঁদা-ও সেই পাথরের কাছে এগিয়ে গেল। চাপ দিল পাথরের গায়। তারপরে সিঁড়ির ওপরে নেমে এল। এর পরে কসাই-এর জবানীতে শুনুন কাহিনীটা।

গর্তের মুখটা বন্ধ করে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেল। কোন দিকে যাব তা আমি প্রথমে বুঝতে পারি নি। তারপরে দেখলাম কোথা দিয়ে যেন একটু আলো আসছে। সেই আলো ধরে বুড়ো আঙুলের ওপরে ভর দিয়ে খুব আস্তে-আস্তে আমি এগিয়ে গেলাম। উত্তেজনায় আমার বুক ধড়পড় করে কাঁপছিল তখন। কিছুটা যাওয়ার পরেই একটা দরজা পেলাম। দরজার ওপরে কান পেতে শুনলাম ভেতরে খুব হাসির হুল্লোড় চলছে। কে যেন শুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে ভেতরে সেই সঙ্গে ভেসে আসছে নানান ধরণের আওয়াজ। দরজার গায়ে একটা ফোকর ছিল। সেই ফোকরের ভেতর দিয়ে আলো আসছিল বাইরে। সেই ফোকরে চোখ রেখে দেখলাম। হ্যাঁ; সেই মেয়েটাই বটে। মেয়ে একটা পালঙ্কে শুয়ে রয়েছে; আর একটা বেশ বড় বাঁদর মেয়েটাকে দলাই-মালাই করছে। বানরের মুখ অনেকটা মানুষের মুখেরই মত।

একটু পরে মেয়েটা উঠে পড়ল; তারপরে জামা কাপড় খুলে উলঙ্গ হয়ে আবার সে পালঙ্কের ওপরে শুয়ে পড়ল। বাঁদরটা উলঙ্গ মেয়েটার বুকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল; তারপরে সজোরে জড়িয়ে ধরল মেয়েটিকে। সারা শরীর দিয়ে ঢেকে দিল তাকে। কিছুক্ষণ পরে ক্লান্ত হয়ে বাঁদরটা উঠে পড়ে একটু বিশ্রাম নিল। তারপরে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটির ওপরে। আবার আগের মত মেয়েটির বুকের ওপরে শুয়ে নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে নিল তাকে। আর আশ্চর্যের কথা, প্রতিবারই মেয়েটি গভীর সুখে বানরটাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল, সোহাগ করল—মানুষ যেমন সঙ্গমের সময় নারীকে সোহাগ করে ঠিক সেই রকম। এই রকম বার দশেক করার পরে দুজনেই এলিয়ে বিছানার ওপরে ঢলে পড়ল; তারপরে পড়ল ঘুমিয়ে। আর কারও

সাড়াশব্দ নেই।

ভোর হয়ে আসছে দেখে থেমে গেল শাহরাজাদ।

তিনশো তিপান্নতম রজনী :

পরের দিন রাত্রিতে শাহরাজাদ আবার শুরু করল গল্প :

কসাই বলল—আমার অবস্থাটা সহজেই আপনারা বুঝতে পাচ্ছেন। আমি যেন বোবা হয়ে গেলাম। এরকম মেয়ে থাকে? ওরা ঘুমোচ্ছে। এমন সুযোগ আর আসবে না বুঝতে পেরে কাঁধ দিয়ে চাপ মেরে দরজা খুলে লাফ দিয়ে ঢুকলাম। হাতে আমার কসাই-এর ছুরিটা তখন কাঁপছে। লোকে বলে এই ছুরিটা মাংস কাটার আগে হাড়ে গিয়ে পেঁছিয়। এত ধার ছুরিটার।

সেই ছুরি নিয়ে ঘুমন্ত বাঁদরটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে তার শিরটা ধড় থেকে নামিয়ে দিলাম। মরার আগে গলার ভেতর থেকে একটা বীভৎস আর্তনাদ বেরিয়ে এল। রক্তে ভেসে গেল সারা ঘর। ভীষণ ধড়পড় করতে-করতে স্থির হয়ে গেল দেহটা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মেয়েটির। চোখ খুলে দেখে রক্তে মাখা ছোরা হাতে নিয়ে আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছি। বুঝতে পেরেই সে এমন জোরে চেঁচাতে আরম্ভ করল যে মনে হল সে বুঝি মরেই যাবে। চেঁচাতে-চেঁচাতে হঠাৎ সে অজ্ঞান হয়ে গেল। চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলাম তার। তারপরে মেয়েটা ধাতস্থ হল, চিনতে পারল আমাকে।

—তুমিই সেই ওয়ার্দা। একজন ভাল খদ্দেরকে কী পুরস্কার দিলে!

বললাম—ওই জানোয়ারটার হাত থেকে তোমাকে মুক্তি দিলাম। কিন্তু তোমাকে আনন্দ দেওয়ার মত কি পুরুষ নেই দুনিয়ায়? একটা জানোয়ারের সঙ্গে তোমাকে⋯;⋯

মেয়েটি বলল—আগে আমার কাহিনীটা মন দিয়ে শোন ওয়ার্দা। তাহলে আমাকে খানিকটা বুঝতে পারবে।

বলি—তোমার কাহিনী কী শুনি।

মেয়েটি বলল—আমি ধনী উজিরের একমাত্র মেয়ে। পনের বছর বয়স পর্যন্ত বাবার বাড়িতে আমার সুখেই কেটেছিল। আমাদের একটা নিগ্রো ক্রীতদাস ছিল। একদিন আমি তারই পাল্লায় পড়লাম। তুমি বোধ হয় জান, মেয়েদের ভেতরের কামনা জাগাতে ওদের জুড়ি আর কেউ নেই। বিশেষ করে তরুণী মেয়েদের যৌবনের খিদে মেটাতে ওরা ওস্তাদ। তা ছাড়া, আমার গড়নটা এমনি ছিল যে সেই বয়সেই আমাকে বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে বলে মনে হোত। ওই নিগ্রোর কাছেই আমি প্রথম যৌবনের স্বাদ পেলাম। খিদেটাও এমন বেড়ে গেল যে প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় ওই নিগ্রোর সঙ্গ সহবাস না করলে আমার চলত না।

ভালই চলছিল; কিন্ত একটা দুর্ঘটনায় নিগ্রোটি হঠাৎ মারা গেল একদিন। পুরুষের সঙ্গে সহবাসের স্বাদ যে পেয়েছে সে সি চুপ করে থাকতে পারে? পুরুষ সঙ্গ না পেয়ে আমি দিন-দিন অস্থির হয়ে উঠতে লাগলাম। এমনি সময় আমাদের বাড়ির এক বুড়িকে সব খুলে বললাম। সে বলল—এ জগতে ওসব ব্যাপারে নিগ্রোদের চেয়ে উপযুক্ত মানুষ আর নেই বাছা।

তোমার যে কষ্ট হবে সে আর এমন কথা কী? তবে নিগ্রো যদি না-ই পাও তাহলে অগত্যা গরিলার মত দেখতে কোন একটা বাঁদরই বেছে নাও। এসব কাজে বাঁদরাও বিশেষ দক্ষ।

কিন্তু ওই জাতীয় বাঁদরই বা পাই কোথায়? আমার যে আর তর সইছে না। বাঁদর খোঁজার চেষ্টায় ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এমন সময় দেখলাম আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে একটা লোক কতকগুল বাঁদর নিয়ে যাচ্ছে। আমার বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করতে লাগল। লোকটা আমার জানলার দিকে এগিয়ে এল। নাকাব সরিয়ে বানরগুলির দিকে তাকালাম আমি। কী করব, কী করব ভাবছি; এমন সময় দেখলাম লোকটার দলের বেশ একটা বড় ধরনের বাঁদর আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেই বড় বাঁদরটা আমাকে দেখে কী ভাবল কে জানে। হঠাৎ সে তার শেকল ছিঁড়ে লাফ দিয়ে রাস্তার ওধারে চলে গেল; তারপরেই হাওয়া। লোকটা অনেক খোঁজা-খুঁজির পরেও বাঁনরটাকে খুঁজে না পেয়ে হায়রানি হয়ে শেষ পর্যন্ত চলে গেল। বাঁদরটা এতক্ষণ আমাদের বাগানের এক কোণে লুকিয়েছিল। লোকটা চলে যাওয়ার পরে সে সটান আমার ঘরের ভেতরে চলে এল। আসার সঙ্গে-সঙ্গে এক মুহূর্ত দেরী না করে সে আমাকে জাপটে ধরে ফেলল। প্রথম-প্রথম আমার গা-টা ঘিনঘিন করত; তারপরে, অভ্যাস হয়ে গেল। এখন বেশ আরামই হয়।

শেষে একদিন বাবা সব ধরে ফেললেন। আমাকে সেদিন তিনি বেদম প্রহার করেছিলেন। কিন্তু ওকে ছাড়া আমি বাঁচব কেমন করে? তাই ওকে লুকিয়ে রাখার জন্যে এই মাটির তলায় ওর ঘর বানিয়ে দিয়েছি। এতে ও বাঁচলো; আমি যথারীতি আনন্দ পেতে লাগলাম। রোজই ওর জন্যে আমি খাবার এনে দিই, এনে দিই সরাব। কিন্তু এখন আমার কী হবে? আমি কাকে নিয়ে বাঁচব?

বলতে বলতে মেয়েটা ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলল।

আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—কেঁদো না। তোমার কাজ চলা নিয়ে কথা। বাঁদরের বদলে আমিই তোমার কাজ চালিয়ে যাব। দেখবে, ওই বাঁদরটার চেয়ে আমার ক্ষমতা মোটেই কম নয়। আমি বেশ ভাল ঘোড়ায় চড়তে পারি। লোকে বলে শুধু ঘোড়া নয়, আর সব ব্যাপারেই কারও ওপরে চড়ার সুযোগ পেলে আর কিছু আমি চাই নে।

আমার প্রস্তাবে রাজি হল মেয়েটি। কেবল সেদিনই নয়; তারপর থেকে প্রতিদিনই আমি তার কাছে যেতাম আর তাকে বহুৎ আনন্দ দিতাম। তাকে আনন্দ দিতে আমারও বেশ ভাল লাগত। একদিন সে স্বীকারই করে ফেলল যে এসব ব্যাপারে বাঁদরের চেয়েও আমার শক্তি আর কৌশল অনেক বেশী। ফলে উৎসাহ পেয়ে আমি দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে তার কাছে যেতে লাগলাম।

কিন্তু এসব জিনিস একভাবে বেশী দিন চলে না। প্রথমে লোভে পড়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম বটে; কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরেই আমার শক্তি কমে গেল। সমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে মানুষ যেমন অনতিবিলম্বেই হাবুডুবু খেতে থাকে আমার অবস্থাও সেই রকম দাঁড়াল। তীরে বোধ হয় আর পেঁছুতে

পারব না। এদিকে মেয়েটির কামনায় যেন ঘি পড়ল। তার কামনা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। প্রতিদিনই সে উগ্র থেকে উগ্রতর হয়; আমাকে গ্রাস করে ফেলে। দুর্বার হয়ে ওঠে সে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাকে ছাড়িয়ে সে সামনে এগিয়ে যায়। পেছোতে সে আমাকে কিছুতেই দেবে না। আমারও শক্তি নেই তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার। এমন বিপদেও পুরুষ মানুষে পড়ে? ই আল্লা!

পরিস্থিতিটা এই রকম জটিল হয়ে উঠলে একটি বুড়ির সঙ্গে আমি কিছুটা শলাপরামর্শ করলাম। বুড়িটা তুকতাক জানত; তা ছাড়া, গোপন রোগ সারানোর দাওয়াই তো জানত অনেক। অনেকের অনেক রোগই সে নাকি সারিয়ে দিয়েছে। সমস্ত ঘটনা তাকে খুলে বললাম—দস্যি মেয়েটার ক্ষিদে মেটাতে পারি এমন একটা দাওয়াই আমাকে দাও। এমন একটা ওষুধ দাও যেটা খাইয়ে তাকে শান্ত করতে পারি।

দাদি বলল—রোগটা বড় সোজা নয়রে সাহেব।

—দেখ দাদি, তুমি তো বাপু আজকের মানুষ নও। সব চুলই তোমার পেকে শাদা হয়ে গিয়েছে। তোমার নামডাক কত! আমি জানি, অনেক লোককেই তুমি ওষুধ দিয়েছ। তুমিই পারবে আমাকে বাঁচাতে।

—দেখি, কী করতে পারি।

এই বলে বুড়ি একটা মাটির হাঁড়ি নিল। তার ভেতরে ঢালল মিশরীয় লুপিন গাছের একমুঠো বীজ, এক গ্লাস ভিনিগার, দু' ছটাক হপ গাছের ছাল; আরও কিছু গাছ-গাছড়ার ছাল। তাদের নাম আমি জানিনে। তারপরে জলে ভর্তি করে সেই হাঁড়িটা বসিয়ে দিল গনগনে উনোনে। টগবগ করে ফুটতে লাগল জল। ঘন্টা দুই পরে উনুন থেকে হাঁড়ি নামিয়ে ছেঁকে শিশিতে পুরে বুড়ি বলল—এই নাও দাওয়াই। এতেই কাজ হবে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কিন্তু এ ওষুধটা খাওয়াবো, না, লাগাব? না, বাবা। এসব কাজ আমার দ্বারা হবে না। তুমি আমার সঙ্গে গিয়ে যাহোক একটা বিহিত করে এস।

—ঠিক আছে। চল।

বুড়িকে সঙ্গে করে লুকিয়ে মাটির নিচের ঘরটিতে নিয়ে গেলাম। বুড়ি আমাকে চুপিচুপি বলল—অন্য দিনের মতই তুমি কাজ করে যাবে। সে যেন তোমার মতলবটা বুঝতে না পারে। কাজ শেষ হওয়ার পরে সে যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন তুমি আমাকে ডেকে নিয়ে যেয়ো।

এই বলে বুড়ি অন্ধকার বারান্দার একটি কোণে ঘাপটি মেরে বসে রইল। ভাবলাম, আজ আমার জীবন-মরণ সমস্যা। সুতরাং, বুড়ির নির্দেশ মতই চলতে হবে আমাকে।

গায়ে তখন আমার মত্ত হাতির বল। অন্য দিনের চেয়ে সেদিন মেয়েটিকে আমি অনেক বেশী আনন্দ দিলাম। দশবারের বার আনন্দের ধাক্কাটা সহ্য করতে না পেরে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। সেই সুযোগে লাফ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বুড়িকে ডেকে নিয়ে এলাম। বুড়িও তাড়াতাড়ি তার ওষুধ নিয়ে এল। ওষুধটা প্রথমে সে গরম করল। তারপরে মেয়েটার পা দুটো ফাঁক করে দুই উরুর মাঝখানে গরম গরম সেই ওষুধটা ঢেলে দিল।

একটা রঙিন ধোঁয়া মেয়েটার নিম্নাংগ ঢেকে ফেলল। বেশ বোঝা গেল, ধোঁয়াটা ধীরে-ধীরে তার শরীরের ভেতরে ঢুকছে। ওষুধটা যথেষ্ট কড়াই বলতে হবে; কারণ, তার দুটি উরুর ফাঁক থেকে হঠাৎ পোকার মত কী যেন দুটি জিনিস বেরিয়ে এল। ভাল করে নজর দিয়ে দেখলাম—পোকা দুটো বেশ বড়—অনেকটা বান-মাছের মত! একটার রঙ কালো, আর একটার হলুদে।

ভোর হয়ে আসছে দেখে চুপ করে গেল শাহরাজাদ।

তিনশো চুয়াম্নতম রজনী:

পরের দিন রাত্রিতে শুরু হল শাহরাজাদের গল্প:

বান মাছের মত দুটো পোকা দেখে চেঁচিয়ে উঠল বুড়ি—হয়েছে; ওষুধে কাজ হয়েছে। আল্লাকে ধন্যবাদ জানাও। মেয়েটার এই ভীষণ যৌন-ক্ষুধার কারণই ওই দুটো পোকা। তুমি বলছিলে না? এই দেখ। নিগ্রোটার সঙ্গে সহবাসের ফলে জন্মেছে এই কালো পোকাটা; আর বাঁদরের সঙ্গে সহবাসের ফলে জন্মেছে এই হলদেটা। ওই দুটো পোকার জন্যেই ওর এই অবস্থা। পোকা দুটো গেল। এবার ও স্বাভাবিক হয়ে আসবে আর পাঁচটা মেয়েদের মতই। অমন খাই খাই, গেলুম-গেলুম ভাবটা আর থাকবে না ওর।

বুড়ি ঠিকই বলেছিল। পরের দিন যখন তার কাছে গেলাম তখন সে বেশ শান্তভাবেই আমাকে গ্রহণ করল। কামনার আর সেই উগ্রতা নেই। অনর্থক বিলম্ব না করে আমি তাকে শাদীর প্রস্তাব দিলাম, এতদিন আমার সঙ্গে শুয়েছে সেইজন্যে সে আর আপত্তি করল না। আমাদের শাদীও হয়ে গেল। আমাদের দুজনের জীবনে নেমে এল বেহেস্ত। সুখের সাগরে ভেসে গেলাম আমরা। সেই বুড়িকে আমাদের বাড়িতে এনে আদর যত্ন করে রাখলাম। আমাদেরই পরিবারের একজন হয়ে গেল সে। বুড়ি আমাদের দুজনকেই বাঁচিয়েছে। স্বাভাবিক সুন্দরভাবে কেমন করে বাঁচা যায় সে ওষুধও সে আমাদের দিয়েছে। আল্লাহ কৃপায় ভালই আছি আমরা।

শাহরাজাদ বলল—যে সব মেয়েরা সব সময় খাই-খাই করে তাদের রোগ সারানোর গল্প আপনি শুনলেন জাঁহাপনা।

শাহরিয়ার বললেন—এই ওষুধটার কথা আমি গতবছর জেনেছি। আর এই গল্পটাও গতবছরের। ওই বদমাস মেয়েটাকে ধোঁয়া দিয়ে সারানো হয়েছিল তা-ও আমি শুনেছি। মানে, মেয়েটাকে আমি দেখেছি। শাহরাজাদ, ও সব শেকড়-বাকড়ের কথা আজ থাক। যা আগে শুনিনি এমন একটা দারুণ গল্প তুমি আমাকে বল। আজ মনটা বিশেষ ভাল নেই আমার। মনে উত্তেজনা জাগে এই রকম একটা গল্প বল।

শাহরাজাদ একটু ভেবে বলল—তাহলে শুনুন জাঁহাপনা।

প্রাচীন কালে গ্রীস দেশে ড্যানিয়েল নামে একজন সাধুপ্রকৃতির পণ্ডিত মানুষ বাস করতেন। তাঁর শিষ্য ছিল অনেক। শিষ্যেরা প্রতিদিন তাঁর কাছে অনেক কিছু শিখতে আসতেন। দুঃখের কথা, এই জ্ঞানী তাপসের কোন সন্তান ছিল না। মৃত্যুর পরে তাঁর শিক্ষা বা পুঁথিপত্র তাঁর বংশের কেউ পাবে না এইকথা ভেবে তিনি বেশ কষ্ট পাচ্ছিলেন, একটি সন্তানের জন্য তাই তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন। পরম করুণাময় আল্লাহর প্রাসাদে কোন দ্বাররক্ষী নেই। সেই জন্যেই হয়ত তাঁর প্রার্থনা অতি সহজেই আল্লাহর কানে গিয়ে পেঁাছল। আল্লা তাঁকে নিরাশ করলেন না।; সন্তান সম্ভবা হলেন।

দিন যায়; মাস যায়। ড্যানিয়েলের পত্নী মাস গুণতে থাকেন।

একদিন ড্যানিয়েল তাঁর পত্নীকে ডেকে বললেন: অনেক বুড়ো হয়ে পড়েছি। যে কোন সময়েই আমার মৃত্যু হতে পারে। তোমার গর্ভের সান্তান শীঘ্রই ভূমিষ্ট হবে। মৃত্যুর পরে বইপত্র অথবা পাণ্ডুলিপি ঠিক জায়গায় থাকবে বলে মনে হচ্ছে না আমার প্রয়োজনের সময় সে হয়তো সেগুলি ঠিক কাছে পাবে না।

লিখতে বসলেন ড্যানিয়েল। জীবনে যা শিখেছেন সে-সবই তিনি ছোট করে লিখে রেখে যেতে চান। কয়েকটি পৃষ্ঠার মধ্যেই তাঁর অগাধ জ্ঞান পাণ্ডিত্যের বিষয়ে লিখে যাবেন। স্বভাবতই সে সব ছোট্ট করে লিখতে হবে। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের সারাংশটুকু আর পাঁচ হাজার পাণ্ডুলিপি —এসব জিনিস কয়েক পাতা কাগজের মধ্যে ধরানো কি সহজ কাজ; কিন্তু সেই অসাধ্য কাজ তিনি করলেন। লেখার শেষে বারবার কাগজগুলি পড়লেন। না; এতো আর কমানো যাবে না। এই পাঁচ পাতায় আনতে তাঁকে সারাটা বছর খাটতে হয়েছে; সেই পাঁচ পাতাকে কমিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি এক পাতায় দাঁড় করালেন।

মৃত্যু যে তাঁর ক্রমশই এগিয়ে আসছে সে কথাটা বুঝতে পারলেন ড্যানিয়েল। বুঝতে পেরে তাঁর সমস্ত পাণ্ডুলিপি তিনি সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন। কেউ যাতে সেগুলি আবিষ্কার করতে না পারে এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। নিজের ছেলের জন্য কেবল রাখলেন সেই এক পৃষ্ঠা কাগজ। তারপরে পূর্ণ গর্ভবতী স্ত্রীকে ডেকে বললেন—শোন, আমার সময় হয়ে এসেছে। বেহেস্ত আমাদের যে সন্তান দিয়েছেন তার মুখ দর্শন করার সময় আমার আর হল না। ঈশ্বরর বোধ হয় সে অভিপ্রায় নয়। বংশধর হিসাবে আমি তার জন্যে কেবল এই কাগজটুকু রেখে গেলাম। বড় হয়ে ছেলে যখন তার বাবার সম্পত্তি দাবী করবে তখন তার হাতে তুমি এই কাগজটা তুলে দিয়ো। সে যদি এই কাগজটি পড়ে এর মর্ম উদ্ধার করতে পারে তাহলে সে তার সময়ে সবচেয়ে বিত্তবান বলে পরিচিত হবে। তার নাম রেখ হাসিব।

বলতে-বলতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ড্যানিয়েল।

শেষকৃত্যের সময় তাঁর সমস্ত শিষ্য আর শহরের মানুষেরা এসেছিলেন। তাঁর তিরোধানে কেঁদেছেন সবাই, শোক করেছেন সকলেই।

ড্যানিয়েলের মহাপ্রয়াণের কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। নামকরণের সময় পিতার ইচ্ছামত নবজাতকের নাম

হল—হাসিব। জ্যোতিষীদের ডেকে আনা হল নবজাতকের ভাগ্য গণনা করার জন্যে। অনেক আঁকজোঁক কষে জ্যোতিষী বললেন—পত্রবতী, তোমার সন্তান দীর্ঘজীবী। তবে যৌবনে ওর একটা ফাঁড়া রয়েছে। সেই ফাঁড়াটা কেটে গেলে সে অনেক দিন বাঁচবে। বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন করবে অনেক, নামও হবে তার; অর্থের রোজগার করবেও অনেক—যদি অবশ্য ওই ফাঁড়াটা ওর কেটে যায়।

এই বলে পাওনাগণ্ডা নিয়ে জ্যোতিষী বিদায় নিলেন।

দিনে-দিন বাড়তে লাগল শিশুটি। পাঁচ বছর বয়সে তাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হল। কিন্তু লেখাপড়া হল না তার। বিদ্যালয় ছাড়িয়ে তাকে পেশাগত ব্যবসায় লাগিয়ে দিলেন। বিধবা মায়ের ভরণ পোষণ তো তাকেই করতে হবে। কথাটা ঠিকই; কিন্তু করবেটা কে? ছেলে তো ওদিকে বাউণ্ডুলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজকর্মের ধার দিয়েই সে যাচ্ছে না। বয়স হল পনের। না শিখল লেখাপড়া, না শিখল কাজকর্ম। বিধবা মা কেবল কেঁদে বেড়ান। প্রতিবেশীরা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—শাদী না দিলে তোমার ছেলের ওই বাউণ্ডুলেমী কাটবে না। ঘাড়ে বউ পড়লেই ও খাটবে। আর পাঁচজন যেভাবে রোজগার করছে ও-ও সেইভাবেই করবে।

পাড়াপড়শীর কথা শুনে অনেক খুঁজে-পেতে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলেন তিনি। সবাই ভেবেছিল, অমন সুন্দর বউ পেয়েছে, কাজ এবার সে নিশ্চয় করবে, করবে রোজগারপাতি। ওমা! কার ঝাড়ে কে বাঁশ কাটে! যাদৃশী ভাবনা যস্য। সেই আগের মত খালি ঘুরে বেড়ায়—কাজকর্মের ধার দিয়েও যায় না।

প্রতিবেশীদের মধ্যে কিছু মানুষ কাঠ কেটে সংসার চালায়। তারা একদিন হাসিবের মায়ের কাছে এসে বলল—এক কাজ কর। একটা গাধা, কিছু দড়ি, আর একটা কুড়োল কিনে দাও তোমার ছেলেকে। আমরা ওকে নিয়ে যাব পাহাড়ে; কাঠ কেটে আনবে। কাঠ বেচে যা লাভ হবে ওকেই না হয় দিয়ে দেব। তোমার আর তোমার বউ-এর পেট চলে যাবে তাহলে।

আনন্দে রাজি হয়ে গেলেন হাসিবের মা। সব কিছু কিনে এনে ছেলেকে উৎসাহ দিয়ে বললেন—ওদের সঙ্গে যাও। কোন ভয় নেই তোমার। তোমরাও ঘাবড়িয়ো না, ওর বাবা আর আমার পুণ্যে ছেলের কোন ক্ষতি হবে না। আমাদের আশীর্বাদ ওর মাথায় ছাতার মত বিছিয়ে থাকবে।

কাঠুরেরা হাসিবকে নিয়ে কাঠ কাটতে চলে গেল পাহাড়ে। কী করে কাঠ কাটতে হয়, কাটা কাঠ কেমন করে গাধার পিঠে চড়াতে হয় সব তারা শিখিয়ে দিল তাকে। হাসিবেরও বেশ ভাল লাগল কাজটা। খুব কম সময়ের মধ্যেই সব কাজ সে শিখে নিল। পাহাড়ের সবুজ বনানী, খোলা আকাশ আর মিষ্টি বাতাস—সব কিছুই ভাল লেগে গেল তার। কাঠ কেটে ভালই রোজগার হতে লাগল হাসিবের। মা আর বউ-এর অভাব মিটলো কিছুটা।

একদিন কাঠুরেরা পাহাড়ের কোলে কাঠ কাটছে এমন সময় হঠাৎ ভীষণ জোরে বৃষ্টি নামল। সঙ্গে-সঙ্গে দারুণ বজ্রপাত। সকলে দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নিল একটা গুহার ভেতরে। প্রচন্ড ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যে আগুন জ্বালালো সেখানে। হাসিবের কাজ হল চুল্লীতে শুকনো কাঠ

যোগান দেওয়া। গুহার বাইরে থেকে কাঠ চেলা করে আনতে হচ্ছে হাসিবকে। কাঠ চেরাই করতে-করতে কুড়োলটা হঠাৎ ঝোপের ভেতরে গিয়ে একটা শক্ত জিনিসের ওপরে আঘাত করল—ঠং করে শব্দ হল একটা। মনে হল সেই জায়গার মাটিটা ফাঁপা। সঙ্গে-সঙ্গে হাসিব মাটি খুঁড়তে শুরু করল। মাটি কিছুটা সরে যাওয়ার পরেই একটা পাথরের চাঁই দেখতে পেল। মাঝখানে তামার বড় একটা ঝুড়ি।

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প থামিয়ে দিল শাহরাজাদ।

তিনশো পঞ্চান্নতম রজনী:

হাসিব গিয়ে কথাটা বলতেই সবাই হুড়মুড় করে দৌড়ে গেল। ধরাধরি করে পাথরের চাঁইটা তুলে ফেলল সকলে। পাথরের নিচে বিরাট একটা গর্ত। উঁকি দিতেই মনে হল ভেতরের দিকে একটা সুড়ঙ্গ চলে গিয়েছে। সেই সুড়ঙ্গের তলায় যেন সারি সারি জালা সাজানো। জালাগুলির সব মুখ বন্ধ। মাটির ওপর থেকে নিচে নামার কোন সিঁড়ি নেই। জালাগুলির গলায় দড়ি বেঁধে ওপরে তুলে আনতে হবে। হাসিবই দড়িতে ঝুলে নিচে নেমে পড়ল।

নিচে নেমে হাসিব কুড়োল দিয়ে একটা জালা ফাটিয়ে ফেলল। কিছুটা খাঁটি হলদে মধু গড়িয়ে পড়ল বাইরে। নিচে থেকে চেঁচিয়ে ব্যাপারটা সে সবাইকে জানিয়ে দিল। কাঠুরেরা এ কথাটা মোটেই ভাবে নি; ভেবেছিল ওই জালাগুলির মধ্যে নিশ্চয় মোহর টোহর জাতীয় কিছু মূল্যবান সম্পত্তি রয়েছে। যাই হোক, যা পাওয়া যায় তাই ভাল। ওপর থেকে দড়ি ঝুলিয়ে দিল তারা। হাসিব সেই দড়িগুলি জালার মুখে বেঁধে দিল। তারপরে জালাগুলিকে একটা একটা করে ওপরে টেনে তোলা হল। সেগুলিকে তারা গাধার পিঠে তুলল; কিন্তু হাসিবকে কেউ গর্ত থেকে আর তুলল না। জালাগুলি গাধার পিঠে ভাল করে বেঁধে তারা রওনা হল বাজারের দিকে। যেতে-যেতে নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগল: গর্ত থেকে ওকে তুললে এই মালের ভাগ দিতে হোত না? শুধু শুধু ওকে ভাগ দিতে যাব কোন্ দুঃখে? সংসারের কুলাঙার ওটা। ওর মরে যাওয়াই ভাল।

বাজারে এসে একজনকে শিখিয়ে পড়িয়ে হাসিবের মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিল তারা। সে তার মাকে বলল—আমরা পাহাড়ের গায়ে যখন কাঠ কাটছিলাম তখন তোমার ছেলের গাধাটা কোথায় যে চলে গেল বুঝতে পারলাম না। গাধাটার পেছনে পেছনে তোমার ছেলেও গেল চলে। কী বৃষ্টি!! আমরা একটা গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। হঠাৎ একটা বাঘ কোথা থেকে লাফ দিয়ে পড়ে তোমার ছেলে আর গাধাকে মেরে ফেলল।

হাসিবের মা আর বউ শোকে-দুঃখে কান্নায় গড়াগড়ি দিতে লাগল, লাগল বুক চাপড়াতে। এ কান্না কি আল্লার দরবারে পেঁছিবে না।

কাঠুরেরা মধুর জালাগুলি বেচে প্রচুর লাভ করল। লাভের পয়সা দিয়ে প্রত্যেকে দোকান সাজিয়ে বসল। বেশ ভালভাবেই দিন কাটে তাদের, —হাসে, খেলে, স্ফূর্তি করে। উৎসবে আয়োজন করে প্রচুর খানাপিনার।

এদিকে হাসিবকে তো তারা ফেলে চলে গেল। বেচারা গর্ত থেকে ওঠার অনেক চেষ্টা করল; কিন্তু পারল না। চেঁচিয়ে গলা ফাটাল। কেউ তার ডাকে সাড়া দিল না। কেঁদে বুক ভাসাল; কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল না। কুড়োল দিয়ে দেওয়ালে গর্ত করার চেষ্টা করল; কিন্তু গ্রানাইট পাথরের বুকে ঘা খেয়ে ছিটকে পড়ল কুড়োল। ভয় ধরে গেল তার। কী করবে সে? ক্ষোভে দুঃখে আত্মহত্যাই করবে ঠিক করল। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে মাথা ঠুকতে লাগল। হঠাৎ দেখে পাথরের ফোকর থেকে বিরাট একটা কাঁকড়া বিছে তার দিকে দৌড়ে আসছে তাকে কামড়ানোর জন্যে। আত্মহত্যার কথা উবে গেল তার মন থেকে। কুড়োলটা তুলে নিয়ে এক কোপে দু টুকরো করে ফেললো কাঁকড়া বিছেটাকে। তারপরেই সে চোখ চিরে দেখতে লাগল। কাঁকড়া বিছেটা এল কোন দিক থেকে? যেখান থেকে বিছেটা এসেছে সেখান থেকে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা বেরিয়ে আসছিল। কুড়ুলের মাথা দিয়ে সে খুব জোরে ঘা মারল সেখানে। দরজার কিছুটা অংশ ফাঁক হয়ে গেল। আরও জোরে চাড় দিতেই ওপাশটা ধ্বসে গেল।

হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসল হাসিব। মাটির ওপরে বিরাট লম্বা একটা গ্যালারী। তার ওপাশে আলো জ্বলছিল। অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে দেখল হাসিব। ঘুরতে-ঘুরতে একটা বড় কালো ইস্পাতের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজার গায়ে রুপোর তালা আর সোনার চাবি ঝুলছিল। দরজা খুলেই সে অবাক হয়ে গেল। সামনে একটা সরোবর। তার ওপরে খোলা, মুক্ত আকাশ। পায়ের তলায় পান্নার পাহাড়। সেই সোনার সিংহাসন, সোনা আর রুপোর বসবার আসন, পান্নার পাহাড়—সবই কী সুন্দরই না প্রতিবিম্বিত হয়েছে ওই সরোবারের জলে। বসবার আসনগুলি গুণে দেখল হাসিব—ঠিক বারো হাজার। কোন কিছু না ভেবে চিন্তেই হাসিব সিংহাসনের ওপরে বসে পড়ল। বসে-বসে চারপাশে তাকিয়ে দেখল সে। এত বড় সুন্দর সরোবর, এত সুন্দর পাহাড়—ব্যাপারটা কী?

সিংহাসনে বসে পা দুলাতে লাগল হাসিব। তার কানে এল করতালের মৃদু তরঙ্গ। সিংহাসনের পেছনে তাকিয়ে দেখল পান্না-পাহাড়ের ওপর দিয়ে বিরাট একটা মিছিল আসছে সরোবরের দিকে। মিছিলটা হেঁটে আসছিল না, আসছিল হাওয়ায় ভেসে। অনেক দূর থেকে আসছিল বলেই বোধ হয় হাসিব বুঝতে পারল না তারা মানুষ না অন্য কিছু। আরও কাছে এগিয়ে এল মিছিল। একদল মেয়ে লোক—খুব সুন্দরী দেখতে। কিন্তু কী অদ্ভুত ব্যাপার! তাদের নিম্নাংগে কোন পা নেই, অংশটা লম্বা সরীসৃপের মত। তাই তারা হাঁটতে পারে না, সরীসৃপের মত ঘসড়ে-ঘসড়ে হাঁটে। তারা সুন্দর গলায় গান গাইছিল। একজন গ্রীক ভাষায় রানীর প্রশস্তি গাইছিল। এরা নিশ্চয় সর্প-কুমারী। রানীর অবশ্য তখনও দেখা নেই। মাত্র চারজন সর্প-কন্যা হাজির হয়েছে। তারা মাথার ওপরে বয়ে আনছে বিশাল একটা সোনার গামলা। ওই গামলায় বসে আছেন তাদের রানী। রানী হাসছেন। চারজন সিংহাসনের কাছে এসে দাঁড়াতেই হাসিব তড়াক করে লাফ দিয়ে নিচে নেমে এল। রানীকে তারা সিংহাসনে বসালো। রানীর নাকাব ঠিক

করে দেয়; তারপরে ঘিরে দাঁড়ালো তাঁকে। অন্যান্য সর্প-কন্যারা বাকি আসনে বসে যায়।

রানী উপস্থিত সকলের সামনে গ্রীক ভাষায় বক্তৃতা শুরু করল। সুন্দর সুরেলা কণ্ঠ রানীর। বক্তৃতা শেষে করতালের আওয়াজ হল, সঙ্গে-সঙ্গে সকলে রানীর স্তব করতে লাগল। এই স্তুতি গ্রীক ভাষায় গাওয়া হল। স্তবের পর যার যার আসনে বসে পড়ল।

স্তব গানের পর রানী এবার হাসিবের দিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখল। রানী অবশ্য ওর উপস্থিতি টের পেয়েছিল। ওকে ইশারায় কাছে ডাকল। তা অবশ্য হাসিব একটু ভয়ও পেয়েছিল, তবু দ্বিধাগ্রস্তভাব নিয়ে ও এগিয়ে গেল রানীর দিকে। সোজাসুজি একখানা আসন দেখিয়ে রানী ওকে বসতে অনুরোধ করল। আসনে বসার পর রানী বলল,—এ দুনিয়ার তলায় আমার সাম্রাজ্যে তোমাকে স্বাগতম জানাই। ভাগ্যবান লোকই কেবল এখানে আসতে পারে। সংকোচ আর ভয় ঝেড়ে ফেল যুবক। তোমার নাম বল। আমার নাম যমলিকা। এই যে দেখছ সব সর্প-কন্যা, এরা আমার প্রজা। এবার বল, কে তুমি? কি করে তুমি এই সরোবরের পাড়ে এসে পড়লে? এই সরোবর আমার শীতাবাস। শীতকালে আমার গ্রীষ্মাবাস মাউণ্ট কাফ ছেড়ে এখানে চলে আসি বছরের কয়েক মাসের জন্য।

যুবক হাসিব নত হয়ে ভূমি চুম্বন করে রানীর ডানদিকের পান্না আসনে বসে বলল—আমার নাম হাসিব। ড্যানিয়েলের পুত্র। বাবা আমার জন্মের আগে মারা গেছেন। সারা দুনিয়ার লোক জ্ঞানী আর তাপস বলে তাঁকে জানত। মান্য করত। আমি আমার পিতার মত একজন ঋষি বা জ্ঞানী হতে পারতাম, নিদেনপক্ষে একজন ব্যবসায়ীও হতে পারতাম। আমার ওসব হতে ভাল লাগল না। পড়াশুনা শিখলাম না, ব্যবসা করলাম না। খালি ঘুরে-ঘুরে বেড়ালাম। বনের পশুপাখী, পাহাড়ের খোলা আকাশ আমাকে ভীষণ টানত। আমি কাঠুরে হলাম। চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী থেকে আমি মরতে চাই নি। আমার মৃত্যুর পর কেউ যেন আমার ওপরে সমাধি বেদী না করে। মৃত্যুর পরও আমি শান্তি পাব না তাহলে।

এরপর আনুপূর্বিক সব সে খুলে বলল। অন্যান্য কাঠুরেদের সঙ্গে কিভাবে এখানে এল, আর মাটির তলায় এই সাম্রাজ্যে কেমন করে পেঁছিল —সব বলল।

হাসিবের কাহিনীতে রানী খুব খুসী হয়ে বললে:

—হাসিব, তুমি সেই গর্তে অনেকক্ষণ বন্দী ছিলে। তারপরে এখানে এসেছো, তাও অনেকক্ষণ হল। তোমার নিশ্চয়ই খিদে তেষ্টা পেয়েছে।

এই বলে রানী একজন সর্প-কন্যাকে ইশারা করতেই, একটি সোনার থালা ভর্তি খাবার নিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে এল। থালায় কি নেই? —আছে আঙুর, আপেল, পেস্তা, মটকা, ডুমুর আর ভাল ভাল মর্তমান কলা। চেটেপুটে খেয়ে নিল হাসিব খুব খিদেও পেয়েছিল। ঢেকুর তুলল। এরপর এক গেলাস সুগন্ধী সরবত ঢকঢক করে খেয়ে নিলো। সরবতের গেলাসটা ভারি চমৎকার। একটা বড় চুনি কেটে গেলাসটা তৈরি। লাল টুকটুক করছে। যে মেয়েটি খাবার দিয়েছিল সেই থালা নিয়ে চলে গেল।

রানী বলল—যুবক তুমি নিশ্চিন্ত হও। যতদিন খুশি তুমি আমার সাম্রাজ্যে থাকতে পার। তোমার কেউ ক্ষতি করবে না। এই সরোবরের ধারে গাছের ছায়ায় বা পাহাড়ের ঢালে প্রকৃতির কোলে সপ্তাহ খানেক থেকে যাও। আমি তোমাকে আমন্ত্রণ করছি। তোমার সময় আমি ভরিয়ে দেব গল্প বলে। তুমি যখন আবার মানব দেশে ফিরে যাবে এই গল্প তোমার কাজে লাগবে।

রানীর প্রজা বারো হাজার সর্প কন্যা আর জ্ঞানী তাপস ড্যানিয়লের ছেলে হাসিবকে রানী যমলিকা গল্প বলবে। সর্পকন্যারা বসে আছে সোনা-রূপার আসনে আর হাসিব বসে আছে পান্না-আসনে। গল্প শুরু হল:

কোন এক রাজ্যে বানু-ইসরায়েল নামে এই নৃপতি রাজত্ব করতেন। রাজা মৃত্যু শয্যায় তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী একমাত্র পুত্র বুলুকিয়াকে ডেকে বললেন !—বুলুকিয়া, আমার মৃত্যুর পর আমার সিংহাসনে বসে তুমি প্রথমেই একটা কাজ করবে !—রাজপ্রাসাদের যাবতীয় সম্পত্তির যে যত ক্ষুদ্র আর ছোট হোক না কেন, একটা ব্যক্তিগত ফর্দ বানাবে। আর, ভালভাবে পরীক্ষা না করে প্রাসাদের বাইরে কোন জিনিস বেরোতে দেবে না।

নৃপতির পরোলোকগমনে পুত্র বুলুকিয়া সিংহাসনে বসেই বাবার আদেশ মেনে কাজ শুরু করে দিল। সমস্ত ঐশ্বর্য, জিনিসপত্র পরীক্ষা করতে শুরু করল। অনেকগুলো হলঘরে ধনদৌলত জমিয়ে রাখা হত। হলগুলোর দরজা খুলে ঘুরে ঘুরে দেখল। দেখতে-দেখতে একটা গোপন ঘরের সামনে চলে এল। ঘরের মাঝখানে দুটো পাথরের থামের ওপর একটা আবলুস কাঠের সিন্দুক দেখতে পেল। সিন্দুকের ডালা খুলে একটা সোনার বাক্স দেখতে পেল। সোনার বাক্সে ছিল এক সোনার পুঁথি। পুঁথি খুলে দেখল গ্রীক ভাষায় লেখা রয়েছে—

> যে ব্যক্তি মানব, জিন, পক্ষী ও পশুর নৃপতি ও মনিব হইতে চাহেন তাঁহাকে একটি অঙ্গুরীয় পরিধান করিতে হইবে। ধর্ম প্রচারক সুলেমান সাহেব এই অংগুরীয়টি পরিধান করিয়াছিলেন। সে মহাত্মন, সপ্ত সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ। তাঁহার আঙুলে অংগুরীয়টি বিদ্যমান। এই দৈবজ্ঞ অংগুরীয় আদি পিতা আদম বেহেস্তে পরিয়া থাকিতেন। বেহেস্ত হইতে পতনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার আঙুলে ইহা ছিল। আদমের নিকট হইতে দেবদূত গ্যাব্রিয়েল ইহা পাইয়া-ছিলেন। তৎপর, তিনি ইহা মহাত্মন সুলেমানকে প্রদান করিয়া-ছিলেন। সপ্ত সমুদ্র পার হইয়া নির্দিষ্ট দ্বীপে পেঁৗছিবার ক্ষমতা কোন তরীরই নাই। এক রকম যাদু বৃক্ষ-রস বিদ্যমান যাহা পদ-প্রান্তে লেপন করিলে অনায়াসে সমুদ্র লঙ্ঘন করা সম্ভব। এই বৃক্ষ-রস সহজলভ্য নহে। কেবলমাত্র ভাগ্যবান মানবসন্তান ইহা হস্তগত করিতে পারে। পাতালে রাজত্ব করেন রানী যমলিকা। তাঁহার সাম্রাজ্যে এবম্বিধ বৃক্ষ জন্মাইয়া থাকে। সেই সাম্রাজ্যে এই সন্দেশ রানী ব্যতীত অন্য কাহারো গোচরে নাই। রানী যমলিকা বৃক্ষলতা-

গন্মাদির ভাষা বুঝিতে পারেন। তাহাদের সহিত তিনি নিয়মিত বাক্যালাপও করিয়া থাকেন। বৃক্ষ-লতা-ফুল-ফল ধর্ম এবং চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার বিপুল জ্ঞান রহিয়াছে। অতএব, যে ব্যক্তি সেই দৈবজ্ঞ অঙ্গুরীয় অর্জন করিতে চাহেন, তাঁহাকে সর্বপ্রথমে পাতালে যমলিকার সাম্রাজ্যে গমন করিতে হইবে। সেই অঙ্গুরীয় যে মানবসন্তান হস্তগত করিতে পারিবেন তিনি কেবল সমুদয় প্রাণীজগতের অধীশ্বরই হইবেন না, উপরন্তু যবনিকা প্রদেশে গমন করিয়া অমৃতবারি পান করিতে সক্ষম হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। অমৃতসুধা পানে রূপ, যৌবন অর্জিত হয় এবং জ্ঞান ও অমরত্ব লাভ করা যায়।

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প বলা থামাল শাহরাজাদ।

তিনশো ছাপ্পান্নতম রজনী :

পরের দিন রাত্রিতে আবার শাহরাজাদ গল্প শুরু করলো :

চামড়ার পুঁথি পড়ে বুলুকিয়া তার রাজ্যের সমস্ত মৌলভী, জাদুকর আর দরবেশদের ডেকে পাঠালেন। সকলে সভায় এলে সে জিজ্ঞাসা করল—আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি আমাকে পাতালের রানী যমলিকার সাম্রাজ্যে নিয়ে যেতে পারেন ?

এই কথা শুনে সকলে মহাজ্ঞাণী অ্যাফানকে দেখিয়ে দিলেন। বিরাট পণ্ডিত এই বৃদ্ধ দুনিয়ার সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী। তিনি যাদুবিদ্যা জানেন, মহাকাশ ও জ্যামিতি বিদ্যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্বে। অপরসায়ন বা ইন্দ্রজালেও তিনি সিদ্ধহস্ত।

আসন ছেড়ে রাজা কাছে উঠে গিয়ে অ্যাফানকে জিজ্ঞাসা করল—মহাজ্ঞাণী অ্যাফান সেই পাতালের রানীর কাছে আমাকে আপনি নিয়ে যেতে পারবেন কী ?

—হ্যাঁ; পারব।

উজীরের ওপরে রাজ্য পরিচালনার ভার দিয়ে বুলুকিয়া রাজার পোশাক ছেড়ে পরিব্রাজকের বেশ ধরল। পায়ে দিল তীর্থযাত্রির পাদুকা। তারপরে, অ্যাফানের সঙ্গে নগর ত্যাগ করে চলে গেল। প্রথমেই পড়ল মরুভূমিতে। অনেকটা পথ এগিয়ে অ্যাফান একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন—এইটি হল উপযুক্ত স্থান। ইন্দ্রজালের সাহায্যে আমাদের পথ খুঁজে নিতে হবে।

তারপরে বৃদ্ধটি একটা নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন। নিজের চারধারে টেনে দিলেন একটা গণ্ডী। বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলেন যাদু মন্ত্র। মন্ত্রটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে পাতালের একটা পথ বেরিয়ে পড়ল। এইটিই পাতাল সাম্রাজ্যের প্রবেশের পথ। ওই পথে দুজনে একসঙ্গে যেতে পারে না। বৃদ্ধ নানারকম আদিভৌতিক ক্রিয়াকলাপ করলেন। তারপরে পথটি প্রশস্ত হল। এই পথ দিয়ে দুজনে এই সরোবরের তীরে এসে পেঁৗছলো। সরোবরটি তোমারই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ হাসিব।

তাঁদের আমি সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম। আমার সাম্রাজ্যে যাঁরাই আসেন তাঁদের আমি এইভাবেই সম্বর্ধনা করে থাকি। তাঁরা তাঁদের

আসার উদ্দেশ্য আমাকে জানালেন। তুমি আগেই দেখেছ সর্পকন্যারা আমাকে গামলার ওপরে চাপিয়ে বয়ে নিয়ে আসে। সেদিনও আমি তাঁদের সেইভাবেই পান্না পাহাড়ে নিয়ে আসি। আসা-যাওয়ার পথে গাছপালারা তাদের ভাষায় আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে। ফুলের গন্ধের ভেতর দিয়ে আমরা সেদিন আসছিলাম। মৃদু সুরে বাজনা বাজাচ্ছিল সর্পকন্যারা। চলতে-চলতে এক গোছা লতার সামনে এসে দাঁড়ালাম। থোকা-থোকা লাল ফুল ফুটেছিল তাদের মাথায়। ফিসফিস করে ফুলগুলি আমাকে বলল—আমার রস বড় চমৎকার। এই রস পায়ে লাগালে অনায়াসেই মানুষ পায়ে হেঁটে সমুদ্র পার হতে পারে।

আমি অতিথিদের বললাম—আপনারা যে গাছ খুঁজছেন—এ সেই গাছ।।

তাঁদের হাতে একটা পাত্র দিলাম আমি। অ্যাফান খুশী মত ফুল তুলে রস নিংড়ে সেই পাত্রটা বোঝাই করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—মহাজ্ঞাণী অ্যাফান, আপনারা দুজনে সমুদ্র পাড়ি দিতে যাচ্ছেন কেন?

অ্যাফান বললেন—তাহলে শোন মহারানী। সপ্ত সমুদ্রের পারে একটি দ্বীপ রয়েছে। সেখানে মহাত্মা সুলেমান কবরে শুয়ে রয়েছেন। তাঁর হাতের আঙটিটি আমরা খুলে আনতে চাই। সেই আঙটির দৌলতে তিনি সমস্ত জীবজগতের অধীশ্বর হতে পেরেছিলেন।

বললাম—এতো বড় অসম্ভব ব্যাপার। সুলেমানের আঙটি তাঁর পরে আর কেউ পরতে পারে নি; পারবেও না। আমার কথা বিশ্বাস করুন। এ-পরিকল্পনা পরিত্যাগ করুন আপনারা। হঠকারিতা করলে বিপদে পড়বেন। বুলুকিয়া, তুমি যুবক। তোমার সামনে অনন্তকাল পড়ে রয়েছে। পাগলামি করো না। বরং আমি তোমাকে একটা গাছ দেখিয়ে দিচ্ছি। এই গাছের পাতা খেলে তুমি অনন্ত যৌবন লাভ করবে।

কিন্তু আমার কথা তাঁরা কানেই তুললেন না। যে-পথে এসেছিলেন সেই পথেই চলে গেলেন।

এই বলে থামলেন রানী; একটা কলা তুলে হাসিবকে দিলেন, নিজে মুখে পুরলেন একটা ডুমুর। তারপরে বললেন—বুলুকিয়ার গল্প এখনও শেষ হয়নি। সমুদ্রের ওপরে কেমন করে তাঁরা দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়েছিলেন সে-কাহিনী তোমাকে আমি পরে বলব। তার আগে, আমার সাম্রাজ্য ঠিক কোনখানে অবস্থিত, এর চারপাশে পৃথিবীর কোন্ কোন্ রাজ্য রয়েছে, আর প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতেই বা কারা থাকে—এসব জানতে ইচ্ছে করে না তোমার? পান্নার পাহাড়ের ওপর দিয়ে কাফে চলে গিয়েছে। কাফ-য়ের ঠিক কোন্ জায়গায় জিনিস্তান সে কথাও তোমাকে আমি বলব। এই জিনিস্তান হচ্ছে জিনেদের রাজধানী। এখানকার রাজার নাম হচ্ছে জান বিন জান। হীরার মালভূমিতে পাহাড় কেমন করে বেঁচে থাকে সেকথাও তোমাকে বলব আমি। একটা যুদ্ধক্ষেত্রের কথা তোমাকে বলব। এখানে পুরানো বীরদের গাথা সঙ্গীত ছড়িয়ে রয়েছে।

হাসিব বলল—মহারানী, আমাকে আপনি রাজা বুলুকিয়ার অভিযানের কাহিনীই বলুন।

রানী বলতে শুরু করলেন—রাজা বুলুকিয়া আর অ্যাফান আমার সাম্রাজ্য ছেড়ে দেশে ফিরে গেলেন। তারপরে সপ্তসমুদ্র পাড়ি দেওয়ার জন্যে প্রথম সমুদ্রের পাড়ে এসে দাঁড়ালেন। পাড়ে বসে সেই ফুলের রস নিজেদের পায়ের তলায় মাখলেন। তারপরে জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলেন খুব সাবধানে। কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারলেন—বেশ হেঁটে যাচ্ছেন তাঁরা। ডুবে যাওয়ার ভয় আর নেই। আর দেখে কে? সময় যাতে বৃথা নষ্ট না হয় এইভাবে দৌড়তে লাগলেন তাঁরা। এইভাবে তিনটে দিন আর তিনটে রাত তাঁরা অতিক্রম করলেন। চতুর্থ দিন সকালে একটা দ্বীপে পেঁছিলেন। কী সুন্দর দ্বীপ! এটা কি তাহলে বেহেস্ত?

এই সময় ভোরের পাখি ডেকে উঠল। গল্প থামালো শাহরাজাদ।

তিনশো ছাপ্পান্নতম রজনী:

পরের দিন রাত্রিতে শাহরাজাদ আবার গল্প বলতে শুরু করলো।

দ্বীপের বেলাভূমি যেন গৈরিক বসন পরে রয়েছে। দূরে চুণির পাহাড়। বেলাভূমির পরেই শুরু হয়েছে বিস্তীর্ণ সবুজ ক্ষেতের বাগান। ফুটেছে নানান জাতের সুগন্ধী ফুল। তাদের গন্ধে ভরে উঠেছে বাতাস। গোলাপের পাশে পদ্মফুল বড়ই সুন্দর মানিয়েছে। বেগনে ফুলের পাশে শাদা গন্ধরাজকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বনে-বনে পাতার অবিশ্রাম মর্মর ধ্বনি মনকে আনমনা করে তুলে। ঘৃতকুমারীর জংগলের মাঝে বড়-বড় ফুলগাছের বিন্যাস সত্যিই বড় সুন্দর। সমুদ্রের গর্জনের ফাঁকে-ফাঁকে গাছের আড়াল থেকে ভেসে আসছে ঘুঘুপাখির ডাক। নাইটেংগল পাখি শোনাচ্ছে তার প্রেমবিধুর রানী গোলাপের কানে-কানে। গোলাপ সেই কাহিনী শুনছে সমঝদারের মত তার মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে। আখের ক্ষেতের ভেতর দিয়ে ছলছল শব্দে বয়ে চলেছে তরঙ্গিণী। প্রকৃতি রূপ, রস, আর গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। এখানে যেন কোন দুঃখ নেই। কোন শোক নেই, এই ধরাধামেই কি বেহেস্ত নেমে এসেছে? তাঁরা দুজনে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন চারপাশ। বুলুকিয়া আর অ্যাফান মনোরম দৃশ্য দেখে দেখে সকাল বিকেল ঘুরে বেড়ালো। ছায়াবীথি শরীর মন তাজা করে দিল। গোলাপের ওপর শিশির টলমল করছে মুক্তার মত। বুলুকিয়া তার ওপর গাল রেখে ফুলের সুবাস ও পেলব স্পর্শ নেয়। শ্রান্ত মন হয়ে উঠল স্থির। এভাবে ওরা সন্ধ্যে পর্যন্ত মন্থর পায়ে এক বীথি থেকে অন্য বীথিতে ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যা নেমে আসে। ওরা রাত কাটাবার জন্য একটা গাছে উঠে বসে। ঘুমে চোখের পাতা একটু জুড়ে আসতেই দ্বীপটা হঠাৎ কেঁপে ওঠে। প্রচণ্ড একটা গাঁগাঁ শব্দ ভেসে এলো। দ্বীপটার নীচে থেকে কে যেন ঝাঁকুনি দিচ্ছে। মনে হল সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেতর থেকে একটা দৈত্য উঠে আসছে। প্রকাণ্ড একটা পাথর তার মুখে। আগুনের মত সেটা জ্বলছে। তাতে সমস্ত দ্বীপটা আলোকিত হয়ে উঠল। দৈত্যটা পেছনে আরো কতগুলো দৈত্য অমনি করে উঠে আসছে। অসংখ্য বাঘ সিংহ আর চিতা এসে দাঁড়াল সমুদ্রের তীরে। অগুণতি পশুর সংখ্যা আল্লা ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। সমুদ্রে দৈত্যাকার পশুদের সঙ্গে ডাঙ্গার পশুরা মিলে-

মিশে সারাটা রাত কাটাল বেলাভূমিতে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দৈত্য যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে গেল সে। তার পেছনে পেছনে একই ভাবে মিলিয়ে গেল আর সব সামুদ্রিক জানোয়ারগুলো। এদিকে বনের পশুরাও বনে ফিরে গেল।

এই লোমহর্ষক দৃশ্য দেখে বুলুকিয়া ও অ্যাফান আতঙ্কে আর দুশ্চিন্তায় দু চোখের পাতা সারা রাত আর এক করতে পারেনি। দুজনে তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে সমুদ্র তীরে দৌড়ে গিয়ে পায়ের পাতায় সেই ফুলের নির্যাস ঘষতে লাগলেন।

এবার দ্বিতীয় সমুদ্র পেরোতে লাগলেন পায়ে হেঁটে। দিন রাত এক নাগাড়ে বহুদিন হেঁটে এক বিশাল পর্বতমালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ছোট একটি উপত্যকা দেখা গেল। ছোট ছোট সুন্দর নুড়ি পাথরে পূর্ণ উপত্যকাটি। সেগুলি সাধারণ পাথর থেকে একেবারে আলাদা। দিনটা তারা শুঁটকি মাছ খেয়ে কাটালেন। বিকালে এসে বসলেন আবার বেলা-ভূমিতে। দেখলেন সূর্যাস্ত। সমুদ্রের সূর্যাস্ত এর আগে ওরা অনেক দেখেছে। কিন্তু এই নির্জন নিষ্প্রাণ পাথরের দ্বীপে সূর্যাস্তের একটা অব্যক্ত কথা ওরা যেন বুঝতে চাইছে। সূর্যাস্তের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট আওয়াজ শুনে পেছনে ফিরতেই দেখলেন একটা বিরাট বাঘ ওদের দিকে ছুটে আসছে। দৌড়ে আর পালাবে কোথায়? তাড়াতাড়ি পায়ের পাতায় গাছের রস মেখে সমুদ্রের ওপর দিয়ে দৌড়োতে লাগলেন। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে বাঘটা ফ্যালফ্যাল করে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। হঠাৎ পিছনের দিকে ফিরে পড়ি কি মরি করে লেজটা একটু গুটিয়ে বাঘটা দিল ছুট।

এবার ওরা তৃতীয় সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে। ঝোড়ো হাওয়া বইছে। মেঘে মেঘে সারা আকাশ ঢেকে রয়েছে। নিকষ কালো সমুদ্রের রঙ। ঝড়ের বেগে বিরাট ঢেউগুলি রাগে ফুঁসছে। ওরা যেন মত্ত হাতির পিঠের ওপর দিয়ে হাঁটছে। অনেক দিন ধরে ওরা ঘুমুতে পারেনি। তারপর একনাগাড়ে এই হাঁটা। ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে পড়ে ওরা আর পা চালাতে পারছে না। হাঁটু ভেঙ্গে আসছে। তবু দেহটাকে টেনে টেনে হেঁটে চলেছে দুজনে। সৌভাগ্যবশতঃ ভোর রাতে এসে পেঁছিল একটা দ্বীপে। পাড়ে পেঁছেই শুয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়ল। ঘুম থেকে জেগে উঠে ওরা দ্বীপটার গভীরে ঢুকে পড়ল। চারদিকেই ফলের গাছ, আর কত না ফল ধরে আছে সেগুলিতে। সব ফলই যেন চিনি ভরা। পেট ভরে দুজনে ফল খেল। বুলুকিয়া মিষ্টি খাবার খুব ভালবাসে। ও একটু বেশীই খেয়ে ফেলল। সারাদিন ধরে ফল খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। সে অ্যাফানকে বললো:

—এখানে আরো দিন দশেক থেকে যাই, কি বলুন? এত সুন্দর সুন্দর নানারকমের লোভনীয় ফলগুলি পুরো স্বাদ নিতে গেলে কম করে দশ দিন তো লাগবেই।

ওর অনুরোধের সায় দিলেন অ্যাফান। তা ছাড়া, একটু বিশ্রামও তো দরকার।

ফলগুলির চরিত্র বড় অদ্ভুৎ। চিনির আধিক্যে ফলের গায়ে মিছরির মত জমাট বেঁধে রয়েছে। দশ দিন ধরে বুলুকিয়া কেবল রাশি-রাশি ফলই খাচ্ছে। এত চিনি পেটে তার সইবে কেন? দশ দিনের দিন তার পেট কামড়াতে শুরু করল। কিন্তু আর তো দেরী করা চলে না। পায়ের পাতায় সেই রস মেখে আবার শুরু হল যাত্রা। চতুর্থ সাগরে পড়ল ওরা।

একটানা চার দিন আর চার রাত হাঁটার পরে তারা একটা ছোট দ্বীপে এসে হাজির হল। সমস্ত দ্বীপটাই শাদা বালিতে ভরা। চেনা-অচেনা নানান জাতের সরীসৃপ এখানে গর্তের ভেতর থাকে। মাঝে-মাঝে ডিম পাড়তে বাইরে আসে। রোদের আলো সেই ডিম তা দিয়ে ফোটায়। এখান গাছ দূরের কথা এক মুঠো ঘাসও কোথাও নেই। এখানে থাকা যে আদৌ নিরাপদ নয় ওরা সেটা বুঝতে পারে। কিন্তু কী আর করবে। তাই একটু-খানি বসে পায়ের গোড়ায় নতুন করে রস ঘষতে থাকে। সমুদ্র পেরিয়ে একবার ডাঙায় উঠলে আবার রস লাগাতে হয়। সেই রস মেখে আবার তারা সমুদ্রে নেমে পড়ল।

পঞ্চম সমুদ্র পেরোতে তাদের লাগল মাত্র এক দিন আর এক রাত। ভোর.বেলা তারা এসে পেঁছিলো একটা অদ্ভুত দ্বীপে। এখানকার পাহাড়-গুলির চূড়ায় সোনার তাল জমাট বেঁধে রয়েছে। দ্বীপে অনেক—অসংখ্য গাছ। গাছে-গাছে উজ্জ্বল হলুদ রঙের ফুল ফুটে রয়েছে অজস্র। রাত্রিতে তারা তারার মত জ্বলজ্বল করে জ্বলে। পাহাড়ের স্বচ্ছ পাথরের ওপরে ফুলের রঙ প্রতিফলিত হওয়ার ফলে সমস্ত দ্বীপটি একটি অপরূপ মায়ার রাজত্বে পরিণত হয়। দিনেও ফুলগুলি জ্বলে; তবে বোঝা যায় না।

অ্যাফান বুলুকিয়াকে বললেন—এই হল সোনালি ফুলের দ্বীপ। অনেক-অনেক কাল আগে সূর্যের এক টুকরো ছিটকে এসে পড়েছিল এইখানে। এই দ্বীপটা সেই টুকরো।

সারা রাতই অদ্ভুৎ আলোর রোশনাই দেখে তাঁরা কাটালেন সেইখানে। ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পায়ে রস মেখে আবার তাঁরা নেমে পড়লেন সমুদ্রে। এইটি হল ষষ্ঠ সমুদ্র।

ভোর হয়ে আসছে দেখে থেমে গেলো শাহরাজাদ।

তিনশো সাতান্নতম রজনী:

পরের দিন রাত্রিতে আবার শুরু হল গল্প:

ষষ্ঠ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ওঁরা এক মনোরম বেলাভূমিতে এসে পড়লেন। এই দ্বীপটি ঘন জংগলে পরিপূর্ণ। বনের শেষে শুরু হয়েছে সমুদ্র; আর সমুদ্রের পরে শুরু হয়েছে অরণ্যানি। সেই মনোরম বনের ছায়ায় বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পরে তাঁরা গভীর বনের দিকে এগিয়ে চললেন। কিছুটা গিয়েই তাঁদের আনন্দ পরিণত হল আতংকে। এসব কীসের গাছ? গাছে কোন ফল নেই—ঝুলছে কেবল অগণিত মানুষের মাথা। মাথার চুলগুলি বোঁটার মত গাছের ডাল থেকে ঝুলছে। মুখগুলির অভিব্যক্তি সব এক নয়। কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে। গাছ থেকে যেগুল খসে পড়েছে সেগুল মাটিতে পড়েই ভীষণভাবে জ্বলতে শুরু করে। এই সব আজব

ফলের কাছে এগোতে সাহস হল না তাঁদের। পায়ে-পায়ে তাঁরা ফিরে আসেন বেলাভূমিতে। তারপরে একটা পাহাড়ের আড়ালে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাঁরা বসে রইলেন চুপচাপ। হঠাৎ বারোটি সাগরকন্যা বেলাভূমিতে উঠে নাচতে শুরু করল। তাদের সব কটিই দেখতে সুন্দর। প্রত্যেকের গলাতেই মুক্তার হার। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে নানান ছলাকলা দেখাল তারা। আকাশে চাঁদ উঠল। চাঁদের আলোয় রুপালি ঢেউ উঠল চারপাশে। এইবারে গান ধরল মেয়েরা। গান গাইতে গাইতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রে। শুরু হল তাদের জলকেলি। কেউ কেউ আবার উঠে এল ডাঙায়।

এদিকে আর এক কাণ্ড। বনের গাছগুলি প্রতি মুহূর্তে যেন এক হাত করে লম্বা হচ্ছে। হয়ত তারা চাঁদকেও ঢেকে ফেলবে। গাছের ছায়া গায়ে এসে পড়তেই তাঁদের চমক ভেঙে গেল। এতক্ষণ মোহিত হয়ে মেয়ে-গুলির নাচ দেখছিলেন। এখন সেই গাছগুলিকে দেখে আর তাঁরা সেখানে থাকতে সাহস করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে পায়ে বৃক্ষরস ঘষে সপ্তম সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন তাঁরা।

সপ্তম সমুদ্রে পাড়ি দিতে লাগল সবচেয়ে বেশী সময়। একটানা দিন-রাত হেঁটে চললেন তাঁরা। পায়ের তলায় বৃক্ষরস লাগানো। তাই তাঁরা বসতেও পারেন না, শুতেও পারেন না। টানা ছ'টি মাস চলল এই-ভাবে। সঙ্গে খাবার-দাবারও বিশেষ কিছু ছিল না তাঁদের। মাঝে মাঝে মাছ লাফিয়ে উঠছে সমুদ্র থেকে। তাঁরা ধরে ধরে কাঁচা মাছই খেয়েছেন। অনেক কষ্টের পরে শেষ পর্যন্ত তাঁরা সপ্তম সমুদ্রের ধারে একটি দ্বীপে এসে পেঁছিলেন। পুঁথিতে যেভাবে বলা ছিল দূর থেকে হুবহু ঠিক সেইরকম দেখতে পেলেন তাঁরা। অনেক দুঃখ, অনেক যন্ত্রণার শেষে অতি প্রার্থিত ভূমিতে পদস্পর্শ করলেন তাঁরা। এই সেই সপ্ত সমুদ্রের দ্বীপ আর এখানেই সুলেমানের দেহ কবরে শায়িত আছে। সুলেমানের আঙুলে রয়েছে সেই আংটি।

এই দ্বীপটি খুবই সুন্দর। চারদিকে অসংখ্য ফল আর ফুলের গাছ। থরে থরে ফলগুলি পেকে রয়েছে। বেশ কয়েকটি ছোট ঝর্ণা পাহাড় থেকে নীচে নেমে এসেছে। কাঁচা মাছ খেয়ে ওদের থাকতে হত। তাও সব সময় পাওয়া যেত না, অভুক্তই থাকতে হত ওঁদের। তার ওপর দীর্ঘ পরিভ্রমণে শরীর শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন। দেখে শুনে একটা আপেল গাছের দিকে ওঁরা এগিয়ে গেলেন। ফলের ভারে ডালগুলি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। বুলুকিয়ার তর সইল না। তাড়াতাড়ি যেই না হাত বাড়িয়ে একটা আপেল ছিড়তে গেল অমনি গাছটা ধমকে উঠল :

—এই গাছের ফলে হাত দিলে তোমাকে দু টুকরো করে ফেলা হবে।

সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাটকায় দৈত্য ওঁদের সামনে এসে দাঁড়ালো।

বুলুকিয়া থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলল—দৈত্যরাজ, ক্ষিদে তেষ্টায় আমরা মরে যাচ্ছি। এ আপেল আমরা খেতে পাব না? কেন আপনি নিষেধ করছেন?

—তোমরা ভুলে গেছ, আমি কি করব। তোমরা মানুষের বাচ্চা। তোমাদের আদি পিতা আদম আল্লার নিষেধ অমান্য করে আপেল খেয়েছিল,

ভুলে গেছো? তা, তোমরা তো আল্লাকে মান না, যখন তখন তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর। তাই আমিই এ গাছ পাহারা দিই। এটা আমার কর্তব্য। এ গাছের ফলে যে হাত দেবে তাকে দুখানা করে দিই। যাও ভাগো, অন্য জায়গায় খাবারের চেষ্টা করো।

বুলুকিয়া আর অ্যাফান প্রাণের ভয়ে ওখানে আর দাঁড়ালো না। দ্বীপের আরো ভেতরে গিয়ে অন্য ফল খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা করল। একটু বিশ্রাম নিয়ে সুলেমানের কবর স্থান খুঁজতে শুরু করল।

পুরো একটা দিন আর রাত দ্বীপে ঘুরে বেড়াল। শেষে ওরা একটা পাহাড়ের কাছে এসে পেঁছিল। পাহাড়ের পাথরগুলির রং নানারকমের। পাহাড়ের গা থেকে মৃগ নাভির সুগন্ধ ভেসে আসছে। সামনে চমৎকার একটা গুহা। ছাদ আর দেয়াল সব হীরের তৈরী। সূর্য্যের আলোর চেয়েও উজ্জ্বল। ওরা বুঝতে পারল এটা সেই গুহা যেখানে সুলেমানের কবর আছে। ওরা গুহার ভেতরে ঢুকল। যতই এগোচ্ছে গুহার জ্যোতি ততই বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে ছাদটাও যেন উঁচু হতে হতে আকাশ ছুঁয়ে ফেলল। ওরা হেঁটে চলেছে অনন্তকাল ধরে। বাইরে বোধ হয় কয়েকটা দিন আর রাত গড়িয়ে গেছে, তবু ওরা হেঁটে চলেছে। একে অপরের সঙ্গে কথা বলছে না। একটা ঘোরে সামনে খালি এগোচ্ছে। হঠাৎ ওদের একজনের মনে হল এ গুহার কি অন্ত নেই? সঙ্গে সঙ্গে গুহাটা যেন একটি হল ঘরের সামনে শেষ হল। হল ঘরটি একটা গোটা হীরে কেটে তৈরী করা হয়েছে। আর তার কি জ্যোতি বের হচ্ছে! ওরা ঘরের ভেতরে ঢুকল। মনে কোন বোধ নেই, নেই কোন অনুভূতি। একটু বিবশ সত্বা নিয়ে দেখে ঘরের ঠিক মাঝখানে নিরেট সোনার পালঙ্কে ডেভিডের পুত্র সুলেমান শুয়ে আছেন। সবুজ মুক্তার জামা পরে শুয়ে আছেন তিনি। দেহ থেকে একটা দিব্য-জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এ জামাটি তিনি জীবদ্দশায় পরতেন। ডান হাতে সেই যাদু আংটিটি। আংটিটি ক্রমাগত জ্যোতি ছড়াচ্ছে। এ জ্যোতি হীরার দ্যুতিকেও হার মানায়। আংটি পরা হাতটি বুকের ওপর রাখা। বাঁ হাত প্রসারিত। হাতে রাজদণ্ড এবং তাতে একটি মাঝারি আকারের চুনি বসানো।

অপার্থিব এক পরিবেশে ওঁরা বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন বিমূঢ় হয়ে। হয়ত সেই ক্ষণটি কয়েকটা দিনরাত কাবার করে দিয়েছে। এক সময় অ্যাফানের ধ্যান ভাঙ্গে কিন্তু আর এগোতে সাহস করল না। বুলুকিয়াকে ফিসফিস করে বললেন:

—অনেক বিপদ, অনেক ফাঁড়া কেটে আমরা এখানে এসেছি। একটুর জন্য ফিরে যাব তা হয় না বুলুকিয়া। তুমি এখানে দাঁড়াও, মহাপুরুষ যেখানে নিদ্রিত আমি একাই সেখানে যাব। তোমাকে যেটা শিখিয়ে দিয়েছিলাম তুমি সেই মোহিনীমন্ত্র বলতে থাকবে। আর আমি মন্ত্র বলার মধ্যে ঝটপট আংটি খুলে আনব। আংটি খোলার মন্ত্র উচ্চারণে একদম ভুল করবে না, বুঝেছো?

বুলুকিয়া মোহিনী মন্ত্র পাঠ শুরু করলেন জোরে জোরে অ্যাফান ধীরে ধীরে এগিয়ে যান সিংহাসনের দিকে। আস্তে আস্তে দৃঢ়ভাবে

আঙ্গুলে হাত ছুঁয়ে আংটিতে চাপ দিয়ে বার করতে চেষ্টা করতে থাকেন। যুবক বুলুকিয়া উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে থাকেন। মন্ত্রটা উল্টো-পাল্টা হয়ে গেল। শক্ত মন্ত্র আগে না বলে আহ্বান মন্ত্র ভুল করে আগে বলে দিল। এ ভুল মারাত্মক। ফলে দীপ্যমান ছাদ থেকে এক ফোঁটা তরল হীরা বৃদ্ধের মাথায় পড়ল। সমস্ত শরীরটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। পলকের মধ্যে বৃদ্ধের নশ্বর দেহ এক মুঠো ছাইয়ে পরিণত হয়ে গেল। সুলেমানের সিংহাসনের পায়ের কাছে ধুলোটুকু পড়ে রইল শুধু।

বুলুকিয়ার উত্তেজনা তড়িতে আতঙ্ক আর পাপবোধে পরিণত হল—ছিঃ ছিঃ লোভে পড়ে দেবতার ঘরে ডাকাতি করতে এসেছিল। দুঃখে ক্ষোভে চোখ ফেটে জল এল তার। অ্যাফানের দেহাবশেষ শেষবারের মত দেখে ঘরে এক দৌড়ে গুহা থেকে বেরিয়ে গেল সে। ছুটতে ছুটতে সমুদ্রের দিকে গেল। পায়ে অবশ্য সেই বৃক্ষরস লাগাতে পারেনি। কিন্তু লাগাবে কি করে? রস ভর্তি পাত্র তো অ্যাফানের কাছে ছিল। সুতরাং—

ভোর হয়ে এলো। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে গেল।

তিনশো আটান্নতম রজনী:

পরদিন রজনীতে শাহরাজাদ আবার শুরু করল।

রানী যমলিকা বলছেন, বুলুকিয়া দুঃখে আফশোষে নিজের চুল ছিঁড়তে থাকে। আমি তাকে অনেক নিষেধ করেছিলাম এই দুঃসাহসিক অভিযানে না যাবার জন্য। দুর্ভাগ্য সে এড়াতে পারবে না—এ আমি জানতাম। একা একা নির্জন দ্বীপে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াল। কি করবে কোথায় যাবে কিছুই জানে না সে। নিজের কর্ম ফলে এখানে সে স্বজনহারা হয়ে পড়ল।

ঘুরতে ঘুরতে একটা বিরাট ধুলোর ঝড় দেখতে পেল। ঝড়ের ভেতর থেকে প্রচণ্ড গোলমালের শব্দ আসছে। বাজ পড়ার চেয়েও জোরদার শব্দ। তরবারি, বর্শার ঝনঝনানির শব্দ. যেন অমানুষিক আর্ত চীৎকারে ওর বুকে কাঁপন ধরায়। হঠাৎ ধুলো ঝড় থেমে গেল। অসংখ্য জিন, ইফ্রিত, প্রেতাত্মা আকাশ, বাতাস, মাটি, বালি, জঙ্গল, সমুদ্র ইত্যাদির যেখানে যত ভূত প্রেত দৈত্যদানব ছিল সব কোথা থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠল।

ভীষণ ভয় পেয়ে গেল বুলুকিয়া। দৌড়ে পালাতে গিয়ে ও পারল না সে। অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই অপার্থিব দলের দলপতি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল—কে তুই? বছরে একবার আমরা আসি মহাত্মা ডেভিডের পুত্র সুলেমানের কবর দেখতে। তুই এখানে কি করে এলি?

—হে দলপতি আমার নাম বুলুকিয়া। আমি বানু ইজরায়েলের সুলতান। সমুদ্রে পথ হারিয়ে এখানে এসেছি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? আপনি কে? আর এই সঙ্গীসাথীরা কারা?

—আমরা জান বিন জান-এর উত্তরসূরি বলে দাবী করি। আমাদের মহাশক্তিধর নৃপতি সাখ্‌র-এর রাজ্য থেকে এই এখানে এলাম। তিনি শ্বেত-ভূমির সুলতান। বহুকাল আগে আদ্‌-এর পুত্র শাদ্দাদ রাজত্ব করতেন সেখানে।

—আজ্ঞে, সেই শ্বেতভূমি কোথায় যেখানে সাখ্‌র বাস করেন?

—কাফ্‌ পাহাড়ের পেছনে সেই রাজ্য। এখান থেকে মানুষের সেখানে যেতে লাগে পঁচাত্তর মাস। কিন্তু আমরা চোখের পলকে এই রাস্তা পাড়ি দিই। তুমি একজন রাজার ছেলে রাজা। তুমি ইচ্ছে করলে আমাদের রাজার কাছে নিয়ে যেতে পারি।

বুলুকিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাজী হল। একজন জিনের কাঁধে চড়ে চোখের পলকে রাজা সাখ্‌র-এর রাজ্য এসে গেল।

এক জাঁকজমকপূর্ণ সমতলে সে নিয়ে গেল বুলুকিয়াকে। সমতল-ভূমিতে নালাগুলি সোনা বা রুপোয় বাঁধা। নালাগুলিতে মৃগনাভি আর কুমকুমের সৌরভ। ধারে ধারে কৃত্রিম গাছ লাগানো। সে গাছের পাতা-গুলি পান্না দিয়ে আর ফলগুলি চুনি দিয়ে তৈরি। সমস্ত সমতলটা সবুজ মসলিন দিয়ে ঢাকা। মসলিনের কাপড় আবার সোনার খুঁটির ওপরে বাঁধা। তাঁবুর ভেতর সোনার সিংহাসনে রাজা সাখ্‌ব বসে আছেন। তাঁর ডান-দিকে বসে সামন্ত রাজারা আর বাঁদিকে উজির, নাজির, সেনাধ্যক্ষ, জ্ঞানী আর গুণীরা বসে আছেন।

আভূমি নত হয়ে বুলুকিয়া মাটিতে চুম্বন করে প্রশস্তি গাইল রাজার। সাখ্‌র সাদরে অভ্যর্থনা করে বুলুকিয়াকে পাশের একটি স্বর্ণাসনে বসতে বললেন। বুলুকিয়া আনুপূর্বিক সব বলে গেল। কোন কিছু বাদ দিল না। শুনে রাজসভার সকলে স্তম্ভিত হয়ে যায়।

এবার বিরাট একটা কাপড় বিছান হল সকলের সামনে। খানা শুরু হবে। জিনেরা সব চিনে মাটির থালা বাসন এনে রাখল। সোনা রুপার বাসনও এলো। বাসনগুলি ভর্তি খাবার-দাবার। পঞ্চাশটা সিদ্ধ উটের মাংস আর পঞ্চাশটা ঝলসানো উটের মাংস সোনার বাসনে সাজান হল। পঞ্চাশটা ভেড়ার মাথা রুপার বাসনে ভর্তি করা হল। সব গরম গরম, ধোঁয়া উঠছে। চিনে মাটির বাসনে যত্ন করে বড় বড় ফল খোসা ছাড়িয়ে সাজিয়ে দিল তারা। সব সাজান হয়ে গেলে জিন আর তার অতিথিরা পেট পুরে খেলেন। যা যা দিয়েছিল। সবাই চেটেপুটে খেয়ে ফেললেন। ভুক্তাবশিষ্টও কারো থালায় রইল না।

খানাপিনা শেষ হলে বললেন—আপনি আমাদের কাহিনী নিশ্চয় শোনেননি। সংক্ষেপে আমি আপনাকে সব বলছি। মানুষের মধ্যে ফিরে গিয়ে আমাদের কাহিনী প্রচার করবেন যাতে ভবিষ্যতে আমাদের সম্পর্কে কেউ যেন অজ্ঞ না থাকে।

রাত ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চুপ করে রইল।

তিনশো উনষাটতম রজনী:

পরের দিন রাত্রিতে আবার শুরু হল গল্প।

রাজা সখর বুলুকিয়াকে বললেন—আদিতে আল্লা আগুন সৃষ্টি করলেন। দুনিয়ার সাতটি জায়গায় তিনি আগুন বন্ধ করে রাখলেন। সাতটি বিভিন্ন স্তরে আগুন রেখেছিলেন তিনি। কয়েক হাজার বছর ধরে তিনি অবশ্য এই কাজটি করেছিলেন। প্রথমে যে অঞ্চলে রেখেছিলেন তার নাম

জাহান্নাম। যেসব বিদ্রোহীরা পাপের অনুশোচনা করবে না তাদের জন্য এই আগুন। দ্বিতীয় অঞ্চলের নাম দেন লাজা। উপসাগরের মত গর্ত খুঁড়ে আগুন লুকিয়ে রেখেছিলেন। এই আগুন ধর্মপ্রচারক মহম্মদের বংশধরেরা ব্যবহার করবে। তাদের ভুলত্রুটিগুলো যাতে অন্ধকারে থাকে তাই এই ব্যবস্থা। এরা পরবর্তীকালে নিজেদের ভুল স্বীকার করতে চাইবে না। তৃতীয় অঞ্চলের নাম হল জাহিন। একটা ফুটন্ত কড়ায় সে অঞ্চল জ্বলছে। এটি তৈরী হল গগ ও ম্যাগগের জন্যে। চতুর্থ অঞ্চলের নাম দিলেন সইর। এবলিসের জন্য এটি নির্দিষ্ট হল। এবলিস হলেন বিদ্রোহী দেবদূতের দলপতি। বিদ্রোহী দেবদূতের সেনাপতি আদমকে অস্বীকার ও অমান্য করেছিলেন। এইভাবে তিনি সর্বশক্তিমানের কঠোর আদেশ উপেক্ষা করেছিলেন। তিনি পঞ্চম স্থানের নাম দিয়েছিলেন সাখর। অধার্মিক, মিথ্যেবাদী ও অহংকারীদের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন এখানকার আগুন। তারপর তিনি মাটির নীচে বিশাল এক গর্ত করলেন। এখানে গুমোট আবহাওয়া আর মড়ক সৃষ্টি করে এর নাম দিলেন হিৎমৎ। সপ্তমটির নাম দিলেন হাওয়াই। এটি তিনি সুরক্ষিত করে রাখলেন। ইহুদী ও খৃস্টান বেশী হয়ে গেলে এখানে রেখে দেবেন আর যারা আল্লায় বিশ্বাস রাখবেন তাদের জন্যও এ স্থান নির্দিষ্ট রাখলেন। প্রথম জাহান্নামে সত্তর হাজার আগুনের পাহাড় আছে। প্রতেকটি পাহাড়ে সত্তর হাজার করে উপত্যকা আছে। প্রতিটি উপত্যকায় আছে সত্তর হাজার সহর। প্রতিটি সহরে সত্তর হাজার বুরুজ আছে। প্রতিটি বুরুজে সত্তর হাজার বাড়ি আর প্রতিটি বাড়িতে সত্তর হাজার বেঞ্চ। এরকম বেঞ্চতে আলাদা আলাদা নিপীড়ন ও শাস্তির বন্দোবস্ত আছে। এগুলো আপনিও গুণে দেখতে পারেন। অবশ্য নিপীড়ন ও শাস্তি কত রকমের তার খবর একমাত্র আল্লাই রাখেন। পাপীকে এই নিপীড়ন ও শাস্তির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রথম অঞ্চল সাতটির মধ্যে সবচেয়ে কম কষ্টকর। সেটি পেরোবার সময় বাকী ছটি অঞ্চল কেমন ভয়ানক তা আঁচ করতে পারবেন।

আমি আগুন সম্পর্কে এতটা বললাম কেন জানেন? আমরা জিনেরা অগ্নিপুত্র, তাই।

আপনাকে সব বুঝিয়ে বললাম। আমরা যে অগ্নি সন্তান তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আরও বলছি শুনুন:

—আল্লা প্রথমে দুটি জীব সৃষ্টি করলেন। এরা দুজনেই জিন। তাঁর প্রহরী হিসেবে তাদের নিযুক্ত করলেন। নাম খলিত ও মলিত। একজনের রূপ হল সিংহের অন্যজনের হল নেকড়ের। সিংহকে তিনি পুরুষ হিসাবে সৃষ্টি করলেন আর নেকড়ে হল স্ত্রীলোক। সিংহ খলিতের পুরুষাঙ্গ হল কুড়ি গজ লম্বা। নেকড়ের যৌনাঙ্গ অনেকটা কচ্ছপের মত। যৌনাঙ্গটি খলিতের পুরুষাঙ্গ ধারণ করার মত উপযোগী করেই আল্লা সৃষ্টি করেছিলেন। একজনের গায়ের রং হল সাদা-কালো অন্যটির রং হল সাদা-গোলাপী। আল্লা এদের দুজনকে মিলিয়ে দিলেন। ক্রমে এদের বহু সন্তান সন্ততি হল— সরীসৃপ, ড্রাগন, বিছা আর যেসব জীব হুল ফোটাতে পারে তারা। ওদের সন্তানকে সাতটি অঞ্চলে নিন্দিত পাপীদের যন্ত্রণা দেবার জন্য বহু সংখ্যায়

ছড়িয়ে দিলেন আল্লা। আল্লা খলিত ও মালিতকে দ্বিতীয় সঙ্গমের জন্য আদেশ দিলেন। এবারে সাতটি পুরুষ আর সাতটি নারী হল তাদের। আল্লার নির্দেশ মান্য করে তারা বড় হতে থাকে। তাদের একজনকে সর্বশক্তিমান আল্লা বেছে নিলেন। খলিত ও মলিতে অসংখ্য মিলনের ফলে লক্ষ লক্ষ প্রজন্মের জন্ম হল। সৌভাগ্যবান দলপতির নাম এবলিস। পরবর্তীকালে মানুষের আদি পিতা আদমের কাছে মাথা নত না করে বিদ্রোহী হয়েছিল। এ আদেশ আল্লাই দিয়েছিল। এর ফলে চতুর্থ অঞ্চলে সে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এখানকার অধিবাসীরা সকলেই আল্লার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন আগে। এবার সকলে একাট্টা হল। এবলিস তার সাঙ্গপাঙ্গ আর সন্তান-সন্ততিদের জায়গা হল দোজখে। বাকী ছজন যুবক আর অন্যান্য মেয়েরা ছিল তারা আল্লার কাছে বিনীত থেকে গিয়েছিল। আমরা ওদেরই বংশধর। সংক্ষেপে আপনাকে আমাদের বংশগাথা বললাম। আমাদের পর্বত প্রমাণ খাওয়া দেখে অবাক হয়েছেন নিশ্চয়ই। সব শুনলে আপনি অবাক হবেন না। আমি বলেছি আমাদের আদি পুরুষ ও নারী ছিল সিংহ ও নেকড়ে। তাদের সন্তান আমরা। তাই আমাদের খোরাক বেশী। আমরা এক-একজন রোজ দশটি উট, কুড়িটি ভেড়া আর বড় বড় চল্লিশ হাতা ঝোল খাই। এক-একখানি হাতা বড় কড়াই-এর সমান।

আমাদের ব্যাপারে আপনার জ্ঞান-ভাণ্ডার ভরে দিলাম। আপনি মানুষের মধ্যে যখন ফিরে যাবেন তখন এ জ্ঞান আপনার অপরিসীম কাজে লাগবে। আরো বলছি শুনুন:

এ পৃথিবীর নোংরা বা আবর্জনা বরফগলা জলে ধুয়ে যায়। এ বরফে কাফ চূড়া থেকে গলে নেমে আসে। পৃথিবীর গর্ভের উত্তাপ সমস্ত জীবজগৎ ধ্বংস করে ফেলত যদি না এই বরফ থাকত। পৃথিবীর নিজেরই সাতটি স্তর আছে। এই স্তরগুলো ঘাড়ে করে দাঁড়িয়ে আছে প্রভূত শক্তিশালী জিনি। জিনি একটা পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়টি আবার ষাঁড়ের ঘাড়ে স্থাপিত। বিশাল একটা মাছ ষাঁড়টিকে ধরে আছে। আর মাছটি অনন্ত সমুদ্রে অবিরাম সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে।

অনন্ত সাগরের তলদেশ হল দোজখের ছাদ। দোজখের সাতটি অঞ্চল বিরাট একটা সাপ মুখে আটকে রেখেছে। শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত আটকে রাখবে। সেই শেষ বিচারের দিন সাপটি দোজখ আর তার অধিবাসীদের উগরে দেবে আল্লার সামনে। ওদের অন্তিম বিচারের রায় দেবেন আল্লা।

ভোর হয়ে আসছে দেখে গল্প থামিয়ে চুপ করে রইল শাহরাজাদ।

তিনশো ষাটতম রজনী:

পরের দিন রাত্রে শাহরাজাদ আবার শুরু করল।

এই হল আপনাদের ও পৃথিবীর সৃষ্টি কথা।

আরও একটা ব্যাপার জেনে যান। আমাদের বয়স কখনো বাড়ে না। আমরা বৃদ্ধ হই না। অথচ, আমাদের চারপাশের দুনিয়া, তার প্রকৃতি, মানুষ, তার পশু পাখী সমস্ত জীবজগৎ দ্রুত বার্ধক্যের দিকে, জরার দিকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। আমরা অনন্ত যৌবন লাভ করেছি। জীবন

ফোয়ারার অমৃত আমরা পান করেছি। এই ফোয়ারা অতন্দ্র পাহারা দিচ্ছেন খিজর সেই ছায়ালোকে। পুণ্যাত্মা খিজর সমস্ত ঋতুকে এক করে দিয়েছেন, রাজকীয় সবুজে সাজিয়েছেন গাছপালা। স্রোতস্বিনীকে বাঁধভাঙ্গা গতি দিয়েছেন। তৃণভূমিতে সবুজ গালিচা পেতে দিয়েছেন আর সূর্য ডুবে গেলে আকাশ জুড়ে গোধূলির আলো নিজের হাতে এঁকে দিয়েছো।

বুলুকিয়া, আপনি মনোযোগ দিয়ে আমার সব কথা শুনেছেন। আপনাকে আমি পুরস্কৃত করতে চাই—অবশ্য যদি পছন্দ হয় আপনার। একজন আপনাকে ঘাড়ে করে এখান থেকে আপনার দেশে পেঁছে দেবে।

বুলুকিয়া জিন নৃপতিকে তার আতিথেয়তার জন্য সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল। তারপর জিনেদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একজন বলবান জিনের ঘাড়ে চড়ে বসল। পলকের মধ্যে বুলুকিয়ার রাজ্যের সামনে নামিয়ে দিয়ে জিন বিদায় নিল।

কোন রাস্তা দিয়ে যেতে হবে প্রথমে স্থির করে নিল বুলুকিয়া। দুটি সমাধির মধ্য দিয়ে রাজধানীতে যাবার রাস্তায় সে পা বাড়াল। সমাধির মধ্যখানে বসে বসে এক যুবক উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে চলেছে। বুলুকিয়া দাঁড়াল। ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল—কি হয়েছে তোমার? দুই কবরের মাঝখানে বসে কাঁদছ কেন? আমাকে সব খুলে বল, তোমার সব কষ্ট আমি দূর করে দেব।

জলভরা চোখ তুলে যুবকটি বলল—আপনি অযথা কেন আমার জন্য কষ্ট করবেন? আপনার দেরী হয়ে যাচ্ছে। আপনি যেখানে যাচ্ছিলেন চলে যান। আমার দুর্ভাগ্য তাই আমি কাঁদছি। নীরবে কাঁদব বলে দুই কবরের মাঝে এসে বসেছি। দুঃখের পাথর চোখের জলে ভেজাতে পারি কিনা দেখছি।

—সত্যি খুব দুর্ভাগের ব্যাপার ভাই! তোমার দুঃখের কথা আমি শুনব। বল আমাকে। তোমার দুঃখের কাহিনী আমাকে নিঃসঙ্কোচে বলতে পার।

বুলুকিয়া যুবকটি পাশে পাথরের ওপর বসে পড়ল। ওর হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে একটু চাপ দিল। বুলুকিয়া তার সমস্ত ঘটনা ওকে বলে গেল। এরপর বলল—আমার কাহিনী তো শুনলে এবার তোমারটা বল। তোমার কাহিনী আমার মনে নিশ্চয় সাড়া জাগাবে।

যুবকের সুন্দর মুখে বিষাদের ছায়া নেমে এলো। ধীরে ধীরে চোখ তুলে নিজের কাহিনী বলতে লাগল:

ভাই, আমিও এক রাজার ছেলে। আমার গল্প অদ্ভুত আর আশ্চর্যজনক। আমার জীবনের কাহিনী শুনলে বিষাদে আপনার মন ভরে উঠবে।

যুবকটি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছলো। কপালটা চেপে ধরে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে আবার শুরু করল।

—আমার জন্ম কাবুলে। সেখানে আমার বাবা টিগমাস বাদ্‌-সালানো এবং আফগানিস্থান রাজ্য শাসন করতেন। আমার বাবার নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, লোকে তার নামে ধন্য ধন্য করত। বাবার সাতজন সামন্ত রাজা ছিলো। প্রত্যেকের শাসনাধীন শহর ছিল একশটি আর একশটি করে দুর্গ। বাবার অধীনে একশতটি দুঃসাহসিক ঘোড় সওয়ার এবং একশজন অতি সাহসী যোদ্ধা ছিল। আমার মা ছিলেন খোরাসানের সুলতান বাহরোয়ানের মেয়ে। আমার নাম জানশাহ।

ছোটবেলা থেকে আমার বাবা আমাকে লেখাপড়া, নানা কলাবিদ্যায় এবং বলবত্তায় পারদর্শী করে তোলেন। আমার যখন পনের বছর বয়স তখন আমার বাবার রাজ্যে আমার নাম ছিল সেরা অশ্বারোহীদের প্রথমে। আমার দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চড়ে শিকার করতে যেতে ভাল লাগতো। কখনো কখনো ঘোড়ায় চড়ে দূর থেকে দূরে চলে যেতাম।

একদিন বাবা তাঁর পারিষদবর্গ নিয়ে শিকারে গেলেন। আমিও বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম। তিনদিন ধরে বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে নানান মজার খেলা খেলেছিলাম। তিনদিনের দিন সূর্যাস্তের সময় আমরা তাঁবু খাটিয়ে বসে বিশ্রাম করছি এমন সময় ছোট একটি হরিণ শিশু লাফিয়ে লাফিয়ে কোথায় থেকে আমাদের সামনে এসে পড়ল। আমি একটা তাঁবুতে বসে সাতজন সৈন্যের সঙ্গে বিশ্রাম করছিলাম। দেখলাম হরিণটা লেজ তুলে দৌড়ে পালাল। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের নিয়ে হরিণটার পেছনে পেছনে ধাওয়া করলাম। অনেকক্ষণ ধরে ধাওয়া করতে করতে একটা বিরাট নদীর ধারে এসে পড়লাম। এবার ওকে ঘিরে ধরতে পারব। পালাবে কোথায়! হরিণটা একবার আমাদের দেখল পেছন ফিরে। তারপর সঙ্গে সঙ্গে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওপারের দিকে সাঁতারাতে লাগল। আমরাও ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে নদীর কিনারায় একটা মাছের নৌকা ঠেলে নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে তাতে চড়ে বাইতে লাগলাম। আমাদের ঘোড়াগুলিকে একজন সৈন্যের ওপর ভার দিয়ে এসেছিলাম। যাহোক আমরা মাঝ নদীতে এসে পড়লাম তাড়াতাড়ি। নৌকা আর আমাদের বাগে থাকছে না। ইতিমধ্যে ঝড় বইতে শুরু করেছে। তাছাড়া নদীর স্রোতও ছিল প্রচণ্ড। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ আগে হয়েছিল, এখন ঘোর অন্ধকার দিক-বিদিক শূন্য হয়ে নৌকা যে কোথায় ভেসে চলল বুঝতে পারছি না। সমস্ত চেষ্টা আমাদের ব্যর্থ হল। সারারাত ধরে প্রবলবেগে নৌকা ভেসে চলল। এ সময় কোন পাথরে বা পাহাড়ে ধাক্কা খেলে আর রক্ষা নেই। এই আতঙ্ক আমাদের আরো কাহিল করে দিল। পরের দিনও একই ভাবে ভেসে চললাম। আল্লার মেহেরবানীতে আমাদের কোন দুর্ঘটনা ঘটল ন। দ্বিতীয় রাত্রির শেষের দিকে স্রোতে ভেসে আমাদের নৌকা পাড়ে এসে ভিড়ল। আমরা লাফিয়ে নৌকা থেকে নেমে পড়লাম।

এরমধ্যে যে সৈন্যের ওপর আমাদের ঘোড়ার দায়িত্ব দিয়ে এসেছিলাম, সে আমার বাবাকে সব জানিয়ে দিল। বাবা, মহামান্য টিগবাস ধরে নিলেন, আমরা নদীতে ডুবে গেছি। শোকে দুঃখে হতাশায় মাথার রাজমুকুট ছুঁড়ে ফেলে দিলেন নিজের হাতে। দিকে দিকে দূত পাঠালেন আমাদের খোঁজে। আমি হারিয়ে গেছি, এ খবরটা আমার মায়ের কাছেও পেঁছোতে দেরী

হয়নি। দুঃখিনী মা আমার নিজের মুখ নিজেই আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে তুললেন। মুঠো-মুঠো চুল ছিঁড়ে ফেললেন। গভীর দুঃখে বুক চাপড়াতে লাগলেন। নিজের পোশাক ছিড়ে ফেললেন এবং সবশেষে শোক বস্ত্র পরলেন।

এদিকে আমরা তীরে নেমে একটু ভেতরে ঢুকে দেখি সুন্দর একটা ছোট্ট নদী। একটা লোক তার পাড়ে বসে তার পা দুটো জলে ডুবিয়ে রেখেছে। আমরা তাকে অভিবাদন জানিয়ে জানতে চাইলাম আমরা কোথায় এসে পড়েছি। লোকটা আমাদের অভিবাদনের প্রত্যুত্তর না দিয়ে শকুনের মত তীক্ষ্ম স্বরে চেঁচিয়ে উঠল। শকুন মরা জন্তুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে আনন্দে যেমন চিৎকার করে তেমনি চেঁচাল। আমাদের বুক কেঁপে উঠল সেই চিৎকারে।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চুপ হয়ে গেল।

তিনশো একষট্টিতম রজনী :

পরের দিন রজনীতে শাহরাজাদ গল্প শুরু করল।

—লোকটা তারপর উঠে দাঁড়াল। আশ্চর্য ওর কোমর দুভাগ করা। ওপরের ভাগটা আমাদের দিকে ছুটে আসছে আর নীচের অংশটা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মত বহু লোক ছুটে আসছে ঝর্ণার ধার দিয়ে। ঝাঁকুনি দিয়ে দেহটা দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে ওপরের অংশ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমার সঙ্গীদের তিনজনকে কাছাকাছি পেয়ে ঘিরে ধরে হালুম হালুম করে খেতে শুরু করল। তিনজন উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে নৌকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। জলে ডুবে মরে যেতে রাজি—কিন্তু এই রাক্ষসদের হাত থেকে যে করেই হোক রেহাই পেতে হবে। নৌকাটাকে জলে ঠেলে দিয়ে স্রোতে ভেসে চললাম আমরা। নদীর তীর ধরে ছুটে আসছে অসংখ্য উরু, ঠ্যাং ; আমাদের ধরার চেষ্টা করছে। দেহগুলো আমার হতভাগ্য সঙ্গীদের খেতে ব্যস্ত। ওদের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। এই রাক্ষসগুলোর পেটটাও পুরো ছিল না দেহটার সঙ্গে। এই অর্ধেক পেটেই কিভাবে খাচ্ছিল আমার সঙ্গী তিনটিকে! উঃ ভাবলেও শরীর কেমন করে! হতভাগ্য সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে শোক জ্ঞাপন করে ভাবছি, সমস্ত ঘটনাটা কি দ্রুতই না ঘটে গেল। এ যে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

পরের দিন ছোট্ট একফালি জমিতে আমাদের নৌকা ভিড়ল। এখানে গাছে গাছে ফল ধরে আছে। বাগানে জানা অজানা কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটেছে। নৌকা ছেড়ে এবার আর নিজে নামলাম না। সঙ্গীদের পাঠিয়ে দিলাম জায়গাটা ভাল করে দেখে আসবার জন্য। প্রায় আধবেলা কাটিয়ে ওরা ফিরল। ওরা ডানে ও বাঁয়ে ভাল করে দেখেছে, সন্দেজনক কিছু চোখে পড়েনি। মার্বেল পাথরের একটা বড় প্রাসাদ দেখে এসেছে। প্রাসাদের সামনে স্বচ্ছ শামিয়ানা টাঙ্গানো। চারপাশে বাগান। বাগানে সুন্দর একটি দীঘি। ওরা সবাই মিলে প্রাসাদে ঢুকেছিল। বিরাট একটা হলঘর। আবলুষ কাঠের বহু আসন মণিমাণিক্যখচিত সিংহাসনের দুপাশে সারিবদ্ধভাবে সাজানো।

আশ্চর্যের ব্যাপার কি বাগানে কি প্রাসাদে ওরা কোন প্রাণীর চিহ্ন দেখতে পায়নি।

ওদের ভাল করে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিন্ত হলাম। নৌকা ছেড়ে প্রাসাদে যাব বলে ঠিক করলাম। বাগানের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে গাছ থেকে পাকা আর টাটকা ফল খেয়ে তাজা হয়ে নিলাম আগে। বিশ্রাম নেবার জন্য প্রাসাদে ঢুকলাম আগে। সোজা সিংহাসনে গিয়ে বসলাম আর আমার সঙ্গীরা আবলুষ কাঠের আসনে বসল। সিংহাসনে বসার পর আমার বাবা-মা আর বাবার সিংহাসনের কথা মনে পড়ল। নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না, কেঁদে ফেললাম। আমার দেখাদেখি আমার সঙ্গীরাও কেঁদে ফেলল।

নিজেদের দুঃখে নিজেরা কাতর। এমন সময় বিশাল সমুদ্র গর্জনের মত শব্দ কানে এল। সামনে তাকিয়ে দেখি উজির, পাত্রমিত্র ও অমাত্যের দল হলঘরে ঢুকছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এরা সবাই বাঁদর। নানান আকারের বাঁদর, ছোটবড় সব রকমেরই এই মিছিল রয়েছে। এবার আর উপায় নাই, মৃত্যু অবধারিত। দৈত্যাকার চেহারার বাঁদরটিকে উজির বলে মনে হল। সে আমার সামনে এগিয়ে এসে কুর্নিশ করে কথা বলল। আশ্চর্যের ব্যাপার, মানুষের ভাষায় কথা বলছে:

—আমি আর আমার লোকজন আপনাকে সুলতান বলে মেনে নিচ্ছি। আপনার এই তিন সঙ্গী আমাদের সৈন্যবাহিনীর তিন প্রধান হবেন।

তারপর মহা সমারোহে কাঁচ হরিণের মাংস দিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করল। খানাপিনার শেষে আমাদের উজির বলল—জাঁহাপনা, প্রাসাদের বাইরে আপনার সৈন্যবাহিনী ও প্রজারা অপেক্ষা করছে। চলুন, বাইরে এসে দেখবেন। ওরা তৈরী হয়ে আছে, এই মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হবে। আমাদের প্রাচীন শত্রু প্রেতের রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ হবে।

বহু ধকল গেছে শরীর আর মনের ওপর দিয়ে। ওদের বিদায় দিয়ে তিনজন সঙ্গী নিয়ে সমূহ পরিস্থিতির আলোচনা করতে বসলাম। ঘণ্টাখানেক আলোচনার পর ঠিক হল—প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাব এখনই। আর যত তাড়াতাড়ি হয় এদেশ ছেড়ে পালাতে হবে। প্রাসাদের পেছনের দরজা দিয়ে ঘুর পথে নদীর তীরে চলে এলাম। কিন্তু আমাদের নৌকাটা নেই। কেউ সরিয়ে নিয়েছে বুঝলাম দাগ দেখে। কি আর করব, ফিরে এলাম সেই প্রাসাদেই। অবসন্ন শরীরে আর জেগে থাকতে পারলাম না, ঘুমিয়ে পড়লাম সবাই।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি উজির এসে কুর্নিশ করে বলল—জাঁহাপনা, সব তৈরি। প্রেতদের সঙ্গে যুদ্ধের সব তৈরি।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখি কয়েকজন লোক বিরাট বিরাট চারটে কুকুর ধরে আনছে। আমাদের চারজনকে কুকুরের পিঠে চড়তে হবে। আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন দাম নেই। কুকুরের পিঠে চড়তে হল। কুকুরগুলো শিকলে বাঁধা ছিল। তারা আগে আগে চলল আমাদের পিঠে করে। সমস্ত সৈন্যের নেতৃত্ব তো আমাদেরই দিতে হবে। আমাদের পেছনে উজির বিশাল বানর সৈন্যের দলপতি হিসাবে চলেছে। আর তার পেছনে লাখ লাখ বানর সৈন্য আকাশ বাতাস তোলপাড় করে চেঁচাতে

চেঁচাতে চলেছে।

আমরা একদিন একরাত খালি কুচকাওয়াজ করতে করতে এগিয়ে চললাম। বিরাট একটা কৃষ্ণবর্ণ পাহাড়ের কাছে এসে দাঁড়ালাম। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে প্রেতেরা লুকিয়ে ছিল। আমাদের দেখে হঠাৎ বেরিয়ে এল। বিচিত্র ধরণের সব চেহারা। ভয়ংকর দর্শন, বুকের রক্ত জমে যাবার অবস্থা। কারো উটের মত দেহে ষাঁড়ের মাথা, কারো হায়নার মাথা, কারো বা দেহই নেই। জীবনে যা দেখিনি বা কল্পনাও করিনি এমন সব চেহারা ওদের।

আমাদের দেখতে পেয়ে ওরা পাহাড় থেকে নেমে এসে পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়াল। তার পর অঝোর ধারায় পাথর ছুঁড়তে আরম্ভ করল। আমার সৈন্যবাহিনীরাও ওদের ছুঁড়ে দেওয়া পাথর তুলে নিয়ে সামনে পাল্টা ছুঁড়তে লাগল। ক্রমেই যুদ্ধের চেহারা ভয়ংকর রূপ নিল। এবং যুদ্ধটা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। আমার আর আমার তিনজন সঙ্গীর কাছে তীর-ধনুক ছিল। তীর ছুঁড়ে কয়েকটাকে ঘায়েল করলাম। বহু মরেও গেল। আমার সৈন্যবাহিনী তা দেখে আনন্দে চেঁচায় ও উৎসাহ বোধ করে। যুদ্ধে জয় আমাদেরই হল। প্রেতেরা পালাচ্ছে, ওদের পিছু ধাওয়া করলাম।

আমরা চারজন কুকুরের পিঠে চেপে সবার আগে দৌড়াচ্ছি। ধাওয়া করার আনন্দে বিশৃংখল। এই সুযোগে আমাদের পালাতে হবে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে। সবাই ছুটছে, সবাই ব্যস্ত, মার মার, ধর ধর শব্দ। আমাদের দিকে কেউ নজর রাখছে না। পিছনে ফিরলাম আমরা। প্রেত আর বানর সৈন্যর চোখের ওপর দিয়ে আমরা মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলাম।

কুকুরের পিঠে চেপে আমরা অনেকক্ষণ দৌড়ালাম। কুকুরগুলোর জিভ বেরিয়ে গেছে, মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে। ওদের বিশ্রাম দেওয়ার জন্য থামতে দেখি বিরাট এক ঝকমকে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে হিব্রু ভাষায় লেখা :

> হে বন্দী ভাগ্য যাহাকে বাঁদর নৃপতি সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতির উদ্দেশ্যে তুমি যদি দৌড়াইয়া থাক, তোমার মুক্তির পথ বলিতেছি। দুইটি পথ তোমার সম্মুখে রহিয়াছে।—হ্রস্বতর পথটি ডানদিকে গিয়াছে। উক্ত পথ সমুদ্রের বেলাভূমিতে মিশিয়াছে। বেলাভূমি পৃথিবীটা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। পথটি বিশাল মরুভূমির অভ্যন্তর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। মরুভূমির রাক্ষস, দৈত্য ও জিনে পরিকীর্ণ। অপর পথটি বামদিক দিয়া গিয়াছে। ইহা দীর্ঘতর পথ। চারিমাস লাগিবে পথের কিনারায় পেঁছিতে। উক্ত পথটি একটি উপত্যকার অভ্যন্তর দিয়া গিয়াছে। উপত্যকার নাম পিপীলিকার উপত্যকা। দ্বিতীয় পথ ধরিয়া কোনক্রমে পিপীলিকার সংশ্রব এড়াইতে পারিলে তুমি অগ্নি পর্বতের পাদদেশে আসিতে পারিবে। উক্ত পাদদেশে ইহুদীদের নগরী বর্তমান। আমি, ডেভিডের পুত্র সুলেমান তোমার মুক্তি উপায় নির্ধারণ করিয়া রাখিলাম।

ভোর হয়ে এল। শাহরাজাদও গল্প থামিয়ে চুপ করে রইল।

তিনশো বাষট্টিতম রজনী :

পরদিন রাত্রিতে শাহরাজাদ আবার গল্প শুরু করল :

বাঁদরের হাত থেকে পালিয়ে ওরা পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ লিপি পড়ে বাঁদিকে যাত্রা শুরু করল। জাঁহাপনা এবার যুবক জানশাহ্‌র মুখেই শুনুন :

বাঁদিকের পথ ধরে চলতে লাগলাম। এই রাস্তা ইহুদী শহরে গেছে। মাঝখানে পিঁপড়ে উপত্যকা পড়বে, আমাদের সেটা মনে রাখতে হবে।

আমরা একটি দিনও পুরো যাইনি আমাদের পায়ের তলার মাটি কেঁপে কেঁপে উঠছে—ভূমিকম্প শুরু হল নাকি। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখি কি, আমার সেই লাখ লাখ বানর প্রজা আমাদের তাড়া করে আসছে। সকলের আগে সেই বানর উজীর। সর্বনাশ। আমাদের আর পালানো হল না। দ্রুত গতিতে আমাদের ঘিরে ফেলল চারদিক থেকে। অনেকে চেঁচাচ্ছে, নাচছে হুটোপুটি করছে। এর মধ্যে উজীর আমার সামনে এগিয়ে এল। তামাম বানরদের প্রতিনিধি সে। যুদ্ধে জেতার জন্য আমাদের অভিনন্দন জানালো। বহুদিন পর ওরা জয়ী হল—একটা ছোট খাট বক্তৃতাই দিয়ে ফেলল উজীর।

দিব্যি সভা চালিয়ে গেল উজীর। রাগে আমাদের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। আমরা সতর্ক হলাম—কোন মতেই আমাদের মনের অবস্থাটা ওদের বুঝতে দেওয়া হবে না। হৈ হৈ করে প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে চললো। আমার নতুন রাজ্যে আমার নাকি অভিষেক হবে। যুদ্ধ জয় করেছি একি চাট্টিখানি কথা। ধরা পড়ার আগে আমরা একটি উপত্যকায় চলে এসে-ছিলাম। পিছন ফিরে চললাম নতুন রাজ্যপাটে। হঠাৎ উপত্যকার মাটি ফেটে গেল। পিলপিল করে পিঁপড়ে বেরিয়ে এলো। আর তাদের কি আয়তন। বাপস। পলকের মধ্যে বানর আর পিঁপড়ের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেল। উঃ সে কি লড়াই। পিঁপড়েগুলো তাদের সাঁড়াশির মত দাঁতের ফাঁকে এক একটা বানরকে ধরে দুটুকরো করে ফেলছে। দশ পনরটা করে বাঁদর পিঁপড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে টেনে টেনেই ছিঁড়ে ফেলছে এক একটা পিঁপড়েকে। জীবনে এরকম লড়াই দেখিনি।

লড়াই বেশ জমে উঠেছে। ওরা লড়াই করুক মজাসে। আমরা কুকুরের পিঠে করে পালাই। কিন্তু আমাদের সকলের পালান হল না। আমার তিনজন সঙ্গীকে এখানেই রেখে যেতে হল। বেচারী তিনজন কেমন করে যেন পিঁপড়ের দাঁতের সামনে পড়ে গিয়েছিল। টুকরো টুকরো হয়ে গেছে সঙ্গে-সঙ্গে। কি দুর্ভাগ্য আমার। আপদে বিপদে প্রতিবার পরামর্শ করে আমরা রেহাই পেয়েছি। এখন আমি একেবারেই একা। ওদের আত্মার জন্য সদগতির প্রার্থনা জানিয়ে এগিয়ে চললাম। চলতে চলতে একটা নদীর সামনে এসে পড়লাম। নদীর তীরে শেষ সঙ্গী কুকুরটিকে বিদায় দিলাম। সাঁতরে নদী পার হলাম। নদীর মধ্যে কোন বিপদ হয়নি। জামা কাপড় শুকিয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরবেলা ঘুম ভাঙতে সুস্থ মনে ভাবলাম, আর আমার ভয় নেই। পিঁপড়ে বা বাঁদর আর কেউ নদী পার হয়ে আমাকে ধরতে আসবে না।

এবার শুরু হল পায়ে চলা। দিনের পর দিন হেঁটে চললাম। লতা-পাতা আর গাছের শেকড় খেয়েই কাটল আমার। অবশেষে সেই পর্বতের লেখার নির্দেশ মত ইহুদীদের শহরে এসে পেঁছিলাম। একটা জিনিস সেই লিপিতে

বলেনি। এটা আমার পরে নজরে এসেছে। একটা নদী খালি পায়ে হেঁটে পেরোতে হয়। অথচ নদীর পাড়ে আমাকে পুরো এক সপ্তাহ বসে থাকতে হয়েছিল। এই নদীর কথা লিপিতে বলা ছিল না। একটা বিশেষ দিনে নদীটা পেরোতে পেরেছিলাম। পরে শুনেছি ; নদীতে শনিবার দিন জল থাকে না। ঐ দিন ইহুদীদের ভোজ হয়।

নদী পেরিয়ে শহরে ঢুকলাম। রাস্তায় কাউকেও দেখলাম না। ছিম-ছাম রাস্তা। এদিক ওদিক দেখে নিয়ে সামনেই প্রথমে যে বাড়িটা পেলাম সেখানেই ঢুকে পড়লাম। দরজা ঠেলে ভেতরে চলে এলাম, একটা বড় হলঘর। কয়েকজন লোক গোল হয়ে বসে আছেন। তাদের দেখে বেশ গণ্যমান্য বলে মনে হল। ঘরে ঢুকে নিজেকে নিরাপদ বলে ভাবলাম—ফাঁড়া বোধ হয় কেটে গেল। ওদের কাছে সালাম জানিয়ে বললাম ঃ

—আমার নাম জানশাহ্। আমি সুলতান টিগমাসের পুত্র। কাবুলে এবং বানু সালানের আধিপতি আমি। অনেক বিপদ কাটিয়ে এখানে এসেছি আমি। এখানে থেকে আমার রাজ্য কত দূরে আর কোনদিকে দয়া করে বলে দেবেন ? আমি ক্ষুধার্ত !

যারা বসেছিলেন সকলেই আমার দিকে তাকালেন। একজনই আমার সঙ্গে কথা বললেন। তাকে দেখে মনে হল উনি বোধ হয় ওদের দলের মাথা। উনি আমাকে ইশারায় বললেন—আগে খানাপিনা করে নাও চুপচাপ। কথা বলো না।

আঙ্গুল দিয়ে একটা খাবারের থালা দেখিয়ে দিলেন। থালায় অনেক-খানি রান্না করা মাংস। এরকম রান্না করা মাংস আমি কোনদিন খাইনি। পাশেই সরাব ছিল। নিজের মনে মাংস আর সরাব খেলাম। তারপর চুপ করে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর সেই দলপতি আমার কাছে উঠে এসে কথা বললেন। অদ্ভুত সে সব কথা। সাংকেতিক ভাষায় বললেন ঃ

—কে ? কখন ? কোথায় ?

আমি ইশারা করে জেনে নিলাম উত্তর দিতে পারব কি না।

ইশারায় জানালেন, মাত্র তিনটি কথা বলতে পার।

আমি বললাম—ব্যবসায়ীর দল, কালুল, কখন ?

বৃদ্ধ ইশারায় জানালেন—জানা নেই।

তারপরে আমাকে ইশারায় বেরিয়ে যেতে বললেন—খানাপিনা শেষ হয়েছে, যাও কেটে পড়।

সালাম জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। বেরিয়ে আশ্চর্য হলাম—সবাই দেখি ইশারা করছে। এতো মহা সমস্যায় পড়া গেল দেখি ! কে সাহায্য করতে পারবে ভাবছি। একটা চীৎকার কানে এল।

—এক সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা যে রোজগার করতে চাও, তার সঙ্গে সুন্দরী ক্রীতদাসীও পাবে, আমার সঙ্গে চলে এসো—মাত্র এক প্রহরের কাজ করলেই পেয়ে যাবে।

এদিক ওদিক ঘুরে কোন লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না। যে লোকটা চেঁচাচ্ছিল তার কাছে গিয়ে বললাম—আমি করে দেব, এক হাজার সুবর্ণ-

মন্ত্রা আর মেয়েটাকে চাই।

আর কোন কথা না বলে লোকটা আমার হাত ধরে একটা বাড়িতে নিয়ে গেল। বেশ ধনী লোকের বাড়ি। সুন্দর সুন্দর আসবাব পত্রে সারা বাড়ি ভর্তি। বাড়ির ভেতর একজন বুড়ো ইহুদী বসেছিল একটা আবলুস কাঠের আসনে। সেই লোকটা বুড়োকে কুর্নিশ করে বলল—এই যে একজনকে পেয়েছি। লোকটা ভিনদেশী মনে হয়। তবে যুবক তো, খাটতে পারবে তিন মাস ধরে সমানে। হেঁকে যাচ্ছিলাম, এই লোকটাই সাড়া দিল এত দিনে।

বুড়ো সব শুনে সঙ্গে সঙ্গে ওর পাশে আমাকে বসিয়ে ভাল ভাল খাবার আর পানীয় এনে দিল। খাবার দাবার খুব উপাদেয় ছিল বলতে পারি। তারপর থলে থেকে গুণে গুণে এক হাজার দিনার দিল আমাকে। ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিনারগুলো দেখলাম ; না, এগুলো অচল বা জাল নয়। আমার খুব আশ্চর্য লাগছিল ব্যাপার স্যাপার দেখে। যা হোক কয়েকজন নফরকে বলে আমার জন্য উৎকৃষ্ট পোশাক আনিয়ে দিল। ওগুলো পরে ফেললাম। যে মেয়েটি আমার হবে, তাকেও আনিয়ে দেখিয়ে দিল। এতো অদ্ভুত ব্যাপার ! কি করতে হবে, কি কাজ তার নামে পাত্তা নেই অথচ কাজের মজুরী মেয়েটাকে এনে দেখানো সবই আগাম হল। ভারি মজা লাগছে আমার।

ভোর হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে রইল।

তিনশো তেষট্টিতম রজনী :

পরের দিন রাত্রে শাহরাজাদ বলতে শুরু করল :

রেশমের জামা পরিয়ে মেয়েটার ঘরে পেঁাছিয়ে দিল আমাকে। মেয়েটি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমাকে ঘরের মধ্যে রেখে নফররা বেরিয়ে গেল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। যা হোক সুন্দরী নারী সামনে বসে আছে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। রাত কাটালাম মেয়েটির সঙ্গে। বুড়ো বলেছিল মেয়েটি কুমারী, অস্পর্শিত। সহবাসে বুঝলাম কথাটা বুড়ো মিথ্যে বলেনি। এভাবে তিনদিন তিনরাত কেটে গেল। তিনদিন তিনরাত ঘর থেকেই বের হইনি। ভাল ভাল খানা খাওয়া ছাড়া আর যা কিছু করার ওই মেয়েটার সঙ্গে ছাড়া করার মত অন্য কিছু ছিল না।

চারদিনের দিন সকালবেলা বুড়ো আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলল—তোমার কাজের পাওনা তো অগ্রিমই পেয়েছ। এখন কাজ করতে পারবে তো ?

কি কাজ, কেমন কাজ কিছুই জানি না। তবু কাজ তো করতেই হবে। আমি শুধু বললাম—হ্যাঁ, আমি তৈরী।

বুড়োর নির্দেশে দুজন ক্রীতদাস আমাকে নিয়ে গেল দুটো লাগাম বাঁধা খচ্চরের কাছে। একটির ওপর একজন আগে থেকেই বসেছিল। লোকটা আমাকে অন্যটার ওপর বসতে বলল। ঠিক ঠাক করে বসতে না বসতেই খচ্চর দুটো খুব জোরে ছুটতে আরম্ভ করল। কোন মতে নিজেকে সামলে নিলাম। সকাল থেকে একটানা দুপুর পর্যন্ত খালি ছুটে গেলাম। অবশেষে আমরা একটা পাহাড়ের পাদদেশে এসে পেঁাছলাম। পাহাড়টা

ভীষণ খাড়াই। মানুষ বা কোন জন্তুর পক্ষে এ পাহাড়ে চড়া অসম্ভব। খচ্চর থেকে দুজনে নেমে পড়লাম। লোকটা বলল:

—এই নাও ছুরি। এটা দিয়ে তোমার খচ্চরটার পেট ফাঁসিয়ে দাও। কাজ করার সময় শুরু হয়ে গেছে—কাজ শুরু কর।

আমিও কাজ শুরু করে দিলাম। ছুরিতে পেট ফাঁসিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খচ্চরটা মরে গেল। লোকটার নির্দেশ মত খচ্চরের ছাল ছাড়িয়ে নিলাম।

এবার লোকটা বলল—চামড়ার ওপর শুয়ে পড় ঝটপট। আমি চামড়াটা সেলাই করে দেব।

যেভাবে সে বলেছে সেভাবে আমি আদেশ মেনে চলেছি। চামড়াটা পেতে শুয়ে পড়ি। লোকটা সাবধানে সেলাই করতে লাগল যাতে আমার গায়ে ফুটে না যায়। সেলাই করতে করতে সে বলল—শোন মন দিয়ে। এখনি একটা বিরাট বাজ পাখী এসে পড়বে। তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাখিটা ওর পায়ে খামচে তোমাকে ওর বাসায় নিয়ে যাবে। এই দুর্গম পাহাড়ের চূড়ায় ওর বাসা। আকাশে ওড়ার সময় একদম নড়বে না। নড়লে ভয় পেয়ে আকাশ থেকে ধপ করে ফেলে দেবে তোমাকে। তাহলে কি হবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। পাহাড়ের চূড়ায় যেই তোমাকে রাখবে সঙ্গে সঙ্গে ছুরি দিয়ে চামড়াটা কেটে বেরিয়ে আসবে। পাখীটা তোমাকে দেখে ভয়ে পালাবে। এবার তোমার আসল কাজ করতে হবে। চূড়ায় দেখবে বহু মূল্যবান পাথর রয়েছে। তুমি ওপর থেকে ওগুলো গড়িয়ে নীচে ফেলে দেবে। বুঝেছো? পাথর ফেলে দেওয়া হয়ে গেলে নীচে নেমে আসবে। আমরা দুজন ফিরে চলে যাবো।

কথা বলতে বলতে ইহুদীটা সরে গেল আমার কাছ থেকে। মুখ ঢাকা ছিল বলে বুঝতে পারিনি, কখন চলে গেছে। ওর কথা শেষ হতে না হতে আমাকে হেঁচকা টানে আকাশে তুলল, টের পেলাম। আমি মড়ার মত পড়ে আছি। এক জায়গায় আমাকে নামিয়ে দিল মনে হল। না আকাশ থেকে ছাড়েনি, পিঠের নীচে শক্ত পাথর রয়েছে টের পেলাম। ছুরি দিয়ে টুকরো টুকরো করে চামড়া কেটে বেরিয়ে এলাম। সবে মাথাটা বার করছি পাখীটা ভয়ে বিকট চীৎকার করে পালিয়ে গেল। আমার আসল কাজ শুরু হল এবার। চুনি পান্না আরো মূল্যবান সব পাথর আগে এক জায়গায় জড়ো করে নিলাম। সব একসঙ্গে নিচে ফেলে দিলাম ইহুদীটার কাছে। ওপরের কাজ শেষ করে এবার নীচে নামব, আমার মজুরি নিয়ে বাড়ি যাব। কত কাজ পড়ে আছে। কিন্তু নামব কি করে? চূড়ার কার্নিশের পরে বিশাল খাড়াই। এদিক ওদিক ঘুরে দেখলাম, নাঃ কোন রাস্তাই নেই নামবার। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে আমার মাথায় যেন বাজ পড়ল। দামী দামী পাথরগুলো বস্তায় বেঁধে ইহুদীটা ওর খচ্চরের ওপর চেপে দ্রুত বেগে চলে যাচ্ছে। আমি ওপরে নির্বাসিত।

দুঃখে, কষ্টে, আতঙ্কে চূড়ায় বসে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলাম। তারপর আল্লার নামে সোজা হাঁটতে লাগলাম যা হবার হবে। না পড়ে যাইনি, হেঁটে চললাম একনাগাড়ে দুমাস ধরে। আশে পাশে সব পাহাড়ের চূড়া মালার

মত গাঁথা। শেষ চূড়ায় এসে পেঁছুনোর পর পরম করুণাময় আল্লার কৃপায় এক উপত্যকা দেখতে পেলাম। ছোট ছোট নদী বয়ে চলেছে তার ওপর দিয়ে। তাছাড়া আল্লার দুনিয়ায় প্রকৃতি অকৃপণ হাতে সব যেমন ঢেলে দেয়, এখানেও তাই দেখছি। সবুজ গাছে গাছে ফল ধরে আছে, নানান রং-এর আর গন্ধের ফুল ফুটে আছে। জানা অজানা অসংখ্য পাখীর কলরব। প্রকৃতি যেন তার ভান্ডার এখানে উজাড় করে দিয়েছে। সামনে আকাশ ছোঁয়া বিশাল একটা প্রাসাদ। প্রাসাদপুরী ঢোকার সিংহদ্বারের সামনে একটা আসনে একজন বৃদ্ধ বসে আছেন। তিনি আমার পথরোধ করলেন। তাঁর মুখে যেন বেহেস্তের দ্যুতি। তাঁর হাতে রাজদন্ড—চুনির তৈরি। মাথায় হীরার মুকুট। ইনি নিশ্চয়ই রাজা হবেন। আমি কুর্নিশ করলাম।

প্রত্যাভিবাদন করে মধুর কণ্ঠে বললেন—বৎস, আমার পাশে বস।

আমি বসলাম। উনি বলে চলেছেন—এখানে কখন এসেছ বাছা? কোথায় থেকেই বা আসছ? তোমার আগে কোন মানুষ এদেশে আসেনি। কোথায় যাবে বাবা?

এত অন্তরঙ্গ কথা এত মধুর ব্যবহার বহুকাল শুনিনি। আমার হৃদয়ের সব কথা যেন ঠেলে বের হতে চাইছে এক সঙ্গে। কথাগুলো এক সঙ্গে ঠোকাঠুকি করছে। জবাবে আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। কথার চাপে বুকটা ফুলে ফুলে উঠল। অবরুদ্ধ অভিমানে, ক্ষোভে আমার চোখের জল বাধা মানে না। আমি ফোঁপাতে থাকি। বৃদ্ধ বললেন:

—এভাবে কেঁদ না বাছা। তোমার কান্নায় আমার হৃদয় ফেটে যাচ্ছে যে। নিজেকে শক্ত কর। বুঝতে পারছি দুর্বল হয়ে পড়েছ। ঠিক আছে এখন আর কিছু বলতে হবে না। আগে খানাপিনা করে চাঙ্গা হয়ে নাও তারপর সব শুনছি।

আমাকে সঙ্গে করে তিনি একটা হলঘরে নিয়ে গেলেন। বহু রকমের পানীয় আমাকে দেওয়া হল। পাশে বসে আমাকে খাওয়ালেন বৃদ্ধ। বেশ তাজা মনে হল নিজেকে। এবার আমার কাহিনী শুনতে চাইলেন তিনি আনুপূর্বিক সব বলে গেলাম তাঁকে। আমার বলার শেষে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম এ প্রাসাদ কার?

তিনি বললেন—বৎস, প্রাচীনকালে এই প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন সুলেমান। তারই নির্দেশে আমি পক্ষীদের সর্বাধিনায়ক। দুনিয়ার তামাম পক্ষী এখানে একবার আসবেই তাদের আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য। তুমি দেশে ফিরে যেতে চাইলে আমি একটা পক্ষীকে বলে দেব। তারা আমার আদেশে যেখানে যেতে চাও সেখান নিয়ে যাবে ভালভাবে। তবে তারা এখনো এখানে এসে পেঁছোয় নি। তারা না আসা পর্যন্ত তুমি এই প্রাসাদে ঘুরে বেড়াতে পার। তোমার ইচ্ছে মত যে কোন ঘরে প্রবেশ করতে পার শুধু একখানা ঘর বাদে। সেই ঘরখানা সোনার চাবিতে খোলে। এই সব চাবির মধ্যে সোনার চাবিটি দেখতে পাবে।

এই বলে চাবির গোছাটি আমাকে তুলে দিয়ে পক্ষী-অধিপতি চলে গেলেন। আমি এবার ইচ্ছে মত ঘুরতে পারব। প্রথমে আমি হলঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। এসব ঘরে পাখীদের থাকবার চমৎকার ব্যবস্থা

রয়েছে। অবশেষে সেই ঘরখানা যেটা সোনার চাবি দিয়ে খোলে তার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি। ঘরটাকে ছুঁতেও ভয় লাগে। বুদ্ধের আদেশ-বাণী এখনো আমার কানে বাজছে।

ভোর হয়ে আসছে। গল্প থামিয়ে চুপ করে থাকে শাহরাজাদ।

তিনশো চৌষট্টিতম রজনী ঃ

পরের রজনীতে আবার গল্প শুরু করল শাহরাজাদ।

জানশাহ্ বুলুকিয়াকে তার কাহিনী বলে চলেছে ঃ

—এদিকে আমার মনের ভেতরে অদম্য কৌতূহল। তাকে চেপে রাখা বেশ কষ্টকর। কৌতূহল ক্রমে যুক্তি ও নিষেধ ভাসিয়ে দিল। মনের সঙ্গে লড়াই করে সম্পূর্ণ পরাস্ত হলাম আমি। কাঁপতে কাঁপতে ঘরখানা সোনার চাবি দিয়ে খুললাম আমি। কী জানি ভেতরে কি আছে। অজানা নিষিদ্ধ বস্তুর টানে কম্পিত চরণে ঘরে ঢুকে পড়লাম।

নাঃ, ভয়ের কিছু নেই। বরং মনোহর দৃশ্যে আমার চোখ ভরে গেল। দরজা খুলে ভালই হয়েছে। নচেৎ এত সুন্দর জিনিস দেখা হত না। ঘরের ভেতরে বিরাট একটা শামিয়ানা টাঙ্গানো। মেঝেটা নানারকম মূল্যবান পাথরে তৈরি। একটা রূপোর গামলার মত বড় পুকুরে ফোয়ারা থেকে মিষ্টি আওয়াজে জল বের হচ্ছে। পুকুরের চারধারে অনেকগুলি সোনার পাখী বসানো। পাশে একটা সিংহাসন বড় চুনি কেটে তৈরি করা।

ধীরে ধীরে সিংহাসনের সিঁড়ি বেয়ে আমি ওপরে উঠতে লাগলাম। সিংহাসনের মাথায় লাল সিল্কের চাঁদোয়া সিংহাসনে বসে একটু চোখ বুজলাম। চোখ খুলে দেখলাম তিনটি মেয়ে পুকুরে নেমে নাইতে লেগেছে। দেখে, বুলুকিয়া ভাই, কি বলব, আমারও সাঁতার কাটতে ইচ্ছে হল। পাগলের মত ঐ গামলার পুকুরের ধারে ছুটে গেলাম। পাড়ে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠি ঃ

—যুবতী মেয়েরা, সোনা মেয়েরা, রানীর দল। আমাকে দেখতে পেয়ে মেয়েরা তারস্বরে চিৎকার করতে করতে জল থেকে দ্রুত উঠে পালক দিয়ে নিজেদের গোপন স্থান ঢাকার চেষ্টা করে। তাদের মুখে ভয়ার্ত দৃষ্টি। ওরা তাড়াতাড়ি পুকুরের পাড়ের গাছের মগ ডালে গিয়ে উঠল। ঘাড় কাত করে নিচে আমাকে দেখতে থাকে। ওদের দৃষ্টিতে যেন ঠাট্টার আভাস। আমিও সেই গাছে চড়ে ওপরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি ঃ

—তোমরা রানীর মত সুন্দরী! তোমরা কারা বল না গো! রাজা টিগমাসের ছেলে আমি। আমার নাম জানশাহ্। আমার বাবা কাবুল ও বানু-সাহ্লানের সুলতান।

ওদের মধ্যে কম বয়েসী মেয়েটি আমার কথার জবাব দিল। মেয়েটি তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরীও বটে। ও বলল ঃ

—আমরা তিন বোন রাজা নসর-এর মেয়ে। আমার বাবা হীরা প্রাসাদে থাকেন। গোছল করতে আর মজা করার জন্য আমরা এখানে আসি।

সঙ্গে সঙ্গে বললাম—আমাকে দেখে কি তোমাদের একটুও ভাল লাগে

নি? নিশ্চয়ই লেগেছে, কি বল? তবে এস, আমার সঙ্গে খেলবে আর আনন্দ করবে।

মেয়েটি সেই মগডাল থেকেই বলল—জানশাহ্, যুবতী মেয়েরা জোয়ান ছেলেদের সঙ্গে খেলতে পারে নাকি? আমার পরিচয় আরো ভাল-ভাবে নিতে হলে আমার সঙ্গে আমাদের প্রাসাদে চল বাবার কাছে।

আমার দিকে বিলোল কটাক্ষ হেনে মেয়েটি তার দু বোনকে নিয়ে চলে গেল যেন উড়ে। একটা প্রচন্ড ধাক্কা খেলাম হৃদয়ে।

ওরা চলে গেল। হায় হায়, আমার যে সব জ্বলে যাচ্ছে, কিভাবে নেবাই এ জ্বালা? মনোকষ্টে গাছ থেকে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম।

গাছতলায় কতক্ষণ এভাবে পড়েছিলাম, জানি না। জ্ঞান ফিরে এলে দেখি মাথার কাছে সেই বৃদ্ধ পক্ষী অধিপতি বসে আছেন। আমার চোখে মুখে গোলাপ জল ছিটিয়ে দিচ্ছেন। চোখ খুলতে দেখে তিনি বললেন:

—অবাধ্যতার শাস্তি কেমন দেখলে তো? এই নিষিদ্ধ স্থানের দরজা খুলতে তোমাকে পই পই করে মানা করি নি?

জবাব দেবার মুখ নেই আমার। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ফোপাতে থাকি।

—কি হয়েছে তোমার এবার বুঝতে পারলাম। পায়রার সাজে মেয়েদের তুমি দেখেছিলে। ওরা মাঝে মাঝে গোছল করতে এখানে আসে।

—আপনি ঠিকই বলেছেন ওরাই এসেছিল।—কাঁদতে কাঁদতে বলি—হীরা প্রাসাদ কোথায় দয়া করে বলে দিন। কোন পথে সেখানে যাব বলে দিন।...সেই হীরা প্রাসাদে নাকি মেয়ে তিনটে থাকে ওদের বাবা নাস্‌র-এর সঙ্গে।

—সর্বনাশ! সেখানে যাবার কথা চিন্তা করো না। রাজা নাস্‌র কে জান? জিনদের অত্যন্ত শক্তিশালী নেতা সে। তুমি ক্ষেপেছ? ওর মেয়ের সঙ্গে তোমার শাদি ও কখনই দেবে না। ওসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো। তার চেয়ে নিজের দেশে কি করে ফিরবে তাই ভাব। তৈরি হয়ে নাও। বড় বড় পাখীরা শিগগির এখানে আসছে। ওদের বলে দেবো। তোমাকে পিঠে চাপিয়ে নিয়ে দিয়ে আসবে।

—আমি কিছু ভাবতে পারছি না। আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। ওকে যে আমি দেখতে না পেয়ে মরে যাব। আপনি আমার বাবার মত, ওকে যাতে আবার দেখতে পাই আপনি দয়া করে তার ব্যবস্থা করে দিন। আমি আমার দেশে ফিরতে চাই না। আমার লোকেদের দেখতে চাই না—শুধু একবারটি দয়া করুন, আপনার পায়ে পড়ি।

বৃদ্ধের পায়ে মাথা রেখে শুয়ে পড়ি। মেয়েটির রজনীগন্ধার রূপ দূর থেকে কেবল দেখেছি, কিন্তু তার সুবাস তো পেলাম না। তার স্পর্শ তো পেলাম না, না পেলে তো বাঁচব না। অভিমানে আব্দারে আঝোরে কাঁদতে থাকি।

এই সময় রাত ভোর হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ হয়ে গেল।

তিনশো আটষট্টিতম রজনী :

জানশাহ্ বৃদ্ধের পায়ে পড়ে কাঁদছে। পক্ষী অধিপতি তাকে দু হাত দিয়ে তুলে ধরে বললেন—বুঝেছি, মেয়েটার জন্য তোমার ভেতরে আগুন জ্বলছে। ওকে না পেলে এ আগুন আর নিভবে না। ঠিক আছে, এতই যখন তোমার ইচ্ছে, যা বলছি মনোযোগ দিয়ে শোন। আর আমার কথা মত চললে মেয়েটিকে তুমি পাবে। গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে চুপচাপ। ওরা আবার আসবে গোছল করার জন্য। পালক খুলে রেখে যথারীতি জলে নামবে। তুমি ঝট করে ওদের পালকের পাখনাগুলি সরিয়ে ফেলবে। পাখনাগুলি ফেরত পাওয়ার জন্য ওরা তোমাকে খুব ভাল ভাল কথা বলবে। তোমার মন জয় করার জন্য তোমার গুনগান করবে। এমন কি বিবসনা হয়ে তোমাকে সোহাগ জানাবে। কিন্তু সাবধান! একবার যদি ওরা তোমাকে ভিজিয়ে পাখনাগুলি নিয়ে যেতে পারে ওরা আর কখনো এখানে আসবে না। সুতরাং ওরা যাই বলুক আর যা-ই করুক পাখনা ফেরত দেবে না কিছুতেই। ওদের বলবে, শেখ আসুক আগে তার পর তোমাদের পোশাক ফেরত পাবে। আমি এখানে না আসা পর্যন্ত ওদের ওপর কিছুতেই নরম হবে না। নিজেকে শক্ত করে রাখবে। আমি এসে গেলে সব ব্যবস্থা করে দেবো, তোমার বাসনা পূর্ণ করে দেবো।

পক্ষী অধিপতিকে অজস্র ধন্যবাদ জানালাম। উনি চলে গেলেন আর আমিও গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম।

অনেকক্ষণ লুকিয়ে আছি বাতাসে পাখা ঝাপ্টের শব্দ শুনতে পেলাম, শুনলাম ওদের হাসাহাসিও। হ্যাঁ, ওরা আসছে। উড়ে এসে পুকুরের পাড়ে বসল, এদিক ওদিক দেখল আড়ি পেতে ওদের কেউ দেখছে কিনা। যে মেয়েটি সেদিন আমার সঙ্গে কথা বলেছিল সে বোনদের বলল :

—দিদি, বাগানে কেউ লুকিয়ে নেই তো রে! সে দিন যে ছেলেটিকে দেখেছিলাম তার কি হল বলতো?

—সান্সা, ও নিয়ে তোর আর মাথা ঘামাতে হবে না। আয় জলে নামি।

ওরা পাখাগুলি খুলে ফেলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুন্দর ভঙ্গী করে কি দারুণ সাঁতারই না কেটে চলেছে, যেন তিনটি চাঁদ জোয়ারের জলে পাড়ি দিচ্ছে। ওদের গায়ের রং-এর ঔজ্জ্বল্যে ফোয়ারার জলগুলি যেন রুপো বনে গেল।

আমিও লক্ষ্য করে আছি কখন ওরা তীর ছেড়ে পুকুরের মাঝখানে চলে যায়। সাঁতার কাটতে কাটতে হুল্লোড় করে ওরা পুকুরের মাঝখানে যেতেই তীর বেগে বেরিয়ে ছোট মেয়েটির পোশাক তুলে নিলাম। আচমকা আমাকে দেখে ওরা সমানে চেঁচাতে থাকে। কোন কথা না বলে আমি শুধু ওদের দিকে তাকিয়ে থাকি। ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল বিবসনা সুন্দরী তিনজন। জলের ওপরে শুধুমাত্র মাথাগুলি ভাসিয়ে রেখে আমার দিকে তীরের কাছে এগিয়ে আসতে থাকে। চোখে মিনতি। না, ভুলব না ওসব ছলনায়। নিজেকে শক্ত রেখে হাঃ হাঃ করে হেসে পাখনার পোশাক মাথার ওপর তুলে নাচাতে থাকি। ছোট মেয়েটি, যার নাম সানসা, সে আমায়

বলল :

—তুমি একজন যুবক, তার ওপর মানী লোক, যে জিনিস তোমার নয় তা কি করে নিলে?

—ওপরে উঠে এসো আগে তারপর আমার সঙ্গে কথা বল।

—নিশ্চয় তোমার সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু বিবসনা তো উঠতে পারি না! আমার পোশাকটা দাও, ওটা পরে নিয়ে তবে তো ওপরে উঠবো। তারপর যেমন তোমার খুশী আমার সঙ্গে কথা বলো আদর করো।

—তুমি আমার দিল! দুনিয়ার সেরা সুন্দরী তুমি! তোমাকে না পেলে আমি বাঁচব না। কিন্তু ওতো দিতে পারছি না গো! তোমার পোশাক ফেরৎ দেওয়া মানে তো আমার নিজের হাতে নিজের বুকে ছুরি বসানো। আমার বন্ধু, পক্ষী অধিপতি যতক্ষণ না এসে পড়ছেন, তোমার পোশাক ফেরত পাচ্ছ না, বুঝেছো সুন্দরী!

আমার কথা শুনে ওরা এ-ওর দিকে দেখে ফিসফিস করে কি যেন বলল। তারপর সানসা বলল :

—তুমি শুধু আমার পোশাকটাই নিয়েছ। এক কাজ কর, তুমি পেছন ফিরে দাঁড়াও, আমার দিদিরা জল থেকে উঠে ওদের পোশাক পরে নিক। ওদের পোশাক থেকে কয়েকটা পালক ছিঁড়ে দেবে আমাকে। আমার দেহের গোপন স্থানগুলি ঢেকে জলের ওপর উঠে আসব। লক্ষীটি, আমার এই মিনতিটুকু রাখো।

—এটা হতে পারে। বলে আমি চুনী সিংহাসনের পেছনে গিয়ে দাঁড়াই।

বড় বোন ওপরে উঠে এসে ঝটপট পালকের পোশাক পরে নিল। ওদের পোশাক থেকে অনেকগুলি পালক ছিঁড়ে নিয়ে একটা ছোট আচ্ছাদনের মত তৈরি করে সানসা উঠে এসে পরে নিয়ে বলল—তুমি এবার বেরিয়ে আসতে পার।

ছুটে বেরিয়ে এসে সানসার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ওর গায়ে অসংখ্য চুমু খেতে থাকি। অবশ্য ওর পোশাকটা ও হাত দিয়ে যাতে ধরতে না পারে তার ব্যবস্থা করে রেখেছি। এক হাতে ওটা শক্ত করে ধরে রাখি। পা থেকে জড়িয়ে ধরে তুলে নিয়ে ও আমাকে আদর করতে থাকে, সোহাগ জানায়। নানা খোসামুদি কথা বলে পোশাকটা চাইতে থাকে বার বার। উহুঁ, আমি কিন্তু ভুলছি না। ওসব কথায় বা কাজে আমি টলছি না। ওকে চুনী সিংহাসনের কাছে কোন মতে টেনে নিয়ে আসি। সিংহাসনে বসে পড়ে ওকে আমার কোলে বসিয়ে নিলাম। ও বাধা দিতে পারল না। বাস্ নিশ্চিন্ত!

পালাবার উপায় না দেখে আমার কামনায় সাড়া দিল সানসা। দু হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। চুম্বনের প্রত্যুত্তরে চুম্বন করল, আলিঙ্গনের জবাবে শক্ত হাতে আলিঙ্গন করল। ফলে দুজনের শরীর যেন মিশে যেতে থাকে। আবেগে আর উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে সানসা। বড় বোন দুজন আমাদের পাহারা দিতে থাকে। ওদের মুখে মৃদু হাসি। আমাদের আনন্দে যাতে বাধা না পড়ে সে জন্য ওরা কোন কথা বলে না,

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমার আশ্রয়দাতা বৃদ্ধ দরজা খুলে ঢুকে পড়লেন। তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্য আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। ও'র কাছে এগিয়ে গিয়ে ও'র হাত চুম্বন করলাম। আমাদের বসতে বলে তিনি বললেন :

—মা, তুমি এই ছেলেটিকে পছন্দ করেছ, ও তোমাকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছে, এতে আমি খুবই খুশী হয়েছি। উচ্চবংশের ছেলে জানশাহ্। তোমার বাবা রাজা নাসর্-ও মনে হয় এতে খুশী হবেন। তোমাদের শাদীতে ও'র বোধহয় আপত্তি হবে না। ওর বাবা রাজা টিগমাস আফগানিস্থানের সুলতান। তোমার বাবাকে সব বুঝিয়ে বলবে, তাঁকে রাজি করাতে হবে মা।

—আমি আপনার আদেশ মাথা পেতে নিলাম।

সানসা মাথা নীচু করে বলল। বৃদ্ধও মাথায় হাত রেখে বললেন,

—যদি সত্যিই ওকে গ্রহণ কর তাহলে আমার সামনে শপথ কর যে আজীবন তোমার স্বামীর প্রতি নিষ্ঠাবতী থাকবে আর কোনদিন ওকে ছেড়ে চলে যাবে না।

সানসা মাথা তোলে। পক্ষী অধিপতি দু হাত তুলে আশীর্বাদ করে বললেন—এস। আমরা সেই সর্বশক্তিমান পরম করুণাময় আল্লাকে ধন্যবাদ দিই। তাঁরই ইচ্ছায় তোমাদের মিলন হল। তোমরা সুখী হও! তোমাদের মধ্যে আর কোন বাধা রইল না। জানশাহ্, ওর পোশাক ফেরত দিয়ে দাও। ও কথা দিচ্ছে কখনো তোমাকে ছেড়ে যাবে না।

বৃদ্ধ এবার আমাদের হলঘরে নিয়ে গেলেন। মেঝেতে সুন্দর গালিচা বিছান। তার ওপর অনেকগুলি থালা। থরে থরে ফল সাজান রয়েছে থালাগুলিতে। সানসা ওর দিদিদের বিদায় দেবার জন্য বৃদ্ধের কাছে অনুমতি চাইল। ওরা ওর বাবার কাছে গিয়ে ওদের শাদীর খবর দেবে। দেবে আমরা হীরা প্রাসাদে তাড়াতাড়ি পেঁছাচ্ছি সে খবরও।

বোনেরা চলে গেলে সানসা সুন্দর করে ফল কেটে সাজিয়ে দিল আমাদের সামনে। ওর সৌজন্য বোধ কতখানি টের পেলাম। হাজার হোক রাজার মেয়ে তো!

এদিকে রাত হয়ে এসেছে। আমরা দুজনে চলে গেলাম একটি ঘরে। সারাদিনের ক্লান্তি এবার দুটি দেহের মিলনে শ্রান্ত হল। এক অনাস্বাদিত আনন্দে সারা রাত কেটে গেল।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প বলা বন্ধ করল।

তিনশো উনসত্তরতম রজনী :

জানশাহ্ তার কাহিনী বলতে থাকে।

ভোর হতেই সানসা ঘুম থেকে উঠে ওর পালকের পোশাক পরে সেজেগুজে তৈরী। আমাকে ঘুম থেকে জাগাবার জন্য আমার কপালে ছোট্ট একটি চুমু দিয়ে বলল—ওগো, ওঠো! তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। এক্ষুণি বের হতে হবে। বাবার হীরার প্রাসাদে যেতে হবে না!

বিছানা থেকে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। আমার তৈরী হতে বেশী

সময় লাগল না। দুজনে পক্ষী অধিপতির কাছে গেলাম। তাঁর সাহায্য ছাড়া আমার এমন সৌভাগ্য হত না। সানসাও আমাকে পেয়ে খুশী। আমরা দুজনে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বেরিয়ে এলাম।

সানসা বলল—এই শোন, এবার তুমি আমার পিঠে উঠে শক্ত করে ধরে বসে পড়। দুষ্টুমি করো না। আমাকে অনেকখানি উড়ে যেতে হবে প্রাসাদে পেঁছতে।

আকাশে উঠে বায়ু বেগে উড়ে চলল সানসা। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা নেমে পড়লাম হীরা প্রাসাদের প্রবেশ পথের সামনে। ধীরে প্রাসাদের ভেতরে হেঁটে চললাম। আমাদের আগমনবার্তা ঘোষণা করার জন্য কটা জিন বাইরে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল।

সানসার বাবা রাজা নাসরু জিনদের নেতা। তিনি আমাকে দেখে খুশী হয়েছেন বলে মনে হল। আলিঙ্গন করে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দামী পোশাক এনে পরতে দিয়ে আমাকে রাজসিক অভ্যর্থনা জানালেন। একটা হীরের মুকুট আমার মাথায় পরিয়ে দিলেন। সানসার মা আসতে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মেয়ের পছন্দ দেখে রানীও খুশী। তিনি তাঁর মেয়েকে কতগুলি হীরে উপহার দিলেন বরণ করে।

এবার আমাদের হামামে নিয়ে যাওয়া হল। নানা সুরভিত এবং নানা রং-এ রাঙ্গানো জলে গোছল করলাম। গোলাপ জল, কস্তুরি মেশানো জল আরো কত কি জল যে ছিল। ঠাট্টা তামাসার মধ্যে উভয়ের গোছল শেষ হল। শরীর ও মন তরতাজা হয়ে উঠল। এর পর শুরু হল ভোজন পর্ব আমাদের সম্মানার্থে এক নাগাড়ে তিন দিন তিন রাত ধরে ভোজ চলল মহাসমারোহে। রাজ্যের যে যেখানে ছিল সবাই এ ভোজে যোগদান করল।

এভাবে মহাআনন্দে কয়েকদিন আমার শ্বশুরবাড়িতে কেটে গেল। এবার দেশে ফিরতে হবে। তাই রাজা নাসরুকে জানালাম, আমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাব। আমার মা-বাবাকে তো বৌ দেখাতে হবে। ছাড়তে কষ্ট হলেও রাজা ও রানী আমাদের যাবার অনুমতি দিলেন। একটা প্রতিশ্রুতি আমার কাছ থেকে তাঁরা নিয়ে নিলেন যে, বছরে একবার আমাকে সানসাকে সঙ্গে নিয়ে হীরাপ্রাসাদে কিছুদিন বেড়িয়ে যেতে হবে।

রাজা নাসরু বিশাল এক সিংহাসন তৈরী করিয়ে আমাকে ও সানসাকে তাতে বসিয়ে কিছু মেয়ে জিন আমাদের তদারকির জন্য সঙ্গে দিয়ে পুরুষ জিনেদের কাঁধে চাপিয়ে দিলেন। তারা আকাশ পথে উঠে দু বছরের পথ দুদিনে শেষ করে আমাদের কাবুলে পেঁাছে দিল।

আমার বাবা-মা ধরে নিয়েছিলেন আমি আর বেঁচে নেই। প্রাসাদে আমাকে নামতে দেখে তাঁরা দুজনে যারপর নাই খুশী হয়েছিলেন। সানসার সঙ্গে আমার শাদী হয়েছে শুনে আনন্দে তাঁরা কেঁদে ফেললেন। আমাদের দুজনকে কাছে টেনে নিয়ে কখনো জড়িয়ে ধরছেন কখনো মাথায় হাত বুলোচ্ছেন। আনন্দের আতিশয্যে মা মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন। সানসা তাঁর নাকে মুখে গোলাপ জল ছিটিয়ে সুস্থ করে তুলল।

সারা সুলতানিয়ত জুড়ে খোশের বন্যা বয়ে গেল। খানাপিনা ও দানখয়রাতি চলতে লাগল দেদার। শাদীর কিছু অনুষ্ঠান বাকী ছিল,

সেগুলি সম্পন্ন করা হল। সব কিছু চুকে গেলে বাবা সানসাকে ডেকে বললেন—তোমার মত চোখ জুড়ানো রূপের মেয়ে দুনিয়ায় দুটি খুঁজে পাওয়া যাবে না মা। আমার রাজ্যের আকাশে চাঁদ হয়ে থাকবে তুমি। তোমার খুশীতে আমরা সবাই খুশী হব। এবার বল এমন কি আমি খুশী হবে।

—মনোরঞ্জনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই আমার আছে বাবা। আপনাদের দোয়া আমাকে সবচাইতে বেশী খুশী করবে।

—তোমার মহান বংশের মেয়ের মতই উপযুক্ত কথা বলেছ মা। তবুও তুমি কিছু চাও যা দিয়ে আমি তৃপ্ত হই।

—বেশ আপনি এমন একটা জায়গা বেছে দিন যেখানে চারদিকে থাকবে বাগান। ফুল আর ফলের গাছ থাকবে সে বাগানে। ছোট্ট একটি নদী বয়ে যাবে বাগানের ভেতর দিয়ে। আমরা দুজনে সেখানে থাকবো। এর বেশী কিছু আমার চাওয়ার নেই।

—বেশ তাই হবে মা।

বাবার আদেশে কাজ শুরু হল। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা নতুন জায়গায় বাস করতে শুরু করলাম। সুখে আর তৃপ্তিতে আমাদের দিন কাটতে লাগল।

এভাবে বছর ঘুরে গেল। সানসা বাপের বাড়ি যাবার জন্য তৈরী হয়ে। আমার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিল। কিন্তু হায়! ওর বাপেরবাড়ি যাওয়াটাই কাল হল!

আমরা সেই সিংহাসনে গিয়ে বসলাম। বাহক আমাদের উড়িয়ে নিয়ে চলল। রাত্রে যাত্রা স্থগিত থাকত। জলের ধারে বা গাছের নীচে বিশ্রাম নিতাম। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা একটা নদীর ধারে থাকলাম। সানসা গোছল করবে আমাকে বলল। আমি এ সময়ে গোছল করতে অনেক নিষেধ করলাম। বললাম, হীরা প্রাসাদে গিয়ে পেঁৗছে গোছল করা যাবে। কিন্তু ও আমার কথা শুনল না। ভীষণ জেদী মেয়ে। কয়েকটি বাঁদীকে সঙ্গে নিয়ে গোছল করতে চলে গেল। পাড়ে পোশাক খুলে রেখে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই। বাঁদীদের মাঝে সানসাকে পরীর মত মনে হচ্ছিল। হৈ হুল্লোড় করে সবাই গোছল করছে, হঠাৎ সানসার আর্তনাদে সব থেমে গেল। ওকে ধরাধরি করে তীরে নিয়ে আসা হল। দৌড়ে গেলাম ওর কাছে। নদীর কিনারায় শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে। ঝুঁকে পড়ে কত ডাকলাম—কিন্তু সাড়া নেই, সব শেষ হয়ে গেছে। বিষাক্ত সাপে কামড়েছে ওকে, বাঁদীরা পায়ের গোড়ালি তুলে দেখাল।

শোকে দুঃখে আমি জ্ঞান হারিয়ে ছিলাম বেশ কিছুদিন। ওরা ভেবে-ছিল আমিও মরে গেছি। মরণ কেন যে আমারও হল না! দুর্ভাগ্য আমাকে বাঁচিয়ে রাখল। সানসার জন্য শোক সহ্য করতে। বুকটা আমার ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমি ওর জন্য সমাধি তৈরী করালাম। ঐটা আমার জন্য। এখন মৃত্যুর দিন গুণছি। ওর পাশেই সমাধিতেই আমার চির নিদ্রা হবে। যে কদিন বেঁচে থাকি। চোখের জলে আর তার স্মৃতিতে বাঁচতে হবে। সানসা যেদিন আমাকে কাছে ডেকে নেবে সেদিনের অপেক্ষায় আছি। আমার

দেশের বহু দূরে এখানে বসে আছি। পৃথিবীর মরুভূমি সব এখন আমার বুকে এসে স্থান নিয়েছে। আমার নিয়তিই আমাকে এখানে এনেছে।

বিষাদগ্রস্ত এক সুন্দর যুবক তার কাহিনী শোনাতে শোনাতে তার দু হাত দিয়ে মুখ ঢাকে। বুলুকিয়া বলে :

—ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, ভাই তোমার কাহিনী আমার দুঃসাহসিক সব কাহিনীর চেয়ে ঢের বেশী চিত্তাকর্ষক ও আশ্চর্যজনক। ভেবেছিলাম আমার কাহিনীই সেরা কাহিনী। ভাই, আল্লাকে ডাক, তিনিই তোমার হৃদয়ে শান্তি দেবেন। ভুলে যাওয়া ছাড়া শান্তি পাবার আর কোন দাওয়াই নেই।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প বলা বন্ধ করে দেয়।

তিনশো সত্তরতম রজনী :

পরের দিন রাত্রে শাহরাজাদ শুরু করে।

বুলুকিয়া অনেকক্ষণ ওর পাশে বসে সান্ত্বনা দিয়ে নিজের রাজ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই এখান থেকে নড়বে না জানশাহ্। ওর ভীষণ জেদ দেখে ভয় পেয়ে যায় বুলুকিয়া। আবার অনেক সান্ত্বনার কথা বলে ওর হাতে চুমু খেয়ে আপন রাজধানীর দিকে পা বাড়াল। পাঁচ দিন অনুপস্থিতের পর ফিরল রাজধানীতে। পথে আর তেমন কিছু ঘটে নি।

তার পর থেকে আমি আর বুলুকিয়ার কোন খবর পাই নি। তুমি এখানে এসেছ, আমি ওর কথা ভুলেই গেছি। ক্ষীণ আশা ছিল ও হয়ত ফিরে আসবে। তুমি আমাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে চলে যেও না। কয়েকটা বছর থাক, তোমার সঙ্গ উপভোগ করি। বিশ্বাস কর আমার কোন কিছুরই অভাব নেই। অনেক গল্পও জানি। বুলুকিয়া বা বিষাদগ্রস্থ যুবকের কাহিনী যেগুলোর কাছে পানসে মনে হবে।* তুমি খুব ভাল শ্রোতা, এতে আমি খুশী। এসব মেয়েরা আমাকে খানা পরিবেষণ করে, সারা রাত ধরে গান গায়। আমার খুশীর নিদর্শন হিসাবে তোমাকে আপ্যায়ণ করব।

পাতালের রানী গল্প শোনাল, খানাপিনা চলল তারপর সর্পকন্যাদের নাচগানও হল। এবার সবাই রাণীর গ্রীষ্মাবাসে চলে যাবে। তার জন্য তোড়জোড় শুরু হয়েছে। হাসিবের তো আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। এই এদের সঙ্গে যেতে হবে নাকি! ও মা আর বউকে ভালবাসে, তাদের ছেড়ে আর কতকাল থাকবে? মনে সাহস সঞ্চার করে বলে :

রানী, আমি সামান্য এক কাঠুরে। আপনি আপনার সঙ্গ দান করে আমার জীবনে আনন্দ দেবেন, এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু বাড়িতে আমার বউ রয়েছে, মা আছেন, তাদের কাছে যেতে না পারলে তারা ভেবে ভেবে শেষ হয়ে যাব। আর এভাবে আমিও বা কি করে বেঁচে থাকি, বলুন? আমার বিরহে ওদের মৃত্যুর আগে আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই। আমাকে যেতে দিন। অবশ্য সারা জীবন আমার একটা দুঃখ থেকে যাবে যে, আপনার সেই সব দারুণ গল্পগুলি শোনা হল না।

রানী হাসিবের কথা শুনে বুঝল যে ছেলেটি ঠিকই বলছে। তাছাড়া হাসিব চলে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রানী বলল :

—ঠিক আছে হাসিব। তোমার বৌ আর মার কাছে চলে যেতে আমি আপত্তি করব না। কিন্তু তোমার মত এমন ভাল একজন শ্রোতা চলে যাবে ভেবে আমার কষ্ট হচ্ছে। তাই তোমার কাছ থেকে আমি একটা প্রতিশ্রুতি চাইছি, না পেলে আমি তোমাকে ছাড়ব না। জীবনে কোনদিন হামামে গোছল করো না। এই শপথ তোমাকে করতে হবে। শপথ ভেঙ্গে ফেল যদি কোনদিন, তবে সেদিনই তুমি শেষ হবে। এখন আর বেশী কিছু বলব না।

এই অদ্ভুত শপথে হাসিব খুব অবাক হয়ে যায়। তাহলেও ও শপথ করল। রানীর বিরোধীতা তো আর করা যায় না এই মুহূর্তে। রানী ওকে বিদায় জানাল। একজন সর্পকন্যা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে রানীর সাম্রাজ্যের বাইরে রেখে আসার জন্য। একটা ভাঙ্গাচোরা বাড়ির তলা থেকে উঠে এল। রাস্তাটা লুকানো। সেই মধুর গর্তের বিপরীত দিকে বেরিয়ে পড়ল হাসিব।

ভোর হয়ে আসছে। হাসিব তার বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ে। তার মা দরজা খুলে দিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন। হাসিবের বুকে মাথা রেখে বৃদ্ধা চোখের জল ফেলতে থাকেন। চেঁচামেচি আর কান্নার ফোঁপানি শুনে ছুটে এল হাসিবের বউ। স্বামীর হাত চুম্বন করল। বাড়ির ভেতরে চলে এল তিনজন। আনন্দের জোয়ার বয়ে যায় বাড়িতে। হাসিব সকলের খোঁজখবর নেয়। ওর সঙ্গে আর যারা গিয়েছিল কাঠ কাটতে তারা তো ওকে মধুর গর্তে ফেলে রেখে এসেছিল। হাসিব ওদের কথাও জিজ্ঞেস করে। ওর মা সবই বললেন। কাঠুরেরা ওঁকে বলেছিল নেকড়ে হাসিবকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু ওদের যে কি হল? ওরা রাতারাতি সব বড়লোক বনে গেল। কেউ কেউ বড় বড় সুন্দর দোকান সাজিয়ে বসেছে। ওরা ক্রমেই ধনী থেকে আরো ধনী হয়ে উঠছে।

হাসিব অনেকক্ষণ কি যেন ভেবে বলল—মা কাল তুমি সকালে বাজারে গিয়ে বলবে যে আমি ফিরে এসেছি। আমার সঙ্গে দেখা করলে খুশী হব।

পরের দিন হাসিবের মা বাজারে গিয়ে সবাইকে ছেলের কথা জানিয়ে দিলেন। সেই কাঠুরেরা পরিস্থিতি বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিল নিজেদের। হাসিবের মাকে বলল, তারা হাসিবের সঙ্গে দেখা হলে খুব খুশী হবে। ওরা ঠিক করল হাসিবের প্রত্যাবর্তনে বেশ ঘটা করে সম্বর্ধনা দিতে হবে। তাই হাসিবের মার হাতে মূল্যবান রেশমী বস্ত্র, বুটিদার কিংখাব দিয়ে দিল ওদের দোকান থেকে। সকলে দোকানের সেরা জিনিসটি দিল। দোকান বন্ধ করে হাসিবের বাড়ি যাবার আগে সকলে পরামর্শ করে ঠিক করল, প্রত্যেকের লাভের অংশ থেকে কিছুটা তো দেবেই উপরন্তু বাঁদী আর বাড়ির অংশও দেবে ওকে। এসব ঠিকঠাক করে ওরা হাসিবের বাড়িতে হৈ হৈ করে চলে এল। হাসিবকে সালাম জানিয়ে হাত দুখানা টেনে চুম্বন করে বলল :

—ভাই হাসিব, আমাদের মাফ করো। তোমার ওপর আমরা ভয়ানক অন্যায় করেছি। ভাই, যা এনেছি সঙ্গে এটুকু তোমাকে নিতেই হবে। এতে

তো তোমারও ভাগ আছে। না নিলে বুঝব আমাদের তুমি ক্ষমা করলে না।

মনের মধ্যে ক্ষোভ জমিয়ে রেখে আর কি হবে? তাতে পড়শীদের সঙ্গে শত্রুতা বাড়া ছাড়া লাভ আর কিছু নেই। ওদের উপহার গ্রহণ করে সে বলল:

—হ্যাঁ, যা হবার তো হয়েই গেছে, মাথা খুঁড়লেও তা ফিরবে না জানি।

হৈচৈ করে মহা ফুর্তিতে ওরা চলে গেল। হাসিবের অবস্থা ফিরে গেল। একটা বড় দোকান খুলল বাজারে। কিছুদিনের মধ্যে শহরে একটা সুন্দর বাড়ি তৈরী করল।

একদিন দোকানে যাচ্ছে বাজারের পথ ধরে। বাজারে ঢোকার মুখে একটা হামাম আছে। হামামের পাশ দিয়েই যাচ্ছিল সে। হামামের মালিক সামনে বসে হাওয়া খাচ্ছিল। হাসিবকে দেখে দাঁড়িয়ে উঠে বলল:

—আসলাম্ আলেকুম্।

—ওআলেকুম সালাম।

হাসিব দাঁড়িয়ে পড়ল। হামাম মালিক বলল—আসুন না আমার হামামে। আপনার পদধূলি পড়লে আমার হামাম ধন্য হবে। আমার সৌভাগ্য হল না যে আপনাকে সেবা করি। গা রগড়াবার নতুন বুরুশ এনেছি, নরম লোম, আপনার ভালই লাগবে। রগড়াতে রগড়াতে আপনার ঘুম এসে যেতে পারে। লুফ গাছের ফলের রেশমী আঁশে সাবান মাখিয়ে দেবো। ভাল কস্তুরী সাবান এনে রেখেছি।

আল্লার কসম, আপনার লোভনীয় আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারছি না। আমি শপথ করেছি কোনদিন হামামে ঢুকব না।

ভোর হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প বলা বন্ধ করল।

তিনশো একাত্তরতম রজনী:

পরদিন রাত্রে আবার গল্প শুরু হল।

এমন উদ্ভট শপথের কথা কেউ বিশ্বাস করতে পারে নাকি? জীবন বিপন্ন হতে পারে হামামে ঢুকলে এই সব আজগুবি কথা হামামের মালিক বিশ্বাস করল না। তাই বলল:

—এসব শপথটপথ কিছু না। আপনি আমায় এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন বলুন তো? কি অপরাধ করলাম মালিক? আল্লার নামে আমিও শপথ করছি, আমার হামামে যদি আপনাকে ঢোকাতে না পারি তবে আমি আমার তিন তিনটে বিবিকে তালাক দেব, দেব, দেব।

—আল্লার কসম খেয়ে বলছি, আমি যা বলেছি তা একটুও মিথ্যে নয়।

এতো বেশ মুশকিল হল! হামামের মালিক শপথ করেছে সেটা ও বুঝবে। হাসিবের কাছে হামামে গোছল করা একেবারে অসম্ভব। হাসিব চলে যাচ্ছিল, ওর পাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল হামামের মালিক।

—আপনি চলে গেলে আমার শপথ রাখতেই হবে মালিক। ফালতু

শপথ রাখতে গিয়ে বিবিদের তালাক দিতে হবে। কথা দিচ্ছি, হামামে গোছল করার জন্য যদি কিছু হয় তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার নিজের। তবু আপনি চলে যাবেন না।

ওদের বাদানুবাদে রাস্তায় বহু লোক জমে যায়। সব শুনে ভীড়ের লোকও হাসিবকে চাপাচাপি করতে থাকে। লোকটা তাকে বিনি পয়সায় গোছল করাতে চায়, গোছল না করলে তার বিবিদের হারাতে হবে। হাসিব কোন কথাই শুনতে চায় না। ও চলে যাবেই। না, মিষ্টি কথায় কাজ হবে না, সবাই মিলে ঠিক করল দু-এক ঘা লাগাতে হবে। হাসিবকে কয়েক ঘা লাগিয়ে সবাই চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল হামামে। পরিত্রাহি চিৎকার করেও হাসিবের রেহাই নেই। জোর করে ওর জামা-কাপড় খুলে নিয়ে হড়হড় করে জল ঢালতে থাকে। বিশ তিরিশ গামলা জল ঢেলে বেশ করে গা রগড়ে সাবান মাখিয়ে গোছল করাতে থাকে মহানন্দে। গরম তোয়ালে দিয়ে গা মুছিয়ে দিল। মাথায় পরিয়ে দিল এক বিশাল পাগড়ি। তাতে মনোরম কাজ করা। হামামের মালিককে আর শপথ মানতে হবে না। খুশী মনে একগেলাস গোলাপ জলের শরবত এনে বলে:

—খোদা আপনাকে ফুর্তি দিক, স্বাস্থ্যবান করুক। নিন, এই শরবতটা খেয়ে ফেলুন। একেবারে তরতাজা বোধ করবেন। আপনি আমাকে বাঁচালেন, বিবি ছাড়া বাঁচা যায়? কি বলেন?

এদিকে হাসিবের অবস্থা শোচনীয়। সময় যত বয়ে যায় বুকের ভিতরটা যেন শুকিয়ে যেতে থাকে। একটা ঠাণ্ডা স্রোত মেরুদণ্ড বয়ে সোজা নীচে নামতে থাকে। কি করবে আর কি করবে না কিছুই বুঝতে পারে না বেচারী। কি একটা বলার জন্য ওর ঠোঁট দুখানা নড়ে ওঠে। এমন সময় হঠাৎ রাজার সেপাইতে ভরে যায় হামাম। উন্মুক্ত তরবারি হাতে হামামকে ঘিরে ফেলে সেপাইরা। হাসিবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে যেভাবে ছিল ঠিক সেইভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল রাজবাড়িতে। গোছলের পর পোশাকও ভাল করে পরতে পারেনি। রাজপ্রাসাদে এনে প্রধান উজীরের সামনে ফেলে দিল। উজীর হাসিবের জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করছিলেন।

হাসিবকে দেখে উজীর খুব খুসী। আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করে ওর সঙ্গে রাজার কাছে যেতে অনুরোধ করল। নসিবে যা আছে তাই হবে ভেবে হাসিব উজীরের পেছন পেছন চলল। ওরা এসে পড়ল একটা হল ঘরে। সারি সারি মান্যগণ্য লোক পদমর্যাদা অনুসারে বসে আছেন। সামন্তরাজা, প্রধান পারিষদ আর খোলা তরবারি নিয়ে জল্লাদরা দাঁড়িয়ে আছে। হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুবেগে মাথা উড়িয়ে দেয় এসব জল্লাদ। ঘরের মাঝখানে এক বিশাল সোনার পালঙ্কে রাজা শুয়ে আছেন। তাঁর মাথা ও মুখ রেশমী কাপড়ে ঢাকা। তিনি বোধহয় ঘুমুচ্ছেন।

রাজার অবস্থা দেখে তো হাসিবের হয়ে গেল। নাঃ এবার মৃত্যু আর দূরে নেই। শপথ ভাঙ্গার জন্য সতর্ক বাণী এবার ফলবে তাহলে। পালঙ্কের নীচে দড়াম করে আছড়ে পড়ে কেঁদে বলতে থাকে, ও কিছু জানে না, কোন দোষ করেনি। উজীর তাড়াতাড়ি ওকে তুলে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় খুব ভদ্রভাবে। তারপর সে বলে:

—আপনি ড্যানিয়ালের পুত্র। আপনি আমাদের রাজা মহাশক্তিধর কারজাদানকে রক্ষা করবেন তার জন্য আমারা অপেক্ষা করছি। রাজার সারা দেহ আর মুখে সাংঘাতিক কুষ্ঠব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর অবস্থা ভাল নয়। আপনি মহান ড্যানিয়ালের পুত্র বলে রাজার এই কালব্যাধি নিরাময় করতে পারবেন। এটা আমরা জানি।

সঙ্গে সঙ্গে সামন্তরাজা, প্রাসাদরক্ষী ও জল্লাদের দল সমস্বরে বলে উঠল—একমাত্র আপনিই পারেন রাজা কারাজাদানকে রক্ষা করতে।

ভয়ে আর ভাবনায় হাসিব যেন কেমন হয়ে যায়। কাঁপা গলায় চেঁচাতে চেষ্টা করে—আল্লার নামে শপথ করে বলছি আমি মহান কেউ নই, ওরা আমাকে ভুল করে ধরে নিয়ে এসেছে। —উজীরের দিকে ফিরে বলল—আমার বাবার নাম ড্যানিয়েল, এটা ঠিক। কিন্তু আমি একেবারেই মূর্খ। ছেলেবেলায় আমাকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছেন কিন্তু আমি কিছুই শিখিনি। হেকিমি শেখাবার চেষ্টা করেছিল, মাসখানেক পরে তাও ছেড়ে দিয়েছি। তালিমদারও ভাল ছিল না। শেষে আমার মা আমাকে একটা খচ্চর আর কিছু দাড়ি কিনে দেন। আমি কাঠুরে হলাম। আমি যা শিখেছি সব বললাম।

কিন্তু উজীর নাছোড়বান্দা, সে বলল—নিজেকে লুকোবার চেষ্টা করবেন না। দুনিয়ার চারদিক খুঁজলেও আপনার মত ভাল একজন চিকিৎসক পাওয়া যাবে না।

এবার হাসিব হাউমাউ করে ওঠে—উজীর সাহেব, আমি তো রোগ বা তার নিদান সম্পর্কে কিছুই জানি না, আমি কেমন করে রাজাকে সারিয়ে তুলব।

—এখানে মিথ্যা কথা বলে কোন লাভ হবে না। আমরা ভালভাবে জানি যে রাজাকে সারিয়ে তোলা আপনার হাতের মুঠোয়।

—কি করে ? —হাসিব মাথার ওপর দুহাত তুলে দেখায়—এই দেখুন আমার হাত, কি আছে এই হাতে ?

উজীর বলল—আপনি নিদান দিতে পারেন কারণ পাতালের রানীর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে। রানীর কুমারী দুগ্ধ খেলে বা মলমের মত লাগালে যে কোন দুরারোগ্য ব্যাধি সেরে যায়।

ভোর হয়ে আসছে দেখে শাহরাজাদ চুপ করে গেল।

তিনশো বাহাত্তরতম রজনী :

পরের রাতে শাহরাজাদ গল্প শুরু করে।

এবার হাসিব বুঝতে পারে ঐ হামামে ঢোকার জন্যই এসব হচ্ছে। নিজের দোষ অস্বীকার করার জন্য চেঁচিয়ে বলে :

—আমি জীবনে এরকম দুধ দেখিনি, বিশ্বাস করুন। পাতালের রানীর নামও শুনিনি কোনদিন। কে সে তাও জানি না।

উজিরের ঠোঁটে মৃদু হাসি ঝিলিক মারে।

—আপনি যদি না-ই বলেন, তবে আমি বলছি। আপনার কথা যে কত অসার তা আমি এক্ষুণি প্রমাণ করে দিচ্ছি। আমি জানি আপনি

পাতালের রানীর কাছে থেকেছেন। কি করে বুঝলাম? সেই প্রাচীনকাল থেকে যারাই রানীর সঙ্গে থেকেছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই পেটের চামড়া কালো হয়ে গেছে। রানীর হামামে না গেলে কিন্তু চামড়া কালো হয় না। একখানা গ্রন্থ থেকে আমি শিখেছি। আপনাকে যে হামাম থেকে নিয়ে এসেছে আমার গুপ্তচররা ওখানে নজর রাখত। যারা গোছল করতে যেত তাদের চামড়া লক্ষ্য করত। আপনার গোছলের সময় আমার গুপ্তচরেরা আমাকে দৌড়ে এসে খবর দিয়ে যায়। আপনারও পেটের চামড়া কালো হয়ে যায় গোছলের সময়। আমার সঙ্গে আর চালাকি করবেন না।

হাসিব জেদী কণ্ঠে বলে—তাহলেও আমি অমন কোন রানীকে দেখিনি।

এবার উজীর এগিয়ে এসে ওর পরনের তোয়ালেটা এক ঝটকায় খুলে পেটটা বার করে দিল। মোষের মত রং পেটের। সেটা দেখা গেল।

এটা হাসিবও জানত না। ওর যেন কেমন একটা ঘোর লাগছে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে।

—আমি বলছি আমি ঐ কালো পেট নিয়েই জন্মেছি আপনার লোকেরা যখন হামামে ঢোকে তখন আমার পেটের ওই রং হয়নি।

উজীর হা-হা করে হেসে উঠল।

—আমার গুপ্তচরেরা দেখে এসেই আমাকে বলেছে, আমি তা বিশ্বাসও করেছি।

রানীকে হাসিব কথা দিয়েছিল, রানী কোথায় থাকে প্রাণ গেলেও সে কথা কাউকে বলবে না। তাই বারবার হাসিব শপথ করে বলতে থাকে, ও রানীকে দেখেনি।

উজীর দু'জন জল্লাদকে ইসারা করল। ওরা ওকে উলঙ্গ করে হাত দুখানি বেঁধে ছাদের আড়ার সঙ্গে বেঁধে দিয়ে পায়ের পাতায় প্রচণ্ড জোরে আঘাত করতে থাকে। বেচারা যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। ওর মনে হচ্ছিল শপথ ভাঙ্গার জন্য এবার ওকে সত্যিই প্রাণ দিতে হবে। এদিকে প্রহার চলছে তো চলছেই। যন্ত্রণা আর সহ্য করতে না পেরে কেঁদে ফেলে বলে, সব সত্যি কথা ও বলবে।

হাসিবকে নামান হল। দামী রাজকীয় পোশাক এনে উজীর নিজে পরিয়ে দিলেন। আস্তাবলে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সব চেয়ে ভাল ঘোড়াটা বেছে দিলেন। উজীরও নিজে দুধের ঘোড়ায় চেপে হাসিবকে নিয়ে চললেন। সঙ্গে চলল একদল সৈন্যবাহিনী প্রহরী হিসাবে। এসে দাঁড়াল ওরা সেই ভাঙ্গাবাড়ির কাছে। রানী যমলিকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এই বাড়িটা থেকেই হাসিব বেরিয়ে এসেছিল।

উজীর বইপত্র পড়ে যাদুবিদ্যা শিখেছিল। কি একটা ধুপের মত জিনিস পুড়িয়ে সে মন্ত্র পড়তে থাকে বাড়িটার দরজায়। হাসিবকে দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল যাতে রানী হাসিবকেই দেখা দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা ভূমিকম্প শুরু হয়। কাছাকাছি যারা ছিল সবাই ছিটকে পড়ে দূরে। একটা বড় গর্ত দেখা দিল। গর্তের মুখে রানীর মাথা দেখা গেল। চারটি সর্পকন্যার কাঁধে গামলায় চেপে বসে আছেন। নিঃশ্বাসে তার আগুন

বেরুচ্ছে। যমলিকার মুখ তপ্ত সোনার মত জ্বলজ্বল করছে। রানী হাসিবকে দেখে চোখ রাঙিয়ে বললেন।

আমার কাছে তুমি এজন্য শপথ নিয়েছিলে ?

আল্লার নামে শপথ করে বলতে পারি মহারানী, এতে আমার কোন দোষ নেই। ওই উজীরের সব দোষ। ওই সব করেছে। মারতে মারতে আমাকে প্রায় খুন করে ফেলছিল।

—আমি সব জানি। সেজন্য তোমাকে কোন শাস্তি দিচ্ছি না। তোমাকে জোর করে ধরে এনেছে, আমাকেও দেখা দিতে জোর করে বাধ্য করেছে। অবশ্য রাজার নিরাময় হওয়া প্রয়োজন। তুমি দুধ নিতে এসেছ আমার কাছে। এই দুধে রাজা ভাল হয়ে যাবেন। আমি তোমাকে দুধ দেব। তুমি আমার কাছে অতিথি হয়ে থেকেছ। সবচেয়ে বড় কথা তুমি অত্যন্ত মনোযোগী শ্রোতা। এরকম শ্রোতা আর পাইনি। আমি খুব খুসী হয়েছি তোমার ওপর। তোমাকে দুই পাত্র দুধ দেব। আমার আরো কাছে এসো। কানে কানে বলি, কি করে ওটা ব্যবহার করবে।

হাসিব রানীর আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে শোনে—শোন হাসিব, একটা পাত্রে লাল দাগ দিয়ে দিয়েছি, ওটার দুধে রাজার রোগ সেরে যাবে। আর অন্যটার দুধ উজীরের জন্য দিয়েছি। তোমায় মেরেছে, না? যখন উজীর দেখবে যে রাজা ভাল হয়ে গেছে, তখন আমার দুধ খাইতে চাইবে উজীর যাতে তার কোন অসুখ না হয়। এবার তুমি দ্বিতীয় পাত্রের দুধটা খেতে দেবে। এই কথা বলে রানী পাত্র দুটি হাসিবের হাতে তুলে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রানী আর তার বাহনের মাথার ওপর মাটি আবার জুড়ে গেল। রাজ প্রাসাদে পেঁছে রানীর কথামত কাজ করল হাসিব। রাজার কাছে গিয়ে প্রথম পাত্র থেকে দুধ খাইয়ে দিল তাঁকে। দুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজার সারা দেহে ঘাম শুরু হল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত চামড়া মাসড়ি হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। জায়গাগুলিতে নতুন নতুন চামড়া গজাতে থাকে। যথারীতি উজীরও সেই দুধ খেতে চাইল। দেওয়ার অপেক্ষা না করে নিজেই দ্বিতীয় পাত্র তুলে গলায় ঢেলে দিয়ে ঢকঢক করে খেয়ে নিল। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে উজীরের সারা দেহ ফুলতে থাকে ধীরে ধীরে। দেখতে দেখত হাতির মত হয় উঠল দেহটা। তারপর বিকট আওয়াজ করে হঠাৎ ফেটে যায়। প্রভাবে উজীর মারা গেল।

পুরো সুস্থ হয়ে রাজা সিংহাসনে বসে রাজ্য শাসন শুরু করলেন। প্রথমে তিনি হাসিবকে কাছে ডেকে এনে তাঁর পাশে বসালেন। তাঁর জীবনদাতাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে মৃত উজিরের পদে নিযুক্ত করলেন। বহু হীরে দিয়ে তৈরী রাজসিক পোশাক পরিয়ে হাসিবকে যথাযোগ্য সম্মান দেখালেন। রাজ্যের সর্বত্র এই নিয়োগের কথা ঘোষণা করালেন।

রাজা আদেশ দিলেন:

—আমাকে যারা সম্মান দেখাবে তারা অবশ্যই হাসিবকেও সম্মান দেখাবে।

এ সময় ভোর হয়ে এল। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে গেল।

হাসিব লেখাপড়া শিখে বেহেস্তে যাবার আগে তার বাবার লেখা তার মার কাছে রাখা একটুকরো কাগজে এটা দেখতে পেল।

"সব শিক্ষাই অসার, কারণ সময় হলে আল্লাই তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে সব শিখিয়ে দেবেন।"

শাহরাজাদ বলল :

জাঁহাপনা এই হল ড্যানিয়েলের পুত্র হাসিব ও পাতালের রানী যমলিকার গল্প।

—আল্লা আরও বেশী জানেন।

গল্প শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাহরিয়ার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন :

—আমার আরো বেশী ক্লান্তি লাগছে। মন অবসন্ন হয়ে পড়ছে যে শাহরাজাদ সাবধান! আমার যদি এরকম অবস্থা চলতে থাকে তাহলে তো বুঝতেই পারছ কাল সকালে তোমার মুন্ডু আর ধড় এক জায়গায় থাকবে না।

দুনিয়াজাদের বুক কেঁপে ওঠে। ভয়ে সে কুঁকড়ে যায়। কিন্তু শাহরাজাদের মুখে কোন উদ্বেগের চিহ্ন নাই। সে নির্বিকারভাবে বলে, যাইহোক, বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দেবার জন্য আমি দু-একটা চুটকী গল্প বলছি, শুনুন জাঁহাপনা।

শাহরাজাদ বলতে শুরু করে :

শুনুন জাঁহাপনা, একদিন খলিফা হারুন অল-রসিদ তাঁর উজির অল বারমাকী, প্রিয়পাত্র গাইয়ে ওস্তাদ আবু ইশাক এবং বয়স্য কবি নবাসকে সঙ্গে নিয়ে বাগদাদের পথে-পথে ঘুরছিলেন। চলতে চলতে এক সময় তারা এসে পড়লেন শহরের এক প্রান্তে। এইখানে বসরাহ থেকে রাস্তা এসে মিশেছে বাগদাদে। সুলতান দেখলেন, একটি বৃদ্ধলোক গাধার পিঠে চেপে শহরের দিকে আসছে। হারুন অল-রসিদ জাফরকে বললেন, জাফর, লোকটাকে জিজ্ঞেস করতো—কোথায় সে চলেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে জাফর ভেবে পেল না, খলিফার কী উদ্দেশ্য। কেনই বা তাঁর এই কৌতূহল। যাই হোক, সে বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে গিয়ে ইশারায় তাকে থামতে বললো। বৃদ্ধ লাগামটা ঢিলে করে গাধাটাকে দাঁড় করালো। জাফর জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ গো, শেখ সাহেব, কোথায় চলেছো? কোথা থেকেই বা আসছো?

বৃদ্ধ জবাব দেয়, বসরাহ থেকে আসছি। বাগদাদেই যাবো।

জাফর বলে, এই লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে এলেই বা কেন?

—খোদা মেহেরবান, শুনেছি, এখানে এই বাগদাদ শহরে অনেক নামকরা ধন্বন্তরী হেকিম আছেন। আমি তারই সন্ধানে এসেছি। চোখের ব্যামোয় বহুৎ কষ্ট পাচ্ছি। যদি কেউ ভালো সুর্মা বানিয়ে দিতে পারেন, এই আশায় এখানে আসছি।

জাফর বললো, সারা না সারা খোদাতালার হাত; আমি একটা কথা বলবো শেখ সাহেব, এমন ধন্বন্তরী দাওয়াই আমি বানিয়ে দিতে পারি যা লাগালে এক রাতের মধ্যে তোমার চোখের সব অসুখ সেরে যাবে। এতে তোমার পয়সাও বাঁচবে ঢের।

বুদ্ধ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। স্বগতভাবে বলে, একমাত্র আল্লাহই এর ইনাম দিতে পারে।

কিন্তু কথাটা শুনতে পায় জাফর। খলিফার কাছে সরে গিয়ে ইশারায় জানায়। তারপর বুদ্ধের কাছে এগিয়ে এসে বলে, দেখ চাচা তোমাকে দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে, তাই সেধে এসে তোমার উপকার করতে চাইছি। তাহলে আমার দাওয়াই বানাবার মাল-মশলা তোমাকে বাৎলে দিই? ভালো করে মন দিয়ে শোন: তিন ছটাক নাকের প্রশ্বাস, তিন ছটাক সূর্যের আলো, তিন ছটাক চাঁদের আলো, আর তিন ছটাক চিরাগের আলো নেবে। একটা তলা খোলা হ্যামানদিস্তায় ভালো করে মেশাবে সবগুলো। তারপর খোলা হাওয়ায় রেখে দেবে সেগুলো। এই ভাবে তিন মাস হাওয়া খাওয়াবে। তার পর আরও তিনমাস ধরে সেই মেশানো মশলাগুলো খুব আচ্ছা করে ডলাই-মলাই করবে। তারপর একটা পিরিচে ঢেলে নেবে। পিরিচ সুদ্ধ মশলাগুলো আরও তিন মাস রোদে শুকোতে দেবে। এরপর তোমার দাওয়াই তৈরি হয়ে যাবে। একটা রাতে এই সুর্মা তিনশোবার লাগাবে তোমার চোখে। সন্ধ্যা থেকে সুবা অবধি। যদি আল্লাহ সহায় থাকেন, তবে দেখবে, এক রাতেই তোমার চোখের সব ব্যামো সেরে গেছে!

বুদ্ধ তো কৃতজ্ঞতায় গদগদ। গাধার পিঠে বসেই মাথা নুইয়ে জাফরকে সালাম ঠুকে বললো, আপনি সেরা হেকিম। আপনার ঐ দাওয়াই-এর দাম কী দিয়ে শোধ করবো? যাই হোক, আপনি আর দেরি করবেন না কষ্ট করে মাল-মশলাগুলো এখনি জোগাড় করে আমার দাওয়াই বানিয়ে দিন। একটু তাড়াতাড়ি করুন, নাহলে ওরা হয়তো উধাও হয়ে যাবে। আমি কথা দিচ্ছি, দেশে ফিরে গিয়ে আপনার জন্যে একটা বহুৎ মজাদার বাঁদী পাঠিয়ে দেব। মেয়েটার লাল টুকটুকে খুদে ডুমুরের মতো পাছাখানা দেখে আপনি ভিরমি খেয়ে যাবেন। মেয়ে-মানুষটা এমন সুন্দর করে কাঁদতে পারে, দেখবেন, আপনার ঐ পাংশুটে মুখখানা থুথুয় লেপে দেবে, আর খড়খড়ে দাড়িগুলো জবজবে করে ভিজিয়ে ছাড়বে।

এই বলে বুদ্ধ তার গাধার লাগাম ঝাঁকিয়ে তড়বড় করে এগিয়ে চলে গেল।

খলিফা তো হেসে খুন। জাফর বোকা বোবার মতো পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। একটাও কথা বলতে পারলো না। লজ্জায় সে তখন আড়ষ্ট।

কবি আবু নবাস শুধু বিজ্ঞের মতে এগিয়ে এসে জাফরকে বাহবা দিতে লাগলো। যেন পুত্রের কৃতকর্মের জন্য এক পিতার বুক দশ হাত ফুলে উঠেছে।

এই ছোট্ট সুন্দর কাহিনীটা শুনে সুলতান শাহরিয়ারের মুখ হাসিতে ঝলমল করে ওঠে। শাহরাজাদকে বললো, এই রকম আর একটা মজাদার কিস্সা শোনাও, শাহরাজাদ।

দুনিয়াজাদ বলে, কী সুন্দর, কী মিষ্টি তোমার বলার কায়দা দিদি!

কিছুক্ষণ বিরতির পর শাহরাজাদ আবার এক কাহিনী বলতে শুরু করে।

ইয়েমানের সুবাদার উজির বদর অল-দিনের এক পরম রূপবান কনিষ্ঠভ্রাতা ছিল। তার অতুলনীয় রূপের জেল্লায় মুগ্ধ নয়নে চেয়ে দেখতো সবাই। বদর অল-দিনের মনে ভয় হতো, না জানি কোন খারাপ সংসর্গে মিশে ভাই তার বয়ে যাবে। তাই সে সব সময় তাকে চোখে চোখে রাখতো। তার সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে বড় একটা মিশতে দিত না। এই আশঙ্কায় সে তাকে মাদ্রাসায় পাঠাতো না। এক প্রবীণ প্রাজ্ঞ সদাশয় শিক্ষককে তার গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করে লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করেছিল। এই বৃদ্ধ মৌলভী প্রতিদিন তার বাড়িতে এসে তাকে পড়িয়ে যেত। বাড়ির একটি নিভৃত কক্ষে দ্বার রুদ্ধ করে বহুক্ষণ ধরে সে তাকে পড়াশুনা করাতো। সে ঘরে কারুরই প্রবেশ অধিকার ছিল না, এমনকি স্বয়ং উজির সাহেবও কখনও যেত না।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বৃদ্ধ মৌলভী খুব সুরৎ কিশোরের প্রেমে মশগুল হয়ে পড়লো। অচিরেই মৌলভীর বুড়ো হাড়ে বহুকালের সুপ্ত বসন্ত চেগে উঠলো।

একদিন সে আর মনের আকুলি-বিকুলি চেপে না রাখতে পেরে কিশোরের কাছে তার মহব্বৎ পেশ করে বসলো, তোমাকে দেখা ইস্তক আমার বুকের মধ্যে আঁকু পাঁকু করছে। তোমাকে ছাড়া এ জিন্দগী আমার বরবাদ হয়ে যাবে—আমি বাঁচতে পারবো না।

বদর অল-দিনের ভাই বৃদ্ধ মৌলভীর এই আকুল আবেদনে বিচলিত হয়ে পড়ে। বলে, কিন্তু আমার বড়ভাই সব সময় আমাকে চোখে-চোখে রাখে। তার নজর এড়িয়ে আপনাকে আমি কি করে খুশি করতে রি?

বৃদ্ধ বলে, উপায় আমি ভেবেছি। রাত্রে যখন তোমার বড়ভাই ঘুমিয়ে পড়বে তখন তুমি ওপাশের ছাদে গিয়ে দাঁড়াবে। আমি দেওয়ালের ওপাশে তোমার জন্য অপেক্ষা করবো। তোমার সাড়া পেলেই আমি দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠে আসবো। তারপর তোমাকে নিয়ে দেওয়াল টপকে ওপাশে চলে যাবো। কেউ জানতে পারবে না।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সুলতান শাহরিয়ার মনে মনে ভাবে, শাহরাজাদকে এখন মারা চলবে না। ছেলেটাকে নিয়ে বৃদ্ধ মৌলভী কী কাণ্ড করে একবার জানতে হবে।

তিনশো পঁচাত্তরতম রজনীতে আবার কাহিনী শুরু হয়:

শাহরাজাদ বলতে থাকে।

ছেলেটি বললো, ঠিক আছে তাই হবে।

সন্ধ্যা হতে না হতেই সে ঘুমাবার ভান করে শুতে চলে গেল। কিন্তু 'বিছানায় ঘাপটি মেরে পড়ে রইলো। কিছু পরে বড় ভাই বদর অল-দিন দিনের কাজকর্ম সেরে নিজের ঘরে চলে গেলে সে চুপিচুপি ছাদের কিনারে এসে দাঁড়াল।

বৃদ্ধ মৌলভী আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল সেখানে। শয়তানটা তাকে দেওয়ালের ওপারে নিয়ে চলে গেল। তারপর সোজা নিয়ে গিয়ে তুললো তার নিজের শোবার ঘরে।

নানা রকম সুন্দর সুন্দর ফলমূল এবং দামী দামী সরাবে সাজানো ঘর। স্ফূর্তি করার সব সাজ-সরঞ্জাম সেখানে হাজির। ঘরের মেজেয় ফুটফুটে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। মৌলভী একখানা সাদা মাদুর বিছিয়ে ছেলেটিকে পাশে নিয়ে বসলো।

তারপর চলতে থাকলো তাদের পানাহার। একের পর এক মদের পেয়ালা নিঃশেষ করে ওরা। চলতে থাকে লঘু সুরের প্যালা মারা গান। মৃদুমন্দ হাওয়া মধুক্ষরা জ্যোৎস্নালোক, সরাবের মদিরতা আর হাল্কা সুরের সঙ্গীত এক অপূর্ব মোহময় স্বপ্নলোকের ইন্দ্রজাল রচনা করছিল তখন।

এইভাবে মধুর আবেশের মধ্যে অনেকক্ষণ কেটে গেছে। আরও কত সময় কাটতো কে জানে। কিন্তু একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

বদর অল দিন নিজের ঘরে বিশ্রাম করছিল। হঠাৎ তার খেয়াল হলো, ভাই-এর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু তার শোবার ঘরে এসে অবাক হলো, বিছানায় সে নাই। সারা বাড়ি আঁতিপাতি করে খোঁজা হলো। কিন্তু না, কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। খুঁজতে খুঁজতে এক সময় সে ছাদের সেই প্রান্তে এসে দাঁড়ায়। বদর অল দিন দেখতে পেল, প্রাচীরের ওপাশের বাড়ির একটি ঘরে বসে তার ভাই মৌলভীর সঙ্গে মদের পেয়ালা হাতে মশগুল।

হঠাৎ মৌলভীর নজর পড়ে ছাদের দিকে। স্বয়ং উজির বদর অল দিন ছাদের প্রান্তে দণ্ডায়মান। মৌলভী প্রমাদ গুণলো। কিন্তু মুহূর্তে মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে সে লঘু গানের বয়ান বদলে এক উচ্চ মার্গের সঙ্গীত শুরু করে দিল।

বদর অল দিন সব ভুলে তন্ময় হয়ে শুনতে থাকে সেই সুমধুর মার্গ-সঙ্গীত। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে তারিফ করতে থাকে, বহুৎখুব—তোফা।

এই রাতে মৌলভীর ঘরে ভাইকে মদের পেয়ালা হাতে দেখেও তার আর খারাপ লাগে না। বরং মনে হয়, তার ভাইকে কালোয়াতী গানের তালিম দিতে নিয়ে গিয়ে মৌলভীসাহেব ভালই করেছে। নিশ্চিন্ত মনে সে নিজের ঘরে ফিরে যায়।

এর পর মৌলভীটা ছেলেটিকে নিয়ে সুখের সমুদ্রে সুধা পান করতে থাকে।

শাহরাজাদ বলে :

—এবারে এক অদ্ভুত বটুয়ার কাহিনী বলবো।

কোন এক রাতে খলিফা হারুন অল রসিদের চোখে ঘুম আসছিল না। ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি পায়চারী করে কাটাচ্ছিলেন তিনি। এক সময় উজির জাফরকে ডেকে পাঠালেন।

জাফর ছুটে আসতে খলিফা বললেন, আজ রাতে বোধহয় আর চোখে ঘুম আসবে না, জাফর। তাই তোমাকে ডেকে পাঠালাম। বাকীটা রাত যাতে ভালভাবে কাটে তার ব্যবস্থা কর।

জাফর বলে, ধর্মাবতার আলী নামে আমার এক দোস্ত আছে—সে পারসী শেখ। এক সময় অনেক মজাদার কাহিনী সে আমাকে শুনিয়েছিল।

হারুন অল রসিদ বললেন, ডাকো তাকে এক্ষুণি। আমি শুনবো তার কিস্‌সা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে সুলতান সমীপে হাজির করা হলো। জাফর তাকে পাশে বসিয়ে বললো, শোন আলী খলিফার চোখে আজ ঘুম আসছে না। রাতটা যাতে ভালোভাবে কাটে সে জন্য তোমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তোমার গল্পের জাদুতে সারাটা রাত খলিফাকে ভুলিয়ে রাখতে হবে।

খলিফা বললেন, শুনলাম; তোমার গল্পের এমন গুণ শুনতে শুনতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। তাই কী? তা হলে এমন একটা গল্প ফাঁদো, যা শুনতে শুনতে আমি ঘুমে গলে যেতে পারি।

আলী সবিনয়ে মাথা নুইয়ে বলে, জো হুকুম জাঁহাপনা। এবারে আজ্ঞা করুন কী ধরনের কাহিনী আপনি শুনতে ইচ্ছা করেন। বানানো কিস্‌সা—না, আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনা?

সুলতান বললেন, তুমি নিজে যে ঘটনার সঙ্গে জড়িত—সেইরকম একটা শোনাও।

আলী বলতে শুরু করে:

একদিন আমি দোকান খুলে বসে আছি, এক সময় একটা কালো নিগ্রো এল আমার দোকানে। দোকানে সাজানো নানারকম জিনিসপত্র দেখতে থাকলো। এটা ওটা নিয়ে দরাদরি করতে লাগলো। তারপর, আমি লক্ষ্য করলাম এক সময় টুক করে একটা বটুয়া তুলে নিল সে। ও ভাবলো, আমার নজরে আসেনি। তারপর অতি সহজভাবে দোকান থেকে বেরিয়ে হন হন করে চলতে থাকলো। এমন একটা ভাব, যেন কিছুই হয়নি। আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। ছুটে গিয়ে তার কামিজের খুট চেপে ধরলাম, এ্যাই—আমার বটুয়া দাও।

লোকটা রাগে ফুঁসে উঠলো, এটা আমার বটুয়া। এর মধ্যে আমার সামানপত্র আছে।

আমি ঐ ডাহা মিথ্যুকটার কথা শুনে চিৎকার করে উঠলাম। পথচারীদের ডেকে জড়ো করলাম। শোনও মুসলমান ভাইসব, এই বিধর্মী লোকটা আমার দোকান থেকে এই বটুয়াটা চুরি করে পালাচ্ছে।

আমার চেঁচামেচিতে অনেক লোকজন জড়ো হয়ে গেল। সম-

ব্যবসায়ীরা পরামর্শ দিল, আর দেরি করো না। লোকটাকে এখনি কাজীর কাছে নিয়ে যাও।

তাদের সাহায্যে নিগ্রোটাকে টানতে টানতে আমি কাজীর কাছে নিয়ে গেলাম। কাজীর প্রথম প্রশ্ন : কে বাদী, কে আসামী?

আমি বলতে যাবো, তার আগেই নিগ্রোটা কাজীকে সালাম ঠুকে বলতে লাগলো, আল্লাহর দোয়ায় আপনি ন্যায়বান ধর্মাবতার। আপনার কাছে আমার নিবেদন, এই বটুয়া আমার সম্পত্তি। এর মধ্যে যা কিছু আছে তাও আমার জিনিস। আমার কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল এটা। আজ ওর দোকান থেকে উদ্ধার করেছি আমি।

কাজী প্রশ্ন করে : হারিয়েছিল?

—গতকাল। এর চিন্তায় কাল সারাটা রাত আমি ঘুমাতে পারিনি, ধর্মাবতার।

কাজী বললো, ঠিক আছে। বটুয়াটা আমার সামনে রাখ। এর মধ্যে কী কী জিনিসপত্র আছে তার একটা ফর্দ বানাও।

নিগ্রোটা বলতে থাকলো : এর মধ্যে আমার দুখানা স্ফটিকের কাজল-কৌটো আছে। এ ছাড়া দুখানা রুপোর কাজল পরানো কাঁটা, একখানা রুমাল, দুটো বাহারী হাতল লাগানো সরবতের গেলাস, দুটো চিরাগবাতি, দুখানা বড় চামচ, দুখানা কুর্শির গদি। খেলার মেজে পাতার জন্য দুখানা গালিচা, দুটো জলের বোতল, দুখানা মুখ ধোবার গামলা, একখানা রেকাবী, একটা রসুইপাত্র, একটা মাটির পানি রাখার কুঁজো, একখানা রসুইখানার সিক, একখানা বড় কুরুশ কাঁটা, দুখানা মদের থলে, একটা অন্তঃসত্ত্বা বেড়াল, দুটো মাদীকুত্তা, একটা চালের হাঁড়ি, দুটো গাধা, দুই প্রস্ত মেয়েদের শোবার ঘরের সামানপত্র, একখানা শণপাটের পোশাক, দুটো মেয়েদের ঢিলেঢালা কামিজ, একটা গরু, দুটো বাছুর, দুটো দ্রুতগামী আরবী উট, দুটো ভেড়া, একটা বড় উট, দুটো বাচ্চা উট, একটা মোষ, দুটো ষাঁড়, একটা সিংহী, দুটো সিংহ, একটা মাদী ভালুক, দুটো খেঁকশিয়াল, একখানা গদীআঁটা আরামকেদারা, দুখানা বিছানা, একখানা বিরাট প্রাসাদ—তার মধ্যে দুখানা ইয়া বড় বড় মজলিশি দরবার কক্ষ, দুখানা সবুজ তাঁবু, দুখানা চাঁদোয়া, দুই দরজাওয়ালা একটা রসুইখানা এবং এক দল কুর্দ নিগ্রো। এ সবই আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এইগুলো আছে ঐ বটুয়ায়—আমি হলফ করে বলছি, হুজুর, বটুয়াটা আমার।

এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো ছিয়াত্তরতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে :

কাজী আমার দিকে ফিরে বললো, এখন তোমার কী বক্তব্য আছে, বল।

আমি আর কী বলবো, নিগ্রোটার সেই আজগুবী কথাবার্তা শুনে আমার তো আক্কেল গুড়ুম। যাই হোক, একটুক্ষণের মধ্যে নিজেকে ধাতস্থ করে নিয়ে আমি কাজীকে বললাম, আল্লাহ আপনার আরও খ্যাতি, মান

বাড়াবেন হুজুর। আমার ঝোলাটায় একটা সভামণ্ডপের ভাঙ্গচুর আছে। আর আছে একটা গোটা ইমারৎ কিন্তু কোনও রসুইখানা নাই। আছে একটা পেল্লাই বড় কুকুরশালা, একটা ছেলেদের মাদ্রাসা। একদল আমুদে দাবাড়ে, একটা ডাকাতের আস্তানা, একদল ফৌজ আর তাদের সেনাপতি, গোটা বসরাহ আর বাগদাদ শহর, আদের পুত্র আমির সাদ্দাদের প্রাচীন প্রাসাদ, একটা কামারশালা' একখানা মাছ ধরা জাল, একখানা মেষপালকের লাঠি, পাঁচটি খুবসুরৎ ছোকরা, বারোটি কুমারী কন্যা এবং মরুযাত্রীদের এক হাজার সর্দার। এই সবই আছে ঐ ঝোলায়। আমি দাবি করছি—এই আমার প্রমান, ঝোলাটা আমার।

আমার জবাব শোনামাত্র নিগ্রোটা কান্নায় ফেটে পড়লো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে বলতে লাগলো, ধর্মাবতার' আমার বটুয়াটা সকলের কাছে সুপরিচিত। যাকে জিজ্ঞেস করবেন সেই বলবে বটুয়াটা আমার সম্পত্তি। আমি আপনার কাছে আগে যে ফর্দ পেশ করেছি তা ছাড়াও আরও কতকগুলো জিনিস ওই বটুয়ায় আছে। সেগুলো শুনুন: দুটো বাজেয়াপ্ত শহর, দশটা গম্বুজ, দুটো রসায়ন কারখানা, চারজন দাবাড়ে, একটা মাদী ঘোড়া, দুটো ঘোড়ার বাচ্চা, একটা পাল দেওয়া ঘোড়া, দুটো টাট্টু ঘোড়া, দুখানা তলোয়ার, দুটো খরগোস, দুটো বকাটে ছোকরা' দুজন মেয়েমানুষের দালাল, এক অন্ধ, দুজন জ্যোতিষী, একজন খোঁড়া মানুষ, দুজন অসাড়লোক, একজন জাহাজের কাপ্তেন' এক জাহাজ ভর্তি নাবিক, এক পাদরী, একজন পাঠান ধর্মযাজক, একজন সমাজপতি, দুজন সাধু এবং একজন কাজী। এছাড়া আরও আছে দুজন সাক্ষী। তারাই বলবে বটুয়াটা আমার।

এর পর কাজী আবার আমার দিকে ফিরে বললো, এর জবাবে তোমার যদি কিছু বলার থাকে বলতে পার।

আলী বলতে থাকে: তখন আমার মাথা গরম হয়ে গেছে, জাঁহাপনা। কিন্তু নিজেকে সহজ এবং সংযত করে কাজীকে বললাম' আল্লাহ আমাদের কাজীকে আরও উদার, নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি দিন। আমি এর আগে যে সব সামানপত্রের কথা আপনাকে বলেছি তা ছাড়াও আরও কতকগুলো জিনিস আমার ঐ ঝোলাটায় আছে, ধর্মাবতার। সেগুলো বলছি: মাথা ধরার দাওয়াই, একটা সেনাবাহিনীর সাজ-পোশাক, বর্ম এবং অস্ত্রাগার, এক হাজার লড়াকু ভেড়া, একটা হরিণ চরানোর খোয়াড়, মেয়ে পাগল একদল মানুষ, কেতাদুরস্ত কতকগুলো ছোকরা, ফুল ফলের গাছে ভরা বাগিচা, দ্রাক্ষাকুঞ্জ, আপেল, ডুমুর জলের বোতল, পেয়ালা' সদ্য শাদী হওয়া যুগল দম্পতী, বারোটা পূতিগন্ধময় বাতকর্ম, অনেকগুলো কাপুরুষ, একটা শস্যশ্যামল মাঠ ভর্তি মানুষ, নিশান এবং পতাকা, হামাম নিসৃত সুগন্ধী হাওয়া, কুড়িজন গায়িকা' চারজন গ্রীক রমনী, পঞ্চাশজন তুরস্ক কন্যা, সত্তরজন পারসী জেনানা, নব্বইজন জর্জিয়া নারী, ইরাকের বেহেস্ত প্রদেশ, দুটো আস্তাবল, একটি মসজিদ, অনেক হামাম, একশো সওদাগর, একটা হাতুড়ী' একটা পেরেক, একটা বাঁশীবাদক নিগ্রো, এক হাজার দিনার, নানা জিনিসপত্রে ঠাসা কুড়িটা প্যাটরা, কুড়িজন নাচনেওয়ালী' পঞ্চাশটা ভাঁড়ার ঘর, গোটা

কুফা শহরটা, এছাড়া গাজা, দামিয়েট্টা এবং শাবন শহর, সুলেমানের খুসরাম আমুশিরবান প্রাসাদ কক্ষ এবং ইসপাহানের মাঝখানের পুরো ভূখন্ড। এছাড়া, আল্লাহ কাজীকে দীর্ঘায়ু করুন, একখানা শবাধার শবাচ্ছাদন এবং কাজী সাহেব যদি আমার অধিকার স্বীকার না করেন সেই জন্যে দাড়ি কামানোর একখানা ক্ষুরও আছে ঐ ঝোলায়। আবারও বলছি, ঝোলাটা আমার ঝোলা।

এই সব কথা শোনার পর কাজী আমাদের দুজনের দিকে তাকালো। তারপর বলতে থাকলো, খোদা হাফেজ, হয় তোমরা দুজনেই পাজী বদমাইস আইনকে নিয়ে রঙ্গ তামাশা করতে এসেছ না হলে এই বটুয়াটা কোনও অলৌকিক বস্তু।

এর পর কাজী বটুয়াটার মুখ খুলে ফেললো। তার মধ্যে কমলা রঙের একটা বড়ি আর কতকগুলো জলপাই এর আঁটি ছিল মাত্র।

কাজী ব্যাচারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। আমি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে তাকে বললাম, না না, এ ঝোলা আমার না, এ নিশ্চয়ই ঐ নিগ্রোটার। ওকেই দিয়ে দিন।

এই বলে আমি সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম।

এই কাহিনী শুনে খলিফা হারুন অল রসিদ হেসে গড়িয়ে পড়লেন। খুশি হয়ে নিয়ে আলীকে নানা ইনাম উপহার দিয়ে বিদায় করলেন।

এর পর খলিফা শোয়ামাত্র নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে থাকলেন।

শাহরাজাদ বলে, কিন্তু জাঁহাপনা, আপনি ভাববেন না, এর চেয়ে মজাদার কিসসা আপনাকে আর শোনাবো না। হারুন অল রসিদের আর একটা কাহিনী শুনুন।

শাহরিয়ার বললে, আমি তো শোনার জন্যেই ঘুম কামাই করে বসে আছি শাহরাজাদ।

এবার শুনুন হারুন অল রসিদের মহব্বতের কাহিনী :

একদিন রাত্রে খলিফা হারুন অল রসিদ দুই সুন্দরীকে দু পাশে নিয়ে মধুযামিনী যাপন করছিলেন। এদের একজন মদিনা এবং অপরজন কুফার মেয়ে। খলিফা দুজনকেই সমান ভালবাসেন। তিনি কিছুতেই ঠিক করতে পারছিলেন না সে রাত্রে তিনি কাকে নিয়ে সুখ সম্ভোগ করবেন। কারণ একজনকে খুশি করতে গেলে আর একজন ব্যাজার হবে।

তাই তিনি ঠিক করলেন যে মেয়ে তাকে খুশি করতে পারবে তাকেই তিনি দেবেন সে রাতের পুরস্কার। সঙ্গে সঙ্গে মদিনার মেয়ে খলিফার হাত টিপতে লাগলো। আর কুফা কন্যা টিপতে থাকলো তাঁর পা। সুযোগটা তারই মিললো বেশি। পায়ের পেশী টিপতে টিপতে ক্রমশ তার হাত উপরের দিকে চালান হতে থাকে। এইভাবে কখনও বা তার হাত নিষিদ্ধ প্রদেশে ঢুকে পড়ে।

এই কায়দায় এক সময় তার জিৎ হয়। খলিফার ধমণীতে আগুন ধরে।

কুফা কন্যার হাতের মুঠোয় বেহেস্ত ধরা পড়ে।

এই না দেখে মদিনার মেয়ে আঁৎকে ওঠে।

—তুমি তো বাজী মাৎ করে দিলে!

এই বলে সে কুফার মেয়েকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে নিচে নেমে আসে। কুফা কন্যা আহত হয়ে বলে, এ তোমার ভারি অন্যায়। আমার হকের ধন তুমি কেড়ে নেবে কেন?

এবার সে মদিনা-মেয়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে। মদিনা কন্যা তাকে আবার ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলে, এ আমার জিনিস, আমি ছাড়বো না। তুমি শুরু করতে পার, কিন্তু আমি এর দফা রফা করবো। সুতরাং এ জিনিস আমার।

খলিফা এতক্ষণ দুজনের বাকবিতণ্ডা শুনছিলেন। এবার তিনি মনে মনে ঠিক করলেন, না, দুজনকেই খুশি করতে হবে।

শাহরাজাদ বললো, কিন্তু জাঁহাপনা এই ছোট ছোট গল্পগুলোর চেয়ে আরও একটা ভালো গল্প আপনাকে শোনাচ্ছি।

দুই নারীর ঝগড়া বেঁধেছে—ভালোবাসার জন্য যুবক শ্রেষ্ঠ না—বয়স্ক মানুষ শ্রেষ্ঠ।

এই গল্পটা বলেছিল আবু অল আইনা:

এক সন্ধ্যায় আমি ছাদের ওপরে উঠেছিলাম। উদ্দেশ্য—একটু মুক্ত বায়ু সেবন। পাশের বাড়ির ছাঁদ থেকে দুটি নারী কণ্ঠের বিতর্ক কানে আসছিল। ওরা দুজনে আমার দুই প্রতিবেশীর বিবি। ওদের প্রত্যেকেরই একজন করে ভালোবাসার পাত্র আছে—ওদের কথোপকথন থেকে বুঝতে পারলাম। দুজনেরই স্বামী বয়সে বৃদ্ধ। একজনের ভালোবাসা একটি উঠতি বয়সের যুবক। আর একজনের ভালোবাসা মানুষ পাকা বয়সের এক শক্তসমর্থ পুরুষ। ওরা এমন তর্কে মশগুল যে, অন্য কেউ তাদের কথা শুনে ফেলতে পারে সে দিকে আদৌ খেয়াল ছিল না।

এই সময়ে রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো সাতাত্তরতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে:

ওদের একজন বলছিল: আচ্ছা ভাই, তোমার ভালোবাসার ঐ ইয়া লম্বা লম্বা দাড়ি তুমি কি করে সহ্য কর? অমন জাঁদরেল বদখদ চেহারার মানুষ দেখলে কি দিল্-এ মহব্বৎ জাগে কারো? উফ্, সে যখন তোমায় চুমু খায় তোমার গাল বুক ঠোঁট চিরে যায় না? ওর গোঁফের চুল তোমার ঠোটের ফাঁক দিয়ে মুখের মধ্যে ঢুকে যায় না? ঐরকম অত্যাচার তুমি কী করে সহ্য কর ভাই? আমার কথা শোন, তোমার ভালোবাসার পাত্রটি পালটাও। আমার মতো একটা খুব সুরৎ নওজোয়ান ছোকরা জোগাড় কর। তার আপেলের মতো টুকটুকে রাঙ্গা গালে চুমু খেয়ে কত মজা

পাবে। তার মাখনের মতো নরম ঠোটের মাংস তুমি মুখে পুরে নিয়ে প্রাণ ভরে চুষতে পারবে। আরও কত নতুন উপাদেয় বস্তুর সন্ধান পাবে তার মধ্যে। তা কি তোমাকে ঐ রুক্ষ দাড়িওলা দিতে পারবে?

অন্যজন বলে, তুমি একটা আস্ত আহম্মক ভাই। তোমার কোনও বুদ্ধিও নাই, রুচিও নাই। তুমি কি জান না, একটা গাছ তখনই মনোহর মনে হয় যখন সে পাতায় ছেয়ে থাকে। শসার খোসা যখন জড় হয় তখনই খেতে বড় স্বাদের হয়। দাড়ি বিহীন এবং টাক মাথার মানুষের চেয়ে হতকুৎসিৎ আর দুনিয়াতে কিছু নাই। দাড়ি গোঁফ পুরুষের শোভা আর নারীর শোভা আজানুলম্বিত কেশ। আল্লাই এই ব্যবস্থা করেছেন। এর পরে কী তুমি আমাকে দাড়ি গোঁফ গজায়নি—তেমন একটা খোকাকে আমার নাগর করতে বলবে? তুমি কী বলতে চাও একটা ছোকরার বুকের তলায় শুতে না শুতেই আমার কামনার জলাঞ্জলি হয়ে যাক। আরে, ওরা তো ওঠে আর নামে। সঙ্গে সঙ্গেই নেতিয়ে পড়ে যায়। নিজেকে ঠকিও না বোন। আমি আমার ভালোবাসাকে ছাড়তে পারবো না। তার মতো দম ছেলেছোকরাদের হতে পারে না। একবার উঠলে আর সে নামতে চায় না। তার কায়দাকানুনই আলাদা। তার আলিঙ্গন, তার বন্ধন, তার চুম্বন, তার রিরংসা তার শৃংগার তার রাগমোচন এক অপূর্ব আলৌকিক বস্তু।

এই সব শুনে ছোকরাসাহেবের প্রেমিকার চোখ কপালে ওঠে।

—তাই নাকি! সত্যি বলছি ভাই, আজ তুমি আমাকে নতুন জ্ঞান দিলে।

একটুক্ষণ পরে শাহরাজাদ আর একটা গল্প বলতে শুরু করে: শসার শাহজাদা।

একদিন আমির মুইন ইবন জাইদ শিকারে বেরিয়েছিল। সে দেখতে পেল একজন আরব গাধার পিঠে চেপে মরুপ্রান্তর পার হয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই সে সালাম জানিয়ে বললো, কোথায় চলেছেন আরব ভায়া? আপনার পিছনে ঐ বস্তুটায় জড়ানো বস্তুটাই বা কী?

আমি আমির মুইনের কাছে যাচ্ছি। আমার জমিতে শসা ধরেছে। তারই কিছুটা তাকে দিতে নিয়ে যাচ্ছি। আমার ক্ষেতের প্রথম ফসল তাকে নিবেদন করে তবে আমি খাবো। এই গোটা সলতানিয়তে তিনিই সবচেয়ে সদাশয় ব্যক্তি। আমার বিশ্বাস তিনি আমাকে উচিৎ ইনাম দেবেন।

বলা বাহুল্য ইতিপূর্বে সে কখনও আমির সাহেবকে স্বচক্ষে দেখেনি।

আমির জিজ্ঞেস করে, কত দাম আশা করছেন?

—তা কমসে কম এক হাজার সোনার দিনার—

—কিন্তু আমির যদি বলেন, দামটা বড্ডো বেশি হচ্ছে—?

—তা হলে আমি বলবো, অন্ততঃ পাঁচশো দিন।

—তবুও তিনি যদি মনে করেন, দামটা চড়া-ই চাইছেন ?
—বেশ, তবে তিনশোই দিন।
—তাও যদি তার কাছে বেশি মনে হয় ?
—একশো—
—যদি এই একশো দিনারও তিনি ন্যায্য মনে না করেন ?
—পঞ্চাশ—
—এর পরেও যদি তিনি বলেন, না, এ দামও বেশি হচ্ছে ?
—তিরিশ—
—তাও যদি তাঁর মনমতো না হয় ?
—তাও যদি মনমতো না হয় ? তা হলে আমার গাধাটাকে তাঁর হারেমের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবো।

আরব শেখের কথা শুনে মুইন হো হো করে হেসে ওঠে। দিল খোলা হাসি। তারপর ঘোড়ার পিঠে চাবুক চালিয়ে তীরবেগে ছুটে আসে নিজের প্রাসাদে। দেওয়ানকে ডেকে বলে, একজন আরব দেশের শেখ একটা গাধায় চেপে আমার প্রাসাদে আসছে। তার সঙ্গে আছে কিছু শসা। সে এলে তাকে আদর আপ্যায়ন করে আমার দরবারে নিয়ে আসবে।

কিছুক্ষণ পরে সেই আরব-শেখ এসে হাজির হলো। দেওয়ান তাকে খুব খাতির করে দরবার কক্ষে নিয়ে গেল। সেখানে পারিষদ পরিবৃত হয়ে বসেছিল আমির মুইন। দরবারের চারপাশে উন্মুক্ত অসি হাতে জবরদস্ত প্রহরীরা দণ্ডায়মান। এই সব জাকজমকের মধ্যে আরব শেখ সেই শিকারী বেশি আমির মুইনকে একদম চিনতে পারলো না।

প্রশ্ন হলো : ঐ বস্তাটায় কী নিয়ে এসেছ আমার জন্যে, আরব-ভাই ?

লোকটি উত্তর দেয় : হুজুরের ভোগের জন্য এই গরীব সামান্য কিছু কচি শসা নিয়ে এসেছে। আমার জমির প্রথম ফলন।

—তোফা-চমৎকার ! তা কী ইনাম আশা কর ?
—জী হুজুর, এক হাজার দিনার—
—একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না ?
—তা হলে পাঁচশোই দিন, হুজুর।
—উঁহুঁ, তাও বেশ বেশি।
—তিনশো ?
—না, তাও বেশি।
—তা হলে একশো ?
—না না, একশো'ও হয় না।
—পঞ্চাশ ?
—তাও বেশি।
—অন্তত তিরিশ
—তিরিশ দিনারও বেশি দাম।

এবার শেখ চিৎকার করে ওঠে। ওপরে খোদা আছেন, আজ আমার নসীবটাই খারাপ। মরুপ্রান্তরে একটা হোদলকুৎকুৎ লোকের সঙ্গে আমার

মোলাকাৎ হয়েছিল। তখনই জানি দিনটা ভালো যাবে না। না না, আমার শসা আমি তিরিশ দিনারের কমে কিছুতেই দিতে পারবো না আমিরসাহেব।

আমির শুধুমাত্র মৃদু হাসলো। কোনও কথা বললো না। এবার আরব-শেখ তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমিরকে লক্ষ্য করতে থাকলো। এঁকেই তো সে কিছুক্ষণ আগে মরুপ্রান্তরে দেখেছিলে না? এবারে সে প্রায় নিঃসন্দেহ হতে পেরেছে।

এতক্ষণ আমির নিজেকে চেপে রেখেছিল, কিন্তু এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়লো। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে তার এক গোমস্তাকে হুকুম করলো। এই শেখকে প্রথমে এক হাজার দিনার দাও। তারপর পাঁচশো, তারপর তিনশো, তারপর একশো, পরে পঞ্চাশ এবং সব শেষে তিরিশ দিনার গুণে গুণে দেবে। এবং বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দেবে, আমির খুশি হয়ে এই এক হাজার নয়শো আশি সোনার দিনার তাকে বকশিস দিচ্ছেন—ঐ আধ বস্তা শসার দাম হিসাবে এটাকা তিনি দিচ্ছেন না। এরপর তাকে খাইয়ে ধুইয়ে তার গাধার পিঠে চাপিয়ে বিদায় করে দেবে। একজন আরব যে আমাকে বোকা বানিয়ে আধবস্তা শসার দাম হিসেবে এই টাকা আদায় করে নিয়ে যাচ্ছে না সেটা তাকে বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে। তাকে জানিয়ে দেবে এ হচ্ছে আমিরের বদান্যতা।

এর পর শাহরাজাদ আর একটি নতুন কাহিনী বলতে শুরু করে :

এই গল্পটি আবু সুবাইদ বলেছিল :

একদিন আমি বাগানে ফল কিনতে গেছি, হঠাৎ নজরে এল, একটা অখরোট গাছের তলায় বসে এক রমণী চুলের প্রসাধন করছে। আরও কাছে যেতে দেখতে পেলাম সে বয়সে প্রবীণা—মাথার সব চুলই সাদা। কিন্তু কী আশ্চর্য তার দেহের কোথাও বার্ধক্যের ছাপ পড়েনি। ঢলঢলে যৌবন তার সারা অঙ্গে। সুন্দর মুখশ্রী, দুধে-আলতা গায়ের রঙ, ডাগর-কাঁচ তনু।

আমাকে দেখেও কিন্তু সে বোরখা দিয়ে দেহ ঢাকা দিল না। যেমন করে হাতীর দাঁতের চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল তেমনি ভাবেই আঁচড়াতে থাকলো। একেবারে নির্লিপ্ত নির্বিকার। আমাকে দেখে কোন ভাব বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না।

তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা সুন্দরী, তোমার চুলেই শুধু পাক ধরেছে, কিন্তু তুমি তো আসলে সুঠাম সুন্দরী যুবতী এখনও। তা কলপ লাগিয়ে সাদা চুলকে কালো করে নিলেই তো পারো! তা হলেই তো মনমোহিণী রূপ হবে তোমার! এই কাঁচ কাঁচা বয়েস তোমার, এই বয়সে চুলগুলো কালো করে নাও না কেন? কী ব্যাপার?

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো আটাত্তরতম রজনীর দ্বিতীয় প্রহরে আবার গল্প শুরু হয়:

মেয়েটি মাথা তুলে তাকায়। টানাটানা কাজল কালো চোখ। আমার প্রশ্নের সে জবাব দেয়:

আমার পাকা চুলে রঙ ধরিয়ে কালো তো করেছিলাম। কিন্তু আমার পোড়া কপাল, সাদা হয়ে গজাচ্ছে, মিথ্যে কালিমা দিয়ে তাকে আর কঁহাতক ঢেকে রাখা যায়? ধৈর্যে কুলালো না, তাই সময়ে আবার সব সাদা হয়ে গেল। তা যাক, ওনিয়ে আর দুঃখ করি না। ভয় হয়, আমার এই দুরন্ত যৌবনের জোয়ারকে। তাকে অনেক ঢেকেঢুকে ধরে বেঁধে সন্তর্পণে আগলে রাখতে হয়। কিন্তু সে তো আর পারা যায় না। আসল কথা—জোর-জার করে কিছুই ঢেকে চেপে রাখা যায় না। আমার দেহের যৌবন, আমার এই পিনোন্নত বুক—কী করে আড়াল করে রাখতে পারি, বল? সুতরাং মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে বলে দুঃখ করি না। আমার দেহে তো এখনও ঢলঢলে যৌবন আছে—সে তো বয়সের ভারে বৃদ্ধ হয়ে পড়েনি।

শাহরাজাদ একটুক্ষণের জন্য থামে। তার পর আবার এক কাহিনী শুরু করে:

একদিন উজির জাফর খলিফা হারুন অল রসিদকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিল। নানা উপাচারে খলিফাকে খানাপিনা করাচ্ছে সে, এমন সময় খলিফা জাফরকে বললেন, জাফর তোমার বাড়িতে দেখছি ভারি সুন্দর বাঁদী রেখেছো। আমার খুব ইচ্ছা মেয়েটাকে আমি তোমার কাছ থেকে কিনে নেব।

জাফর বললো, কিন্তু ধর্মাবতার, আমি ওকে বিক্রি করতে চাই না।

খলিফা বললেন, তা হলে এমনিতেই দাও।

জাফর বলে, তাও আমি দিতে পারবো না, জাঁহাপনা।

এবার খলিফা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। আমি বার বার তিন কসম খেয়ে বলছি, জাফর আমার কথা যদি না মান—যদি ন্যায্য দাম নিয়ে বিক্রি না কর, অথবা এমনিতে না দাও তা হলে আজই আমি আমার প্রধান বেগম জুবেদাকে তালাক দিয়ে দেব।

জাফর সমানে গলা চড়িয়ে বলতে লাগলো, আমিও বার বার তিনবার কসম খেয়ে বলছি, আপনার কথা যদি মানতেই হয় তবে, আমার বালবাচ্চাদের মা—আমার বিবিকে বয়ান তালাক দিয়ে দেব আমি। তারা দুজনেই মদের ঝোঁকে এইরকম মারাত্মক কসম খেয়ে বসলো কিন্তু একটুক্ষণ পরে দুজনেই বুঝতে পারলে কাজটা ভালো হয়নি। তখন কীভাবে এই সংকট থেকে রেহাই পাওয়া যায় তারই উপায় খুঁজতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে খলিফা একটা মতলব বের করলেন।

—জাফর, এস আমরা কাজী ইউসুফের পরামর্শ চাই। তিনি আইনজ্ঞ মানুষ, নিশ্চয়ই এর একটা বিধান করে দিতে পারবেন।

তখুনি কাজী ইউসুফের কাছে লোক পাঠানো হলো। এত রাতে খলিফা ডেকে পাঠিয়েছেন, ইউসুফ চিন্তিত হলো, নিশ্চয়ই এমন কোনও কাণ্ড তিনি করে বসেছেন যার ফলে ইসলাম বিপন্ন হতে বসেছে। তড়িঘড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা খচ্চরে চেপে কাজী ইউসুফ আগন্তুক পেয়াদাকে বললো, তুমি এই বাক্সটা নিয়ে রওনা হও, আমি এখুনি আসছি।

কাজী ইউসুফ এল। খলিফা এবং জাফর তারই প্রতীক্ষায় সময় গুণছিল। কাজী ইউসুফের সম্মানে দুজনেই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। খলিফা একমাত্র ইউসুফকেই এই সম্মান দিতেন' আর কাউকেই না। খলিফা বললেন, আমি আপনাকে বড় বিপদে পড়ে ডেকে পাঠিয়েছি।

খলিফা আগাগোড়া সব ঘটনা খুলে বললেন তাকে।

—ধর্মাবতার, আবু ইউসুফ বললো, ব্যাপারটা একেবারেই জটিল কিছু না, পানির মতো সোজা সরল।

তারপর জাফরের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি বাঁদীর অর্ধেকটা খলিফাকে বিক্রি করবেন, বাকী অর্ধেকটা দান করবেন।

কাজীর বিচারে খলিফা খুশিতে নেচে ওঠেন। এতে শুধু যে তিনি নিদারুণ সংকট থেকে অব্যাহতি পেলেন তাই নয়, তার আকাঙ্ক্ষিত সুন্দরী বাঁদীটাকেও পাওয়ার পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। খলিফা বললেন, মহামান্য কাজী সাহেব, আপনি আর কালবিলম্ব করবেন না। তাড়াতাড়ি আইনের খুঁটিনাটি সেরে নিন যাতে আমি মেয়েটিকে নিয়ে এখুনি চলে যেতে পারি।

তখনি বাঁদীকে সামনে হাজির করতে বলা হলো। কাজী ইউসুফ বললো একজন ক্রীতদাসকে ডাকুন।

সঙ্গে সঙ্গে এক দশাসই চেহারার ক্রীতদাসকে আনা হলো।

ইউসুফ বললো' এই ক্রীতদাসের সঙ্গে আমি বাঁদীটার শাদী দিয়ে দিচ্ছি। শাদীর পর সে তার বিবিকে সঙ্গে সঙ্গেই বয়ান তালাক দিতে পারে। তার খেসারৎ হিসাবে তাকে দেন মোহর দিতে হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হবে। শাদীর সঙ্গে সঙ্গেই সে তাকে এক হাজার দেন মোহর দিয়ে তালাক দিয়ে দেবে। তালাক হয়ে গেলে তার পর এই বাঁদীকে খলিফা অনায়াসেই ইসলাম বিধি অনুসারেই রক্ষিতা করতে পারবেন।

ইউসুফ এবার ক্রীতদাসকে উদ্দেশ করে বললো, তুমি একে শাদী করতে চাও?

নফরটা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো, চাই।

—তা হলে এই মুহূর্তে এই বাঁদীর সঙ্গে তোমার শাদী হয়ে গেল। আচ্ছা, এই নাও এক হাজার দেন মোহর। এবার এই দিনারগুলো তোমার সদ্য শাদী করা এই বিবিকে দিয়ে বল, এক তালাক, দুই তালাক বয়ান তালাক দিলাম তোমাকে। এই নাও তোমার খেসারতের দেন মোহন।

ক্রীতদাসটা অবাক হয়ে বললো, কিন্তু এই মাত্র তো আপনি আমার সঙ্গে ওর শাদী দিলেন।. এখন সে আমার আইনসম্মত বিবি। কেন তাকে তালাক দিতে যাবো? না—দেব না। আমি আমার বিবিকে ঘরে নিয়ে যাবো। আমরা সুখে ঘরসংসার করবো।

ক্রীতদাসের এই ঔদ্ধত্য দেখে ক্রোধে ফেটে পড়েন খলিফা। কাজীকে উদ্দেশ করে বললেন, একটা ক্রীতদাসের এত বড় স্পর্ধা!

ইউসুফ খলিফাকে ধৈর্য ধরতে অনুরোধ করলো।—আপনি শান্ত হোন ধর্মাবতার, আমি সব সমাধান করে দিচ্ছি। ক্রীতদাস আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আইনতঃ কোনও অপরাধ করেনি। কারণ বাঁদী এখন তার শাদী করা বিবি। সে যদি রাজি না হয়, তবে তাকে তালাক নাও দিতে পারে। কিন্তু তারও বিধান ইসলামেই দেওয়া আছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপনি শুধু এই ক্রীতদাসকে কিছুক্ষণের জন্য আমাকে দান করে দিন।

হারুন অল রসিদ তৎক্ষণাৎ বললেন, ওকে আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম।

এইবার কাজী ইউসুফ বাঁদীকে বললো, এই ক্রীতদাসটাকে আমি তোমাকে উপহার দিলাম—নেবে একে?

বাঁদীটা বললো, হ্যাঁ, নেব।

কাজী ইউসুফ এবার সোচ্চার কণ্ঠে বললো, ব্যাস, কেল্লা ফতে। তোমাদের শাদী বাতিল হয়ে গেল। এখন থেকে এই ক্রীতদাস আর তোমার স্বামী নয়, নফর মাত্র। এই-ই ইসলামের বিধান। আমার বিচার খতম; এবার ধর্মাবতার আপনি অনায়াসে এই মুক্ত বাঁদীকে আপনার রক্ষিতা করে নিয়ে যেতে পারেন।

কাজীর এই বিচার বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হয়ে খলিফা লাফিয়ে উঠলেন।

—আপনার তুল্য বিচারক তামাম দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় নাই, কাজী-সাহেব।

খলিফার হুকুমে তখনি একখানা বিরাট রেকাবী ভর্তি সোনার মোহর এনে কাজী আবু ইউসুফের সামনে ধরা হলো। খলিফা বললেন, আমি খুশি হয়ে আপনাকে দিচ্ছি। মেহেরবানী করে গ্রহণ করুন।

ইউসুফ খলিফার বদান্যতায় গদগদ হয়ে বললো, আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘায়ু করুন। ধর্মের পথে অবিচল থেকে আপনি প্রজাপালন করতে থাকুন।

তারপর সেই পেয়াদাকে বললো, আমার বাক্সটা নিয়ে এস।

মোহর ঠাসা রেকাবীখানা বাক্সে পুরে নিয়ে কাজীসাহেব স্বগৃহে ফিরে গেল।

এই ছোট্ট কাহিনী থেকে একটি আইনের জটিল সমস্যার সমাধান পাওয়া গেল।

শাহরাজাদ একটুক্ষণ থেমে আর একটি কাহিনী বলতে শুরু করলো।

আবু নবাস আর জুবেদার গোসলের কাহিনী:

হারুন অল রসিদ তার চাচার মেয়ে বেগম জুবেদাকে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন। তার মনোরঞ্জনের জন্য তিনি একটি সুন্দর নয়নাভিরাম

বাগিচা বানিয়ে দিয়েছিলেন। বাগিচার মাঝখানে একটি বিরাট ফোয়ারা। তার চারপাশে পুকুর-সদৃশ এক চৌবাচ্চা—হাল্কা নীল জলে ভরা। বাগিচার চারপাশে ঘন ঝাঁপড়া গাছ বসানো। এই গাছের পাতার আচ্ছাদন বাগিচা-টাকে বাইরের জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এই বাগিচায় বেগম জুবেদা অসংবৃত বেশবাসে ঘুরে বেড়ায়, সাঁতার কাটে, গোসল করে। বাইরের কোন জনপ্রাণীর দৃষ্টি এখানে পৌঁছবার কোনও উপায় নাই। এমন কি সূর্যের আলোও ঢুকতে পায় না এখানে।

একদিন, প্রচণ্ড খরতাপে দগ্ধ হচ্ছিল দুনিয়া, দুপুরে বেগম জুবেদা বাগানে ঢুকে সাজপোশাক খুলে ফেলে ঝরনার ধারে এসে দাঁড়ালো। এক পা এক পা করে নেমে সে হাঁটুজলে গিয়ে দাঁড়ালো। আরও গভীরে যেতে তার ভয় করে। একে ঠাণ্ডা জল তার ওপর সে খুব ভালো করে সাঁতার কাটতে জানে না। তাই সে কোমর ছুঁইছুঁই জলে দাঁড়িয়েই ঘটি করে জল ভরে কাঁধে ঢালতে থাকলো।

পা টিপে টিপে খলিফা তার পিছনে এসে ঢুকেছিলেন বাগানে। দূর থেকে ঝরনার পাশে জুবেদার উলঙ্গ শরীর দেখার লোভ তিনি আর সামলাতে পারেন নি। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তিনি জুবেদার শঙ্খশুভ্র শরীরের লাবণ্য নিরীক্ষণ করতে থাকেন। খলিফা গাছের একটা ঝুলন্ত শাখা ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ তার হাতের ভারে ডালটা মড়মড় শব্দ করে ভেঙ্গে পড়ে।

এই সময় রাত্রি শেষ হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো উনআশিতম রজনীতে আবার সে শুরু করে :

হঠাৎ এই শব্দে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে জুবেদা। দু হাতে নিজের শরীরের নিম্নাঙ্গ ঢাকার চেষ্টা করে এদিক ওদিক চাইতে থাকে। কোনও অদৃশ্য চোখের লোলুপতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু বৃথাই সে চেষ্টা ছোট দুখানা হাতের আচ্ছাদনে তার অর্ধাংশও ঢাকা পড়ে না। সবই খলিফার দৃষ্টিগোচর হয়।

এর আগে খলিফা কখনও তার চাচার মেয়ে জুবেদাকে এই অবস্থায় দেখেন নি। এমন ঝকঝকে প্রকাশ্য দিবালোকে এই তিনি প্রথম তাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখার সুযোগ পেলেন। জুবেদার গোপন অঙ্গের শোভা দেখে তিনি বিমুগ্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু পরে আবার পা টিপে টিপে, যেমন করে এসেছিলেন তেমনিভাবে, বাগিচা থেকে বেরিয়ে গেলেন। মন তার এক অনাস্বাদিত আনন্দে ভরে গেল। গুন গুন করে তিনি গাইতে থাকলেন :

ঝরনার ধারে দেখে এলাম তারে...

কিন্তু অশান্ত হৃদয় উথাল পাথাল করতে থাকে। কিছুতেই মনকে সহজ শান্ত একাগ্র করতে পারলেন না। তাই গানের পরের কলি আর গুছিয়ে বানাতে পারলেন না তিনি। চেষ্টার কোনও অন্ত ছিল না, কিন্তু কিছুতেই তিনি মেলাতে পারলেন না পরের ছত্র। তাই অপ্রকাশের যন্ত্রণায় তিনি ছটফট

করতে থাকেন। শুধু সেই একটা কলিই—ঝরনার ধারে দেখে এলাম তারে—ফিরে ফিরে গাইতে লাগলেন।

এইভাবে আর কতক্ষণ অসহায়ভাবে কাটাতে পারা যায়। অসমাপ্ত কবিতাটা বুকের মধ্যে আঁকুপাকু করতে থাকে কিন্তু মুখের ভাষায় সে মূর্ত হতে পারে না।

অবশেষে সে কবি আবু নবাসকে ডেকে পাঠায়।

—দেখ তো কবি, আমি একটা গানের কলি বানিয়েছি: ঝরনার ধারে দেখে এলাম তারে—। কিন্তু পরের ছত্র মনে আসছে তবে মুখে আসছে না। তুমি মিলিয়ে দাও তো—

আবু নবাস বলে, যো হুকুম, জাঁহাপনা।

খলিফাকে অবাক করে দিয়ে সে তৎক্ষণাৎ পুরো গানটি বানিয়ে দিল:

ঝরনার ধারে, দেখে এলাম তাবে,
এখনও তার রূপের ছবি চক্ষে আমাব ভাসে।
তার বুকের পাহাড়ে, পিছলে পড়ি আছড়ে,
ক্ষতি কিবা তার, মৃত্যুই যদি আসে।

খলিফা হতবাক হয়ে ভাবেন, যে কথাগুলো এতক্ষণ ধরে অনেক চেষ্টা করেও তিনি ভাষায় রূপ দিতে পারলেন না আবু নবাস মুহূর্তের মধ্যে কী করে তাকে সহজে সুন্দর করে প্রকাশ করে দিল। ঠিক ঠিক এই কথাগুলোই তো উনি বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারেননি কিন্তু আবু নবাস কত সহজে পারলো! নিশ্চয়ই সে এক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী!

কবিকে প্রচুর ইনাম দিয়ে খুশি করলেন খলিফা।

শাহরাজাদ বললো, এবারে আবু নবাসের কবি প্রতিভার দু-একটা নমুনা শোনাচ্ছি জাঁহাপনা।

এক নিদ্রাবিহীন রাতে খলিফা হারুন অল-রসিদ প্রাসাদের দরজায় অস্থিরভাবে পায়চারী করছিলেন। এমন সময় দেখতে পেলেন, তাঁর এক প্রিয়পাত্রী বাঁদী তার বিলাস গৃহের দিকে চলেছে। খলিফা তাকে অনুসরণ করতে করতে তার ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। খলিফা তাকে জাপটে ধরে বোরখা আর নকাব খুলে ফেলার জন্য জবরদস্তি করতে লাগলেন। বাঁদীর সঙ্গে সুখসম্ভোগ করার জন্য তার সমস্ত সত্ত্বা চঞ্চল হয়ে উঠলো। কিন্তু বাঁদীটি করুণ ভাবে প্রার্থনা জানাতে লাগলো। আজকের রাতটা আমাকে ক্ষমা করুন। জাঁহাপনা। আজ আমার শরীর খারাপ, আমি কথা দিচ্ছি, কাল রাতে আমি আপনার কামনা-চরিতার্থ করে দেব। আজ আমার শরীরটা ঠিক নাই, আজকের রাতটায় আমাকে রেহাই দিন। খোদা মেহেরবান, কাল রাতে সুগন্ধী আতর মেখে মোহিনীরূপ ধরে আমি আপনার সামনে হাজির হবো।

সুতরাং খলিফা আর কোনও জোরজার করলেন না। ফিরে এসে আবার পায়চারী করতে থাকলেন।

পরদিন তিনি খোজা-সর্দার মাসরুরকে পাঠালেন সেই বাঁদীর কাছে। বললো, খলিফা আপনার কাছে পাঠালেন আমাকে। কাল রাতে তার সঙ্গে আপনার যে-কথা হয়েছিল তা কি আপনার স্মরণে আছে?

সেদিনও বাঁদীর দেহ-মন ভালো ছিল না। সকাল থেকেই শরীরটা জুৎসই মনে হচ্ছিল না। মাসরুরকে সে বললো, খলিফাকে গিয়ে বল, নিভৃত রাতের সব কথাই লুকিয়ে থাকে দিনের আলোর গভীরে—

মাসরুর এসে যখন বাঁদীর এই জবাব খলিফাকে শোনালো সেই সময় কবি আবু নবাস, অল রাক্কাসী এবং আবু মুসাব তার সমীপে এসে হাজির হলো। খলিফা তাদের বললেন, 'নিভৃত রাতের সব কথাই লুকিয়ে থাকে দিনের আলোর গভীরে' এই কথাকে কেন্দ্র করে তোমরা সবাই এক একটা কবিতা বানাও, দেখি।

প্রথমে অল রাক্কাসী একটানা বলে গেল:

ওরে আমার অশান্ত অবুঝ হৃদয়—সাবধান,
যেওনা যেওনা সেখানে, এলেও তাকে দিও না ঠাঁই
কথা তার মিষ্টি মধুর, কিন্তু কেমন বেয়াড়া
তার দুর্বোধ্য হাসির তুলনা বুঝি নাই
তাইতো সে বলতে পারে হেঁয়ালী ক'রে
'নিভৃত রাতের সব কথাই লুকিয়ে থাকে
দিনের আলোর গভীরে।'

এরপর আবু মুসাব এগিয়ে এসে শুরু করে:

হাতের পুতুল হয় এ হৃদয় আমার,
পুড়ে পুড়ে ছারখার হয়ে যেতে চায়।
মোহময় রাতের আঁধারে,
ইশারায় ডাকে বারে বারে;
ছিনিমিনি খেলা ক'রে কী সাধ মেটায়?
সে আমায় বিদ্ধ করে রাখে শুধু
দুর্বোধ্য ভাষার তীরে:
'নিভৃত রাতের সব কথাই লুকিয়ে থাকে
দিনের আলোর গভীরে।'

সব শেষে আবু নবাস বলতে শুরু করে:

দুঃসহ সুন্দরী—আনন্দের ঝরনা,
অনিন্দ্য মধুর ভাষিণী—কী দেব বর্ণনা!
ঘন তন্দ্রাবৃত মধ্যরাতের তারা,
একমাত্র সাক্ষী ছিল যারা,

তারা তো সবাই জানে,
কী তার মানে?
আর জানে সেই তরুবর,
মৃদুমন্দ সমীরণে তার শাখার মর্মর্
বারবার ধ্বনিত হয়েছিল আমার বুকে।
তোমার কথার কুহকে
ভুলালে আমায়।
দুঃখের বেদনা চেপে ফিরে আসি আশায় আশায়
ফিরে রাতে ফিরে পাব বলে।
কিন্তু হায় এ রাত্রিও গেল বুঝি চলে।
তোমার শব্দের ইন্দ্র জাল আমাকে রয়েছে ঘিরে,
'নিভৃত রাতের সব কথাই লুকিয়ে থাকে
দিনের আলোর গভীরে।'

কবিতাগুলো শোনার পর খলিফা খুশি হয়ে প্রথম দুজন কবিকে অনেক টাকা পুরস্কার দিলেন। কিন্তু কবি নবাস-এর ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন।

—নবাস আমি তোমার গর্দান নেব।

নবাস বিচলিত হয় না, আমার কী অপরাধ, জাঁহাপনা?

—তোমার কবিতায় যা বর্ণনা করলে তা শুনে আমি নিঃসন্দেহ যে, ঐ বাঁদীটার সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমার কোনও গোপন সম্পর্ক আছে! কারণ সে সব ব্যাপার একমাত্র আমি আর সেই বাঁদী ছাড়া তৃতীয় কোনও প্রাণীর জানার কথা নয়। নিশ্চয়ই তুমি তার কাছ থেকে সব শুনেছ।

খলিফার কথা শুনে আবু নবাস হো হো করে হেসে ওঠে, আমাদের মহানুভব সুলতান জানেন না, সত্যিকার শিল্পীর কাছে কোনও সত্যই গোপন করা যায় না। সে তার অন্তর দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত গোপন রহস্য জেনে নিতে পারে। কবিদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমাদের পয়গম্বর বলেছেন, কবিরা পাগলের মতো উদ্দাম অসংলগ্ন হয়, প্রেরণাই তাদের পরিচালনা করে ভালোর দিকে অথবা খারাপ পথে। তারা অনেক সুন্দর সুন্দর নীতি কথা উপহার দেয় আমাদের। কিন্তু নিজেরা তা মেনে চলে না।

আবু নবাসের এই সব যুক্তি-তর্কে খলিফা ক্ষান্ত হন। খুশিও হন। অন্য দুজনকে যে ইনাম দিয়েছিলেন তার দ্বিগুণ দিলেন তাকে।

এই কাহিনী শোনার পর সুলতান শাহরিয়ার বললো, খোদা হাফেজ, আমি হলে কিন্তু আবু নবাসকে রেহাই দিতাম না। আসল রহস্য টেনে বের করতাম। তারপর তার গর্দান নিতাম। আমার এখনও ধারণা, বাঁদীটার সঙ্গে তার গুপ্ত প্রেম ছিল। এবং তার কাছ থেকে জেনেই সে ঐ কবিতা বানিয়েছিল। আমি বিশ্বাস করি না, কবি হলেই তারা গোপন যা কিছু সবই জানতে পারে। শাহরাজাদ, তুমি ভবিষ্যতে ঐ লম্পট কবিটাকে নিয়ে আর কোনও কিসসা শোনাবে না আমাকে। লোকটা ইসলাম, কানুন বা খলিফা কারুর উপরই শ্রদ্ধাবান নয়।

শাহরাজাদ বলে, তাই হবে জাঁহাপনা, আবু নবাসের আর কোনও কাহিনী আপনাকে শোনাবো না। আচ্ছা, এবারে একটা গাধার গল্প বলছি, শুনুন :

একদিন এক দিল খোলা আমুদে লোক একটা রশিতে বেঁধে একটা গাধাকে টানতে টানতে বাজারের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তাই দেখে, একটা সেয়ানা চোর গাধাটাকে চুরি করার মতলব ভাঁজতে লাগলো। চোরটা তার সাগরেদকে বললো, গাধাটাকে হাওয়া করতে হবে। কিন্তু খুব সাবধান, লোকটা যেন জানতে না পারে। কী করে করা যায় বল তো?

সঙ্গীটা বলে, কিসসু ভেবো না ওস্তাদ, তুমি আমার পিছনে পিছনে এস। দেখ, আমার কীরকম হাত সাফাই।

এমন সময় রাত্রির আঁধার কাটতে থাকে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো আশিতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে :

সাগরেদটা অতি সন্তর্পণে গাধা-মালিকের পিছনে পিছনে চলতে থাকে। দাঁও বুঝে এক সময় সে গাধার গলা থেকে দড়ির ফাঁসটা খুলে নিজের গলায় পরে নেয়। এই ফাঁকে ওস্তাদ গাধাটাকে নিয়ে উধাও হয়ে যায়। লোকটা গাধার গলার দড়ি নিজের গলায় পরে এমন ল্যাকপ্যাক করে চলতে থাকে যে লোকটার বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগে না। সে ভাবে, গাধাটা কুড়ের বাদশা। গতরটাকে একেবারে চালাতে চায় না।

কিছুক্ষণ পরে সাগরেদটা যখন দেখল তার ওস্তাদ গাধাটাকে নিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেছে, তখন সে হঠাৎ অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো মাঝ রাস্তায়। গাধার মালিক তখনও দড়ি ধরে টান দিতে থাকে আর ভাবে গাধাটা কী ঘ্যাঁচড়া। কিন্তু একপাও যখন তাকে নড়াতে পারে না তখন সে রাগে জ্বলে ওঠে, পিছন ফিরে তাকায়। মুহূর্তের মধ্যে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়, একী? গাধা—তার গা-ধা—, এ যে জলজ্যান্ত একটা মানুষ! নিজের চোখকেই সে বিশ্বাস করতে পারে না। সে কী ভুল দেখছে না কী? কিন্তু না, ভুল হবে কী করে? পথ-চলতি আর পাঁচটা মানুষের মতো এ-ও তো দেখছি একটা মানুষ। তা হলে তার গাধা—গাধা কোথায় গেল? বোকার মতো সে প্রশ্ন করে, তুমি কী?

—আমি আপনার গাধা, মালিক। কেন আমাকে চিনতে পারছেন না?

চোরের সাগরেদটা খুব ধীর শান্তভাবে কথাগুলো বলে।

এবার গাধার মালিক ভড়কে যায়, গাধা আবার কথা বলে নাকি?

লোকটা বলে, আমি কিন্তু জন্মাবধি গাধা নই, মালিক। আমি মানুষেরই বাচ্চা। কিন্তু আমার কর্মদোষে আজ আমি অভিশপ্ত—তাই গাধা হয়েছি।

'মালিক অবাক হয়, সে কেমন?

—আমি ছোটবেলায় বড় দুরন্ত, বেয়াড়া ছিলাম। এই নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই মা-এর সঙ্গে আবার ঝগড়া লাগতো। আমি পাড়াপড়শীর বাড়ি ঘর গাছপালা তছনছ করে ফেলতাম। তাদের ছেলেমেয়েদের বিনা কারণে মারধোর করতাম। সেই জন্যে মা আমার ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে একদিন আমাকে অভিশাপ দিয়ে গাধা বানিয়ে ফেললো। সেই থেকে আমার এই হাল। আমি মনের দুঃখে ঘর ছেড়ে চলে গেলাম। কিন্তু রেহাই পেলাম না। একটা লোক আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বাজারে বিক্রি করে দিল। এবং সেখান থেকে কিনে আনলেন আপনি। সেই থেকে আমি আমার সাধ্যাতীত মোট বয়ে চলেছি আপনার। যখন একান্তই বইতে পারিনি, হয়তো বা একটুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে জিরিয়ে নিতে চেয়েছি। কিন্তু আপনি আমাকে দাঁড়াতে দেন নি, পেটের মধ্যে খোঁচা মেরে আমাকে তখুনি চলতে বাধ্য করেছেন। এতকাল আমার মুখে কোনও ভাষা ছিল না। তাই শত চেষ্টা করেও আপনাকে আমার মনের কথা জানাতে পারি নি। আজ আমার মুখে কথা ফুটেছে। আপনার কাছে আমার আর্জি, আমাকে মেহেরবানী করে খালাস করে দিন। আমি আমার মা-এর কাছে ফিরে যাই। তিনি আমাকে অভিশাপ থেকে মুক্তি দিলে আবার আমি পুরোপুরি আগের মতো মানুষ হতে পারবো।

লোকটার সথা শুনে গাধার মালিক হা হুতাশ করতে লাগলো, হায় হায় এ আমি কী পাপ করেছি। না জেনে তোমাকে কত কষ্টই না দিয়েছি। দোহাই আল্লাহ, তুমি আমার অপরাধ নিও না। আমার অনুতাপের শেষ নাই। ছিঃ ছিঃ, এ আমি কী করেছি। আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। আজই তোমার মা-এর কাছে ফিরে যাও তুমি। জানি না, আল্লাহ আমার এ গুস্তাকী মাফ করবেন কিনা।

আর তিল মাত্র দেরি না করে গাধার মালিক তার গলার দড়ি খুলে দিল। অনুতাপে দগ্ধ হতে হতে সে বাড়ি ফিরে বিছানায় ঢলে পড়ল।

দিন কয়েক পরে গাধার মালিক বাজারে এল অন্য একটা গাধা কেনার জন্য। হঠাৎ তার নজর পড়লো একটা গাধার ওপর। আরে! এ যে তারই সেই আগের গাধাটা! বিক্রির জন্যে বাজারে তোলা হয়েছে! কী ব্যাপার, কিছু ঠাওর করতে পারে না সে। মনে মনে ভাবে হয়তো, এই পাজী বদমাইশটা আবার তার মাকে জ্বালিয়েছে। তাই আবার তাকে গাধা করে বাজারে বেচে দিয়ে গেছে। যাই হোক, এই নচ্ছারটাকে আর সে বাড়ি নিয়ে যাবে না।

রাগে গাধাটার মুখের ওপর থু থু করে থুথু ছিটিয়ে দিয়ে সে অন্য একটা গাধার দিকে চলে গেল। সারা বাজার ঘুরে ঘুরে সে অন্য একটা গাধা কিনে নিল। লোকটা বুঝতেও পারলো না, হাড়ে হাড়ে বজ্জাত, খল সেই গাধাটার জুড়ি সারা বাজারে পাওয়া যাবে না।

সেই রাতে শাহরাজাদ আরও একটা গল্প শোনালো সুলতান শাহরিয়ারকে—জুবেদার গল্প:

❦ ❦ ❦ ❦

খলিফা হারুন অল রসিদ একদিন খাড়া দুপুর বেলা বেগম জুবেদার শোবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ইচ্ছা ছিল, একটু বিশ্রাম করবেন। কিন্তু বিছানায় গিয়ে বসতেই তার নজরে এল, চাদরের ঠিক মাঝখানে একটা তাজা ঘোলাটে দাগ। খলিফার মুখ কালো হয়ে গেল। চোখে অন্ধকার দেখলেন তিনি। একি দৃশ্য! রাগে সারা শরীর রিরি করে উঠলো; গর্জে উঠলেন তিনি, এসব কী, জুবেদা? বিছানায় দাগ কেন?

জুবেদাও অবাক। ভালো করে পরীক্ষা করতে লাগলো। মাথাটা নামিয়ে বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে আঘ্রাণ করে বোঝার চেষ্টা করলো।

—এ তো, মনে হচ্ছে পুরুষের বীর্য, ধর্মাবতার।

কী এক অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠেন খলিফা।—কী তাজ্জব ব্যাপার! পুরুষের তাজা বীর্য—এই দিনে দুপুরে তোমার বিছানায় কীভাবে আসতে পারে? আমি তো তোমার ঘরে আজ এক সপ্তাহ পরে এলাম! তোমার সঙ্গে এ শয্যায় আমি অনেকদিন শুইনি। তবে?

জুবেদা আহত কণ্ঠে বলে, আপনি কী আমাকে সন্দেহ করছেন, জাঁহাপনা? আপনার অবিশ্বাসের কাজ কী আমি কখনও করেছি? না, করতে পারি? আপনি কী মনে করছেন, আমি পরপুরুষের অঙ্কশায়িণী হয়েছিলাম?

—আমার তো তাই মনে হচ্ছে।

খলিফা উত্তেজিত ভাবে বলতে থাকেন, আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। এখুনি কাজীকে তলব পাঠাচ্ছি। কাজী আবু ইউসুফ বিচক্ষণ বিচারক, এ ব্যাপারে তার কী মত, আমার জানা দরকার। আমার পূর্ব পুরুষদের মর্যাদা রক্ষার জন্য, শোনও আমার চাচার মেয়ে—আমার বেগম, কাজীসাহেব যদি তার রায়ে বলেন তুমি দোষী, আমি তোমাকে উপযুক্ত সাজা দিতে দ্বিধা করবো না।

কাজী এল। খলিফা হারুন অল রসিদ তাকে বললো, এই দেখুন কাজীসাহেব, আমাদের বিছানায় এই তাজা দাগটা পরীক্ষা করুন। আপনার কী মনে হয়, আমাকে বলুন।

কাজী বিছানায় উঠে এল। দাগটার মাঝখানে তর্জনী রাখলো। তারপর আঙুলটা চোখের সামনে তুলে ধরে ভালো করে নিরীক্ষণ করলো। নাকের কাছে ধরে আঘ্রাণ নিল। তারপর সাফ জানিয়ে দিল, ধর্মাবতার, এ মানুষের বীর্য।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো একাশি তম রজনী:

আবার গল্প শুরু হয়। শাহরাজাদ বলতে থাকে।

কাজী আরও বলে এবং সদ্য নির্গত—একেবারে তাজা।

খলিফা ছটফট করে উঠলেন। কিন্তু তা কী করে সম্ভব, কাজী-সাহেব? সাতদিন পরে আমি বেগমের ঘরে আজ এসেছি। বিছানায় বসার আগেই আমার নজরে পড়েছে এ জিনিস।

কাজী মুহূর্তে সব ব্যাপারটা আচ করতে পারলো। বেগম জুবেদা তার ওপর খড়্গ-হস্ত হবেন সন্দেহ নাই। তাঁর বিরাগভাজন হওয়ার পরিণাম যে শুভ হতে পারে না তা সে তৎক্ষণাৎ অনুধাবন করতে পারলো। ওপরের দিকে চেয়ে দেখতে থাকলো সে। মনে হতে পারে, সে এই ব্যাপারটা আরও ক্ষতিয়ে তলিয়ে চিন্তা করছে।

হঠাৎ তার নজরে পড়লো, ছাদ ঘেঁসে দেওয়ালের মাথায় একটা ফোকর। আর সেই ফোকরে একটা বাদুড়—ডানা মেলে ঝুলছে। আবু ইউসুফের মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

—আমাকে একখানা তরোয়াল দিতে পারেন?

খলিফার দিকে চেয়ে কাজী ইউসুফ বললো। খলিফার নির্দেশে তৎক্ষণাৎ একখানা তরোয়াল এনে দেওয়া হলো তার হাতে। কাজী বিছানার ওপর দাঁড়িয়ে তরোয়ালখানা দিয়ে বাদুড়টাকে মারলো এক কোপ। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বাদুড়টা ছিটকে পড়লো মেজেয়। তলোয়ারের আঘাতে সে ঘায়েল হয়েছে। ওঠবার আর শক্তি নাই। কাজী বললো, এই যে বাদুড়টা দেখছেন জাঁহাপনা, এদের বীর্য আর মানুষের বীর্য দেখতে অবিকল একরকম। কোনও ফারাক বুঝতে পারবেন না। আমাদের হেকিমী শাস্ত্রে সেই কথাই সবিস্তারে লেখা আছে। আমার ধারনা বেগম জুবেদা যখন ঘুমিয়েছিলেন তখন এই বাদুড়টা বেগম সাহেবার উপর উপগত হয়েছিল। এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফল এই বীর্যপাত। তার এই অপকর্মের জন্য আমি তাকে নিজে হত্যা করে সাজা দিলাম।

এতক্ষণে খলিফা ধাতস্থ হলেন। বুঝতে পারলেন, তার বেগম জুবেদা নিতান্তই নির্দোষী। তার অজ্ঞাতসারে যা ঘটে গেছে তার জন্য তাকে দোষী করা যায় না।

শুধু হারুন অল রসিদ নয়, জুবেদার মুখের কালো মেঘ কেটে গিয়ে খুশির বন্যা ছড়িয়ে পড়লো সারা দেহ মনে। খলিফা নানা মূল্যবান উপহার সামগ্রী এবং অনেক নগদ মোহর ইনাম দিলেন তাকে। বেগম জুবেদাও দিল মূল্যবান রত্নাভরণ। এবং বললো, আসুন কাজীসাহেব, আজ আপনি আমাদের সঙ্গে খানা করবেন।

মেজেয় পাতা পারস্য গালিচার ওপর খলিফা আর বেগমের মাঝখানে বসে পরিতৃপ্তি করে খানাপিনা করলো কাজী আবু ইউসুফ। বেগম জুবেদা নিজে হাতে বড় বড় পাকা মর্তমান কলা তুলে দিল কাজীর হাতে, আমার নিজের বাগানের ফল, এ সময়ে এ ফল আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমার বাগানে ফলিয়েছি, খান। কলা খেতে আপত্তি নাই তো কাজী সাহেব?

কাজী ইউসুফ বললো, না আপত্তি কেন? আপনি লক্ষ্য করবেন, বিচারের রায় মনের মধ্যে এইরকম পরিপুষ্ট হয়ে না থাকলে আমি প্রকাশ করি না। এই কলা আপনার অকালের ফল। কিন্তু বেশ পুষ্ট, পাকা।

বেগম জ্বেদা তার বাগানের আরও কিছু সুমিষ্ট ফল এনে রাখলো কাজীর সামনে। এক এক করে কাজী সবই উদরস্থ করলো। জুবেদা জিজ্ঞেস করে, সবচেয়ে কোন্‌টা ভালো লাগলো—আপনার রায় শুনতে চাই।

কাজী মৌন হয়ে চিন্তা করলো ক্ষণকাল। তারপর বললো, দেখুন বেগম সাহেবা, সবগুলোই আমি বেশ তৃপ্তি করে খেয়েছি। এখন আপনি জানতে চাইছেন, কোন ফলটা সেরা। এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে শক্ত। তার কারণ ওরা এখন সবাই আমার উদরে। একেকে ছেড়ে অন্যকে বেশি প্রশংসা করলে বাকীরা আমার পেটে বিদ্রোহ করবে। আমার বদ হজম হোক এটা নিশ্চয়ই চান না।

জুবেদা এবং হারুন অল রসিদ সশব্দে হো হো করে হেসে ওঠেন।

সুলতান শাহরিয়ার, শাহরাজাদের এই কাহিনী থেকে একটা কথাই বুঝলো, স্বয়ং খলিফা হারুন অল রসিদ তার বেগমকে কিছুক্ষণের জন্যও দোষী সাব্যস্ত করে খুব সঙ্গত কাজ করেন নি।

শাহরাজাদ সুলতানের এই মানসিক প্রতিক্রিয়া আঁচ করতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা গল্পের মধ্যে ডুবিয়ে দেবার জন্য নতুন এক কাহিনী ফেঁদে বসলো।

শাহরাজাদ বলে, এবার পুরুষ না নারী সেই কাহিনী শুনুন, জাঁহাপনা।

শোনা যায়, পারস্যের মহান সুলতান খুসরাও মাছ খেতে খুব ভালো বাসতেন। একদিন তিনি তার পরমা সুন্দরী বেগমকে নিয়ে ছাদের ওপরে বসেছিলেন। এমন সময় এক জেলে কিছু মাছ নিয়ে সেখানে হাজির হলো। তার ডালা থেকে একটা বিরাট বড় মাছ বের করে সে সুলতানের সামনে তুলে ধরলো। সুলতান তো দেখে মহা খুশি। জেলেকে চার হাজার দিরহাম ইনাম দেবার হুকুম দিলেন তিনি। কিন্তু সুলতানের এই বদান্যতা বেগম সাহেবা সিরিনের মোটেই পছন্দ হলো না। লোকটা চলে গেলে সে সুলতানকে বললো, সামান্য একটা মাছের জন্য এত ইনাম দেবার কী প্রয়োজন? এটা নেহাতই খামখেয়ালী বাজে খরচা। তুমি ওকে অত টাকা দিও না। এর ফলে হবে কি, যখনই কোনও লোক কোনও কিছু নিয়ে আসবে সেও এই রকমই আশা করবে। কিন্তু সবাইকে যদি তুমি এইভাবে খয়রাতি কর, তাহলে লাটে উঠতে হবে যে!

সুলতান বললো, কিন্তু আমি একবার যা দান করেছি তা ফেরত নেওয়া কী সম্ভব? এতে আমার ইজ্জত থাকবে? যা হবার হয়ে গেছে, ছেড়ে দাও।

সিরিন অবাক হয়, তুমি কী বলছো! ব্যাপারটা কী ছেলে খেলা? ছেড়ে দেব বললেই ছেড়ে দেওয়া চলে? তার চেয়ে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে আমি সে ব্যবস্থাই করছি। তুমি ডাকো তাকে?

সুলতান কিছুতেই বুঝতে পারেন না বেগম সাহেবা কীভাবে দুকুল রক্ষা করতে পারবে? জেলের কাছ থেকে টাকাটাও ফেরৎ নেবে অথচ তার ইজ্জত বাঁচবে—তা কী করে সম্ভব?

সিরিন বলে আমি একটা ফন্দী এঁটেছি। জেলেটাকে ডেকে তুমি জিজ্ঞেস কর, মাছটা পুরুষ না মেয়ে। লোকটা একটা কিছু জবাব দেবে। যদি সে বলে, পুরুষ, সঙ্গে সঙ্গে বলবে, না না, পুরুষ মাছ আমি খাই না, তুমি নিয়ে যাও আমি মেয়ে মাছ ছাড়া খাই না। আর যদি বলে মেয়ে, তুমি বলবে তোমার পুরুষ মাছের দরকার। ব্যাস অতি সহজ ভাবেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে।

সুলতানের বিবি অন্ত প্রাণ। তাকে তিনি কিছুতেই অখুশি রাখতে পারেন না। ব্যথিত মনেই তিনি জেলেকে ডেকে পাঠালেন।

—ওহে, মাছটা তো দিয়ে যাচ্ছো, তা—মাছটা কী? পুরুষ না মেয়ে?

সুলতানের কথায় জেলে প্রথমে ঘাবড়ে যায়। কী জবাব দেবে ভেবে পায় না। একটুক্ষণ চিন্তা করে সে বলে, জাঁহাপনা এ মাছ পুরুষও না মেয়েও না, একে বলে ক্লীব।

জেলের কথা শুনে সুলতান তো মহা খুশি। ছেলেও না মেয়েও না—ক্লীব। এমন আজব বস্তু তো বড় একটা দেখা যায় না। সে তক্ষৎণাৎ হুকুম দিল জেলেকে চার হাজারের বদলে আট হাজার দিরহাম ইনাম দিয়ে দাও। জেলেটা তো আনন্দে গদগদ হয়ে গুণে গুণে আট হাজার দিরহাম থলেয় ভরে বাড়ির পথে হাঁটা দিল।

তখনও সে প্রাসাদ প্রাঙ্গণ পার হতে পারেনি, হঠাৎ তার থলেটার মুখের বাঁধন খুলে গিয়ে সমস্ত দিরহামগুলো আঙ্গিনায় ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়লো। মাথার ডালাটা মাটিতে নামিয়ে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে একটা একটা করে দিরহামগুলো কুড়িয়ে গুণে গুণে আবার থলেয় ভরতে থাকলো। যতক্ষণ না শেষ দিরহামটাও সে খুঁজে পেল ততক্ষণ চললো তার সেই একান্ত অনুসন্ধান।

ছাতের ওপর বসে বসে সুলতান খুসবাও এবং বেগম সিরিন এই দৃশ্য দেখে মজা পেল অনেক।

এই সময় রাত্রির অন্ধকার কাটতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো বিরাশীতম রজনীতে আবার সে শুরু করে:

সিরিন বলে, দেখ লোকটা কী লোভী, একটা মাত্র দিরহাম সে খুঁজে পাওয়ার জন্য কী পরিশ্রম না করলো। অথচ এই টাকাগুলো তার আদৌ হকের ধন নয়। তুমি দয়া করে দিয়েছ তাই সে পেয়েছে।

সুলতান বললো, ঠিক—ঠিক বলেছ বেগম সাহেবা, লোকটা একেবারে কঞ্জুস। দাঁড়াও ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

সুলতানের হুকুমে তখনি জেলেটাকে হাজির করা হলো। সুলতান বললো, তুমি তো লোকটা বড় কৃপণ হে। এমন চিঁড়িয়ার মতো দিল কেন

তোমার? একটামাত্র দিরহাম তুমি খুঁজে পাচ্ছিলে না। তাতে এমন ভাব দেখাচ্ছিলে যেন, তোমার বিশাল সলতানিয়ৎ দরিয়ায় ডুবে যাচ্ছিল। আমার সন্দেহ হচ্ছে, কলিজাটা মানুষের না। যে দিরহামটা খোঁজার জন্য এত কসরৎ করলে, যদি সেটা খুঁজে নাই-ই পাওয়া যেত কী এমন যেত আসতো তোমার? তোমার আশার অনেক বেশি তো তুমি আজ পেয়েছ। তার থেকে দু-চারটে যদি হারিয়েই যায়, ক্ষতি কতটুক? তোমার থলে থেকে যেটা পড়ে গিয়েছিল সেটা হয়তো কোনও গরীবগুর্বো মানুষ কুড়িয়ে পেত। তার অনেক কাজে আসতো। কিন্তু তুমি বড় অর্থ গৃধ্নু। একটা দিরহামের মায়া তুমি কাটাতে পারো না?

আভূমি আনত হয়ে জেলেটা কুর্নিশ জানায়, খোদা সুলতানকে শতায়ু করুন, দিরহামটা খুঁজে না পেলে যে আমার একটা বিরাট লোকসান হয়ে যেত সে কথা ঠিক নয়, জাঁহাপনা। সামান্য একটা দিরহামের কী মূল্য আমিও জানি। তার জন্য অত সময় এবং অত ধৈর্য ব্যয় করা সঙ্গত না তাও মানি। আমি কিন্তু ঐ দিরহামটাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য ঐরকম আকুল হইনি। আমি উদভ্রান্ত হয়েছিলাম অন্য কারণে। আমার রোজগারের পয়সা হলে একটা কেন পাঁচটা দিরহাম আমি ভিখিরিকে দান করেও দিতে পারতাম। কিন্তু এ অর্থ আমার সুলতানের কাছ থেকে পাওয়া ইনাম। এর মূল্য কোনও টাকাপয়সা দিয়ে বিচার করা যাবে না হুজুর। এ আমার কাছে অমূল্য সম্পদ। এর প্রতিটি দিরহাম আমার কাছে লক্ষ মোহরের চাইতেও বেশি।

জেলের এই স্তুতি বাক্য শুনে সুলতান গলে জল হয়ে গেল। গর্বে তার বুক দশ হাত ফুলে উঠলো। না লোকটা সত্যিই বোদ্ধা। দানের মর্যাদা সে বোঝে। সুলতান হুকুম করলো জেলেকে আরও চার হাজার দিরহাম ইনাম দিয়ে দাও। আর সারা সলতানিয়াতের প্রজাদের ঢ্যাঁড়া পিটে জানিয়ে দাও: মেয়েমানুষের পরামর্শে যেন পুরুষ কোনও কাজ না করে। তাদের কথায় চললে, সাধারণ ভাবে যা লেকসান হওয়ার কথা তার চর্তগুণ লোকসান বাড়বে।

এই কাহিনী শুনে সুলতান শাহরিয়ার সুলতান খুসরাও-এর প্রসংশায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে, সুলতান খুসরাও-এর ফরমান অক্ষরে অক্ষরে ঠিক। মেয়েরাই যত নষ্টের গোড়া। তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে সংসারের।

সুলতানের কথা শুনে শাহরাজাদ স্মিত হেসে আর একটা গল্প শুরু করে:

একদিন রাতে খলিফার চোখে আর কিছুতেই ঘুম আসছিল না। উজির জাফরকে ডেকে খলিফা তার অনিদ্রার দুঃখ জানাচ্ছিলেন এমন সময় দেহরক্ষী মাসরুর উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলো। তার উচ্চকিত হাসির শব্দে খলিফা বিরক্ত হয়ে ভ্রূ কুঁচকে মাসরুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, এতে হাসির কী হলো? তোমার কী মাথার কিছু বিকৃতি ঘটেছে? তা না হলে

এইরকম বেয়াদপের মতো হেসে ওঠার মানে কী?

হারুন অল রসিদের এই ধমকে মাসরুর লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করে।

—আমার গুস্তাকী মাফ করবেন, জাঁহাপনা। আমি আপনার কোনও কথা শুনে হাসি নি। আপনাকে অবজ্ঞা করার স্পর্ধা আমার কী করে হতে পারে? আমি হাসলাম একটা হাসির কথা মনে পড়ে গেল বলে।

—কী কথা?

গতকাল টাইগ্রীসের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে একদল লোক ইবন অল কবিবী নামে ভাড়কে ঘিরে তার কিসসা শুনতে শুনতে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল। আমিও শুনেছিলাম তার রসের গল্প। সেই কথা মনে হতে হাসি আর চাপতে পারলাম না, জাঁহাপনা।

খলিফা বললেন, তাই নাকি! তা হলে তো শুনতে হয় তার রসাল কিসসা। বেশ, তলব করে নিয়ে এস তাকে। দেখা যাক, তার হাসি মস্করার গল্প শুনে মেজাজটা হাল্কা হয় কিনা। তা হলে হয়তো ঘুমও আসতে পারে।

তক্ষুণি মাসরুর ছুটে গেল সেই ভাঁড় ইবন কবিবীর সন্ধানে। খুঁজে পেতে তাকে ধরে নিয়ে এল খলিফার প্রাসাদে। খলিফার সামনে হাজির করার আগে মাসরুর তাকে কড়ার করতে বললো, দেখ ভাঁড়, আমার জন্যেই তুমি আজ খলিফার সামনে দাঁড়াতে পারছো। তা শোন, তোমার কিসসা শুনে খলিফা খুশি হয়ে যা বকশিস করবেন তার তিনভাগ আমাকে দেবে আর এক ভাগ নেবে তুমি।

লোকটা চোখ কপালে তুললো, তুমিই তিন ভাগ নিয়ে নেবে? আমার একটা কথা রাখ। যা পাবো তার দু ভাগ তোমাকে দেব, আমি নেব এক ভাগ। মাসরুর আরও কিছু দর কষাকষি করতে চেয়েছিল, কিন্তু দেরি হয়ে যাবার আশঙ্কায় সে বললো, ঠিক আছে, চল।

ভাঁড়টাকে দেখে খলিফা তাকে উদ্দেশ করে বললেন, তুমি নাকি খুব লোক হাসাতে পার? তা আমাকে দু-একটা শোনাও দেখি তোমার চুটকী। কিন্তু একটা কথা, তোমার চুটকী শুনে যদি আমার মজা না লাগে, হাসি না পায় তবে চাবুকের ঘা খেতে হবে, মনে থাকে যেন?

খলিফার সামনে এমনিতেই দাঁড়াতে তার হাত-পা কাঁপছিল, এখন এই চাবুকের ভয়ে হাসি তামাশা বেমালুম সব তার মগজ থেকে উবে গেল। অনেক চেষ্টা করেও একটা চুটকী সে মনে করতে পারলো না। যতই সে ভাবতে চেষ্টা করে ততই সব গুলিয়ে যেতে থাকে। ঘামে সারা শরীর নেয়ে যায়। হাত-পা সিটকে ধরে। মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না—তো তো করতে থাকে।

খলিফা ধমক দেয়, থামো, আর ন্যাকামী করতে হবে না। এই কে আছিস, একশো ঘা চাবুক লাগাও। যদি বা চাবুকের চোটে বাছাধনের মগজ খোলসা হয়।

সঙ্গে সঙ্গে ঘাতক এসে লোকটাকে মাটিতে ফেলে চাবুকের ঘা বসাতে থাকে। ভাড়টা মুখ বুজে নিরবে সহ্য করে এই সাজা প্রতিটি চাবুকের ঘা গুণতে থাকে সে। এক-দুই-তিন...এইভাবে তিরিশ ঘা পর্যন্ত সে

একটিও শব্দ উচ্চারণ করে না। কিন্তু তার পরেই সে তড়াক করে উঠে বসে, এর পরের চাবুকগুলো মাসরুরকে মারার হুকুম দিন জাঁহাপনা।

খলিফা অবাক হন, কেন? মাসরুরকে কেন?

ভাঁড় বলে, এখানে আসার আগে মাসরুর আমাকে কড়ার করিয়ে নিয়েছে, আপনার কাছ থেকে যা পাবো তার দুভাগ সেই নেবে; আমি পাবো একভাগ মাত্র।

খলিফা গর্জে উঠলেন, কোথায় মাসরুর, ধরে নিয়ে এস তাকে। লাগাও চাবুক। প্রহরীরা বেঁধে নিয়ে এসে হাজির করে মাসরুরকে। সপাং সপাং করে চাবুকের ঘা পড়তে থাকে তার পিঠে। কয়েক ঘা মাত্র মারা হয়েছে হঠাৎ খোজা-সর্দার হা হাঁ করে ওঠে, থামো থামো। আর ওকে নয়। বাকীটা আমার পিঠে মারো।

এই সব কান্ড দেখে খলিফা হেসে গড়িয়ে পড়েন। হাসতে হাসতে তার দেহ মনের সব গ্লানি সাফ হয়ে যায়। ঝরঝরে তাজা মানুষ হয়ে ওঠেন তিনি। জাফরকে বলেন, ওদের তিনজনকে হাজার দিনার করে বকশিস দিয়ে দাও।

তখনও রাত বেশ কিছু বাকী। শাহরাজাদ আরও একটা ছোট গল্প বলতে শুরু করে—এক মাদ্রাসার মৌলভীর কিসসা:

এক বাউণ্ডেলে ছিল। তার একমাত্র ব্যবসা পরের ঘাড় ভেঙে খাওয়া। পেটে বোমা মারলে তার 'ক' বেরুবে না—এইরকম বিদ্যাধর সে। একদিন সে মতলব ভাঁজলো মাদ্রাসার মৌলভী হবে সে। নানারকম বোলচাল দিয়ে এবং কায়দা কৌশল করে হলেও সে একটা মাদ্রাসা খুলে বসলো। ভাবতে অবাক লাগে, সাধারণ ভাষাজ্ঞান বিন্দুমাত্র নাই, অথচ সে মৌলভী হয়ে গেল। এমন মুরুব্বী চালে সে কথাবার্তা বলতো যাতে মনে হবে তার মতো ভাষাবিদ বুঝি সে তল্লাটে আর দুটি নাই। সাধারণ মানুষ তার বোলচালে ভাবলো, সত্যিই বুঝি বা সে বিদ্যার দিগ্গজ। নিজেদের ছেলে-দের পাঠাতে লাগলো তার মাদ্রাসায়। কিন্তু লোকটা লেখাপড়া শেখানোর ধারে কাছ দিয়েও যায় না। রোজ সে বেত হাতে ভারিক্কী চালে মাদ্রাসায় এসে বসে। ছাত্ররা কিছু জিজ্ঞেস করতে এলে কটমট করে তাকায়। ছেলেরা ভয় পেয়ে সরে যায়।

ছেলেরা নিয়মিত বই বগলে মাদ্রাসায় হাজির হয়। নিজেরাই পড়ে, আবার নিজেরাই বই বগলে করে বাড়ি চলে যায়। এইভাবে দিনে দিনে মৌলভীর মাদ্রাসা বেশ জমে ওঠে। ছাত্র সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলে। টাকাও রোজগার হতে থাকে ঢের।

একদিন মৌলভী রোষকষায়িত চোখে বেত হাতে বসেছিল তার কুর্শিতে। এমন সময় এক অশিক্ষিত জেনানা একখানা খৎ হাতে সেখানে এসে হাজির হলো। সবিনয়ে মেয়েটি চিঠিখানা মৌলভীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, মেহেরবানী করে খৎখানা যদি একবার পড়ে দেন—

মোলেভী তখন দিশাহারা হয়ে পড়ে। এই অগ্নিপরীক্ষা থেকে কীভাবে রেহাই পাওয়া যায়—ভাবতে পারে না সে। কুল-কিনারা না পেয়ে সে ব্যস্ত বাগীশের মতো চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজা দিয়ে বাইরে বেরুবার চেষ্টা করে। কিন্তু মেয়েটি নাছোড়বান্দা। চিঠিখানা পড়ানো তার বিশেষ দরকার। তাই সে মৌলভীর পথ রোধ করে কাকুতি মিনতি করে, দয়া করে আমার চিঠিখানা পড়ে দিয়ে যান মৌলভী সাহেব—

মৌলভী বলে, আমার এখন সময় নাই। তাড়া আছে, তুমি অন্য সময় এস। দুপুরবেলার নামাজের আজান হচ্ছে। আমি আর দেরি করতে পারবো না। আমাকে মছজীদে যেতে হবে।

—আল্লাহ আপনার ভাল করবেন, মেয়েটি প্রায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে চায়, আমার স্বামী আজ পাঁচসাল বিদেশে গেছে। এতকাল বাদে এই তার প্রথম খৎ এসেছে। আমি আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারছি না। আপনি আমাকে বাঁচান, একটিবার পড়ে শোনান, সে কেমন আছে, কোথায় আছে, কবে আসবে—কী লিখেছে।

মেয়েটি প্রায় জোর করেই চিঠিখানা গুজে দিল তার হাতে। আর কোনও কাটাবার পথ নাই দেখে চিঠিখানা নিতে সে বাধ্য হলো। ভাঁজ খুলে উল্টো করে মেলে ধরলো। তারপর বিড়বিড় করে পড়ার ভান করতে করতে নানারকম বিচিত্র মুখভঙ্গী করতে থাকলো সে। কখনও বা কপাল চাপড়ালো, কখনও বা মাথার টুপী খুলে নামিয়ে রাখলো, আবার কখনও বা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

মৌলভীর এই রকম ভাবভঙ্গী দেখে বেচারী মেয়েটির বুঝতে আর বাকী রইলো না, খবর শুভ নয়। হয়ত বা তার স্বামী আর বেঁচে নাই। ভয়ার্ত কণ্ঠে কোনও রকমে সে প্রশ্ন করতে পারে, কী খবর মৌলভী সাহেব? সে কি তবে বেঁচে নাই? আল্লার দোহাই, আমার মুখের দিকে চেয়ে সত্যি কথা বলুন, কোনও কিছু লুকাবেন না।

মৌলভী তখনও মুখে রা কাড়ে না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে মেয়েটির মুখের দিকে।

আকুলভাবে সে প্রশ্ন করে, চুপ করে থাকবেন না মৌলভী সাহেব। বলুন, আমি কী এই সাজপোশাক ছিঁড়ে ফেলবো?

মৌলভী গম্ভীরভাবে শুধু বলে, ফেলো।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, আমি কী কপাল চাপড়াবো, বুক চাপড়াবো?

—চাপড়াও।

—আমি কী ডুকরে ডুকরে কাঁদবো?

—কাঁদো।

শোকে প্রায় উন্মাদের মতো মেয়েটি ছুটে মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে যায়। কপাল বুক চাপড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদে। সাজ-পোশাক কুটি কুটি করে, ছিঁড়তে ছিঁড়তে ছুটে চলে বাড়ির পথে। পাড়া-পড়শীরা ছুটে আসে। কী হলো, কী ব্যাপার।

মুখে বলার অপেক্ষা রাখে না, সবাই পলকে বুঝতে পারে অভাগীর কপাল পুড়েছে। তার স্বামীটার ইন্তেকাল ঘটেছে।

কী আর সান্ত্বনা দেবে তারা। এমন দুঃখের দিনে কিইবা সান্ত্বনা দেওয়া যায়। তবু অনেকে বোঝাবার বৃথা চেষ্টা করে, কেঁদে আর কী হবে বলো। আল্লাহ যাকে টেনে নিয়েছেন তাকে তো, হাজার মাথা কুটলেও ফেরৎ পাবে না বাছা। যাও, ঘরে যাও।

এই সময় গ্রামের একজন শিক্ষিত শেখ, তারই এক আত্মীয়, এগিয়ে এসে বলে, কই দেখি খতে কি লিখেছে।

চিঠিখানা পড়ে থ হয়ে যায় সে। একি! কে বলেছে তোমার স্বামী মারা গেছে। কে পড়ে দিয়েছে তোমার চিঠি? সে সব তো কিছু লেখা নাই। আমি পড়ছি শোন:

'চাচার মেয়ে, তোমাকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। আমি খুব বহাল তবিয়তেই আছি। এক পক্ষর মধ্যেই দেশে ফিরবো। কতদিন তোমার সঙ্গে মিলন হয়নি। এই লেফাফার মধ্যে আমি একটুকু শনের সুন্দর কাপড় তোমাকে উপহার পাঠালাম। আল্লাহ তোমার সহায় থাকুন।'

এই কথা শোনার পর মেয়েটি চিঠিখানা নিয়ে আবার মাদ্রাসার দিকে ছুটে চলে। মৌলভীকে সে জিজ্ঞেস করবে তাকে এই রকম ধোকা দেবার কারণ কী? সে তার কী সর্বনাশ করেছে!

মাদ্রাসার দরজায় ঢুকতেই মৌলভীর দেখা পেল সে। —একটা গরীব মেয়েছেলেকে এইভাবে ধোঁকা দিয়ে আপনার কী লাভ হলো মৌলভী সাহেব? কেন এমন প্রতারণা করলেন আমার সঙ্গে? আমার স্বামী তো লিখেছে, সে খুব ভাল আছে। এবং দিন পনেরোর মধ্যেই সে দেশে ফিরবে। খামের মধ্যে একখানা ছোট কাপড়ের টুকরো পাঠিয়েছে সে।

মৌলভী বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলে, তুমি ঠিকই বলেছ, মা। আমি ঐ সময় ভীষণ চিন্তিত অন্যমনস্ক ছিলাম। কী বলতে কী বলে ফেলেছি আমার কিছু মনে নাই। যাইহোক, শুনে সুখী হলাম, তোমার স্বামী সুস্থ আছেন, এবং শিগগিরই দেশে ফিরছেন।

এরপর শাহরাজাদ মেয়েদের সৌমিজের কারুকর্মের কথা বলতে থাকে।

খলিফা অল-মামুনের ভাই অল আমিন একদিন তার চাচা অল মাহদীর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দেখলো একটি পরমা সুন্দরী বাঁদী কিনে এনেছে তার চাচা। বড় চমৎকার সে গান বাজনা জানে।

মেয়েটিকে দেখামাত্র সে তার মহব্বতে মজে গেল।

ব্যাপারটা অল মাহদীর নজর এড়ায় না। ভাবে, ভাইপো আমার সুন্দরী বাঁদীর মোহে পড়েছে। অল আমিন যখন পাশের ঘরে বিশ্রাম করছিল সেই সময় অল মাহদী বাঁদীকে বললো, খুব ভাল করে সেজেগুজে তুমি আমার ভাইপোর ঘরে যাও। ও তোমার ওপর নজর দিয়েছে। মনে হয় তোমাকে ওর খুব পছন্দ হয়েছে।

বাঁদীটা সবচেয়ে দামী সাজ-পোশাক আর রত্নাভরণে নিজেকে সুন্দর

করে সাজালো। তার রূপের জেল্লা—তার ওপর এই রকম মোহিনী সাজ—যে কোনও পুরুষের বুকেই আগুন ধরাতে পারে।

পায়ে পায়ে সে অল আমিনের ঘরে এসে দাঁড়ায়। কাজল কালো সুর্মা-টানা চোখের বান হানে। আমিনের বুকে রক্তের নাচন শুরু হয়।

মেয়েটি মুচকী হেসে খানিকটা কাছে সরে আসে। ফিস ফিস করে বলে, আমাকে তোমার পছন্দ?

আমিন কী করে বোঝাবে তাকে; প্রথম দর্শনেই সে মরেছে।

আমিন জানতো, তার চাচা কচি ডাসা মেয়ের সন্ধান পেলে সব কাজ ফেলে তার পিছনে ধাওয়া করে। এ কথা আমিন কেন, পাড়া-পড়শীরা সবাই জানে। এই কচি সুন্দরীকে সে অনেক আশা করে কিনে এনেছে। মেয়েটির দেহে এখনও যৌবনের পুরো ঢল নামেনি। এই রকম মেয়েই তার সবচেয়ে বেশি পছন্দ। তার মুখের জিনিসে আমিন ভাগ বসাতে পারবে না। মেয়েটিকে বললো, পছন্দ আমার খুবই। কিন্তু তুমি চাচার কাছে ফিরে যাও। তোমাকে আমি গ্রহণ করতে পারবো না।

মেয়েটি আমিনের চোখে চোখ রাখে, কেন?

—চাচা তোমাকে পছন্দ করে নিয়ে এসেছে। আমি তার ভোগে ভাগ বসাতে চাই না।

চাচাকে চিঠি লিখলো: কচি কাঁচা আপেল গাছ থেকে পেড়ে যে মালী বাজারে নিয়ে যায়—সে তার কী দাম আশা করতে পারে? বাজারে তার তো কোনও চাহিদাই নাই!

অল মাহদী চিঠিখানা পড়ে ভাবলো, ভাইপো ভুল বুঝেছে। সে ভেবেছে বাঁদীটা এখনও নেহাতই বালিকা। মেয়েটিকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা করে, শুধুমাত্র একটি পাতলা ফিনফিনে রেশমী শেমিজ পরিয়ে, হাতে একখানা বীণা দিয়ে আবার আমিনের ঘরে পাঠিয়ে দিল সে। শেমিজটার ওপরে সুন্দর সূচীকর্ম করা ছিল। সুতোর বুননে একটি চমৎকার কবিতার কয়েকটি ছত্র ফুটে উঠেছিল:

এখনও সে কোনও হাতের স্পর্শ পায়নি,
একেবারে আনকোরা, অপাপ বিদ্ধা।
অতি সঙ্গোপনে আমি তাকে লুকিয়ে রেখেছিলাম,
ভয় ছিল, কোনও লোভাতুর শ্যেন দৃষ্টি বুঝি তাকে বিক্ষত করে।
কিন্তু না, বিশ্বাস করো, আজও আনকোরা—অপাপ বিদ্ধ,
সে শুধু এখন তোমারই,
প্রাণ ভরে আঘ্রাণ করো।

মেয়েটির যাদুকরী যৌবনের আকর্ষণে অল আমিন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। কবিতার কলিগুলো তার শিরায় শিরায় অনুরণিত হতে থাকলো।

শাহরাজাদ আবার বলতে থাকে:

একদিন খলিফা মুতাবাক্কিল অসুস্থ বোধ করে হেকিমকে ডেকে পাঠালেন। হেকিম যুহান্না একটি চমৎকার দাওয়াই-এর ব্যবস্থাপত্র লিখে দিল। খলিফা দিন-কয়েকের মধ্যে সেরে উঠে। হেকিমকে ডেকে তিনি নানা উপহার ইনাম দিলেন।

দেশের নানা প্রান্তর থেকে নানাজনে খলিফাকে অভিনন্দন জানিয়ে বহু বিচিত্র রকমের উপঢৌকন পাঠাতে লাগলো। অল ফাও ইবন কাহকন তাঁকে একটি পরমা সুন্দরী কুমারী বাঁদী পাঠালো। তার সুললিত দেহ-বল্লরী পুরুষের বুকে তুফান তোলে। তার সুডৌল আপেল সদৃশ ডাসা দুটি স্তন যে কোন নারীর হিংসার বস্তু। সেই সুন্দরী শুধু তার রূপ যৌবনের পশরা নিয়েই খলিফার সামনে হাজির হলো না, সে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল একটি মহামূল্যবান সুধাপাত্র। সুদক্ষ কারিগরের নিপুণ হাতের কাজ করা ওই সুরাপাত্রখানি সত্যিই লোভনীয়। বাদী একটি সোনার পেয়ালায় সুধা-পাত্র থেকে মদ ঢেলে খলিফার হাতে তুলে দেয়। এই পেয়ালাটার গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পলা বসিয়ে লেখা ছিল:

হেকিমের ছুরি, কিংবা
মোক্ষম দাওয়াই অথবা মলম
কোন কোন অসুখের হতে পারে উপশম
কিন্তু যদি আগাগোড়া দেহটাই নড়বড়ে হয়,
তখন মদের পেয়ালা ছাড়া আর কিছুতেই কিছু নয়।

এই সময় খলিফার পাশে হেকিম যুহান্না উপস্থিত ছিল। বাঁদীর হাতের ঐ পেয়ালার বাণী পড়ে সে হো হো করে হেসে ওঠে।

নিন জাঁহাপনা, আপনার আসল দাওয়াই এসে গেছে। আমার ওষুধে যা ফল পেয়েছেন, তার অনেক বেশি ফল পাবেন এই সুন্দরী বাঁদী আর তার সুরা পাত্র পান করে। দুনিয়াতে যত রকম প্রাচীন এবং আধুনিক দাওয়াই আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে এই দুটোই সেরা।

এরপর শাহরাজাদ অন্য কাহিনী বলতে শুরু করে:

এই কাহিনীটা মসুলের বিখ্যাত কালোয়াতী গায়ক ইশাকের:

একদিন রাত্রে প্রচুর মদ্যপান করে আমি বাড়ি ফিরছিলাম। ভীষণ প্রস্রাবের বেগ দিচ্ছিল। আমার তলপেটটা টনটন করছিল। আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। রাস্তার একধারে বিরাট একটা প্রাচীর দেখে সেইদিকে এগিয়ে গিয়ে প্রস্রাব করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ ধরে জলধারা নির্গত হওয়ার পর শরীরটা বেশ হাল্কা মনে হলো। মাটি নিয়ে উঠে দাঁড়াতে

যাবো এমন সময় ওপর থেকে কি একটা কঠিন বস্তু এসে আঘাত করলো আমার মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগলাম। আঁতকে ছিটকে সরে গেলাম কয়েক হাত। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে চেয়ে দেখি প্রাসাদের ওপর থেকে কে বা কারা রেশমীর দড়িতে বেঁধে নামিয়ে দিয়েছে একটা সুন্দর কাঠের বাক্স। ওপরটা খোলা। বাক্সের ভিতরে পাতা একখানা সুন্দর কাজকরা সুগন্ধী আসন।

সে দিন মদের মাত্রাটা একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল। বেশ নেশা হয়েছিল। নেশার ঝোঁকেই বুঝিবা কোনও কিছু চিন্তা ভাবনা না করে সোজা গিয়ে বাক্সটার মধ্যে বসে পড়লাম। তখন আমাকে এক অদ্ভুত মজায় পেয়ে বসেছিল।

একটু পরে রেশমীর দড়িতে টান পড়লো। ধীরে ধীরে বাক্সটা ওপরে উঠতে লাগলো। আমার কোন বিকার নাই, যেমন বসেছিলাম তেমনি বসে রইলাম। বাক্সটা আমাকে নিয়ে ক্রমশ উপরে উঠতে উঠতে প্রাসাদের এই অলিন্দে উঠে এল। কয়েকটি মেয়ে, মনে হল পরিচারিকা টরিচারিকা হতে পারে, আমাকে ইশারায় নেমে ঘরের ভিতরে এসে কুর্শিতে বসতে বললো। আমি সুবোধ বালকের মতো তাদের নির্দেশ মতো বাক্স ছেড়ে বেরিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলাম। মেয়েগুলো আমাকে বসিয়ে রেখে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে আর একটি সুবেশা তরুণী এসে আমাকে বললো, আমার সঙ্গে আসুন।

আমি মন্ত্রচালিতের মতো তাকে অনুসরণ করলাম। সে আমাকে অনেক বারান্দা, অনেক দরজা পার করিয়ে একটি সুন্দর সাজানো গোছানো ঝক-ঝকে তকতকে বিলাসবহুল শয়ন কক্ষে নিয়ে এসে বললো, আপনি এই গদী-আঁটা আরাম কেদারাটায় বসুন।

আমি তার আজ্ঞামতো মুখটি বুজে আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিলাম। নেশাটা ততক্ষণে থিতিয়ে এসেছে। এদিক ওদিক যতই যা কিছু নজরে পড়ে ততই কেমন ঘাবড়ে যাই। একিরে বাবা, এ আমি কোথায় এলাম! এমন সব দামী দামী বাহারী সাজ-পোশাক, আসবাব পত্র—এ তো সাধারণ মানুষের ঘরে থাকার কথা নয়। তবে কি—নেশার ঘোরে প্রাসাদেরই অন্দর মহলে ঢুকে পড়েছি নাকি?

সামনে একটা বিরাট রেশমী পর্দা। একটুপরে ধীরে ধীরে পর্দাটা উঠে গেল। দেখলাম গোটা দশেক সুন্দরী রমণী আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের মধ্যে একজন পূর্ণ শশী নিন্দিতা অনিন্দ্য সুন্দরী। সারা ঘর দামী আতর-সুবাসে মদির হয়ে গেল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাদের সালাম জানালাম। মধ্যমণি স্মিত হেসে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো, আমার কী *সৌভাগ্য, আজ এলেন আমার ঘরে। আপনি মুসাফীর, এই প্রথম দেখলাম কিন্তু মনে হচ্ছে, যেন কত কালের চেনা। তা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, মেহেরবানী করে বসুন।*

আমি বসলাম। সেও আমার পাশে বসলো। ততক্ষণে আমার নেশা

ফেনা কেটে জল হয়ে গেছে। খুব শান্ত সংযত হয়ে বসে রইলাম তার পাশে।

সুন্দরী প্রশ্ন করে, এই রাতে, এই পথে আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন? আর ঐ বাক্সেই বা বসলেন কেন? আপনি কী জানতেন, আমি বাক্সটা নামিয়ে দিয়েছিলাম?

আমার জবাব: পথে চলতে চলতে ভীষণ প্রস্রাব পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু খোলামেলা পথের ধারে বসি কি করে? তাই একটু আড়াল খুঁজতে খুঁজতে আপনাদের প্রাচীরের সামনে এসে বসে পড়লাম। প্রস্রাব-শেষে উঠতে যাবো, এমন সময় মাথায় একটা বাড়ি খেলাম। তাকিয়ে দেখি, একটা ঢাকনা খোলা রেশমীর সুতোয় বেঁধে উপর থেকে নামানো হচ্ছে। আমি তখন মদে চুর হয়ে আছি, মাথায় কেমন বদ বুদ্ধি খেলে গেল। ভাল মন্দ কী হতে পারে না পারে ভাবতে চাইলাম না, বাক্সের মধ্যে এসে বসে পড়লাম। বিশ্বাস করুন, বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে বসিনি আমি। নেহাতই মজা —নেহাতই খেয়াল। বলতে পারেন সরাবের শয়তানী।

মেয়েটি আমার কথার মধুর প্রতিবাদ করে, আহা, শয়তানী হতে যাবে কেন? আমি খুব খুশি হয়েছি, সাহেব। মনে হচ্ছে যেন, কতকাল ধরে আপনারই প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আর কাল গুণে বসেছিলাম আমি। আপনি এলেন বসন্ত ফাল্গুনে। আমি বড় আনন্দ পেলাম। তা সাহেবের কী করা হয়?

আমি যে খলিফার সভা গায়ক ইশাক সে কথা তাকে বলবো কী করে? তাহলে পরদিন সকালে সারা শহরে ঢিঢি পড়ে যাবে না? খলিফার প্রিয় গায়ক-ইশাক তামাম আরব-জোড়া যার নাম সে কিনা লম্পটের মতো চোরের মতো ঢুকেছে এক রমণীর অন্দর মহলে! নিজের পরিচয় গোপন করে বললাম, এ বান্দা, এই শহরেই তাঁতীবাজারে কাপড় বুনে।

মেয়েটি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—কী সুন্দর আপনার কথা বলার ঢং। আর কী চমৎকার আপনার ব্যবহার। আপনি তো আপনার তাঁতীকুলের শিরোমণি। আপনাকে দেখে কিন্তু আমার ধারণা হয়েছিল, আপনি কবিটবি বা তেমনি একজন কেউ-কেটা কিছু হবেন। কাব্য-টাব্য চর্চা করেন নিশ্চয়ই! কোনও নাম করা কবির পয়ার কিছু জানেন?

—খুবই সামান্য।

—তা যদি মেহেরবানী করে দু-একটা সায়ের শোনান·

না না, শোনাবার মতো তেমন কিছু জানি না। এই মানে-মাঝে মধ্যে একটু আধটু পড়ি-টড়ি আর কি? আমি বলি, তার চেয়ে আপনি আমাকে দু-চারটে শোনান। আজ রাতে আমি তো আপনার মেহেমান। আমার মনোরঞ্জন করাই তো আপনার কাজ—

মেয়েটি বলে, নিশ্চয়ই শোনাবো। আমি যা জানি সব শোনাবো আপনাকে।

এক এক করে অনেকগুলো ভালো কবিতা আবৃত্তি করলো সে। বিখ্যাত সব কবির লেখা। প্রাচীনদের মধ্যে ইমরুল অল কাইস, জুহাইর, আন্তার, নবীঘা,আমির ইবন কলতুম এবং তারাফা। আর একালের কবি-

দের মধ্যে ছিল আবু নবাস, অল বাক্কাশী আর আবু মুসারের কবিতা। সবচেয়ে ভালো লাগলো মেয়েটির আবৃত্তি করার নিজস্ব এক সুন্দর ভঙ্গী। তার সুললিত কণ্ঠের উচ্চারণ আজও আমার কানে বাজে।

মেয়েটি বললো, আশা করি এতক্ষণে লজ্জার জড়তা আপনার কেটে গেছে। এবার নিশ্চয়ই দু-একটা শোনাবেন—

আমি কাকুতি মিনতি জানাই, আপনি বিশ্বাস করুন, সুন্দরী, লজ্জা বা ভয়ের জন্য নয়, জানা থাকলে আমি সানন্দে আপনাকে শোনাতাম। কিন্তু সত্যিই আমি ও-সব রসে একেবারে বঞ্চিত। যাই হোক, আপনার যখন এতই ইচ্ছা, দু-একটা পদ্য আমি বলছি। যদি কোথাও ছাড় হয়ে যায় বা ভুলচুক হয়, মেহেরবানী করে শুধরে দেবেন।

খুব নাম করা বাছা বাছা দুটি কবিতা মোটামুটি চলনসই কায়দায় আবৃত্তি করলাম। সঙ্গত এবং অতি সহজ ভাবেই আমার কণ্ঠে সুর এসে পড়ে। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে আবৃত্তি দুটি সুর-বিহীন করার সচেতন প্রয়াস করেছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার আবৃত্তি শুনে সুন্দরী বিশেষ পুলকিত হয়েছিল।

—হায় বাপ্, কী সুন্দর ভরাট আপনার গলা। যেন মধু ঝরছিল! তাঁতী-বাজারে এমন হীরে পাওয়া যায় তাতো জানা ছিল না?

এই সময় রাত্রি প্রভাত হয়। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো পঁচাশিতম রজনীতে আবার গল্প শুরু হয়ঃ

নানা উপাচারে সাজিয়ে খানাপিনার ব্যবস্থা করা হলো। মেয়েটি নিজে-হাতে আমাকে পরিপাটি করে খানাপিনা পরিবেশন করলো। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মেজ পরিষ্কার করে সরাবের ঝারি এবং সুদৃশ্য পেয়ালা এনে রাখলো সে। এক পাত্র মদ ঢেলে সে আমার হাতে দিল।

—এবার আপনার দু-একটা কিসসা শুনতে চায় এই বাঁদী।

আমি বললাম, বহুৎ আচ্ছা, বেশ শোনাচ্ছি।

বেশ কয়েকটা মজাদার কিসসা শোনালাম তাকে। আমার গল্প বলার কায়দায় কখনও সে হেসে খুন, আবার কখনও বা ভয়ে শিউরে উঠতে লাগলো। সবই একালের শাহবাদশাহদের দরবারের কাহিনী।

এক সময়, গল্পের মাঝখানেই সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, তাজ্জব কী বাত, সামান্য একজন তাঁতীর পক্ষে খলিফার দরবারের এমন নিখুঁত খুটিনাটি সবিস্তারে বর্ণনা কী করে দেওয়া সম্ভব?

অবাক হওয়ারই কথা। কিন্তু আমার সৌভাগ্য, খলিফার দরবারের এক কর্মচারী আমার জীগরী দোস্ত। প্রতি দিন সে দরবার থেকে ফিরে এসে সব বৃত্তান্ত আমাকে শোনায়। তা না হলে এত সব ভেতরের কথা, আমি এক নগণ্য তাঁতী, জানবো কেমন করে?

সে যাই হোক, আপনার মনে রাখার ক্ষমতারও তারিফ করতে হয়। এমনভাবে বলছেন, যেন সব নিজের চোখে দেখা—

সুন্দরীর লাস্যময় ভঙ্গী, চোখের বাণ, অধরের মধুর হাসি এবং

দেহের সুবাস আমাকে সারাটা রাত মোহিত করে রেখেছিল। সে-দিনের সেই সুন্দর রাত্রির প্রতিটি মুহূর্তের সুখ-স্মৃতি আজও আমাকে পুলকিত করে। তেমন সুখের রমণীয় রাত্রি তার আগে আমার জীবনে একটিও আসেনি।

মেয়েটি বলে, আপনার কথাবার্তায় কী সুন্দর মার্জিত ভাব। আপনার শান্ত সৌম্য চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দেখে মনে হয় আপনি আর পাঁচজন সাধারণ মানুষ থেকে কত আলাদা। আর একটা অনুরোধ আপনাকে জানাবো, যদি মেহেরবানী করে আমার সঙ্গে একটু গানবাজনা করেন। আমার খুব ইচ্ছে—খুব খুশি হবো।

সঙ্গীত আমার পেশা। তাই এই আনন্দ পরিবেশে গান গাইবার কোনও স্পৃহা আমার নাই। বললাম, এক সময় গান শেখার শখ হয়েছিল, কসরৎও করেছিলাম যথেষ্ট। কিন্তু আমার গানের ইন্দ্রজালে যখন শুধু গর্দভরাই ছুটে আসতে লাগলো তখন থেকে পাড়াপড়শী ইয়ার দোস্তদের একান্ত অনুরোধে তা বন্ধ করে দিয়েছি। আর কখনও গাইনি।

আমার কথা শুনে সুন্দরী হেসে লুটিয়ে পড়ে।—ইয়া আল্লাহ, কী মজার মানুষ আপনি! কী সুন্দর করে কথা বলেন।

—বিশ্বাস করুন, গান আমার আসে না। তা না হলে আপনার মতো রূপসী কন্যা আমাকে এত খোসামোদ করছেন—আমি রাখতাম না?

তার চেয়ে আপনি গেয়ে শোনান। আপনার কণ্ঠের আওয়াজ শুনে আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারছি ও বিদ্যায় আপনি পটিয়সী। আজকের এই মধুযামিনী আরও মধুময় হয়ে উঠুক আপনার সুরের মূর্ছনায়! আর দেরি নয় সুন্দরী, আপনি শুরু করুন।

আমি ভেবেছিলাম; আর পাঁচটা মেয়েছেলে যেমন সাধারণভাবে গায় সেও তেমনি কিছু একটা গাইবে। কিন্তু তার অপূর্ব কণ্ঠ, তালমান লয় জ্ঞান শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। এতো তাবড় তাবড় নাম-জাদা ওস্তাদদেরও তাক লাগিয়ে দেবে।

আমাকে বিস্ময়ে হতবাক দেখে সে খুব খুশি হলো।

—জানেন, কার লেখা গীত এটা?

আমি যথারীতি অজ্ঞতার ভান করে বললাম, না; বলতে পারবো না।

—সে কী! তামাম দুনিয়ার কারো কি অজানা এই গীত? আবাল বৃদ্ধ বণিতা কে না জানে এর গায়ক আর গীতকারের নাম? আপনি জানেন না, এর গীতকার কবি আবু নবাস, আর গেয়েছেন মসুলের বিখ্যাত গায়ক ওস্তাদ ইশাক?

আমার মুখের কোনও ভাব পরিবর্তন হলো না। বললাম, ইশাকের গান আমি শুনেছি। কিন্তু আপনার কাছে সে দাঁড়াতে পারবে না। এমন গলা সে পাবে কোথায়?

—থাক থাক, খুব হয়েছে, অত মিথ্যে তোষামদে আমার মন ভরবে না, সাহেব। গুণী লোকের মর্যাদাহানী করে বাহবা পাওয়া যায় না। ইশাকের জুড়ি তামাম আরব দুনিয়ায় নাই। এ আপনি কী বলছেন? আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, ইশাকের গান আপনি শোনেন নি কখনও।

এই বলে আবার সে গাইতে থাকলো। এবং মাঝে মাঝে থেমে সে আমাকে ইশাকের মহিমা বোঝাতে লাগলো। এইভাবে সারাটা সুন্দর রজনী এক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল। গান থেমে গেছে, কিন্তু তার মধুর রেশ তখনও সেই ঘরের মধ্যে গুঞ্জরিত হয়ে ফিরছিল। এক অনাবিল প্রশান্তিতে ভরে গিয়েছিল আমার মনপ্রাণ। কেমন করে কোথা দিয়ে যে ফুড়ুৎ করে পালিয়ে গেল সেই রাতটা টেরই পেলাম না। সুখের সুন্দর মুহূর্তগুলো বুঝি এমনিভাবেই তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়।

একজন বয়স্কা ক্রীতদাসী এসে জানালো, রাত আর নাই। সকাল হতে চলেছে। এবার আসর বন্ধ করতে হবে। না হলে পালাবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

সেই বিদায়বেলায় তার চোখের করুণ চাহনী আমি কখনও ভুলবো না। একটিমাত্র রাতের পরিচয়, কতটুকুই বা সময়, কিন্তু তার মধ্যেই যেন আমরা অনেক অনেক শীত গ্রীষ্ম বসন্ত অতিক্রম করে ফেলেছি। মনে হলো, এই অচেনা অজানা অনিন্দ্য সুন্দরী যেন কতকালের চেনা, কত গভীর নিবিড় অন্তরের অচ্ছেদ্য বন্ধনে যেন আমরা বাঁধা। তাই এই বিদায়ের বেলায় বিচ্ছেদের বাণ বুকে বড় বেশি করে বাজে।

ভারাক্রান্ত কণ্ঠে মেয়েটি বলে, আপনি সারা রাত ধরে যেভাবে আমায় সুখসঙ্গ দান করলেন তার জন্য বহুৎ সুক্রিয়া।

আমি বলি, থাক না, ধন্যবাদের কী বা প্রয়োজন। আমি কী দিতে পেরেছি জানি না, কিন্তু যা পেয়েছি তুলনা তার নাই। একে সামান্য শুকনো ধন্যবাদে খাটো করে দেবেন না।

মেয়েটি অবাক হয়, আপনি সত্যিই সমঝদার মানুষ। ক্বচিৎ কখনও সখনো, বরাতে থাকলে, এমন গুণী-জ্ঞানী মানুষের সঙ্গ লাভ করা যায়—

আমি আর দাঁড়ালাম না। এখনি দিনের আলো ফুটবে। তাড়াতাড়ি আবার সেই বাক্স চেপে তরতর করে রাস্তায় নেমে পড়ি।

সকালবেলার নামাজ সেরে শুয়ে পড়লাম। সারাটা দিন পড়ে পড়ে ঘুমালাম। যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন সন্ধ্যা হয় হয়। তাড়াতাড়ি সাজ পোশাক করে প্রাসাদের দিকে রওনা হলাম। প্রাসাদের সচিব আমাকে জানালো, খলিফা বাইরে বেরিয়েছেন। তিনি না ফেরা পর্যন্ত আমি যেন অপেক্ষা করি। কারণ সে রাত্রে খলিফা এক উৎসবের আয়োজন করেছেন। জোর খানাপিনা নাচ গান হবে।

আমি অনেকক্ষণ বসে রইলাম। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল। তখনও খলিফা ফিরলেন না দেখে আমি প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার তখন রক্তে নাচন শুরু হয়েছে। চলতে চলতে এক সময় আবার সেই প্রাসাদ-প্রাচীরের পাশে এসে দাঁড়ালাম। কি যেন এক অদ্ভুত নেশায় পেয়ে বসেছিল আমাকে। না হলে, সে রাতে আবার সেই সুন্দরীর ঘরে যাবার তো আমার কথা ছিল না। তবু আমি কলের পুতুলের মতো সেই বাক্সটার মধ্যে বসে পড়লাম। পলকের মধ্যে আবার আমি উঠে এলাম প্রাসাদ-অলিন্দে। সেই নির্বাক মেয়েগুলো আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে গেল সুন্দরীর ঘরে।

আমাকে দেখে সে হো হো করে হেসে উঠলো।—খোদা হাফেজ, মনে হচ্ছে এইখান আপনি পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে নিতে চান।

আমি মাথা নত করে সালাম জানিয়ে বললাম, তা যদি হয় মন্দ কী। আমি আপনার অতিথি, হিসেব মতো অতিথির সৎকার যথাযোগ্যভাবে তিন দিন করার নিয়ম। আজ আমার দ্বিতীয় দিন। তৃতীয় দিনের পরেও যদি আমি আবার হ্যাংলার মতো আসি তখন নিশ্চয়ই কথা শোনাতে পারেন আপনি।

সে রাত্রিও বেশ হাসি গল্প গানবাজনার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। খুব আনন্দ পেলাম। রাত্রি শেষে আবার যখন বিদায় জানিয়ে বাক্সে গিয়ে বসলাম তখন আমি খলিফার রোষের কথা ভেবে আতঙ্কিত হতে থাকলাম। ভাবলাম, খলিফা আমার কোনও কৈফিয়ৎই মানবেন না। একমাত্র এই রোমাঞ্চকর অভিসারের কাহিনী যদি তাকে বলতে পারি তবেই হয়তো ঠাণ্ডা হতে পারেন। সেই মুহূর্তে আমার নিচে নামা হলো না। আবার ফিরে গেলাম সুন্দরীর ঘরে।

—কী ব্যাপার, ফিরে এলেন যে ?

আমি বললাম, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আপনি তো গান খুব ভালোবাসেন। কিন্তু আমি তো আপনার সে-সাধ মেটাতে পারলাম না। আমার এক সম্পর্কে ভাই আছে, সে খুব ভাল গায়। ভেবেছি আজ রাতে তাকে নিয়ে আসবো আপনার ঘরে। তার গলা শুনলে আপনি খুব খুশি হবেন। তা ছাড়া দেখতে তিনি সুপুরুষ—। ওস্তাদ ইশাকের প্রায় সব গানই সে সুন্দর করে গাইতে পারে। আপনি যদি আজ্ঞা করেন তাহলে আজ রাতেই তাকে নিয়ে আসতে পারি। আর কথা দিচ্ছি, অদ্যই শেষ রজনী। এর পর আপনাকে আর বিরক্ত করবো না।

রাত্রি শেষ হতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো ছিয়াশিতম রজনীর দ্বিতীয় যামে আবার সে শুরু করে :

মেয়েটি বলে, আপনার কি মাথাটাথায় কিছু গোলমাল ঘটেছে ? তা —আপনার ভাইকে যদি এখানে আনতে চান আনুন, আপত্তির আর কী থাকতে পারে। বলছেন, তিনি গানটান জানেন। বেশ ভালই হবে, নিয়ে আসবেন তাকে।

তার অনুমতি আদায় করে আমি ফিরে এলাম বাক্সের কাছে। তরতর করে নেমে পড়লাম নিচে।

বাড়ি ফিরে দেখি, খলিফার প্রহরী দরজায় দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখা মাত্র গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল তারা খলিফার দরবারে। পথে যেতে যেতে অনেক গালমন্দ করতে লাগলো লোকগুলো।

দরবারে ঢুকেই দেখি, রোষ কষায়িত নয়নে খলিফা বসে আছেন তখ্‌তে। চোয়ালের পেশী কঠিন হয়ে উঠেছে। আমাকে দেখামাত্র তিনি গর্জে উঠলেন, এ্যাই কুত্তাকা বাচ্চা, এত বড় স্পর্ধা তোমার, আমার হুকুম অগ্রাহ্য করতে সাহস পাও। জান এই বেয়াদপির কী সাজা ?

—দোহাই ধর্মাবতার, আমার সব কথা আগে শুনুন, তার পর সাজা দিতে হয় দেবেন। কিন্তু মেহেরবানী করে না শুনে কিছু করবেন না, হুজুর, এই আমার আর্জি।

—বল কী তোমার কৈফিয়ৎ।

—এই প্রকাশ্য দরবারে সে-কথা বলা যাবে না, জাঁহাপনা। নিভৃতে বলতে চাই।

সঙ্গে সঙ্গে দরবারের সবাইকে বাইরে চলে যেতে বললেন তিনি। তখন আমি তাঁকে গত দুটি রাত্রির রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করলাম।

—আজ রাতে সে আমাদের দুজনের জন্যেই পথ চেয়ে থাকবে। আমি তাকে কথা দিয়ে এসেছি জাঁহাপনা, আজ আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

এতক্ষণে খলিফা অল মামুনের মুখে হাসি ফুটলো।

—তাই বলো, তা তুমি এক্ষেত্রে আমার হুকুম অমান্য করে খুব একটা অপরাধ করনি। ঠিক আছে, যাবো। তুমি যে সেখানে বসেও আমার কথা চিন্তা করেছ তার জন্য আমি খুশিই হয়েছি, ইশাক। তাহলে ওই কথাই রইলো, সন্ধ্যা হতে না হতে তৈরি হয়ে চলে আসবে এখানে।

আমি বলি যথা সময়ে বান্দা হাজির হবে জাঁহাপনা। কিন্তু আপনার কাছে একটা আমার আর্জি, আমার আসল পরিচয়টা ফাঁস করে দেবেন না সেখানে। তাহলে বড় বেইজ্জৎ হব। আমি বিশ্বাস ঘাতক হবো—তার কাছে। দোহাই আপনার—

খলিফা হাসলেন, ঠিক আছে, আমার মনে থাকবে। ও-নিয়ে তুমি কোনও দুশ্চিন্তা করো না।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই খলিফা এক সওদাগরের ছদ্মবেশ ধরে আমাকে নিয়ে পথে নামলেন। চলতে চলতে এক সময় সেই প্রাসাদ-প্রাচীরের সামনে এসে দাঁড়ালাম দুজনে। একটু পরেই সেই বাক্সটা নেমে এল। আমরা দুজনেই চেপে বসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পেঁছে গেলাম সুন্দরীর সুরম্য শয্যাকক্ষে।

সে রাতে সে আরও সুন্দর করে সেজেছিল। একালে চোখ আর ফেরানো দায়। আমি লক্ষ্য করলাম, খলিফা অপলকভাবে তাকিয়ে দেখছে তাকে। তার রূপের জৌলুস তাকে প্রায় পাগল করে তুলেছে।

তারপর সুন্দরী যখন সুমধুর তানে গান ধরলো খলিফার অবস্থা তখন কাহিল। বুঝতে পারলাম তিনি আর তাঁর মধ্যে নাই তখন। সুন্দরীর ধ্যানে তাঁর চৈতন্যর দফা-রফা হয়ে গেছে। বেহেড মাতালের মতো অসংলগ্ন প্রলাপ বকতে লাগলেন তিনি। আমি প্রমাদ গনলাম।

আনন্দে উল্লাসে দিশাহারা খলিফার দিল্ তখন দরিয়া সদৃশ। এক সময় তিনি আমাকে আরও কাছে সরে আসতে বললেন, ইশাক, এস আমার কাছে এস। তুমি কেন তোমার গান শুরু করছ না, ইশাক। তোমার গান শুনে তামাম দুনিয়া পাগল হয়, আর আজ রাতে এই সুন্দরীর পাশে মুখ বুজে বসে রয়েছ! এমন সহেলী রাত কী রোজ রোজ আসবে ইশাক। গাও, তোমার সব চাইতে ভালো গানগুলো শোনাও তাকে। বড় গুণী

মেয়ে, গুণের কদর করবে।

মরমে মরে গেলাম আমি। আমার সব ছলনা ধরা পড়ে গেছে। মেয়েটির কাছে আমি মিথ্যেবাদী হয়ে গেলাম। মাথা হেট করে বললাম, যো হুকুম জাঁহাপনা।

মেয়েটি কয়েক মুহূর্ত অপলকভাবে আমাদের দু'জনকে দেখতে থাকলো। তারপর এক সময় কোনও কথাবার্তা না বলে ভীত-চকিত এক হরিণীর মতো পর্দার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেললো। সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে এই ছদ্মবেশী সওদাগর স্বয়ং খলিফা ছাড়া আর কেউ নন। আমার 'জাঁহাপনা' হুজুর' এই সব সম্বোধনে তার মনে অনেকক্ষণ ধরেই সন্দেহের উদ্রেক করেছিল। এবার আমার পরিচয় ফাঁস হওয়াতে সে নিঃসন্দেহ হয়ে গেল ইশাকের সঙ্গীটি সুলতান ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। যেহেতু সুলতানের সামনে কোনও নারীই বেআব্রু থাকতে পারে না, সেই কারণে সে পর্দার আড়ালে চলে গেল।

খলিফা ঈষৎ ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, আমাকে কী মনে ধরলো না? পালিয়ে গেল কেন ইশাক?

এ কথার আমি আর কী জবাব দেবো। খলিফা এবার কিছু রাগ প্রকাশ করলেন, খোজ নাও তো, মেয়েটি কে? এই বাড়ির মালিককে একবার তলব কর।

আমি খলিফাকে ফিসফিস করে বললাম, ওসব কথা শুনলে এরা যে আপনাকে সন্দেহ করবে, জাঁহাপনা।

খলিফা জিভ কামড়ালেন। আমাকেও তর্জন করলেন, তোমারই বা কী বুদ্ধি! এরকম 'জাঁহাপনা টাঁহাপনা' না বললেই কী হতো না!

—ইস্, তাই তো ভারি বেকুফের মতো কাজ হয়ে গেছে—

খলিফা বললেন, আর লুকিয়ে কোনও লাভ নাই। সবই সে জেনে ফেলেছে। যাই হোক, বাড়ির মালিককে একবার খোঁজ করতো।

বৃদ্ধা দাসীটার কাছ থেকে জানতে পারা গেল সেই প্রাসাদের মালিক খলিফারই দরবারের উজির শাহল্। এই সুন্দরী মেয়েটি তারই।

খলিফার হুকুমে উজির এসে কুর্নিশ করে দাঁড়ায়। মুখে চোখে দারুণ বিস্ময় আর আতঙ্ক। খলিফাকে এইভাবে এখানে দেখবে তা সে স্বপ্নে ভাবতে পারেনি।

খলিফা অল মামুন হো হো করে হেসে ওঠেন, এ তোমার মেয়ে?

—হ্যাঁ, হুজুর।

—কী তার নাম?

—কাদীজা

—শাদী হয়েছে?

—না, হুজুর।

খলিফা বললেন, আমার ইচ্ছা, তোমার মেয়েকে আমি ধর্ম মতে শাদী করে বেগম করবো। তোমার কী মত, বল।

উজির বলে, আমি এবং আমার মেয়ে জাঁহাপনার একান্ত আজ্ঞাবহ, হুজুর। আপনি যা বলবেন, তাই হবে।

তোমার মেয়েকে আমি একলক্ষ দেন মোহর দেবো, উজির। কাল সকালে আমার প্রাসাদে গিয়ে তুমি টাকাটা নিয়ে আসবে। ইতিমধ্যে তোমার মেয়েকে তুমি রাজি করাও। তাকে আমার বেগম হওয়ার মতো করে তৈরি কর। আমি তোমার মেয়ের পরিবার পরিজনদের জন্য এক হাজারটি গ্রাম এবং এক হাজারটি খামার যৌতুক দেবো। তুমি সবাইকে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিও।

এই বলে খলিফা উঠে দাঁড়ালেন। আমিও। এবার আমরা সদর ফটক দিয়েই রাস্তায় বেরুলাম। বাক্সে ঝুলে নামার আর দরকার হলো না।

খলিফা আমাকে সতর্ক করে বললেন, এ ব্যাপারে কারো কাছে কিছু বলবে না, ইশাক।

খলিফা এবং কাদীজা যতকাল জীবিত ছিলেন একথা কারো কাছে কখনও আমি বলিনি। এতটা বয়স হলো, জীবনে অনেক নারী আমি দেখেছি, কিন্তু কাদীজার মতো পরমা সুন্দরী একটাও চোখে পড়েনি। আল্লা জানেন, তার সমান সুন্দরী তিনি আর কাউকে বানিয়েছেন কিনা।

গল্প শেষ হলে দুনিয়াজ উঠে এসে শাহরাজাদকে জড়িয়ে ধরে। কী সুন্দর কিসসা, দিদি। আর কী অপরূপ মিষ্টি করেই না তুমি বলতে পারো।

শাহরাজাদ বলে, এর পর তোমাদের আর একটা কিসসা শোনাই।

মক্কায় প্রতি বছর একটা সময়ে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। তারা দলে দলে কাবাহকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে আল্লাহর কাছে দোয়া চায়। একদিন এইভাবে একদল তীর্থযাত্রী কাবাহ প্রদক্ষিণ করছিল আর যে যার নিজের নিজের মনের কামনা বাসনা নিবেদন করছিল। পুণ্যার্থীদের একজনের অদ্ভুত ধরণের মনস্কামনা শুনে সবাই ক্ষেপে আগুন হয়ে ওঠে। লোকটা কাবাহ প্রদক্ষিণ করতে করতে বারবার একটিমাত্র কথাই আওড়াচ্ছিল : 'আল্লাহ, মেয়েটা যেন তার স্বামীকে ঘৃণা করতে শেখে। তাহলে আমার বরাত খুলে যাবে। আমার সারা জীবনের একমাত্র বাসনা তাকে নিয়ে আমি শোবো।'

এই ধরনের অপবিত্র নোংরা কথা ধর্মস্থানে যদি কেউ উচ্চারণ করে তবে কি মুখ বুজে সহ্য করা সম্ভব? তাই ক্ষিপ্ত জনতা তার ওপর চড়াও হয়ে কিল চড় লাথি ঘুসি ইত্যাদি বেপরোয়াভাবে চালাতে থাকে। এতই তারা ক্রোধান্বিত হয় যে, বেধড়ক মার-ধোর দিয়েও তারা ক্ষান্ত হলো না। সবাই মিলে তাকে কাবাহ আমিরের কছে টেনে নিয়ে গেল। এই আমিরই মক্কার সর্বময় কর্তা। তার ওপর আর কারো কোনও কথা চলে না। সুলতানেরও না।

সব শুনে সে রায় দিল, লোকটাকে ফাঁসীতে ঝোলাও।

এই সময় রাত্রির অন্ধকার কেটে আসছে দেখে শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো সাতাশিতম রজনীতে আবার সে বলতে থাকে :

কিন্তু লোকটা আছাড় খেয়ে পড়লো আমিরের পায়ে, দোহাই ধর্মাবতার, আপনি আল্লাহর পয়গম্বর। আমার সব কথা না শুনে এই গুরুদণ্ড আমাকে দেবেন না।

আমির বলল, ঠিক আছে, বল তোমার কী বলার আছে।

লোকটা তখন বলতে থাকে :

আমি দুটি ব্যবসা করি। রাস্তার যতো নোংরা জঞ্জাল সাফ করা আমার প্রথম কাজ। এছাড়া কসাই এর দোকান থেকে ভেড়ার নাড়িভুঁড়ি কুড়িয়ে পরিষ্কার করে বিক্রি করি। এই আমার জীবিকা।

একদিন আমার গাধাটার পিঠে এইরকম সংগৃহীত নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে আমি তার পিছনে পিছনে চলছিলাম। এমন সময় হঠাৎ দেখলাম একদল লোক ভীতচকিত সন্ত্রস্ত হয়ে আমার দিকে ছুটে আসছে। আর তাদের পিছু পিছু ইয়া বড় বড় লাঠিসোটা নিয়ে তাড়া করে আসছে কতকগুলো সশস্ত্র নিগ্রো ক্রীতদাস। তাদের একজনকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার, কী হয়েছে ?

লোকটা বললো, হারেমের মেয়েরা এই পথ দিয়ে যাবে। তাই পথঘাট জনশূন্য করার হুকুম হয়েছে।

তার কথা শুনে আমার হৃদকম্প শুরু হলো। এখন আমি কী করি, কোথায় লুকাই। দিশাহারা হয়ে গাধাটাকে একপাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমি রাস্তার দিকে পিছন ফিরে একটা বাড়ির দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকলাম কোনভাবেই যাতে আমার নজর না যায় খানদানী ঘরের মেয়ের ওপর।

একটুক্ষণ পরে বুঝতে পারলাম বহু দাসী খোজা পরিবৃত হয়ে হারেমের মেয়েরা পার হয়ে যাচ্ছে। আমি প্রায় দেওয়ালে সেটে গেছি তখন। কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি পাওয়া গেল না। দুটো নিগ্রো এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার ওপর। দুদিক থেকে দুজনে ঝাপটে ধরলো আমাকে। আমি তখন ভয়ে থর থর করে কাঁপছি। মুখ ফিরে দেখলাম, আর একটা নিগ্রো আমার গাধাটাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আর দেখলাম গোটা তিরিশেক মেয়ে আমাকে ড্যাব ড্যাব করে দেখছে। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে ডানা কাটা হুরীর মতো অপূর্ব সুন্দরী। তার কাজল কালো টানাটানা চোখ, টিকলো নাক, আপেলের মতো টুকটুকে গাল, পাকা আঙ্গুরের মতো অধর বেহেস্তের হুরীকেও হার মানায়।

আমার হাত দুখানা পিছমোড়া করে বেঁধে আমাকে টানতে টানতে নিয়ে চললো নিগ্রো দুটো। আমি যতই বলি, আমি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কোনও কিছুই দেখিনি। কিন্তু কে শোনে কার কথা। পথচারিরাও আমার হয়ে ওকালতী করলো অনেক। কিন্তু নিগ্রো দুটো কোনও কথাই কানে তোলে না। কয়েকজন রুখে এল আমার হয়ে, একি অন্যায় কথা, এর কী দোষ ? কেন একে পাকড়াও করেছ। পথঘাট সাফা রাখা এর কাজ। রাস্তা ছাড়া ও যাবে কোথায় ? তা ছাড়া হারেমের কোনও জেনানার দিকে তো নজর দেয় নি। ওতো দেওয়ালের দিকে মুখ

করে দাঁড়িয়েছিল। এইরকম একজন নিরীহ নিরপরাধ লোককে গ্রেপ্তার করলে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন না।

কিন্তু আমাকে যারা পাকড়াও করেছিল তাদের কানে ঢুকলো না সে-কথা। টানতে টানতে আমাকে নিয়েই চললো তারা।

আমি শুধু ভাবতে লাগলাম এমন কি অপরাধ আমি করলাম যার জন্য এরা আমাকে এইভাবে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে। একবার মনে হলো, আমার গাধার পিঠে-বোঝাই কাঁচা নাড়িভুঁড়ির দুর্গন্ধে হয়তো কোন গর্ভবতী মেয়ের গা গুলিয়ে গিয়ে থাকবে। আর তারই রোষে পড়েছি আমি! অথবা আমার এই শতছিন্ন ময়লা সাজপোশাক দেখে তারা কুপিত হয়েছে! যাই হোক, এ বিপদ থেকে এখন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউই বাঁচাতে পারবে না আমাকে।

সহৃদয় পথচারীদের অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে তারা আমাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যেতে থাকলো। আমাদের সামনে সামনে চলেছে হারেমের বিশাল বাহিনী।

চলত চলতে এক সময় তারা এক প্রকাণ্ড প্রাসাদের সদর ফটকে এসে ঢুকলো। ভিতরে ঢুকে আমাকে এক আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো। প্রাসাদের আদালত যে এত চমৎকার সাজানো গোছানো জমকালো ভাবতে পারে না সে। কাজীর বিচার, নির্ঘাৎ গর্দান যাবে আমার। এইভাবে বেঘোরে প্রাণটা যাবে। আমার পরিবারের কেউই তো জানতে পারবে না, জলজ্যান্ত মানুষটা কাজে গেল, আর ফিরলো না। হাজার খুঁজেও কি তারা আমার লাশের হদিশ করতে পারবে?

অঝোর নয়নে কাঁদতে থাকি আমি। একটু পরে একটি ক্ষুদে ছোকরা বান্দা এসে আমাকে সঙ্গে করে একটা হামামে নিয়ে গেল। সেখানে দেখলাম, তিনটি মেয়েছেলে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখা মাত্র তারা বললো, তোমার ঐ জগঝম্প সাজপোশাকগুলো খুলে ফেলো।

আমি মুন্ত্রমুগ্ধের মতো তাদের কথা মতো বিবস্ত্র হলাম। ওরা আমাকে গরম জলের ফোয়ারার পাশে নিয়ে গেল। শ্বেত পাথরের মেজেতে আমাকে শুইয়ে ফেলে সাবান খোসা আর গরম জল দিয়ে উল্টেপাল্টে আচ্ছা করে ডলাইমলাই করতে থাকলো। সাতজন্মে আমি গায়ে সাবান মাখি নি। পানির অভাবে ভালো করে গোসল করতে পারি নি। এক পরত ময়লা জমে জমে দেহের আসল রঙ কবে যে চাপা পড়ে হারিয়ে গিয়েছিল আমি নিজেই বুঝতে পারি নি। সাবান খোসা দিয়ে সাফা করার পর নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে নিজেই আমি অবাক হয়ে যাই। এমন কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙ কি আমার কখনও ছিল? ওইরকম শঙ্কা ভয়ের মধ্যেও মুহূর্তের জন্য আমার মন খুশিতে ভরে ওঠে। ঘষা মাজা শেষ হয়ে গেলে ওরা আমাকে আতর সুবাসিত চৌবাচ্চার জলে চুবিয়ে দিল। অনেক-ক্ষণ ধরে অবগাহণ করে গোসল করলাম। তারপর ওরা আমাকে শুকনো তোয়ালে দিয়ে ভালো করে গা হাত-পা মুছিয়ে দিল। এর পর পাশের আর একটা কামরায় নিয়ে গিয়ে নতুন সাজপোশাক পরালো। এমন জমকালো বাদশাহী সাজে আমি শুধু আমির বাদশাহদের সাজতে দেখেছি। সাধারণ

মানুষ এসব পরার স্বপ্নও দেখতে পারে না। আমি ভাবতে থাকলাম, এবার যদি ওরা আমাকে ফাঁসীর দড়িতেও ঝোলায় তাতেও আমার দুঃখ নাই। জীবনটা তো রাস্তা ঝাড়ু দিয়ে, জঞ্জাল সাফা করে আর ভেড়ার নাড়িভুঁড়ি পরিষ্কার করেই কাটলো। লোকে আমাকে ধাঙড় বলে দশ হাত দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। আমি অস্পৃশ্য, অসুচী। কিন্তু আজ এই ইন্তে-কালের সময় আমার সব সাধ পূরণ হয়ে গেল। কয়েক দণ্ডের জন্য হলেও আমি তো শাহজাদার মতো সাজতে পেরেছি। আমার আর কোনও দুঃখ নাই।

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

তিনশো অষ্টআশিতম রজনীতে আবার সে বলতে শুরু করে :

পরিপাটি করে সাজিয়ে গুজিয়ে ওরা আমার গায়ে গোলাপজল আর দামী আতরের খুসবু ছিটিয়ে দিল। তারপর আমার হাত ধরে নিয়ে চললো। চলেছি—যেন এক শাদীর পাত্র। এক সুরম্য শয্যাকক্ষে নিয়ে গিয়ে আমাকে সোনার পালঙ্কে মখমলের বিছানায় বসতে বললো তারা। এমন সুন্দর সাজানো গোছানো ঘর আমি জীবনে কখনও দেখিনি। মুখে আমার এমন কোনও ভাষা নাই, সে ঘরের বাহারের বর্ণনা দিতে পারি। দামী দামী আসবাব আবরণে সারা ঘরটা চমৎকার করে সাজানো।

রাস্তায় যে মেয়েটিকে দেখে মনে হয়েছিল বেহেস্তের ডানা কাটা হুরী, তাকে দেখলাম পালঙ্কের মাঝখানে গা এলিয়ে শুয়ে আছে। পাতলা ফিন-ফিনে মসুলের সূক্ষ্ম কাজ করা শুধুমাত্র একটা রেশমী-কামিজ তার গায়ে। আর কোনও পোশাক নাই। পালঙ্কের চারপাশ ঘিরে রয়েছে এক দঙ্গল বাঁদী। মেয়েটি ইশারায় বললো, তার কাছে ঘেঁষে বসতে। বাঁদীদের হুকুম করলো, খানাপিনা সাজাও।

পলকের মধ্যে মেজে কাপড় পাতা হলো। নানা রকম নাম-না-জানা সুগন্ধী খানা-পিনা এনে সাজিয়ে দিল তারা। এ-সব খানা আমি জীবনে কখনও, আস্বাদ করা দূরে থাক, চোখে দেখিনি। কত রকম মাংসেরই খাবার। আঘ্রাণেই পেট ভরে যায়।

খিদেও পেয়েছিল যথেষ্ট, খুব তৃপ্তি করে খেলামও। খানা শেষ করে হাত-মুখ ধুয়ে ফল খেলাম দু একটা। নানা রকম সরাবের পাত্র সাজানো হয়েছিল। এবার সুন্দরী নিজ হাতে সোনার পেয়ালায় সরাব ঢেলে তুলে দিল আমার হাতে। নিজেও নিল এক পেয়ালা।

এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে পেয়ালা নিঃশেষ করলাম আমরা। মৌতাত বেশ জমে উঠলো। গুলাবী নেশায় ক্রমশ ছোট হয়ে আসতে থাকে আমার চোখ। সুন্দরীও তখন নেশায় বুদ হয়ে গেছে।

এবার সে ইশারা করতেই দাসী বাঁদীরা সবাই ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। মেয়েটি এক হ্যাঁচকাটানে আমাকে তার বুকের ওপর নিয়ে গিয়ে ফেললো। আমি একেবারে তার দেহের সঙ্গে সেঁটে গেলাম। ওর বুকের ডাসা স্তন দুটি নিপীড়িত হতে থাকলো আমার বুকের তলায়।

তারপরের ব্যাপার আর আপনার সামনে বলতে পারবো না, আমির সাহেব। তবে সহজেই অনুমান করতে পারছেন। আমার খেটে খাওয়া শক্ত সমর্থ দেহের উত্তপ্ত মাংস পেশীর নিষ্পেষণে তার কামজরজর কুসুম পেলব দেহবল্লরী এক সময় অসাড় হয়ে নেতিয়ে পড়লো।

আমি আর সে সারাটা রাত স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো জড়াজড়ি করে কাটালাম। যখন ঘুম ভাঙ্গলো দেখি, ভোর হয়ে আসছে। সে বললো, আর না, এবার তোমার যাবার সময় হয়ে গেছে, উঠে পড়। লক্ষ্য করলাম, মেয়েটির মুখে চোখ কামনার কোনও চিহ্ন নাই—এক অনাবিল প্রশান্তির ছাপ নেমে এসেছে।

আমি উঠে পোশাক পরে নিলাম। সে আমাকে একখানা কাজ করা রেশমী রুমাল উপহার দিয়ে বললো, এটা কাছে রেখ, আমার কথা মনে পড়বে।

রুমালের এক কোণে কী যেন বাঁধা ছিল। আর এক কোণে লেখা ছিল 'গাধাটাকে খাবার কিনে দিও।'

—তোমাকে আমার মাঝে মাঝে প্রয়োজন হবে। লোক পাঠাবো—তার সঙ্গে চলে আসবে, কেমন?

আমি ঘাড় নেড়ে বলি, সে তো আসবোই—

গাধাটাকে নিয়ে নাড়িভুঁড়ির আড়তে গেলাম। মালগুলো বিক্রি করে দিলাম। রুমালখানা বের করে খুঁটে বাঁধা বস্তুটা নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করতে করতে ভাবলাম, হয়তো বা কিছু তামার পয়সা বাঁধা আছে। কিন্তু গিটটা খুলতেই আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। পঞ্চাশটা সোনার পয়সা। এক সঙ্গে এতগুলো মুদ্রা দেখিনি কখনও। একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে মাটি খুড়ে গর্ত করে পয়সাগুলো পুর্তে রেখে আবার দোকানের সামনে এসে রোয়াকে বসলাম।

নিজের মনেই গত রাতের অবিশ্বাস্য বোমাঞ্চকর অভিযানের স্মৃতি-চারণ করতে থাকলাম। এইভাবে সারাটা দিন কেমন করে কেটে গেছে, বুঝতে পারিনি।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমি তখনও একভাবে ঠায় বসে আছি দোকানের রোয়াকে, এমন সময় একটা লোক এসে আমাকে বললো, চল. যেতে হবে।

আমি জিজ্ঞেস করি, কোথায়?

—চল, গেলেই জানতে পারবে।

আমি লোকটাকে অনুসরণ করে চলি।

আবার সেই প্রাসাদের হারেমে এসে পড়লাম। সেই বিলাসবহুল সুরম্য শয্যা কক্ষে। সেই স্বল্প বসনা সুন্দরী ঠিক তেমনিভাব মখমলের শয্যায় গা ডুবিয়ে শায়িতা। পালঙ্কের চারপাশে বোবা বাঁদীরা দণ্ডায়মান।

আমি আভূমি আনত হয়ে কুর্নিশ জানিয়ে দাঁড়ালাম তার সামনে। সে আমাকে ইশারায় বসতে বললো তার পাশে। তুড়ি বাজাতেই খানাপিনা সাজানো হলো মেজ-এ। তেমনি নানা স্বাদের মুখরোচক সব সুন্দর সুন্দর খাবার। তৃপ্ত করে খেলাম।

তারপর সে নিজে হাতে ঢেলে দিল আমাকে সরাব। নিজেও নিল। ধীরে ধীরে নেশা জমতে থাকে। ইশারা করতেই বাঁদীরা বাইরে চলে যায়।

আমাকে টেনে নেয় সে বুকে। তারপর আমার কঠিন বাহুর বন্ধনে তার মোমের মতো দেহখানা গলে গলে নিঃশেষ হতে থাকে। সারাটা রাত এই ভাবে সে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সুধাপাত্র পূর্ণ করে নেয়। বিনিময়ে সকালবেলা সে আমাকে একখানা কাজ-করা রেশমী রুমালে বেঁধে পঞ্চাশটা সোনার দিনার ইনাম দেয়। আমি আবার ফিরে যাই সেই গর্তটার পাশে। আগের পয়সাগুলোর সঙ্গে এক করে রেখে দিই সেদিনের দিনারগুলো।

এইভাবে এক এক করে আটটা রাত্রির রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, আর কিছু স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চয় করি আমি। প্রতি রাত্রেই খানাপিনার অঢেল এলাহী বন্দোবস্ত করে সে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা যথারীতি সেই সুন্দরীর ঘরে খানাপিনা সেরে সবে আমার সাজ-পোশাক খুলতে আরম্ভ করেছি, এমন সময় একটি বাঁদী এসে ফিস্‌ফিস্‌ করে কি যেন বলে আবার তক্ষুণি দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল। আমি লক্ষ্য করলাম ; একটা অজানা আতঙ্কের রেখা ফুটে উঠলো তার কপালে। তড়াক করে বিছানা ছেড়ে নেমে দাঁড়ালো সে। আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল ছাদের ওপরে চিলে কোঠায়। ছোট্ট খুপরীর মতো একটা ঘর। সেখানে পুরে শিকল তুলে দিয়ে সে চলে গেল।

অন্ধকারচ্ছন্ন খুপরীর দু পাশে দুটো ছোট্ট ঘুলঘুলি। কানে এল অশ্ব খুর ধ্বনি। একদল লোক ঘোড়া ছুটাতে ছুটাতে এসে থামলো প্রাসাদ প্রাঙ্গণে। বেশ পরিষ্কার দেখতে পেলাম। এক অপূর্ব সুন্দর সুঠামদেহী এক নওজোয়ান, আর তার জনাকয়েক নফর চাকর। ঘোড়া থেকে নেমেই প্রায় ছুটে এসে সে ঢুকে পড়লো সুন্দরীর শয্যা কক্ষে।

আমি অন্য একটা ঘুলঘুলিতে চোখ রেখে সে-ঘরের খোলা জানালা দিয়ে সব কিছুই প্রত্যক্ষ করতে থাকলাম। ক্ষিপ্র হাতে সে তার সাজ-পোশাক খুলে ছুড়ে দিল। যুবকের দেহ-সৌষ্ঠব দেখার মতো। যেন এক দুর্ধর্ষ জাঁদরেল বীর সেনাপতি। ক্ষুধার্ত সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো সে মেয়েটির দেহের ওপর। তার কামোত্তেজিত নাকের শ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ কানে আসতে লাগলো। মনে হয়, যেন কোনও কামার-শালার হাপর চলেছে। আর রিরংসায় জরজর মেয়েটির শীৎকার শুনে বুঝতে কোনও কষ্ট হলো না, এই রকম আসুরিক পৌরুষের দাপট আর দংশন না হলে নারীর কামনার ক্ষুধা মেটানো যায় না। সারারাত ধরে আমি লক্ষ্য করতে থাকলাম ওদের নানা রকম শৃঙ্গার, রাগমোচন আর রতিরঙ্গ। নিজেকে বড় দীন ভিখারী অসহায় মনে হতে লাগলো। আমার দেহে তো তেমন তাগদ নই—ওই ভাবে কী আমি তুষ্ট করতে পারি ?

রাত্রির অন্ধকার কাটতে থাকে। শাহরাজাদ গল্প থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

তিনশো উননব্বইতম রজনী :

আবার সে বলতে থাকে।

রাত্রি শেষ হতে এক এক করে অনেকবার তারা রতিরঙ্গে মাতলো। তারপর ভোরের আলো ফোটার আগে ওর স্বামী আবার সাজ পোশাক পরে

সশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে সুন্দরী এসে শিকল খুলে আমায় আবার ঘরে নিয়ে আসে।
—আমার স্বামীকে দেখলে?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, হ্যাঁ। খুব সুন্দর সুপুরুষ দেখতে। তা এমন বীর সেনাপতির মতো তাগদ তার, তোমার তো সব কামনা বাসনাই সে ভালো করে মেটাতে পারে, তাকে ফেলে আমার মতো একটা ধাঙড়-মেথরকে ঘরে নিল কেন তুমি?

মেয়েটি বললো, ঠিকই বলেছ, আমার স্বামীর যা ক্ষমতা, কম পুরুষেরই তা থাকে। কিন্তু সে-ই বুঝি হয়েছে আমার কাল। তুমি তো সারারাত ধরে দেখলে, আচ্ছা তুমিই বল, একটা মরদের এত পৌরুষ কী কোনও মেয়ে সব সময় সহ্য করতে পারে। হয়তো কখনও সখনও তাকে পুরোপুরি খুশি করতে পারি না, তাতে সাহেবের গোসা হয়ে যায়। একদিন হয়েছে কি, শোন: আমি আর আমার স্বামী সন্ধ্যাবেলা বাগিচার ভিতরে বসে আছি। হঠাৎ কী হলো, আমাকে বসিয়ে রেখে সে উঠে চলে গেল। আমিও পায়ে পায়ে তার পিছনে পিছনে আসলাম। তারপর যা দেখলাম তা আর কী বলবো। আমাদের বাসন মাজার এক আধবুড়ি ঝিকে নিয়ে সে রসুইখানার মেঝেয় একখানা মাদুর পেতে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। সারা শরীর আমার রী রী করে জ্বলতে লাগলো। কি কুৎসিৎ তার রুচি প্রবৃত্তি। সেই দিনই আমি কসম খেলাম। এর উচিৎ জবাব একটা দিতেই হবে। মনে মনে ঠিক করলাম, ও শুয়েছে বাসন মাজা ঝিকে নিয়ে। আর আমি শোবো রাস্তার সবচেয়ে নোংরা কুৎসিৎ কোনও ধাঙড় মেথরকে নিয়ে। সেই কারণে পরদিন থেকে রাস্তায় বেরুতে শুরু করলাম। কোথায় পাওয়া যায় সব চেয়ে নোংরা কুৎসিৎ—সমাজের সবচেয়ে নিচুতলার একটা মানুষ, তারই সন্ধানে। পর পর পাঁচদিন খোঁজার পর সে-দিন তোমার দেখা পেলাম। এই কদিন তোমাকে নিয়ে শুয়ে আমি আমার গায়ের ঝাল মিটিয়েছি। যোগ্য প্রতিশোধ আমি নিতে পেরেছি তার ওপর। ব্যাপারটা সে আঁচ করেছে। তাই কাল রাতে আমার ঘরে আবার এসেছিল। যাক আপাতত একটা ফয়সালা হয়ে গেছে। আমাকে সে কথা দিয়েছে, আর কখনও ঐরকম নোংরা কাজ সে করবে না। কিন্তু পুরুষ মানুষকে আমি বিশ্বাস করি না। তবে এও তোমাকে আমি বলে রাখছি, ফের যদি সে কথার খেলাপ করে আবার আমি তোমাকে ডাকবো। যাক, আপতত তুমি বিদায় হও। পরে দরকার হলেই আবার ডাকবো।

সে দিন যাবার আগে সে আমাকে এক থোকে আরো চারশো সোনার দিনার ইনাম দিয়েছে। আমি সেই থেকে পথ চেয়ে আর দিন গুণে বসে আছি। কবে তার স্বামী আবার কোনও একটা মেয়েমানুষের কাছে যাবে, কবে আমার আবার ডাক পড়বে। কিন্তু দিনে দিনে মাস যায় মাসে মাসে বছরও কাটে, আমার দয়িতা আমাকে ডাকে না। তাই আমার মনের মধ্যে ঝড় উঠেছে। আমি আর থাকতে না পেরে বহু পথ হেঁটে, অনেক কায়-ক্লেশে এই মক্কায় এসছি খোদাতালার দরবারে আমার মনের দুঃখ জানাতে। যদি তিনি আমার কাতর প্রার্থনা শুনে প্রসন্ন হন—এই ভরসায় কাবাহ প্রদক্ষিণ

করার সময় আমার একমাত্র বাসনাই তাকে জানাচ্ছিলাম। আপনিই বলুন, আমির সাহেব, কী আমি অপরাধ করেছি?

লোকটাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। খুব একটা মারাত্মক কিছু দোষ ওর নাই।

কাহিনী সূচী

কাহিনী সূচী